Cuk-405783-1-1787-P30081

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

-পঞ্জি ১

আ

-া ৩৬৯
১৬১
-য়কতার কথা ৩১৫
-দর আশা ১৩৩
-দর লক্ষ্য ৮৩
-ঃ ? ১২৫
-কথা ২০৬

ঈ

-প্রণিধান ২৭৩

ঋ

২০৯

এ

-া ৬৭

ক

-পূজা ৩২১

গ

-পরিবর্ত্তন ১২৯
-শিষ্য ২৯, ৪৫, ৬২

চ

-চুম্বক ১৬২, ২৪২

ছ

-কথা ২৫৮

জ

-ী ২৬৯

ত

-ধর কথা ৩৭৩
-র আদর্শ ৬৯

দ

দুর্গমঃ পথস্তৎ ৩১১
দুর্গোৎসব ৩০৫
দেবজন্ম ৫২
দেবলীলা ১৬৪
দেশের কথা ৩১
দ্বন্দ্বজয় ১৯৪

ধ

ধর্ম্ম ১৭৭
ধর্ম্মসাধনা ২৯৭

ন

নিত্য ও লীলা ৯
নির্ভরতা ২১০
নীচুশ ৩২৪
নূতনের পূজা ৯
নূতনের প্রতি ২২৮

প

পরিণাম ৪৩
পরিবর্ত্তন ৮০
পাগলের চিঠি ৯১, ২৬৬
পূর্ণের আনন্দ ৯৫
পূর্ণাভাষ ৩৫৩
প্রকৃতি রহস্য ৫
প্রশ্নোত্তর ২৭২, ৩০২
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৩৩
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দীক্ষা ২১২
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ ৫৬
প্রাপ্তি-স্বীকার ৩২০
প্রেমের কথা ৫৪১

ব

বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা ৩০৩

বর্ণাশ্রম ২৩
বর্তমান সমস্যা ১৪৭
বাঙ উৎসব ১১৩
বাঙ্গালীর অন্নলাভ ১৯১
বাঙ্গালার রণশিক্ষা ২৯৪
বাণী ১৪
বার্তা ৩৭১
বিজয়া দশমী ৩৬৬
বিশ্ব-বিমোহিনী বঙ্গভূমি ৩৮২
বিশ্ব সৌন্দর্য্য ১৯৭
বুদ্ধির কথা ৩৩৯
ব্যাধ কোথায় ? ৩৩৭

ভ

ভগবান বিশ্বাস ৬৫
ভলন্টিয়ার প্রসঙ্গ ১৭৪, ২২৩
ভারতের ব্রত ২৮৯
ভারতের ভবিষ্যৎ ৮৫
ভোগঃ যোগায়তে ২৪৫

ম

মনের মানুষ ৩৫১
মনোবেদনা ২২৫
মহিমা ২৯১
মানবজাতির একতার আদর্শ—
১০২, ১১৭, ১৮১, ২৭৭, ৩৫৮
মানুষ না পুরুষ ? ১৪০
মানুষের কথা ৩৪২
মা ভৈঃ ১৪৬
মুক্তি ১১৪
মূল কথা ১৯৩

য

যুগ সম্মিলন
যুগাবতার রামকৃষ্ণ
যোগ ১০৯, ১৩
২০১, ২১৯, ২৩৫, ২৫০,
৩৪৬,
যোগের উদ্দেশ্য
যোগের কথা
যৌবন যুগ

র

রণসাধ
রবীন্দ্রনাথ
রাসলীলা
রুচি

ল

লক্ষ্য ও উপায়

শ

শিক্ষা
শুদ্ধি
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ইত্যাদি

স

সত্যং ঋতং বৃহৎ
সনাতন সংরক্ষণ নীতি
সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম ৩৩
সংবাদ ১৩
সংসার ও সন্ন্যাস ১৫৯
সমালোচনা ৮৮, ১৪৪, ১৭৬, ৩০
সহজকথা ৯৭
সাধনা ৪৯
স্মরণ মঙ্গল ২৭৪

P3008

প্রবর্ত্তক—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

অনুষ্ঠান-পত্র।

সাহিত্যই জাতীয়-জীবন গঠনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান। বাঙ্গালার নব-জাগরণ কাল হইতে ইহার অদম্য উচ্ছৃঙ্খল মহাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেতার অধীনস্থ করিবার চেষ্টা সাহিত্য-জগতে আজ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা দেশের এই দারুণ সঙ্কটকালে, মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্য সম্ভারের মত, চিত্তাকর্ষক গল্পগুজবেই পরিপূর্ণ। মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ দেশের রুচি অনুসারেই চলিয়া থাকেন। যে কয়েকখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আছে সেগুলি প্রাণহীন প্রস্তাবনা ও মন্তব্যে পরিপূর্ণ; ব্যবসা করাই ইহাদের ধর্ম্ম অতএব সুবৃহৎ কাগজগুলি বিজ্ঞাপন প্রচার জন্যই যেন অনুষ্ঠিত আশার কথা 'বাঙ্গালী'র মত দৈনিক এবং 'প্রবাহিণী'র মত সাপ্তাহিক বাংলার অনেক অভাব দূর করিবার জন্য নূতন ভাবে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে।

ক্ষুদ্র 'প্রবর্ত্তক' কি করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—মত স্থির করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে প্রজা রাজায় মর্য্যাদা রাখে না—প্রজা রাজবিদ্বেষী হয়—যাহা না থাকিলে প্রজা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY.

প্রজার সহানুভূতি থাকে না—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়—বিষের জ্বালা অনুভব করে—'প্রবর্ত্তক' সেই অমূল্য বস্তু গঠনের সহায়তা করিবে।

সেটী কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা এতটা নীচ হইয়া পড়িয়াছি—ভাবের ঘরে চুরি করিতে শিখিয়াছি। আমরা উপরে সাধু ভিতরে চোর—উপরে দেশ হিতৈষী, ভিতরে নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়া বসিয়াছি—রাজভক্তি প্রকাশচ্ছলে নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় করিতেছি। ইহাতে না হইতেছে রাজার মঙ্গল, না হইতেছে প্রজার লাভ—উপরন্তু রাজা-প্রজার মধ্যে একটা ভীষণ সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এই চরিত্রের অভাব বশতঃই গুণীর আদর নাই—সর্ব্বত্যাগীর সম্মান নাই—উপযুক্ত লোকের কর্ম্মক্ষেত্র নাই। এই চরিত্র দেব-চরিত্র। মানব চরিত্রের সঙ্গে ইহার কোন খানেই মিল নাই। ইহা মানব-বুদ্ধির অতীত। মানুষের কর্ত্তব্য, মানুষের জ্ঞান, মানুষের চরিত্র যাহা, তাহা আজ য়ুরোপে প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—পণ্ডিত জার্ম্মাণ জাতির পৈশাচিকতার কাহিনী কাহারও অবিদিত নহে। বাঙ্গালী দেব-চরিত্র লাভ করিবে। এই চরিত্র সাধনার সামগ্রী—তাই হিন্দুর সর্ব্ব কর্ম্ম ধর্ম্মসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর চরিত্র পূর্ণাঙ্গ। বাঙ্গালীকে এই দেব দুর্লভ পরিপূর্ণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর যাহা আছে তাহার উপর দাগ রাজী করিয়া কিম্বা তাহাকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া দাঁড় করাইলে চলিবে না। একবারে পুরাতন বনিয়াদ্ তুলিয়া ফেলিতে হইবে—সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন বনিয়াদ্ হইতে তাহার এই সুমহান চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।

'প্রবর্ত্তক' এই কার্য্যের আরম্ভ মাত্র। ইহার অধিক আমরা এক্ষণে বলিতে অসমর্থ। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

—:০:—

যৌবন যুগ।

ুধা তৃষ্ণা মানবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। বিধাতা স্বয়ং উহাকে মানবদেহে পিন করিয়াছেন—উদ্দেশ্য সৃষ্টির রক্ষা ও স্থিতি। সুস্থ দেহের পক্ষে ক্ষুধা তৃষ্ণা যথোপযুক্ত থাকা চাই; উহার ব্যতিক্রম হইলেই বুঝিতে হইবে স্বাস্থ্য ঠিক নাই। আবার মানব শরীরে যখন পরিবর্ত্তনের ক্রীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, যখন শৈশব যায় ও তাহার স্থানে যৌবনের জোয়ার আসিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণার আমরা একটা স্বাভাবিক বৃদ্ধিই পরিলক্ষণ করিয়া থাকি। এই ক্ষুধা তৃষ্ণা শারীরিক। কিন্তু মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণাও আছে। স্থূল পান ভোজনের ন্যায় সূক্ষ্ম মানসিক পান ভোজনও আছে। বিচিত্র সত্য, বিবিধ ভাব ও কথা, নানা কর্ম্ম ইহাই মানস খাদ্য; এবং অনন্ত ও অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও শ্রীচরণামৃতই আধ্যাত্মিক অন্নরস। শারীরিক যৌবনের ন্যায় মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও যৌবনের বিকাশ আসে। তখন তত্ত্বস্পৃহা, প্রেমাকাঙ্খা ও কর্ম্ম তৃষ্ণা এবং গভীর ও বিপুল ধর্ম্ম ও ভগবৎ পিপাসা তাহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

* * * * *

যাহা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে, সমষ্টি মানব জীবনেও তাই দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ ও জাতির ইতিহাসে এইরূপ একটা যৌবন যুগের আগমন হইয়া থাকে। তখন চারিদিকে পরিবর্ত্তন, স্পন্দন আন্দোলন—সমাজ ও জাতির চিত্ত মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া তুলে। নিজের মধ্যে তখন সে যে কি এক গভীর প্রেরণার অনুভব করিয়া থাকে—যাহা তাহাকে স্থির হইয়া থাকিবার

অবসর দেয় না। কি এক বিপুল অভাব ও অপূর্ণতার অনুভূতি অনু
তাহাকে তৃপ্তি ও পূর্ণতার-জন্য ঘুরাইয়া, ছুটাইয়া, নাচাইয়া অস্থির করি
তুলে। যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে ক্ষুধারূপে সংস্থিতা আছেন—চিতে
রাজলক্ষ্মীর মত তিনি যেন তখন "মম ভুখা হুঁ" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠে
তখন কতদিকে কত অনুসন্ধান পড়িয়া যায়—সে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃ
জন্য দুই হাতে যাহা সম্মুখে পায় তাহাই কবলিত করে। চঞ্চলতা, ব্য
লতা, অস্থিরতা—জগতটা যেন তখন এক বিশাল মহাসমুদ্রের
সংক্ষোভিত হইয়া উঠে।

* * * * *

এই সংক্ষোভের সময়ে দেশে অনেক বিচিত্র দৃশ্য, অনেক অদ্ভুত ঘট
অনেক অপূর্ব্ব চরিত্রের মানুষ আমাদের নয়ন পথে পতিত হইয়া থাকে
একই মূল প্রেরণা-শক্তির উদ্ভেজনা, শুদ্ধাশুদ্ধ আধার ভেদে শুদ্ধাশু
ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঋষির সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের সৃষ্টি হয়, দেবত
পাশে পাশে দুই একটা দৈত্যও জন্মগ্রহণ করে—গোপবালা রাধার গো
বৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় জটিলা কুটিলার আবির্ভাব হয়। আর কত বি
প্রকারের কর্ম্মস্রোতই না বহিয়া থাকে। যেখানে শুদ্ধ প্রণালী
সেখানে নির্দ্দোষ শুদ্ধকর্ম্ম, আর যেখানে পঙ্কিল প্রণালী সেখানে বি
বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়। ধর্ম্মের নামে, পুণ্যের নামে কখন
জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে পাপ ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে।
ত্যাগীর আত্মত্যাগের পাশে পাশে উন্মাদের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টিগোচর
হয়। এই সমুদয় একত্র সম্মিলিত হইয়া সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর
করিয়া তুলে। এসব জটিলতার স্বার্থকতা যে নাই তাহা নহে কার
ভগবান সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা। তিনিই মানব-জাতিকে ঐতিহাসি
বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কোন ব্যবস্থাই নিরর্থ
হইতে পারে না। জটিলতার মধ্য হইতেই সরলতার উদ্ভব
সংসারের সুখদুঃখময় সহস্রমুখী চিন্তা ও ভাবনা মন্থন করিয়াই ম
একের উপসংহারে পৌঁছে।

* * * * *

প্রকৃতি-রহস্য।

ভগবান গীতাতে অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে তাঁহার দুই
কৃতি—অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। এই দুইয়ের মধ্যে অপরা
কৃতি অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া মায়িক ব্যাপারে মানবকে মুগ্ধ করিয়া রাখে
ং পরা প্রকৃতি মানবকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সাহায্য করেন ও
হার মানসচক্ষুর সম্মুখে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিন দিন তাহাকে
রূপোপলব্ধির পথে অগ্রসর করাইয়া দেন। আমরা সাধারণতঃ এই পরা
কৃতিকেই মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি, কেননা আমাদের মনে
। তিনিই আদ্যাশক্তি। তাঁহারই শক্তিতে এই বিশ্বচক্র চলিতেছে এবং
ামাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধনায় আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ
রিয়া থাকি। ভগবানকে লাভ করিবার ইহা অপেক্ষা সুগম পন্থা
ার নাই। যাঁহাদের ভগবান লাভের আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে,
াহাদিগকে অপরা প্রকৃতির মায়া অতিক্রম করিয়া পরা প্রকৃতির
পাসনা করিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই, অপরা ও পরা প্রকৃতি একই
ক্তির দুইদিক অথবা তাহারা পরস্পর-বিরোধী দুইটি শক্তি? এই
শ্নের সুমীমাংসার উপর আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা ও জীবনের
কৃত লক্ষ্য প্রভৃতি গুরুতর বিষয়সমূহ নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমরা
ই বিষয়ের যথাসাধ্য বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ভগবান গীতাতে অপরা প্রকৃতিকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,
া—ক্ষিতিঃ, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। তন্মধ্যে
থম পাঁচটি স্থূল ও শেষোক্ত তিনটি সূক্ষ্ম। অপরপক্ষে তিনি পরা
কৃতিকে জীবভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেননা সেই শক্তিই এই
গতকে ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীভগবান ইহা হইতেই নির্দ্দেশ

করিতেছেন যে পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি জগ
দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে
মঙ্গলময় শ্রীভগবানের মঙ্গল বিধানের উপর সন্দেহ করা হয়। তিনি
সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং এই জগতে তাঁহারই আনন্দের লীলা বিকাশ প্রা
হইতেছে। যদি অপরা প্রকৃতি বলিয়া একটি পৃথক শক্তি মানা হয়, ত
হইলে বলিতে হয় যে অন্ধকার ও আলোকের চিরদ্বন্দ্বের নিমিত্তই
জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; এখানে শান্তি ও অশান্তি, আনন্দ ও নিরা
চিরকাল সমভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে এবং চিরকালই এই
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহা হইলে সত্যযুগ বলি
কোন যুগের অস্তিত্ব কিম্বা এই জগতে 'ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন'-রূপ আদর্শ বিকৃ
মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। যদি এ জগতে 'অজ্ঞান
অবিদ্যা মানব জাতির শিয়দংশকে চিরকালই বদ্ধজীব শ্রেণীভুক্ত করিয়
রাখে, তাহা হইলে আর কোনরূপ সদনুষ্ঠান বা ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা
থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে পরা প্রকৃতির উপাসক হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ
করিয়া জগৎ ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি
আমরা বিশ্বাস করি যে এ বিশ্ব ভূমানন্দের লীলাক্ষেত্র এবং সচ্চিদানন্দে
আনন্দ এই সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই আনন্দ ক্ষণিক আ
প্রকাশ করিয়া আবার হঠাৎ বিদ্যুতের ন্যায় অবিদ্যামেঘের অন্তরালে
লুক্কায়িত হইতেছে, ইহাই শ্রীভগবানের লীলা। ভক্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
সর্ব্বত্রই এই লীলা প্রস্ফুটিত হইতে দেখিতেছেন বলিয়াই ভগবানকে 'ভক্তে
ভগবান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত জগৎ ভগবানেরই শক্তি
অভিব্যক্তি—স্বরূপতঃ এই বিশ্ব সমস্ত চরাচর সেই একত্বের উপরই প্রতিষ্ঠি
এবং সর্ব্বত্রই নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে তাঁহারই আনন্দ-ভাব খে
করিতেছে। এজগতে কোনরূপ ভেদভাব নাই এবং থাকিতেও পা
না। আমরা যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি এই জগতে কর্ম্মক্ষে
দেখিতে পাইতেছি এবং মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছি না
তাহাও সেই আনন্দেরই বিকার মাত্র, তাহার পৃথক সত্তা নাই। য
একবার ইহা বিশ্বাস করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞান প্রচারে
দ্বারা এই মোহ—বিকার দূর করিবার আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়

তখন আর জগতে 'ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন' বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় অননুসরণীয় বা অসম্ভব আদর্শ বলিয়া মনে হয় না।

বলা বাহুল্য, যে শেষোক্তরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অপরা ও পরা প্রকৃতিরূপ দুইটি বিরোধী শক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কেননা তাহা হইলে এই সৃষ্টি একই সত্তার অভিব্যক্তি না হইয়া দুই বা ততোধিক শক্তির একরূপ যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমাদের মতে ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত যে পরা ও অপরা শ্রীভগবানের একই শক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে পৃথকভাবে বিকাশমাত্র; বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের পৃথক সত্তা নাই। যখন এজগতে দ্বন্দ্ব, মোহ, ভয়, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিকারকে আশ্রয় করিয়া আনন্দময়ের আনন্দলীলা প্রকটিত হয় তখন আমরা তাহা অপরা প্রকৃতির লীলা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, কেননা অহঙ্কার হইতেই এই সমস্ত বিকারের উৎপত্তি হয়; আবার যখন আমরা সমতা, জ্ঞান, বীর্য্য, পরার্থপরতা প্রভৃতি সদ্গুণের কর্ম্মক্ষেত্রে বিকাশ দেখিতে পাই, তখন আমরা স্বভাবতঃই বুঝিতে পারি যে আনন্দকে সৃষ্টির কেন্দ্র বলিয়া মানিয়া না লইলে এই সমস্ত সদ্গুণের বিকাশ হইতে পারে না এবং তখন আমরা ভগবানের এই লীলাকে পরা প্রকৃতির ক্রিয়া বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ, এই দুই প্রকৃতিই এক—সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি। আমরা যেন ইহা কখনও ভুলিয়া না যাই যে সুখ ও দুঃখ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, লাভ ও ক্ষতি, সাহস ও ভয়, প্রভৃতি দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি সমভাবেই বর্ত্তমান আছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য। বীরত্বেও যে শক্তির আবশ্যক হয়, কাপুরুষতাতেও ঠিক সেই শক্তিরই আর এক ভাবে বিকাশ হয়। একপক্ষে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া অন্যত্র অভাবের মধ্য দিয়া সেই এক ভগবৎশক্তিই এই জগতে কার্য্য করিতেছে। আর একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে শক্তিমান্ ও শক্তি দুইটি পৃথক সত্তা নহে, তাঁহারা এক। যেমন অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকশক্তিকে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ ভগবান্ হইতে ভগবানের শক্তিকেও পৃথক করা চলে না। তবে আমরা সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য করিবার জন্য যাহা প্রকৃতই অভেদাত্মক, তাহাকে বিভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া থাকি এবং যখন সচ্চিদানন্দ স্ব-স্বরূপে নির্বিকারভাবে অবস্থান করেন তখন তাঁহাকে নির্গুণব্রহ্ম বলি এবং যখন তাঁহাকে তাঁহার লীলাক্ষেত্রে লীলার সহিত

ধারণা করি তখন তাঁহার শক্তিকে পৃথকভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হই। এইটি ঠিকভাবে দেখিতে পারিলে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধভাব এজগতে প্রবল হইতে পারে না। একই যখন বহু হইয়াছেন এবং সেই বহু যখন একেরই বিকাশ তখন আর বিরোধ কিসে সম্ভব হইতে পারে?

এইবার আমরা মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভগবান ও তাঁহার শক্তির (প্রকৃতির) মধ্যে স্বরূপতঃ কোনই প্রভেদ নাই; প্রকৃতি তাঁহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত করিতেছেন। প্রকৃতির ক্রিয়া স্বভাবতঃ দুইভাগে বিভক্ত—অবিদ্যারূপে তিনি এই জগতে ভ্রান্তির (বিকারের) সৃষ্টি করেন এবং তাহার ফলে আত্মা বদ্ধ না হইয়াও নিজেকে বদ্ধজীব বলিয়া মনে করে; অন্যদিকে পরা প্রকৃতিরূপে তিনি এই সৃষ্টি-রহস্য সহজ বোধগম্য করিয়া দেন, তাহার ফলে মানব দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত চরাচর এই এক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হইতেছে, তখন শক্তিমান স্বয়ং যে সকল পদার্থেই অবস্থান করিতেছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আর সকল পদার্থই বা বলি কেন, জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে, যাহা কিছু ভোগ হইতেছে, যাহা কিছু চিন্তা করা যাইতেছে, তাহা (আমরা জানিতে পারি আর নাই পারি) সেই শক্তিমান্ স্বয়ং। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে এই সৃষ্টি-প্রবাহে নানারূপ ভাব ও কর্ম্মের মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। যতটা পরিমাণে আমরা সেই আত্মপ্রকাশে জ্ঞানিত ভাবে (conscious) যন্ত্র হইতে পারি, ততটা পরিমাণে আমরা আমাদের জীবনের পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। আমরা বিশ্বাস করি যে একদিন এই ভাব জগতের ইতিহাসে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া এই ভূমণ্ডলে ভগবদ্ প্রতিশ্রুত ধর্ম্মরাজ্য বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই যুগকে ও যুগাবতারকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমরা এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে তাঁহারই নাম স্মরণপূর্ব্বক তাহারই যন্ত্ররূপে তাঁহারই কার্য্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি। তিনিই সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, পরা ও অপরা, দুইয়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ দিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

নিত্য ও লীলা।

প্রতিভাশালী বিপিনচন্দ্র কোন স্থানে লিখিয়াছেন,—

> "এই আত্মা ভোক্তা ; তার ভোগ আছে। এই ভোগের আবার ক্ষয় আছে। এই ভোগের জন্যই তার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। এই ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সে এই সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ করে।"

একখানি মাসিকে বিপিন বাবুর এই আত্ম-তত্ত্বের একটু সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

> "..... আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে সে আবার 'ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয়' ও 'পূর্ণ করে' কি করিয়া ? যে অপূর্ণ, যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি ও লয় আছে, সে আবার 'নিত্য' কিসের ? পাল মহাশয়ের দার্শনিক মত বিচিত্র !"

আমরা বিপিন বাবুর মত ও ইহার সমালোচনা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। কোন্‌টি অভ্রান্ত তাহা না বলিয়া এতদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর তাহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা যাইতে পারে, কেননা বহুলোকের দর্শনগোচর হইলেই তদ্বিষয়ে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভবপর। কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা বিজ্ঞান দ্বারাও আয়ত্তে আসিবে না, সে বিষয়ের আলোচনা অতি সাবধান হইয়াই করিতে হয়।

এই আত্মা অনুভূতি সাপেক্ষ ; কঠোর যোগ সাধনার দ্বারাই এই আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে। একে একে দেহ, প্রাণ, মন, প্রভৃতি অতিক্রম

করিয়া যে সাধক মহাতীর্থের মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপনীত হয়, সেই এ জটিল রহস্য ভেদ করিতে পারে—সেই দেহস্থিত মহামৃতের সন্ধান পায়—তাহারই জীবন মধুময় হয়। সেই বলিতে পারে এই আত্মা অনন্ত অথচ সীমাবদ্ধ দেহভাণ্ডে কেমন করিয়া অবস্থিত—সেই বুঝিতে পারে আত্মা অমর আবার কেমন করিয়া এই জরামরণশীল দেহে বিদ্যমান—সেই উপলব্ধি করিতে পারে এই আত্মা পূর্ণ অথচ এই অপূর্ণ যন্ত্র বদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া লীলারত। আমরা সাহিত্য, সমাজ লইয়া অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি—বিজ্ঞান লইয়া যুক্তি তর্ক করিতে পারি, পরন্তু সেই নিত্য, শাশ্বত, আনন্দময় পরমাত্মা লইয়া বিচার বিতর্ক করিয়া সে সম্বন্ধে স্থির সত্যে উপনীত হইতে পারি না—সে যে অব্যক্ত—সে যে বর্ণনাতীত,—সে ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত—সে সকল বুদ্ধিচেষ্টার অতীত—সে যে শুধু সাধনার ধন।

এই সাধনার পথে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিয়ত তাঁহাদের অনুভূতি, স্তুতিগীতির ন্যায় প্রকাশ করিতেছেন, তদ্দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচারিত হইতেছে। যাঁহাদের সাধনা অল্প, যাঁহাদের জ্ঞান অল্প তাঁহারাও যখন এই ভগবদ্ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন, ক্ষুদ্র শিশুর অস্ফুট শব্দের মত, এই ভগবদ্স্তুতি ভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। আবার যখন জলদমন্দ্রের মত আর্য্যঋষিদের ভগবদনুভূতি, উপনিষদের ছন্দে ভক্তের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয় তখন সে বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে।

সাধক নিজের জীবন-মধ্যে এমন একটা কিছুর সন্ধান পায়—যেটা তাহার দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার হইতে স্বতন্ত্র একটা বস্তু। সেই স্বতন্ত্র বস্তুটি শক্তি—যে শক্তি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে যাদুকরের মত নাচাইয়া বেড়ায়—যে শক্তি আমায়, তোমায়, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী-সমেত নিখিল ভুবনকে নাচাইতেছে—যে শক্তির আদি নাই, অন্ত নাই—যে শক্তি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী।

এই শক্তি আছে বলিয়াই সব আছে। এই শক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা। এই শক্তি কেন আছে, কাহার ইচ্ছায় আছে অথবা এই শক্তিই কি সব? যাঁহার জন্য সাধনা, যাঁহার জন্য তপস্যা, যাঁহার জন্য জ্ঞানার্জ্জন—তিনিই কি এই মহাশক্তিরূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন? ইঁহাকে জানিবার জন্যই কি সৃষ্টিকাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বাহিরের

জ্ঞানকে দূরে রাখিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষসাধনে যোগনিরত ? ইঁহার জন্যই কি ভারতের ঋষি সর্ব্বত্যাগী, সংযমী, ব্রহ্মচারী - ইঁহার জন্যই কি বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য সংসার—বিরাগী, চিরকৌপীনধারী—ইঁহার জন্যই কি রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ উন্মাদ, ভাবভক্তি—পথচারী ? এই জন্যই কি ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা পথ ছাড়িয়া না দিলে কিছুই হইবে না" ? এই মা কি আমার সর্ব্বময়ী, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী, মহাকালী—এই মা কি লীলাচ্ছলে সর্ব্বজীবে অবস্থান করিয়া মহানন্দে লীলা করিতেছেন ? এই অনন্ত মাতৃশক্তিই যদি সৃষ্টির আদ্যন্ত রহিত মহাসামগ্রী হয়েন, তবে ঠাকুর ইঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন কেন ? কাহার জন্য ? এই ঘনঘটা অন্ধকারময়ী কালীমূর্ত্তির পশ্চাতে আরও কিছু আছে না কি ? এই বুদ্ধের অনন্ত মহাশূন্যের পশ্চাতে কোন অপার্থিব ভগবদ্বস্তু আছে না কি ?

দেহের পশ্চাতে প্রাণ, এই প্রাণ দেহস্থিত স্নায়ুমণ্ডলীর কর্ত্তা ; প্রাণের অধিনায়ক মন, মন আবার বুদ্ধি দ্বারা চালিত—ইহার উপর অহংতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। জীবের এই অহংভাবই জীবাত্মা, প্রকৃতিই ইহার কর্ত্রী—জীবাত্মা ইহার অধ্যাস মাত্র। এই প্রকৃতি নিত্যবস্তু অথচ অনিত্য দেহভাণ্ড লইয়াই ইহার খেলা। জগতের যত আধার, সমস্তই এই প্রকৃতির লীলাভূমি। প্রকৃতি কোটী কোটী আধারে বাস করিয়া, কোটী কোটী প্রকারের লীলা প্রকট করিতেছেন। এই প্রকৃতির পশ্চাতে বাজিকর বসিয়া আছেন—ইনি নির্ব্বিকার। ইঁহার ইচ্ছায়, ইঁহার ইঙ্গিতে মহাশক্তি আধারস্থিত আত্মারূপে ছুটাছুটী করিতেছেন। এই বাজিকর শ্রীকৃষ্ণ, আর আত্মারূপা মহাশক্তি শ্রীরাধা। এই বাজিকর উমানাথ শঙ্কর—ঐ আধারস্থিত পরমবস্তু কালীশক্তি।

সাধন সাহায্যেই ইহা বুঝিতে হয়, জানিতে হয়। সাধন সাহায্যেই নিত্যের লীলা, অনিত্যের মধ্যে দেখিতে হয়।

এই পুরুষ প্রকৃতি আবার অভিন্ন। পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতি। প্রকৃতি, পুরুষের আনন্দ বিধানের জন্য এত সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাই সৃষ্টি অনন্ত।

যদি পুরুষের আনন্দবিধান কল্পেই সৃষ্টির বিকাশ—তবে সৃষ্টির মধ্যে এত দ্বন্দ্ব কেন ? এত দুঃখ, এত বেদনা, এত শোক, এত ভয় কিসের ?

ভগবান্ সচ্চিদানন্দময়স্বরূপ। এই সচ্চিদানন্দ-ময় ব্রহ্মই প্রকৃতির

সাহায্যে বহু হইয়াছেন। তিনি আছেন—নিত্যকালের জন্য আছেন। এই সৎ, ইহার পরিবর্ত্তন নাই, ভেদ নাই, রূপ নাই—চিৎশক্তির সাহায্যেই তিনি বহু হইয়াছেন। এই চিৎ, সৎকে বহুভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এই আত্মপ্রকাশকারী মহাশক্তি জড় প্রকৃতিতে অনন্ত প্রকারে বিকশিতা; সুতরাং আনন্দও নানাবিধ।

অসংখ্য আকারে, অসংখ্য ভাবে রস সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ আনন্দ ভোগ করিতেছেন। আমাদের অহং-আশ্রিত খণ্ডজ্ঞান এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌ভাব ধারণায় আনিতে অসমর্থ, তাই আমাদের এত দ্বন্দ্ব। আবার আমাদের ভিতর অফুরন্ত, দ্বন্দ্বাতীত ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই আমরা দ্বন্দ্ব ভোগ করি—নিত্য সুখের জন্য দুঃখকে আলিঙ্গন করি—অমৃত লাভের আশাতেই মৃত্যুর অট্টহাস্য হাসিমুখে বরণ করিয়া লই। আমরা মায়াবিদ্ধ মনে করি, কেননা এই বন্ধন ছিন্ন করিলেই মুক্তি পাইব। মায়া-মুগ্ধতা আমাদের স্বরূপ নহে, তাই আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া চিরদিন থাকিতে পারি না। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য প্রভৃতি আমাদের স্বরূপ নয়—ইহা কেবল আমাদের অনন্ত পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতামাত্র। কিন্তু এ সকল তাঁহারই ইচ্ছায় সম্পাদিত। তিনি ইচ্ছা করিয়াই কোথাও বদ্ধ, কোথাও মুক্ত—কোথাও দরিদ্রতার কঠোর কবলে নিষ্পেষিত, আবার কোথাও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে উৎফুল্ল—কোথাও ব্যাধিক্লিষ্ট, কোথাও বা সুন্দর স্বাস্থ্যে স্ফূর্ত্তিযুক্ত। আধার ভেদে আনন্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। মূলে সেই সচ্চিদানন্দের খেলাই সর্ব্বত্র আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন—ব্রহ্ম যদি নিত্য পূর্ণ অনন্ত, তবে এই বিশুদ্ধসত্তা, এই পরমব্রহ্ম, এই সৎ—আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কেন সীমাবদ্ধ হইলেন? কাহারও কাহারও মত এই, যে তিনি স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—এইরূপ প্রকৃতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তিনি এই প্রকৃতির অধীন নহেন, পরন্তু এই প্রকৃতির প্রভু স্বরূপ হইয়া ইহার অবাধ লীলায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা—ইহাই তাঁহার আনন্দ—ইহাই তাঁহার লীলা।

———o———

চন্দননগর সংবাদ।

দিনে ডাকাতি।

গত সোমবার ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় একজন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী সাইকেল যোগে ভদ্রেশ্বর পোষ্ট আফিস হইতে চুঁচুড়া পোষ্ট আফিসে ২০০০৲ টাকা লইয়া যাইতেছিলেন। চন্দননগর অতিক্রম করিয়া যেমন তিনি ইংরাজ সীমানায় প্রবেশ করেন, অমনি একব্যক্তি তাহাকে ছাতার দ্বারা স্কন্ধে আঘাত করে; তিনি পড়িয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনজন লোক আসিয়া তাহাকে গুরুতররূপে আহত করিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করে। অনতিবিলম্বেই তথায় বহুলোক আসিয়া চতুর্দ্দিকে ডাকাইতদের সন্ধান করিতে থাকে, ফলে নিকটস্থ একটী বাগানে একজন এবং খাদনিয়ার রাস্তায় আর একজন ডাকাইত ধৃত হইয়াছে; তাহার পর রাত্রিতে চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে কাশশেওড়া গ্রামে পুলিশ আর একজনকে ধৃত করে। লুণ্ঠিত অর্থও ঘটনা স্থলের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে পাওয়া গিয়াছে। ধৃত ডাকাইতদের মধ্যে দুইজন মুসলমান ও একজন বাগ্দী। আহত ব্যক্তিকে চুঁচুড়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ এ বিষয় আরও তদন্ত করিতেছে।

ভারতীয় সংবাদ।

তিলকের জন্মোৎসব।

গত ১লা আগষ্ট মহামতি তিলকের জন্মোৎসব নাগপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিলক মহাপণ্ডিত, মহা কর্ম্মী, জননেতা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রধান পরিচয় তিনি স্বদেশসেবায় সর্ব্বত্যাগী। আমরা জানি তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের স্বদেশ প্রেম স্বার্থশূন্য, উদার, এবং তাহাতে কোনও সঙ্কীর্ণ বিদ্বেষভাবের বিন্দুমাত্র স্থানও নাই। তথাপি এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভুল ধারণা সমূহের প্রচলন দেখিয়া আমাদের মনে হয় এ হেন মহাপুরুষের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচার করা বুঝি হইতেছে না; যাহা হউক আশার কথা, দেশ তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখিতেছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজও যেদিন তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদিগকে সত্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, ভারতের রাজা প্রজা উভয়েরই পক্ষে সেদিন কি সুখের দিন হইবে!

অভ্যুদয়।

এলাহাবাদের হিন্দী সাপ্তাহিক "অভ্যুদয়" পত্রের সত্বাধিকারী পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মহাশয় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া একটী আপত্তিজনক প্রবন্ধাংশের জন্য মুদ্রাযন্ত্র আইনানুসারে জামিন দাখিল করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধাংশটী দক্ষিণ আফ্রিকার "Indian opinion" নামক পত্রে Gold coast Colony'র কোন পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। "অভ্যুদয়ে" তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী আমরা পড়ি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা ভাল নহে। কিন্তু সকলেরই এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে পণ্ডিত মালব্য মহাশয়ও যখন, কোন্‌টী আপত্তিজনক কোন্‌টী আপাত্তজনক নহে, তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ তখন অন্য সম্পাদকগণের ত কা কথা। এক্ষণে শুনিতেছি মালব্য মহাশয় টাকা জমা দেওয়া অপেক্ষা ছাপাখানা বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে উহা জানাইয়াছেন। ? ?

পত্রিকা প্রচার বন্ধ।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লাহোরের নিম্নলিখিত দশখানি দৈনিক প্রচার বন্ধ হইয়াছে—যথা, "অমৃত", "আজাদি," "হিন্দু," "নং শিয়াল্‌", "শমসীর", "আমবীর", "পঞ্জাব", "দর্পণ", "খালসা", "সাহিদ্‌"। উপরন্তু "দীপক" সাময়িক ভাবে এখন বন্ধ রাখা হইয়াছে। আবার "নির্বলসেবক" সম্প্রতি উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত পত্রখানির নিকট হইতে প্রেস এক্ট অনুসারে ১০০০৲ জামিন চাওয়া হইয়াছে মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিভীষিকায় এতগুলি ভারতীয় দৈনিককে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে দেখিলে, বাস্তবিকই আমাদের কষ্ট হয়। তাহার উপর পাঞ্জাবের একমাত্র উর্দ্দু শিখ-পত্রিকা শের-ই-পাঞ্জাব অর্থাভাবে প্রচার বন্ধ করিয়াছে। এদেশে যাহারা লেখা পড়া জানেন, তাহাদের সংখ্যা সমগ্র জন সংখ্যার অনুপাতে শতকরা প্রায় ১২ জন মাত্র। এ হেন দেশে শিক্ষা প্রচারের একটী প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ এই পত্রিকাগুলি। বিশেষতঃ, অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে দৈনিকের একান্ত অভাব। এরূপ অবস্থায়, সাহিত্য-জগৎ হইতে এতগুলা দৈনিককে বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে—দেশের দুর্ভাগ্য নহে কি?

মুসলমান ছাত্র আটক।

এবার আর একজন মুসলমান যুবক আটক হইয়াছেন। যুবকের নাম মহম্মদ ইকবল। বি এ ক্লাশের ছাত্র। মহম্মদ স্বগ্রাম মোজাপোড়া নামক স্থানের বাহিরে যাইতে পারিবেন না।

গ্রেপ্তার।

ঢাকা ওল্ড লাইনে শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একটী যুবক রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এখনও পুলিশ প্রকাশ করে নাই।

ভারতে গোলাগুলি সরবরাহ।

মিঃ ভিক্টর বেলির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার পাটকল সমূহে গোলাগুলি নির্ম্মানের জন্য যে আয়োজন হইতেছিল, তাহা প্রায়ই শেষ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্প-শাখাও এই শস্ত্র নির্ম্মান কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। বাঙ্গালী-ছাত্র আজ শুধু পরীক্ষায় পাশ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে না, আবশ্যক বুঝিলে, দেশের জন্য, গবর্ণমেণ্টের জন্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেও কুণ্ঠিত নহে। বঙ্গীয় হাঁসপাতাল বাহিনী, বিলাতে ভারতীয় ছাত্রগণের ও বঙ্গীয় শিল্পশাখার ছাত্রগণের এই প্রচেষ্টা সমূহ তাহারই সাক্ষ্য দিবে। তাঁহাদের সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

বঙ্গীয় হাঁসপাতাল বাহিনী।

উক্ত বাহিনী এক্ষণে Tigris নদীতীরে বসোরা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অমরা নামক স্থানে কার্য্য করিতেছেন। সেখান হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যুবকগণকে এখন খুব কঠিন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য-ভারই বহন করিতে হইতেছে। ভগবান্ তাহাদের দেহমনের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ অব্যাহত রাখুন। তাঁহারা যেন জননী বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হন।

পঞ্জাবে ফাঁসী।

অমৃতসরে সেতুরক্ষার্থ যে সৈনিক পাহারা ছিল, তাহাদের হত্যাকরার অপরাধে যে পাঁচজন শিখ ধৃত হইয়াছিলেন, লাহোরের বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক তাহাদের উপর ফাঁসীর হুকুম হয়। এই পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের

উপর ইতঃপূর্ব্বেই সর্দ্দার আচরসিংকে হত্যা করার অপরাধে এবং আর একজনের উপর হুসিয়ার পুরের জেলদারকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসীর হুকুম হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলেই পঞ্জাবের ছোট লাট ও বড় লাটের নিকট এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। গত শুক্রবার ৬ই আগষ্ট তারিখে আত্মসিং, হারনামসিং, কালাসিং এবং চানাম সিংএর লাহোর জেলে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। বাঁটাসিং আর একবার ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আপীল করিয়াছিলেন, এবারও তাহার আপীল অগ্রাহ্য হইল। পাঞ্জাবে এপর্য্যন্ত রাজনৈতিক অপরাধে প্রায় ২০ জনের ফাঁসী হইয়াছে।

লাহোর ষড়যন্ত্রের জের।

অমৃতসর জেলার টার্ণ টার্ণ নামক স্থানে কপুর্রসিং নামক একব্যক্তিকে কাহারা হত্যা করিয়া গিয়াছে। কপুর্রসিং নাকি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন সাক্ষী ছিল।

ডাকাতি ও গ্রেপ্তার।

সোমবার ২রা আগষ্ট আগড়পাড়া ষ্টেশনের নিকট জনৈক বিল সরকার কয়েকজন ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন কিন্তু লোকজন আসিয়া পড়ায় ডাকাইতেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। শুনা যাইতেছে, একজন নাকি ইহার পরে রিভলভর হস্তে ধরা পড়িয়াছে। যুবকের নাম বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলী, হালিসহরের অঘোর কুমার গাঙ্গুলীর পুত্র। তাঁহার কলিকাতাস্থ বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কিছু পাওয়া যায় নাই।

বৈদেশিক সংবাদ।

ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্ট সদস্য বন্দী।

ট্রিবিটস লিনকলন নামীয় একজন কমন্স সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য ১২ই জুনে নিউইয়র্কে অনেক কাগজ পত্রে ছাপাইয়াছেন যে যুদ্ধের সময় লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তিনি একজন জার্ম্মান গুপ্তচর রূপে কার্য্য করিতেন। গ্রেটব্রিটনে জাল করার অপরাধে তিনি নিউইয়র্ক নগরে ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকা যাহাতে তাহাকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করেন, সে জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রার্থনা করিবেন।

প্রবর্ত্তক—১ম বর্ষ, ২য়সংখ্যা।

সনাতন সংরক্ষণনীতি।

ভারতবর্ষ সনাতন ধর্ম্মের লীলাভূমি। এইখানে ভগবান যুগে ২ অবতীর্ণ হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম্মবিপ্লবের দ্বারা এই সনাতন জাতির আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত অনেককেই আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই। অবশ্য, এক্ষণে ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা হয়ত কোনদিনই ছিল না কিম্বা যাহা ছিল তাহা যুগ পরিবর্ত্তনে নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যে মূলনীতি এই আর্য্যসভ্যতাকে এতদিন ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাই ইতিহাসের প্রাণ, ইহা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই। আমরা এই প্রবন্ধে সেই নীতির ভারতে কি ভাবে বিকাশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিব।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটী ঐতিহাসিক ঘটনা এবং উহা আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩১০০ সালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অনেকের মতে সেই সময় হইতেই ভারতের অবনতির যুগ আরম্ভ হয়। যে ধ্বংসযজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা, তাহার ফল যে ভবিষ্যতের পক্ষে এরূপ বিষময়, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের ধারণা

যে যদি সেই সময়ে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ অন্তর্বিপ্লবের ফলে ছারখার হইয়া শ্মশানে পরিণত হইত। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সময়োপযোগী নীতির অনুসরণ দ্বারা ভারতে সনাতনধর্ম্মের বীজ সংরক্ষণ করিয়া পুনরায় নবজীবন লাভের পথ সুগম করিয়া যান। তাহার ফলে এই ৫০০০ বৎসরের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও আমরা বর্ত্তমানে বিশ্বপ্রেমের আদর্শ জগতে প্রচার করিবার জন্য হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের অনুপ্রেরণা অনুভব করিতেছি। ইহাই ভারতের 'ইতিহাসে' সংরক্ষণনীতির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। আমরা পরবর্ত্তী যুগেও দেখিতে পাইব যে ইহাই ভারতবর্ষের মূলনীতি।

তারপর কিছুকালের জন্য ভারতে বৈদিক যুগের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষ উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হয়। বেদের আধ্যাত্মিক (Spiritual) তত্ত্বসমূহ সেই যুগে ভারতবাসীর করতলগত ছিল। কালে সাধনবল ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল, বেদের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের উপাসক হইলেন এবং কালে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। ষোড়শোপচারবিশিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ভারতের অস্থিমজ্জা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে ভারতীয় সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ সঙ্কুচিত হয়। 'ধর্ম্মের গ্লানি' উপস্থিত হওয়াতে অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, শ্রীভগবান সেই যুগোপযোগী নীতির 'প্রবর্ত্তক' রূপে ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা। বলা বাহুল্য, আমরা ভগবান বুদ্ধদেবের কথা বলিতেছি। তিনি 'কর্ম্মই বন্ধনের মূল' একভাবে এই মতই প্রচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া 'নির্ব্বাণ' লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। যদিও অশোকের ন্যায় কয়েকজন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তত্রাচ আমরা দেখিতে পাই যে কালে এই বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ব্যাভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন কর্ম্মত্যাগ দ্বারা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সমাজের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতিরূপে অনুসৃত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, যে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এবং তাহাই সেই যুগে আদর্শ-সংরক্ষণের নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কালে আদর্শ পুনরায় মলিন হইয়া উঠে। অনধিকারীর সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করায় বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে নানারূপ বিকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ঠিক ইউরোপে মধ্য যুগে (Middle Ages) মঠ-জীবনে (monastic life) আমরা যেরূপ ব্যাভিচার দেখিতে পাই, ভারতের অবস্থাও বৌদ্ধযুগের অবনিত কালে অনেকটা সেইরূপই হইয়াছিল। ইউরোপে তাহার ফলে প্রোটেস্ট্যাণ্ট (Protestantism) ধর্ম্ম প্রচার হয় এবং এখানেও অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া যুগোপযোগী 'বেদান্তের মায়াবাদ' প্রচার করেন। তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে একরূপ বহিষ্কৃত হয়। তিনি 'কর্ম্ম, বন্ধনের হেতু' মানিয়া লইয়া অনধিকারীর পক্ষে 'সৎকর্ম্ম' ('নিষ্কাম কর্ম্মের') ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণই যে অধিকারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা, ইহা তিনি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে যুগে হয়ত এভাবে প্রচার না করিলে প্রকৃত বেদান্ত ধর্ম্ম কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না এবং কালে উহা ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইত। তিনি বেদান্তের একদিক—'একমেবাদ্বিতীয়ং'—মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন, অন্যদিক—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—তাঁহার 'মায়াবাদের' কলে পড়িয়া ঠিক ফুটিয়া উঠে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে কতকাংশে মানিয়া লইয়া সে যুগে ভারতীয় 'সংরক্ষণ'-নীতি এইভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে সাময়িক উদ্দেশ্য ঠিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতীয় জীবনের আদর্শে এক মহাবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য প্রচার করিয়াছিলেন যে এই সৃষ্টির বাস্তব সত্তা কিছুই নাই, ইহা মায়িক ব্যাপার। এইরূপ মত প্রচারের ফলে সমাজ অজ্ঞানীদের জন্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল এবং সমাজত্যাগ করিয়া অধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সমাজত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করায় সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। ক্রমে সমাজের একতা নষ্ট হইয়া গৃহবিবাদ, নীচ স্বার্থপরতা প্রভৃতি অজ্ঞানপ্রসূত ব্যাভিচার সামাজিক শরীরে বিস্ফোটকরূপে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। ইহা আনুমানিক দশম শতাব্দীর কথা। ঠিক সেই সময়ে ভারতীয় আদর্শ ঠিকভাবে পরিস্ফুট হইবার জন্য এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইবার ভগবান ভারতীয় আদর্শ সংরক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে

আশ্রয় না করিয়া এক জাতিকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে দৌর্ব্বল্যকে আমরা ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাই ভারতবর্ষের পক্ষে অমৃতপ্রসূ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমরা মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ের কথা বলিতেছি।

বেদান্তের একত্বভাব সমাজ-শরীরে বিকাশলাভ করে নাই বলিয়াই মুসলমান কর্তৃক ভারতাক্রমণ সম্ভবপর হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতীয় জীবনে বীরত্বের অভাব ছিল না; কিন্তু যে সাধনা, যে একপ্রাণতা থাকিলে বীরত্ব ফলপ্রসূ হয়, তাহার অভাবে বীরত্ব কোনরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। প্রথমে মুসলমান আক্রমণের সময় ভারতে যে আত্মকলহ জাতীয় জীবনের আভরণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, কালে তাহা যে কতকাংশে প্রশমিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মুসলমান বিজয় সম্বন্ধে ইতিহাস একটী বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তাহা কতকটা মুসলমানদের কলঙ্ক বলিয়াই সকলে মনে করেন। কিন্তু আমরা সেরূপ কিছু মনে করিবার কোনই কারণ দেখি না। ইতিহাস বলে যে মুসলমান-রাজগণ অত্যন্ত অত্যাচারী ও ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারা একহাতে কোরাণ ও একহাতে তরবারি লইয়া সকলকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। প্রথমতঃ ইহা আমাদের অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়; কেননা, ইহা যদি সত্যই হইবে তাহা হইলে প্রথমাবস্থায় হিন্দুজাতি অতিশয় দুর্ব্বল ও মুসলমানজাতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, সেই সময়ে মুসলমান-জাতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত এবং অদ্য ভারতবর্ষ নিজের আদর্শ পরিভ্রষ্ট হইয়া একটী মুসলমান-প্রধান দেশে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন মনে করিতে হইবে যে হয় মুসলমানরাজগণ সাধারণ বৈদেশিকরাজশক্তি যেরূপ হয় সেইরূপই ছিলেন, নতুবা হিন্দু জাতির সেই দুর্দ্দিনেও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি সুপ্তভাবে সমাজশরীরেই বর্ত্তমান ছিল। শেষোক্ত মতটী সত্য হইলে তাহা ভারতীয় আদর্শের 'সনাতন সংরক্ষণনীতি' বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে। তাহা হইলে বলিতে হয় যে প্রথমে হিন্দুজাতি কতকাংশে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেও শীঘ্রই নিজের সুপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেশের পরাধীনতা সত্ত্বেও সমাজ-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই জন্যই বলিয়াছি যে 'মুসলমানকর্তৃক

P3008

ভারত-বিজয় ভারতেতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা'। ইহা ধ্রুব সত্য যে শক্তিমান জাতির সহিত সংঘর্ষে সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়। মুসলমান কর্ত্তৃক এই ভারতাক্রমণ না হইলে ভারতবর্ষ বলিতে আজ কিছুই থাকিত না।

কালে মুসলমান সমাজ হিন্দুসমাজের পার্শ্বে আশ্রয়লাভ করিল। তখন হিন্দুসমাজ নিজেকে কঠোর অষ্টপাশবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে; ভয়,—পাছে রাজশক্তিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত মুসলমানসমাজের সংস্পর্শে হিন্দু-আদর্শ মলিন হইয়া যায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক বসবাসের ফলে এই কঠোর বন্ধন শিথিল হইয়া কালে সামাজিক সংমিশ্রণ না হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে মেশা-মিশি প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; নতুবা, চিরবিরোধের মধ্যে ভারতে মুসলমানসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই মেশামিশির ফলে দুইজাতির মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দিন২ দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু আদর্শ পরিস্ফুট না থাকায় অজ্ঞানকৃত ব্যাভিচারের অনুষ্ঠান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে রাজনীতিবিৎ আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি দেখিলেন যে হিন্দুজাতি যতদিন তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিবে ততদিন ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। সেইজন্য তিনি তৎকালে ভারতীয় আদর্শের পৃষ্ঠপোষক রাজপুত জাতির সহিত যৌনসম্বন্ধস্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং কতকাংশে সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাণা প্রতাপসিংহকে আশ্রয় করিয়া 'সনাতন সংরক্ষণনীতি' কর্ম্মক্ষেত্রে বিকাশলাভ করিয়াছিল: রাণাপ্রতাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই, তিনি ভারতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য যজ্ঞে আত্মাহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার সাধনা ভারতে এক নবযুগের 'প্রবর্ত্তন' করিয়া হিন্দু আদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিল: পরবর্ত্তী যুগে আমরা দেখিতে পাই যে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসের মুখে যখন আরঙ্গজেব কঠোর দমননীতির (Repression) অনুসরণ করিয়া হিন্দুসমাজকে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 'পার্ব্বত্য মূষিক' শিবাজী হিন্দুজাতি ও ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্যে মোগল-

শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিবাজী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের একত্বপ্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমাদের রাজনীতির সহিত কোনই সম্পর্ক নাই বলিয়া আমরা এপ্রবন্ধে সে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলাম না। আমরা ভারতের ইতিহাসে ইহাই দেখাইতে চাই যে যখনই আবশ্যক হইয়াছে তখনই ভগবান স্বয়ং কর্ম্মীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুগোপযোগী ধর্ম্ম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে ভারতের দিবার এখনও অনেক জিনিস আছে বলিয়াই ভারতীয় আদর্শ যুগে যুগে মলিন হইলেও কখনও ধ্বংশ বা নূতন বিজাতীয় আদর্শ কর্ত্তৃক দূরীভূত হয় নাই। আমরা পাশ্চাত্যজাতিশ্রেষ্ঠ ইংরাজজাতির সংস্পর্শে আসিয়া জাতীয় আদর্শের সংরক্ষণ বা পুষ্টি হিসাবে কোন্ কোন্ বিষয়ে লাভবান হইয়াছি ইহা আমরা পরবর্ত্তী কোন প্রবন্ধে আলোচনা করিব। তবে বোধ হয় এইখানে এইটুকু বলিয়া রাখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শিবাজী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে আমরা রাজনীতিবিশারদ ইংরাজজাতিকে এইভাবে বুঝিয়া তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করিতে পারিতাম না এবং তাঁহাদের সদ্‌গুণগুলি জাতীয় জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ করিতেও সক্ষম হইতাম না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে ভগবান আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভাবেই ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে 'সনাতন সংরক্ষণ-নীতির বিকাশ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও যুগোপযোগী ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যথাসময়ে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

বর্ণাশ্রম।

স্বামীজী বলিয়াছেন, "জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সমস্ত ভারতবাসীই আমার ভাই"। যে ভাবে স্বামীজি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই ভাবের দ্যোতনা আমাদের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিলেই ভেদবুদ্ধি অপসারিত হইবে—এক বিশাল মধুর মমত্ববোধে আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইব। ইহাই মিলন, ইহাই একতা।

অনেকের ধারণা জাতিভেদ-বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু সমাজে এই একতা সৃষ্টির পথে ভীষণ বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান। এই জাতিভেদপ্রথা দূর করিতে পারিলে সকল হিন্দুকে একই সূত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহা সত্য কিনা জানিতে হইলে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তিস্থান বাহির করিতে হইবে।

ভারতের হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। কালে এই চারিভাগ হইতে হিন্দুজাতি কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যে বিভক্ত হইয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। অতএব এই বর্ণাশ্রমই যে ভেদের একটী প্রধান কারণ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি দেখা যায়, ইহার দ্বারাই ভারতের ঐক্য শক্তির খর্ব্ব হইয়াছে, তবে এমন অনিষ্টকর বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আপত্তি কি? এই গুরুতর বিষয়টীর আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা, যে বর্ণাশ্রম ভারতবর্ষের নিজস্ব সামগ্রী যাহা ভারতছাড়া আর কুত্রাপি গড়িয়া উঠে নাই, যাহার উপর ভারতের হিন্দুসমাজ আজও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বর্ণাশ্রম বিষয়ক সঠিক জ্ঞান অর্জ্জন করা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" গীতা, ৪।১৩ "আমি, গুণ ও

কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি।" এই আমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। গুণ ও কর্ম্ম কাহার? অবশ্যই ভগবানের। তাঁহার বিকাশেই সৃষ্টির বিকাশ। ভগবানের গুণ ও কর্ম্মের দ্যোতনায় জগতের সৃষ্টি। এই গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য সমাজেই ইহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ তদীয় গুণ ও কর্ম্ম মনুষ্যজাতির ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছেন—ভারতবর্ষই ইহা উপলব্ধি করিয়াছে—ভারতের ঋষিই ভগবল্লীলা পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাই ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং এইখানেই তাহার প্রথম বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল।

ভগবান্ গুণাতীত এবং গুণময়। তাঁহার ইচ্ছাতেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড লয়ের কোলে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া যায় এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই অনলে, অনিলে, ব্যোমে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ইচ্ছাই প্রকৃতিশক্তি। প্রকৃতি গুণময়ী। বহুগুণসমন্বিতা হইলেও তাঁহার একটী গুণ বীর্য্য। এই বীর্য্যই হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

বীর্য্যের আধার জীব-শরীর। এই জীব আবার পঞ্চকোষাত্মক। অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ এবং আনন্দময়কোষ।

প্রথম কোষ-চতুষ্টয়ের উপরেই বীর্য্যের অধিকার। এই চারিটী কোষ লইয়াই মানব জগদ্রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যায়। আনন্দময় কোষের খেলা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির স্বভাবশক্তি বীর্য্য-রূপে এই চতুর্কোষে বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্যকে ক্রীড়নকরূপে খেলাইতে-ছেন। মনুষ্যের ইহাতে হাত নাই—সে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। এই বীর্য্য-শক্তি চতুর্কোষে সদাবিদ্যমান থাকিলেও ইহার ক্রিয়ার আভব্যক্তিতে যথেষ্ট সমতার অভাব আছে। সেইজন্য যখন জীবের যে কোষে শক্তির সমধিক বেগ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কোষের বিশেষ লক্ষণ ও ক্রিয়াগুলি তাহার জীবনের কার্য্যাদিতে ফুটিয়া উঠে। এই বীর্য্যশক্তি, বিজ্ঞানময় কোষে সমধিক বিকাশ পাইলে মানুষের চরিত্রে কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে যথা জ্ঞানলিপ্সা, জ্ঞানপ্রকাশ, ব্রহ্মবর্চ্চঃ ও স্থৈর্য্যগুণ। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যশরীরকেই আর্য্যঋষিগণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের কামনা নাই—ব্রাহ্মণের যাচ্ঞা নাই, ব্রাহ্মণের লোভ নাই, ভোগেচ্ছা নাই। আছে জ্ঞানলিপ্সা। সে কামনাকে শুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া আনন্দময় কোষের সন্ধানে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে। জ্ঞানলিপ্সাই ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ। জ্ঞান দুই প্রকার। পরা এবং অপরা। পরা ব্রহ্মবিদ্যা, অপরা পার্থিব জ্ঞান। ব্রাহ্মণ পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই সতত চেষ্টা করিবেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সকল জ্ঞানই ব্রাহ্মণের করতলগত হইবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই হউক আর পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যাই হউক ব্রাহ্মণের নিকট সমস্তই সুবিদিত। কঠোর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব। আপাতমধুর অপরাবিদ্যার উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভ্রান্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ অদ্ভুত জ্ঞানলিপ্সা দ্বারা কামনারহিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যারই সাধনা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ মানব বিষয়-বিশেষের বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া পরে তাহার অন্তর্জ্ঞানের পরিচয় লাভার্থ ধাবিত হয়। ব্রাহ্মণ বস্তুর অন্তঃস্থল দর্শন করেন এইরূপে অগ্রে ভিতরের প্রকৃতি দেখিয়া তাহার বাহ্যপ্রকাশের ধারা নির্দ্ধারণ করেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞানপ্রকাশশক্তি বাহিরে নহে, ইহা ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে।

ব্রহ্মবর্চ্চঃ তেজোবিশেষ। ব্রাহ্মণের দিব্যজ্ঞান তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে এই মহাশক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া স্বর্গীয় প্রভা এবং শক্তি জগতে প্রকাশ করিবার প্রেরণা প্রদান করে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবর্চ্চঃ, ব্রাহ্মণের শরীরে ভগবানের স্বভাব আরোপিত করে। ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ তখন এক হইয়া যায়—তাই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের পূজাই পরব্রহ্মের উপাসনা, ব্রাহ্মণের সেবাতেই নিখিল ভুবনের সেবা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অহমিকার মোহান্ধকার ব্রাহ্মণকে দিশেহারা করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা যে অমরার ঐশ্বর্য্য আহরণ করে, সে ঐশ্বর্য্যে অভিভূত না হইয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণের ধৃতিশক্তি অসাধারণ—সেই জন্য ব্রাহ্মণের আধার ভগবানের সকল গুণ প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী।

বিজ্ঞানময় কোষের নিম্নেই মনোময় কোষের স্থান। ইহার বিকাশে জীবশরীরে ক্ষত্রিয় শক্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অভয়, সাহস, যশোলিপ্সা এবং আত্মশ্লাঘাই ক্ষত্রিয়ের ভূষণ। ক্ষত্রিয়, নির্ভীক এবং নিঃশঙ্ক। ভয়ের ক্ষণিক ইঙ্গিতেও তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলে না।

প্রশান্তচিত্তে ক্ষত্রিয় সহস্র বিপদ মাথা পাতিয়া সহ্য করে। কোনও বিপদ পাতে, কোনও দৈবদুর্বিপাকে ক্ষত্রিয় কদাপি অভিভূত হয় না ইহাই অভয়ের লক্ষণ।

ক্ষত্রিয়ের সাহস অসাধারণ। স্বকার্য্যসাধনে সে সতত তৎপর। কোন বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষত্রিয়ের ইষ্টসাধনে সহস্র বাধা বিপত্তি উত্তোলন করুক না কেন, ক্ষত্রিয় তাহা অসীম সাহসে, অমিত বিক্রমে পদদলিত করিবে। ক্ষত্রিয়ের নিকট অসম্ভব কিছুই নাই। ক্ষত্রিয় জগতে অপরাজেয়।

ক্ষত্রিয় নির্ভীক বলিয়া, সাহসী বলিয়া সহস্র বিপজ্জাল মাথায় করিয়া বহন করে, সহস্র ক্লেশ অম্লানমুখে সহ্য করে কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধিই তাহার লক্ষ্য। বিজয়, অভীষ্টসিদ্ধি এবং প্রভুত্ব এইগুলিই ক্ষত্রিয়ের যশের চিহ্ন। ঘোর সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় জয়পতাকা উড়াইবার জন্যই অগ্রসর হয়, পরাজয় সে জানে না। বিজয়লক্ষ্মী ক্ষত্রিয়কেই বরণ করিয়া লয়েন। রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় দারুণ দুর্দ্দৈবক্লিষ্ট হইয়াও একবিন্দুশোণিত থাকিতে পরাজয় স্বীকার করে না। এইরূপে যশোলিপ্সাই ক্ষত্রিয় চরিত্রের প্রধান ভূষণ স্বরূপ। কিন্তু এই লিপ্সা বাসনা নহে। ক্ষত্রিয়ের ভিতর ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, এই জ্ঞান ও ধৃতিশক্তি বলেই ক্ষত্রিয় আপনার ভিতর ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করেন। এইরূপ আধারের ভিতর দিয়াই ভগবান্ তাঁহার ক্ষত্রিয়-বীর্য্য জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্ম-শ্লাঘা অশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শক্তি। যখন জ্ঞান সংযোগে এই শ্লাঘা আত্মা ছাড়াইয়া পরমাত্মায় সংযোজিত হয় তখন ক্ষত্রিয়ের গর্ব্বশক্তি ভগবচ্ছক্তি হইয়া কার্য্য করে। কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবান্ জীবের মধ্যদিয়া উদার ও মহৎ কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইবার তৃতীয়কোষ প্রাণময়। এই প্রাণময় কোষের বিকাশে জীবশরীরে দান, কৌশল এবং ভোগলিপ্সা গুণ ফুটিয়া উঠে। ইহাই বৈশ্য-শক্তি। দান এবং প্রতিদান করাই বৈশ্যের প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমিকের মত সে যাচিয়া যাচিয়া আপনার প্রাণ পরের হাতে সঁপিয়া দেয় বটে—কিন্তু সে তার প্রতিদানেরও প্রতীক্ষা করে। বৈশ্য আপনার সর্ব্বস্ব পরহিতে ছড়াইয়া দেয়, কিন্তু কুড়াইবার সময় তাহার শতগুণ সে আহরণ করে। ইহাই বৈশ্যবৃত্তি। অকুণ্ঠিত চিত্তে বৈশ্য পরের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিবে, আবার কৌশল করিয়া সংহরণ করিবে। বৈশ্যের ব্যবস্থা, দক্ষতা এবং

নিপুণতা সমস্তই প্রজা-হিতের জন্য। বৈশ্যের আহরণ এবং সংরক্ষণ প্রবৃত্তি যেমন আনন্দদায়ক, ব্যয় করিতেও কিন্তু সে তেমনি কুণ্ঠাশূন্য। বৈশ্য সৃষ্টিরক্ষা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। বৈশ্যের ভোগশক্তি তাই অসাধারণ। বিষ্ণুশক্তির লীলা বৈশ্যের ভিতরই প্রকাশিত হয়। রুদ্রশক্তি ক্ষত্রিয়ে ও শিবশক্তি ব্রাহ্মণেতেই অবস্থান করেন।

অবশেষে অন্নময় কোষের কিঞ্চিৎ-পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। কাম, প্রেম, দাস্যলিপ্সা এবং আত্মসমর্পণ এইগুলিই অন্নময় কোষের গুণ। ভগবান্ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে অবতরণ করিয়া আপনার চৈতন্যময় শক্তি দিয়াই অন্নময়কোষ সৃষ্টি করিয়া তাহা লইয়া অন্নময় জগতে শূদ্ররূপে লীলা করেন। এক হিসাবে শূদ্রশক্তিই চতুঃশক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি—কারণ তাঁহাকেই ভগবানের অন্নময় লীলা নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আত্মত্যাগ বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু অশুদ্ধ অবস্থায় শূদ্র জ্ঞান, শক্তি, কৌশল হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে নীরবে মূক, মোহবদ্ধভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহকে এই অশুদ্ধতা দূর করিতে হইবে। তাহাকে তাহার নিজের ভিতর জ্ঞান, শক্তি, ও কৌশলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, তাহার পর ভগবান্, মানুষ এবং সর্ব্বভূতের সেবায় সেইগুলি উৎসর্গ করিতে হইবে। তাহার অশুদ্ধ কামকে পরিশুদ্ধ করিয়া আত্মসুখস্বচ্ছন্দপ্রিয়তার স্থলে অন্নময়কোষে ভগবানের আনন্দলীলারই ভোগপরায়নতা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহার স্বভাবগত প্রেমকে দাস্যলিপ্সার সহিত সংযোজিত করিয়া তাহাকে মানুষ ও ভগবানের নিষ্কাম সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

কলিযুগে এই শূদ্রশক্তিই প্রধান। আজ এই কলিযুগে দাঁড়াইয়া তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহার ভিতর কতদূর সত্য আছে সুধীবর্গ তাহার বিচার করুন। যুগ-প্রভাবে আজ আমাদিগকে শূদ্রে পরিণত করিয়াছে। শূদ্রের ধর্ম্মই আমাদের পালনীয়। কেবল অশুদ্ধতা দূর করিয়া আমাদিগকে দাঁড়াইয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু স্বধর্ম্মের সম্যক পালনে অপ্রবৃত্ত হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যযুগের প্রধান লীলা ছিল ব্রাহ্মণ্যশক্তির। কাল প্রভাবে ভগবদিচ্ছায় সে শক্তি চূর্ণ হইয়াছে—কেবল ব্রাহ্মণ-সংস্কার লইয়া গর্ব্ব করিলে চলিবে কেন—শূদ্রত্বই যে তোমার

অস্থিমজ্জায় ফুটিয়া উঠিতেছে। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় শক্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়া ছিল—উপর হইতে অবতরণ কালে ধাপের পর ধাপে পা ফেলিয়াই নামিতে হয়—আজ ত্রেতার সে ক্ষত্রিও নাই, স্মৃতির আঁকড় মাত্র অবলম্বন করিয়া কে তুমি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দাও? ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ কোথায়? যুগ যুগান্তরের কোলে ভগবান্ তাহাকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। দ্বাপরে বৈশ্য ছিল। কিন্তু আজিকার বৈশ্য! কোথায় তোমার নিপুণ শিল্প, অপূর্ব্ব সংরক্ষণ প্রথা, অতুল ঐশ্বর্য্য? ভগবানের ইচ্ছায় সব ধ্বংস হইয়াছে—দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সব ভাঙ্গিয়াছে—আবার গড়িয়া উঠিবে। সমস্ত নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইবে। ভগবল্লীলা চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে—সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের পর কলি—আবার সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। ভগবদ্‌বিধান চির অব্যাহত। যুগপ্রভাবে আজ আমরা শূদ্র। তাই ঘটনা চক্রে বাধ্য হইয়া শূদ্রের আচরণই আমাদের ধর্ম্ম হইয়াছে। বর্ণ চিরকাল বংশগত নহে—ভগবানের ইচ্ছা-সঞ্জাত। এই ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতের উত্থান পতন হইয়া থাকে। চতুর্যুগের ভিতর দিয়া ভগবান্ বিজ্ঞানময় কোষ হইতে অন্নময় কোষে অবতরণ করিয়াছেন। এতদিন পতনের যুগ চলিয়া আসিয়াছে—আবার উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাই আবার সত্যযুগের আগমন প্রতীক্ষায় সাধকগণ তপস্যানিরত। আজ আমাদের কাম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, আজ আমাদের প্রেম—স্বদেশপ্রেমের ভিতর দিয়া ভগবদ্ প্রেমাভিসারে পরিচালিত। নিষ্ঠাসহকারে অহমিকা শূন্য হইয়া যদি আমরা আজ ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব সমর্পন করিতে পারি—তবেই অন্নময়কোষের পরিশুদ্ধি হইয়া ক্রমে আমাদের বিজ্ঞানময়কোষ আবার অদ্ভুত প্রতিভানলে জ্বলিয়া উঠিবে। আমাদের জ্ঞান অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ হইবে, আমাদের মনের প্রসারে, প্রাণের বিকাশে, ভগবানের মহিমাময় গুণাবলী জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে। সে সুখের স্বর্গরাজ্যের যে দিন ধরায় আবার প্রতিষ্ঠা হইবে—সেদিন দেখিবে এই তপস্যা বলেই মানবাধারে ভগবানের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রকাশ হইয়াছে। ইহা সাধন-সাপেক্ষ, চেষ্টা ও নির্জ্জীব অহমিকা পূর্ণ আন্দোলন সাপেক্ষ নহে।

———o———

গুরু ও শিষ্য।

শিষ্য। গুরো! আর কতদিন এভাবে সংসার করব? এতে যে বড়ই ক্লেশ অনুভব করছি; আদেশ করুন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি।

গুরু। বৎস! এত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে কেন? সতী সাধ্বী স্ত্রী, চাঁদের মত ছেলে, ভগবতীর মত জননী, ধনেরও অভাব নাই বিদ্যার্জ্জনও যথেষ্ট করিয়াছ, তথাপি সংসারে বিতৃষ্ণা কেন বৎস?

শিষ্য। সবই সত্য গুরুদেব! আপনার কৃপায় অভাব অভিযোগ নাই বলিলেও দোষ হয় না, তথাপি মনে হয়, জরামরণ নিপীড়িত এই সংসার, দুঃখের সাগর। উপর থেকে সংসারটী দেখিতে বড় মনোরম, বড় আনন্দের, কিন্তু হায়! অন্তরটি ঠিক তাহা নহে,—ভিতরের দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণতার পূতিগন্ধে সংসার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

গুরু। বৎস চঞ্চল হইয়োনা—বিচার শক্তি লোপ পাইবে; আনন্দময়ের এই বিশ্ব সংসারে যে কেবল পুতিগন্ধ পায় তাহাপেক্ষা হতভাগ্য কেহই নাই। আমার দুঃখ, যে এত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াও তুমি আনন্দ অনুভব করিতে পারিলে না।

শিষ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রই ত নির্দ্দেশ করিতেছে যে সংসার অনিত্য, নিত্য বস্তুতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলেই আনন্দ মিলিবে।

গুরু। বৎস, সংসার কোথায় নাই বল? দেহী মাত্রই আধিব্যাধির তাড়না সহ্য করিতে বাধ্য, ক্ষুধা তৃষ্ণার বন্ধনে বদ্ধ। সংসারী সন্ন্যাসীতে বিভিন্নতা স্থূলতঃ কোথায় বৎস? তুমিও পরিশ্রম করিয়া নিজের আহার যোগাড় করিয়া লও, আমিও ত সেই প্রকারেই নিজের আহার যোগাড় করি। সংসারী [illegible]

ক্ষুধার উপর পরের ক্ষুধাও মিটায়। বৎস, তোমার মত সংসারী না থাকিলে আমার মত সন্ন্যাসীর কোথায় স্থান হইত? জানিয়ো বৎস! এসংসারে কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট বা বড় নহে। আনন্দময়ের সংসারে আনন্দের অভাব হয়না বৎস, তিনি যে অনন্ত আনন্দের উৎস, এ কথা ভুলিয়া যাও কেন?

শিষ্য। গুরো! তবে আপনি সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত হইলেন কেন? আরও আরও শিষ্যকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন?

গুরু। বৎস, উদ্বেলিত হইয়োনা চঞ্চল হইয়োনা, স্থির বুদ্ধি না হইলে গুরূপদেশ সম্যক উপলব্ধ হয় না।

এ বিশ্বসংসার কর্ম্মের আগার, আনন্দময় ভগবান আত্ম বিকাশার্থে এই সৃষ্টিলীলা বা মায়ার খেলা করিয়া আনন্দ পাইতেছেন। তিনি আপনাকে অনন্ত প্রকারে প্রকাশ করিয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; এখানে দুঃখের কোন স্থান নাই বৎস, যাহাকে দুঃখ বলিয়া ভাবিতেছ তাহা তোমার অজ্ঞানতা মাত্র জানিয়ো। তুমি আত্ম তত্ত্বজ্ঞ নও বলিয়া এই অনন্ত বিস্তৃত আনন্দ সাগরের কুলে দাঁড়াইয়াও আনন্দবারি স্পর্শ করিতে পারিতেছনা। আনন্দের উপলব্ধি হইলে এবিশ্ব আনন্দের ভাণ্ডার—অনন্ত, অফুরন্ত।

শিষ্য। প্রভু! আমার ত বুদ্ধিতে আপনার কোন কথাই বুঝিতে দেয় না—ক্রমাগত এসংসার জটিল ও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি একটা প্রকাণ্ড অবিচার ও অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা এই সংসারে চলিতেছে—সে তাণ্ডবের শেষ নাই। পুত্র মরিতেছে, মাতা বুক চাপড়াইয়া মরিতেছে, স্বামী মরিতেছে, স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করিতেছে, কাল নাই অকাল নাই যম যাহা ইচ্ছা অবিচার করিতেছে। এদিকে সংসারে সব বিপরীত, এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উপাধি-মণ্ডিত উকিল হইলাম, দুই বৎসর কর্ম্মের ফলে নিজের উদর পূরণে সমর্থ হইলাম না, কনিষ্ঠটীকে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ব্যবসা করিয়া দিলাম, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঘরে ফিরিল; জ্যেষ্ঠ অকালে যমসদনে চলিয়া গেলেন, কেন এত দুঃখেও আনন্দ পাইব?

আপনি সংসারের বাহিরে বসিয়া সংসারের আনন্দ অনুভব করেন, তাই আনন্দ আনন্দ করিয়া আপনি উন্মত্ত হন। আমি দেখিতেছি কেবল কান্না, কেবল কান্না, চতুর্দ্দিকেই নিরানন্দ।

গুরু। বৎস। এতদিন পরে যে তোমার মুখে এই ভাবের কথা শুনিতে হইবে, এত ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষদ গ্রন্থাদি পাঠের পর যে এমন একটী কুহকে পড়িবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। কর্ম্মে যে আনন্দ আছে তাহা তুমি পাও নাই, কারণ আনন্দের উপকরণ-গুলি তোমার মানস ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখ নাই বা রাখিবার চেষ্টাও কর নাই। স্থির হইয়া আজ কর্ম্মের আনন্দ প্রসঙ্গ শুন বৎস!

শিষ্য। আজ্ঞা করুণ প্রভু আপনার উপদেশে আমার চঞ্চলতা আজ দূর হউক।

গুরু। বৎস, বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে উপনিষদে পড়িয়াছ।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবহি
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ।"

কঠোপনিষৎ।

এই শরীরী তুমি আমি মনে করি, তুমি আমিই এ বিশ্বের কর্ম্ম অর্থাৎ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা। এসংসার চলিবেনা যদি তুমি আমি এসংসার হইতে বিচ্যুত হই বা সংসারকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাই; অথচ নিত্যই দেখিতেছ, একমাত্র উপার্জ্জনশীল সংসারের প্রতিপালক অকালে মরিয়া যাইলেও, সংসারটী সমান হাসি কান্নায় মণ্ডিত হয়ে বেঁচে থাকে, জনক জননীর আনন্দের উৎস একমাত্র পুত্র অসময়ে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও সেই হাসি কান্না সমন্বিত সংসার সমান ভাবেই চলে—ইহাত নিত্য দেখিতেছ বৎস।

এ দেহ রথ মাত্র, আত্মা বা ভগবান ইহার রথী বা কর্ত্তা, বুদ্ধি এই রথীর সারথী নামধারী নফর মাত্র, মনঃ—ইন্দ্রিয়াদি অশ্বগণকে সোজা পথে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইবার উপকরণ—বল্গা মাত্র। বৎস, এই দেহাভিমানী তুমি আমি, মানুষী বুদ্ধি যাহাকে ইংরাজীতে তোমরা human intellect বল, তাহার দ্বারা

বিচার করিয়া এই বিপুল আনন্দ আগার বিশ্ব রাজ্যকে নিরানন্দের আকর বলিয়া প্রচার করি—একি সামান্য দুঃখের কথা বৎস! মানুষী বুদ্ধি কতটুকু দৌড়িতে পারে? বৎস এই লীলা নিকেতনে আমরা যে একটী একটী লীলার উপকরণ, ছকে বসাইয়া কাহাকেও বা রাজা মন্ত্রী করিয়া নাচাইতেছেন কাহাকেও বা গজ অশ্ব বা বড়ে করিয়া বসাইতেছেন উঠাইতেছেন। এ আনন্দলীলায় যদি আনন্দ না পাইলে তাহা হইলে কি হইল বৎস! তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাঁহাকে রথী করিয়া তাঁহার হাতে যদি এ দেহ রথখানি চালাইবার ভার দাও, বৎস এসংসার তোমার সুখ দুঃখের, পাপ পুণ্যের, স্নেহ ঘৃণার, শত্রু মিত্রের বাহিরে যাইয়া পড়িবে,—দুঃখের ছায়া ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৎস এ যে অতি চমৎকার অবস্থা, এ যে অতি মনোরম ব্যবস্থা।

শিষ্য। প্রভু আরও একটু সহজ ভাবে আমায় বুঝাইয়া দিন। আপনি যত সহজে আনন্দ পান আমি তত সহজে পাইনা, ইহাইত দুঃখ।

গুরু। স্থির হও বৎস, তোমরা ইংরাজীনবিশ সকল কথাতেই ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠ, তোমাদের সকল কর্ম্মেই চঞ্চলতা।

জীব মাত্রই কর্ম্ম করিতে বাধ্য মানুষ কর্ম্ম করিয়াই থাকে—"To work is the normal condition of man," এই কর্ম্ম করিয়াই সে আনন্দ নিরানন্দ সৃষ্টি করে। এই কর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে—দেখিতে পাইবে—ইহার তিনটী মাত্র উপাদান আছে।

প্রথম কর্ত্তা বা প্রভু, দ্বিতীয় কর্ম্মী যে কর্ম্ম করে, তৃতীয় যন্ত্র বা ইংরাজীতে যাহাকে তোমরা instrument বল। এই তিনটী উপকরণের সম্যক বিবৃতি ও উপলব্ধি হইলে কর্ম্মরহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া কর্ম্মের আনন্দ উপলব্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

আজ আমরা বিপন্ন। দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে, দারিদ্র্যে ঘুঝিবা আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। কি এ দেশ? শরীরে স্বাস্থ্য নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, মনে শ্রদ্ধা নাই। চিন্তায় শৃঙ্খলার, মস্তিষ্কে প্রখর প্রতিভার অভাব। হায়! হায়! এতবড় একটা বিরাট জাতির একি ভীষণ অধঃপতন।

কিন্তু চিরদিন এমনই ছিল না। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, প্রতিভায় সাহসে, বীর্য্যে শ্রদ্ধায় একদিন এদেশের সারা পৃথিবীতে উপমা ছিল না। তখন বেদগানে আকাশ মুখরিত হইত, ধর্ম্মসাধনায় জীবন দেবতুল্য হইত, ধনধান্য-ঐশ্বর্য্যে দেশ ভরিয়া থাকিত।

গৌরবের দিন ছিল বটে—কিন্তু কবে কোন্ কালে ঘৃতভক্ষণ করিয়াছি আজও হস্তাঘ্রাণ করিয়া গর্ব্বান্বিত হইলে চলিবে কেন? একবার হিন্দু সমাজের দিকে তাকাও—দেখিবে কোথাও ঐক্য নাই, প্রেম নাই প্রাণ নাই; আছে কলহ, আছে বিদ্বেষ, আছে জরাজীর্ণ অস্থি পঞ্জরের রাশি। বেদাধ্যয়নে, ধর্ম্মসাধনে, রাজকার্য্যে, জীবিকাউপার্জ্জনে সর্ব্ব-বিষয়েই অধিকারী হওয়া চাই—আমরা অনধিকারী বলিয়া সকল ভোগে বঞ্চিত হইয়াছি।

কেনই বা এমন হইল? এবং আবার কি আমরা জীবনীশক্তি ফিরিয়া পাইবার পথে চলিয়াছি? আবার কি আমরা প্রকৃত অধিকারী, প্রকৃত

মানুষ হইবার জন্য সত্য সত্যই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি? আমাদিগের জাতীয়জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে এই বিষয়ে একটী সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই।

আমরা বলি, ইহা ভগবল্লীলা। "বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচাও তেমনি নাচি"। তাঁহারই ইচ্ছাতে প্রাচ্যের এই মহাতীর্থ ভারতবর্ষ আজ ধ্বংসের লীলারঙ্গে নিষ্পেষিত। আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্যভূমি ধনসম্পদগরিমায় পরিপূর্ণ—বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উত্থান ও পতনের একটা ক্রম আছে। সে ক্রমের বিস্তারিত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে প্রাচ্য যখন সঞ্জীবনী সুধাস্পর্শে নবীন অনুরাগে জাগিয়া উঠে, পাশ্চাত্য তখন বিশ্রামলাভের জন্য কিছুকালের জন্য ঘুমাইয়া থাকে। আবার পাশ্চাত্যের মহাজাগরণে প্রাচ্য নিদ্রা যায়। দিবারাত্রির মত ইউরোপ ও এসিয়ায় কালের এই মহা তাণ্ডবলীলা সৃষ্টিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইউরোপ আজ জাগ্রত তাই আমরা নিদ্রিত। পরন্তু আমরা মরি নাই, মরিতে পারি না।

এই দুই মহাদেশ চিরদিন ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। আমরা যখন নিদ্রায় অভিভূত, ইউরোপ তখন তাহাদের বিদ্যা, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের সাধনা আমাদিগকে দান করিতে আসিয়াছে। আবার আমরাও যখন জাগিয়া উঠিয়াছি তখন ইউরোপকে আমাদের সর্ব্বস্ব দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছি। এইরূপে আমরা যুগযুগান্তর ধরিয়া পরস্পরের সম্পদ বিনিময় করিয়া একটা অখণ্ড মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আজও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কে বলিবে কবে সেই মহা ঐক্য, সেই মধুর সত্যযুগের স্বপ্ন ধরাধামে সফল হইবে? কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই মহতী চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু ইহা এখনও যে ফলবতী হয় নাই তাহার কারণ, এসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধনে চিরদিন যত্নবান্—ইউরোপকে মানসিক ও ভোগজীবনের বিকাশক্ষেত্ররূপেই পরিণতিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ইউরোপ তাহার মানসিক ও ভোগগত জীবনের পূর্ণতর বিকাশের উপরেই একটা উন্নততর মানবসভ্যতার নির্ম্মান করিবার কামনা করে—এসিয়া তাহার মনঃপ্রাণকে ভগবানের স্বরূপান্বেষণে নিয়োজিত করিয়া সার্থক হইতে চাহে। ফলতঃ উভয়েই এক একটা দিকের চরম

উৎকর্ষে পৌঁছিলেও উভয়েরই জীবনে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য—বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃতিত্বলাভ করিয়াছে; এসিয়া—প্রেমে, বিশ্বাসে, সত্যে আপনার অদ্ভুত পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছে। কবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হরিহরের মত সম্মিলিত একটা সম্পূর্ণ জীবনাদর্শলাভে সমর্থ হইবে—সেই স্মরণীয় মহামুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় ভারতের ঋষি এখনও যোগনিরত। হে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধকমণ্ডলী তোমরা কি দেবতার জন্য আপনাদের হৃদয়সিংহাসন শুভ্র নির্ম্মল বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে না?

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয় বিধ গুণে জীব যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ আছে। এই বন্ধন দশাই সংসার লীলা। এত যে সুন্দর বৈচিত্র্যময় জগৎ শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ গুণেই সংঘটিত হইয়াছে। অধিকাংশ মানব আপাতমধুর, প্রেয়ের মোহে পড়িয়া হাঁসি কান্নার খেলাঘরে ক্রীড়াশীল। শ্রেয়ের বন্ধন ফাঁস দেওয়া টানিলেই খুলিয়া যায়। প্রেয়ের বন্ধন কিন্তু টানিলেই জটিল ও দৃঢ়হয়। সাধক শ্রেয়গুণ অবলম্বনে সংসার হইতে মুক্তির সন্ধান করিয়া থাকে।

ভিতরের শক্তি।

মানুষ যতই কেন আপনার জালে আপনি জড়াইয়া পড়ুক না সে মরণ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। বন্ধন ছেদন করিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করে, সে ততই আরও অধিক জড়াইয়া পড়ে, সংগ্রামের ত্রুটী তাহার নাই। মহামায়া ফাঁক না দেখাইয়া দিলে জীবের বাহির হইবার উপায় নাই। এই যে সংগ্রাম শক্তি এটী অসাধারণ। চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলিয়া এ শক্তির গরিমা মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এটী অন্তর্শক্তি। এই শক্তির বলেই মানুষ খায় হাসে বসে কর্ম্ম করে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। এই শক্তির ব্যর্থ প্রয়াস এত উৎকট যে জগতের ইতিহাস তাহার কাহিনী প্রকাশ করিতে করিতে ক্রমশঃই আপনার অবয়ব স্থূল হইতে স্থূলতর করিতেছে। যে এই অন্তর্শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার সাক্ষাতের জন্য সাধনা করে, অতি কঠোর তপস্যার পর মহাকালী তাহারই হৃদয় মন্দিরে

তাঁর শক্তিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। জীব তখন অহঙ্কার শূন্য হয়—কর্তৃত্ব অভিমান দূরে পলায়ন করে, মায়ের মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

তন্ত্র সাধনা।

জগতে তান্ত্রিক সাধনার অবসর বাড়িতেছে। তামসিক সাধন প্রণালী সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইতেছে। সাধক তন্ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইবা মাত্র মায়ের সাক্ষাত লাভ করিতেছে। এমন সুযোগ বুঝি পৃথিবীতে আর কখনও আসে নাই। মহাগুরু বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে জগতের সর্ব্বত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র সন্তান নবধর্ম্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। তন্ত্র সাধনার দিনে প্রাচীন বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত গলিত শবের মত পৌরানিক সাধন ছাড়িয়া আত্মোন্নতি প্রয়াসী ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

মন্ত্র শক্তি।

মহাগুরু যে মন্ত্র যাহার কর্ণে আরোপ করেন, সেই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অমরকোষে অথবা শব্দকল্পদ্রুমে অন্বেষণ করিতে হয় না। সদ্‌গুরু আধার অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রশব্দ সাধকের হৃদয়ে উপ্ত করেন। সাধক নিজের সাধন বলে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লয় সাধকের অসাধারণ জলন্ত বিশ্বাস সংযোগে মহামন্ত্র অগ্নিবর্ণ ধারণ করিয়া তাহার অন্তরস্থিত সমুদয় আবর্জ্জনা দূর করিয়া দেয়। ক্ষেত্রস্থিত বীজের উপর আবশ্যক মত জল সিঞ্চন না করিলে যেমন তাহার অঙ্কুর সুবিধা মত বিকশিত হইয়া উঠেনা; বিশ্বাস অভাবে সাধকের ইষ্টমন্ত্রও সেইরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠে না। অতএব যে মন্ত্র লাভ করিয়াছ তাহার উপর জলন্ত বিশ্বাস আরোপ কর, মন্ত্রের শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে।

নিত্যের উপাসনা।

মানুষ কিসের ধ্যান করে, কাহার ধ্যান করে, অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ধ্যানে বসিবার পূর্ব্বে সাধক যে বিষয় ধ্যানের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া লয় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই তাহা ভাসিয়া যায়।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাবই ইহার কারণ। প্রত্যেক সাধককে ধারণা করিতে হইবে, যে সে কিসের জন্য জন্মিয়াছে এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? কোন অনিত্য সুখে ত মানুষ চিরদিন নিমগ্ন থাকিতে পারে না। ধন-জন জীবন যৌবন ত চিরদিনের জন্য নয়, এ সঙ্গীত ত নূতন নয়, হিন্দুর দ্বারে দ্বারে খঞ্জনি বাজাইয়া প্রতিদিন কত ভিখারী একমুষ্টি চাউলের বিনিময়ে এ তত্ত্ব-গীতি গাহিয়া যাইতেছে। আর বোধ হয় হিন্দু সমাজের অতি নীচ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তি পর্য্যন্ত এ কথা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। স্বীকার না করিবার উপায় নাই, চক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন মিথ্যার গৌরব ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। আজ আর ইহা কেবল মুখের কথায় শেষ করিলে চলিবেনা, জগতকে চাক্ষুষ দেখাইতে হইবে, যে ভারতবর্ষ নিত্যধনকে চেনে এবং নিত্যেরই উপাসনা করে।

ধ্যান।

অনিত্য ধনের চিন্তা হইতে মনকে নিত্যবস্তুতে আরোপ করাই ধ্যান। যতক্ষণ মন নিত্যে অবস্থান করে ততক্ষণ সাধকের বহির্জ্ঞান অন্তর্হিত হয় সে নির্ব্বিকল্প আনন্দে মাতিয়া থাকে। শরীর জ্ঞান তিরোহিত হয়, সুখ দুঃখ জগতের যাবতীয় দৈবিক, ভৌতিক, মানসিক পীড়া হইতে সে মুক্তি লাভ করে। এরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে জীবকে সর্ব্ববিধ কামনা বিবর্জ্জিত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ ব্যতীত এ অবস্থা লাভ করা সুদূর পরাহত।

সমাধি।

যখন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয় দেহ প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে লয় হয়, বুদ্ধি অহংকার বিবর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয় তখন একটা অনির্ব্বচনীয় উচ্ছাস ভিতর হইতে উছলিয়া উঠে। সে অফুরন্ত আনন্দের প্রকাশ বাহিরে ফুটিয়া উঠে না। সাধকের সকল ব্যাপিয়া শুধু একটা আনন্দের ধারা প্রবাহমান হয়। সমস্ত বিশ্বের সুর সেখানে বাজিতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন স্পন্দন সেখানে অনুভূত হয়—সে কি সুন্দর—অপরিসীম আনন্দ! ভাব সেখানে মূক ভাষা সেখানে নীরব!!

লক্ষ্য ও উপায়

জীবনগঠন করিবার উদ্দেশ্য মনে জাগরিত হইলে স্বতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, 'আমাদের গন্তব্য স্থান কোথায়?' এই যে চরিত্রগঠনের জন্য প্রথমাবস্থায় সংযমাভ্যাস বা কঠোরতা অবলম্বন, এই যে তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় ভোগবিলাসসুখত্যাগ, এই যে জীবনটাকে গড্ডলিকা প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তজ্জনিত সমস্ত অসুবিধা ভোগ—এই সমস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সার্থকতা কোথায়? মানব এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করিবার আশাবাণী, অস্ফুটভাবে শ্রবণ করিয়াছে বলিয়াই সে এই দুস্তর সমুদ্রপারে অভিযান করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই আনন্দের আস্বাদ সে ভিতরে ভিতরে অনুভব করিয়াছে বলিয়াই সে আজ জীবনান্ত পণ করিয়া এই আত্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি এই চরিত্রগঠনে বাস্তবিক আনন্দ না পাওয়াই যাইবে তাহা হইলে মানব কি কখনও মৃগতৃষ্ণিকার আশায় নিজ আয়ত্বাধীন ক্ষণিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া এই জীবনকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারিত? আমরাও প্রত্যক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি যে যেখানে চরিত্রগঠন কেবল 'আত্মনিগ্রহ'মাত্র, যেখানে আনন্দ উৎস হৃদয়ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করিতে পারে নাই, সেখানে এ চেষ্টা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, স্থায়ীও হইতে পারে না; কেবল কিছুকালের জন্য বিকারগ্রস্ত রোগীর দৈহিক ক্রিয়ার মত অসংযত চেষ্টা হইবার ফলে একটা মানসিক অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই অবসরে ইন্দ্রিয়নিচয় বিশেষ প্রবলভাব ধারণ করিয়া তাহার বালির বাঁধকে ইন্দ্রিয়স্রোতোমাঝে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জন্যই সাধনার প্রথমাবস্থায় এত পদস্খলন হয় এবং নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ খুব প্রবল হইয়া উঠে।

আমরা 'লক্ষ্য ও উপায়' সম্বন্ধে উপরে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি মাত্র। এইবার একটু বিশদভাবে এই দুইটী বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের লক্ষ্যনির্ণয়ের উপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ

নির্ভর করিতেছে। ইহা বলাই বাহুল্য। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে মানবজীবনকে ভগবদ্ভাবের আধার ও লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত করাতেই ইহার সার্থকতা এবং ইহাই মানবের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যনির্ণয় চিরকালই মানব সমাজের মীমাংসার বিষয় হইয়াছে—যে যুগে যে ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে, সেই যুগে মানবীয় সভ্যতা ঠিক সেই ভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে, কিন্তু যে ভাবেই হউক না কেন মানব চিরকালই সেই স্বর্গীয় আনন্দ' বা 'অমৃতত্বে'র সন্ধানে ফিরিয়াছে। এই বিশ্বচরাচর যে ভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত, যে ভাবে সুপ্রণালীবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত, তাহাতে মানবের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা যে উন্নত অবস্থা সম্ভব, এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হয় ও সেই অবস্থা লাভকরাই আমাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমস্ত সৃষ্টিই যে একই সত্তার বিকাশ ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজ আবার তাঁহাদেরই একজন বংশধর পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সত্যই উদ্ভিজ্জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিদের জীবনীশক্তি ত প্রত্যক্ষভাবে সাধারণেও অনুভব করিতে পারিতেছে কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাবলে প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জগতেরও জন্তুদিগের ন্যায় অনুভূতির ক্ষমতা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সেইরূপেই হয়ত ভবিষ্যতে ইহাই প্রমানিত হইবে যে জড়জগতও নির্জ্জীব নহে, তাহাতে প্রাণশক্তি অপ্রত্যক্ষভাবে হইলেও সত্যসত্যই বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে জড়জগতেও প্রাণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা প্রত্যক্ষভাবে বিকাশলাভের চেষ্টা পাইতেছে; উদ্ভিজ্জগতে প্রাণশক্তি স্পষ্টভাব ধারণ করিয়াছে কিন্তু অনুভূতিশক্তি এখনও একরূপ সুপ্তভাবে বিদ্যমান; জান্তবজগতে আমরা প্রাণশক্তি ও অনুভূতিশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, কিন্তু বিচার শক্তি রুদ্ধভাবে Instinct বা সহজ বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া বিকাশলাভের চেষ্টা পাইতেছে। আমরা মনুষ্য সেই বিচারশক্তির পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইতেছি। অতএব ইহাই দাঁড়াইল যে এই সৃষ্টিচক্রে মানবই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে প্রতিষ্ঠিত—যদিও সর্ব্বত্র সেই একই সত্তা বিদ্যমান তথাপি বিকাশের তারতম্যে মানবের এই সৃষ্টিচক্রে শ্রেষ্ঠত্ব আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কে বলিবে যে মানব উন্নতির চরমসীমায়

উপনীত ? এই সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই যখন একটা উচ্চতর স্তর লাভের আকাঙ্খা বর্ত্তমান, তখন মানবজীবনেই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন ? মানব শ্রেষ্ঠজীব বলিয়াই তাহার ক্রমোন্নতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে ; ঐ সমস্ত বাধা দূর করিবার পর সৃষ্টিতে যে অভাবনীয় সামঞ্জস্য (Harmony) প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ফলে এই জগৎ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে এবং সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তব জগৎছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করে না, তাহাদের পক্ষে আমাদের এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাহারা মানবের জ্ঞানকে চিরকালই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং যাঁহারা সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতীন্দ্রিয় অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের জন্য সচেষ্ট হইবেন, তাঁহারা চিরকালই তাহাদের হাস্যাস্পদ হইবেন। যাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই এই অনন্তজ্ঞানসমুদ্রের পরপার হইতে উত্থিত অস্ফুটধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যতই আমরা এই পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই আমাদের মানসচক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক বিশাল অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের দ্বার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে আমাদের লক্ষ্য আপনা হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নিজে ভগবদ্ভাবের কেন্দ্র বা যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা সেইভাব জগতে প্রচার করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। যে দিন এই ভাব জগতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের উচ্ছৃঙ্খল শক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, সেই দিনই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছিব। বাস্তবিক, যতদিন জগতে একজন মনুষ্যও অজ্ঞানতিমিরে বদ্ধভাবে অবস্থান করিবে, ততদিন আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই বুঝিতে হইবে। বিশ্বমুক্তিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এইবার আমরা 'উপায়' সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বলা বাহুল্য, উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ করিয়া বলা একরূপ অসম্ভব। যেখানে সমস্ত জগৎ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এবং জগতের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই আমাদের উদ্দেশ্য, তখন আমরা উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহাও ভাবরাজ্যেরই কথা। যে ভাবটী

সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে সমস্ত কর্ম্মই বাহ্যতঃ সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও নূতন শক্তির বিকাশের পন্থা সুগম করিয়া দিবে, তাহাই আমাদের প্রধান উপায়। সে উপায়টী 'আত্ম-সমর্পণ'। দৈনন্দিন অভ্যাসের দ্বারা এই আত্মসমর্পনের ভাবটী আমাদের মনে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমরা যেন সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতা বা উত্তেজনার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে পারি যে আমরা মায়ের যন্ত্র মাত্র। এই ভাব যতই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, ততই আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের সমস্ত ভাব ও কর্ম্ম ক্রমশঃ একটা প্রসারতা লাভ করিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের অহঙ্কার, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, ব্যষ্টিভাব দূরে পলায়ন করিতেছে। এই ভাবে আমাদের 'একাত্মবোধ' দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'আত্মসমর্পনে'র ফলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায় এবং এই ক্ষুদ্র মানব হৃদয় বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে ছুটে। আমরা সামান্য কর্ম্মক্ষেত্রেও এই আত্মসমর্পনের প্রভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। সৎসঙ্গে কত অসাধু প্রকৃতির লোক সাধু হইয়া উঠে দেখিতে পাওয়া যায়; বন্ধুর চরিত্ররক্ষায় বন্ধুই প্রধান সহায়, ইহার উদাহরণও বিরল নহে; স্ত্রী অন্য কোনরূপ ধর্ম্মপালন না করিয়াই সতীত্বের তেজে মহিমান্বিতা হইয়াছেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এ সমস্তই আত্মসমর্পনের ফল। লৌকিকক্ষেত্রে যখন আত্মসমর্পনের এতদূর প্রভাব তখন অনন্ত শক্তির আধার আদ্যাশক্তি মায়ের নিকট আত্মসমর্পন করিলে যে আমরা 'অমৃতত্বে'র অধিকারী হইব সে বিষয়ে সন্দেহ কি? জগচ্চক্রানুগমন করাই ধর্ম্ম; যে শক্তি সেই জগচ্চক্র চালনা করিতেছেন তাঁহার নিকট আত্মসমর্পন করার ফলে আমাদের ধর্ম্মপালন করা হইবে। প্রকৃত আত্মসমর্পণ করিতে হইলে কি ভাবে এই সৃষ্টি চক্র চলিতেছে, সেই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি; কেন না, সৃষ্টি রহস্য প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই জগচ্চক্রানুগমন সুগম হইয়া উঠিবে। আমরা এই বিশ্বে একই শক্তির তিনভাবে ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছি তাহা হইতেছে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার। আমাদের পুরাণে এই বিশ্বলীলার তিনদিক দেখাইবার জন্যই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। যখন এই মহাশক্তি সৃষ্টি করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মাতে অধিষ্ঠিত মনে করি;

যখন তিনি এই সৃষ্টিচক্র পালন করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাকে বিষ্ণুরূপে অধিষ্ঠিত দেখি এবং যখন সংহার-নীতির অনুষ্ঠানে তাঁহার ভীষণ তাণ্ডব লীলা এই বিশ্বে প্রকট দেখিতে পাই, তখন আমরা তাঁহাকে মহেশ্বর মূর্ত্তিতে আমাদের মানসপটে অঙ্কিত দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে এই ত্রিমূর্ত্তি স্বরূপতঃ সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। সেই মহাশক্তির বিশ্বলীলা আলোচনা করিতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে এই বিবিধলীলা বিচ্ছিন্ন-ভাবে অনুষ্ঠিত না হইয়া কতকটা যেন সমান্তরাল সরল রেখার ন্যায় অনন্ত কালপ্রবাহ ধরিয়া একভাবে একত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে এই তিনটী নীতির একটীর অভাবে অপর দুইটীর অনুষ্ঠান একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সৃষ্টি ও স্থিতি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া আমরা সংহার নীতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। অনেকের ধারণা যে জগতে যদি মৃত্যু বলিয়া কোনও অবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে এই জগৎ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যে তাহা হইলে সৃষ্টি অবাধে চলিবার ফলে স্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠিত এবং সেই জন্যই ভগবান্ যুগে যুগে ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া এক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আমরা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে এই নীতিরই অনুষ্ঠান দেখিয়াছি এবং বর্ত্তমানে এই ইউরোপীয় মহাসমরে তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি। এই মহাযুদ্ধে ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং যাহা কিছু পুরাতন তাহা ধ্বংস হইয়া এক নবযুগের সূচনা করিতেছে। বলা বাহুল্য এই মহাযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ও বৃটীশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ প্রভৃতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র আদর্শ এই নবযুগে নবভাবে জগতে প্রচারিত হইবে। তারপর ত্রিবিধ এই লীলার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে সৃষ্টির মধ্যেই স্থিতির, স্থিতির মধ্যে প্রলয়ের এবং প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির শক্তি ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছে বলিয়াই এই জগচ্চক্র অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইল যে, যে সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত (স্থিতি) করিবার শক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে তাহাই প্রকৃত সৃষ্টিপদবাচ্য এবং যে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির মধ্যে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে

উৎসর্গ (প্রলয়) করিবার শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাই প্রকৃত পক্ষে স্থিতি এবং যে ধ্বংসের মধ্যে নূতনের বিকাশ বা সৃষ্টি সম্ভব তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রলয়। এই সত্যটী আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা চাই নতুবা আমাদের আত্মসমর্পণের ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দুষ্কর। যখনই আমরা দেখিব যে আমাদের অন্তর্জ্জগতে একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়া চলিতেছে, যখনই আমরা দেখিব একটী নূতনতত্ত্ব মনে উঠিয়া পরক্ষণেই জলবুদ্বুদের মত বিলীন না হইয়া তাহা হৃদয়মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, যখনই আমরা দেখিব যে পূর্ণতর নূতনের আগমনে সেই পুরাতনভাব এই বিরাট আত্মযজ্ঞে আহুতি দিতেছে, যখনই দেখিব কোনও কিছু ভাঙ্গাচুরা বা ওলটপালটের মধ্যে যাহা নূতন তাহা সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এক কথায় যখন আমরা দেখিব যে মানস-জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় চক্রাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া ঐশীশক্তির লীলা প্রকট করিতেছে এবং তাহার ফলে দিন দিন আধ্যাত্মিকজগতে আমরা উচ্চতর-মার্গে আরোহণ করিতেছি এবং আমাদিগের দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিয়া বিশ্ব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে, সেই দিন আমরা বুঝিব যে আমাদের আত্মসমর্পণ সার্থক হইয়াছে এবং আমরা সরলপন্থা অবলম্বনে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তখন আমরা যাঁহার কৃপালাভ করিব, তিনি অগতির গতি ; তখন নৃত্য করিতে করিতে জোরের সহিত বলিতে পারিব

"ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি ॥"

—:o:—

পরিণাম।

জীবন ও যোগের একটা সিদ্ধি, একটা পরিণতি আছে। সে সিদ্ধি, সে পরিণতি আর কিছুই নয়—ভগবান্ মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবেন আর মানুষও তাহার আত্মাকে ভগবৎ সত্তার মধ্যে ডুবাইয়া দিবে।

কিন্তু এ নিমজ্জনের অর্থ নির্ব্বাণ নহে। এত অন্বেষণ ও ব্যাকুলতা,

এত বিরহ ও উচ্ছ্বাস শেষে শূণ্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ শূণ্যের মধ্যে আত্মবিলয়ই যদি বিশ্বের পরিণতি হইত, তাহা হইলে বরং এ বিশ্বক্রীড়া আরম্ভ না হওয়াই ভাল ছিল।

আনন্দের মধ্যেই এই বিশ্বের পরিণাম খুঁজিতে হইবে। আনন্দের নিগূঢ় রহস্যের ভিতরেই ভগবানের সর্ব্বরহস্য নিহিত। জগচ্চক্রের আরম্ভ তবে কোথায়? বিশ্বসত্তা বিশুদ্ধ গভীর আনন্দের আবেগেই আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এবং সেই আনন্দ অসংখ্য কোটী আকারে ভোগ করিবার জন্যই আপনাকে অসংখ্য কোটী রূপের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তাহার পর—সেই বিভক্ত বিন্দুগুলি আবার বহুসমন্বিত একত্বে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের বিভিন্ন চৈতন্যগুলি—একই অখণ্ডজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ইহা বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে—তাহাদের ভেদজনিত বেদনা দূর করিয়া সেই একই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্পর্শলাভ করিবার জন্য ছুটিয়াছে। এই ভেদ, এই দ্বন্দ্ব ছায়াময় অস্পষ্ট প্রকাশ মাত্র—ইহারা বিকৃতি, সুতরাং অপনেয়।

আর এই বিশ্বলীলার পরিণতি? সে এক বিচিত্র অভাবনীয় অবস্থা! মধু যেন আপনাকে এবং আপনার প্রত্যেক কণিকাকে ও কণিকাগুলি প্রত্যেকে পরস্পরকে ও সমগ্র মধুকে যুগপৎ আস্বাদ করিতেছে—ভগবান্ আপনাকে এবং তাঁহার প্রত্যেক বিকাশকে ও তাঁহার বিকাশগুলি প্রত্যেকে পরস্পরকে এবং ভগবান্‌কে যুগপৎ অনুভব করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছে।

অনন্তদেব—আনন্দসঙ্গীত-রচনা করিয়া জ্ঞানরূপে প্রেমের সুরে শক্তির ঝঙ্কার দিয়া আপনি গাহিতেছেন আপনি শুনিতেছেন। সেই মহান্ ঐক্যতানের পূর্ব্বসূচনা-স্বরূপ এক্ষণে আমাদের কর্ণে বিষমসুর ধ্বনিত হইতেছে মাত্র। এ সুরের মধ্যে আজ আমরা যত অনৈক্য এবং বৈষম্যরস অনুভব করিতেছি, ভবিষ্যতে ইহা তেমনি স্বর্গীয় সুমধুর লহরী সৃষ্টি করিবে—ইহা অবধারিত।

গুরু ও শিষ্য।

গুরু। পূর্ব্ব অধ্যায়ে তোমায় বলিয়াছি যে কর্ম্মের তিনটী উপাদান আছে প্রথম কর্ত্তা, দ্বিতীয় কর্ম্ম, তৃতীয় যন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ তোমাকে স্থূলতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর।

তোমার হাতে বেশ সুন্দর ছড়িটী দেখিতেছি সুন্দর ফুল পাতা পাখী খোদাই করা। বৎস, সূত্রধর ও তাহার বাটালি স্থূলত এই দুইটী উপকরণ দেখিতেছ। বাটালি জানেনা যে সে ফুল-কাটিতেছে বা পাখী খোদিত করিতেছে, কিন্তু সে করিতেছে; সূত্রধর কোথায় এই শিল্পনৈপুণ্য পাইল, এই বুদ্ধিটুকু পাইল, এই শক্তিটুকু পাইল যাহাতে তাহার নাম এত জগদ্বিখ্যাত হইল? বৎস বাটালি যদি বলিত "আমি আমার ইচ্ছামত কাট কাটিব," তাহা হইলে এমন ফুলটী পাখীটী পাতাটীও হইতনা এমন ছড়ীটীও হইত না, সূত্রধরের হাত যদি বলিত "আমার ইচ্ছামত ঘুরিব ফিরিব, বুদ্ধি সারথী দ্বারা পরিচালিত হইবনা" তাহা হইলে সূত্রধর এমন শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত হইত না? বৎস যন্ত্র যদি কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত করে, তাহা হইলেইত দুঃখ সৃষ্ঠ হয়। বাটালি নারায়ণের সিংহাসন নির্ম্মাণ করে এবং মলবাহী টব্ প্রস্তুত করে, তাহাতে তাহার অহঙ্কারও নাই, দুঃখের রেখাও নাই। কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে নারায়ণের সিংহাসন গঠন করিয়াই নিজের স্বার্থকতা অনুভব করিত।

সুতরাং প্রথমে যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র হইতে অভ্যাস কর বৎস; ভগবান এই বিশ্ব কারখানার একমাত্র যন্ত্রী, ও তাঁহার এই কারখানায় জীব তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র। এই ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত দেহ যাহাকে তুমি আমি, "আমি" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, ইহাই তাহার যন্ত্র, মনের একটী ছাঁচ, শক্তির প্রবর্ত্তক, একটী

কাঠাম, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রসমন্বিত একটী কর্ম্মের উপকরণ মাত্র। ইহাকে সাধারণতঃ কর্ম্মী বা কর্ত্তা জ্ঞানে ভ্রমে পতিত হইয়োনা।

শিষ্য। কেন প্রভু আমি কি কর্ম্ম করিনা?

গুরু। তুমি কর্ম্ম কর সত্য, বাটালিও ফুল কাটে, পাখী খোদাই করে। কিন্তু বাটালি কি কর্ম্মী বা কর্ত্তা?

বৎস ভাই গৌরবের সহিত সপুলকে স্বীকার করিতে শিখ যে তুমি আমি ও তোমার আমার মত জীবসমূহ ভগবানের যন্ত্র মাত্র। ইহাপেক্ষা গৌরবের কথা, গৌরবের সম্পর্ক আমি ত মানুষের আর দেখিতে পাইনা। যে দিন বিশ্বের জীব বলিতে পারিবে, সগৌরবে, সপুলকে বলিতে পারিবে, যে সে ভগবানের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার যন্ত্র যাত্র, তাহার আনন্দ সাগরের বিন্দু-মাত্র, সেইদিন এই বিশ্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। নির্দ্দোষ যন্ত্র হইয়া যে দিন তুমি আমি ভগবানের অভিপ্রায় সাধিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব, সেই দিন তোমার আমার জীবন স্বার্থক হইবে।

বৎস, সর্ব্বতোভাবে ভগবানের প্রভুত্ব মানিতে শিখ, বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাধ্য হইয়া চলিতে শিখ; অনন্ত শক্তিধর যাহার প্রভু, অনন্ত জ্ঞানী যাহার প্রভু সে যন্ত্রের ভয় বা চিন্তার কারণ কোথায় বৎস! অসি জানেনা কাহার স্কন্ধে সে নিপতিত হইবে, শর জানেনা কাহার উদ্দেশ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইয়া কোন্ দিকে ছুটিবে, কলের যন্ত্রগুলি জানেনা তাহাদের কর্ম্মে কোন্ সামগ্রী প্রস্তুত হইবে বা তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কি হইবে? প্রকৃতির অভিপ্রায়ও কর্ম্মের দ্বারা নির্ণিত হইয়া থাকে, এবং যতশীঘ্র বিবেকবুদ্ধি সমন্বিত যন্ত্র প্রকৃতির নিয়োগ ও অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, তত শীঘ্রই সে নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ ও সুপরিস্ফুট কর্ম্ম করিতে পারে। এই দুর্ব্বল স্নায়ুসমন্বিত দেহের আত্মশক্তি পরিচয় দানের ইচ্ছা ও এই দেহের ও বুদ্ধির বিদ্রোহভাব, কর্ম্ম সম্যকরূপে বিনষ্ট করিয়া দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

বৎস, ভগবানের নিশ্বাস প্রবাহে পরিচালিত হইতে প্রস্তুত হও, বাত্যা নিক্ষিপ্ত পাতার মত উড়িতে প্রস্তুত হও, তাঁহার হাতে,

যোদ্ধার হস্তে অসির মত ধনুকের শরের মত ব্যবহৃত হইতে প্রস্তুত থাক। বিচার করিওনা—কোথায় ভাসিয়া যাইবে, কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইবে, কোন্ অজ্ঞাত আকাশের কোণে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে ; বিচার করিয়োনা তরবারি হইয়া ভ্রাতৃস্কন্ধে পড়িবে বা শত্রুস্কন্ধ কাটিবে, চিন্তা করিয়োনা নিক্ষিপ্ত শর হইয়া প্রাণসম পুত্রের বক্ষে বাজিবে বা শত্রুর মস্তক ছেদন করিবে।

এ দেহটি বাদ্য মাত্র, মনটী কর্ম্মযন্ত্রের প্রবর্ত্তক মাত্র, শক্তি তোমার এই বলের শক্তিনিক্ষেপ যন্ত্র মাত্র, ও তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ ও উপকরণ, ঘসা মাজার সামগ্রী মাত্র. এইভাবে নিজেকে একটী কর্ম্মের যন্ত্র মাত্র স্বীকার করিয়া কর্ম্মে রত হও, দেখিবে কত আনন্দ।

তোমার বাক্য ওই হাতুড়ির আঘাতের শব্দ ; ওই কলের ঘর্ঘর শব্দ স্বরূপ মনে করিয়া দশদিকে ভগবানের অভিপ্রায় প্রচার করিতেছে ভাবিতে শিখ। সর্ব্বাবস্থায় তোমাকে যন্ত্র স্বরূপ কল্পনা করিয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রকৃত অবস্থা ইহাতেই প্রকৃত আনন্দ।

সংগ্রাম ক্ষেত্রে তরবারির একটী অব্যক্ত আনন্দ আছে, নিক্ষেপে ও শন শন শব্দে শরেরও একটী আনন্দ আছে, সূর্য্যের এই আলোকদানে একটী আনন্দের ধারা আছে, হে বৎস তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার যন্ত্র স্বরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, এই আনন্দ সুধা পান কর, এই আনন্দ সাগরে ভাস।

তরবারি গঠিত হইবার জন্য আকাঙ্খা করে নাই, ব্যবহৃত হইতেও বিদ্রোহী হয় নাই, ও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পরিত্যাক্ত হইলেও দুঃখিত হয় নাই, এই সৃজিত ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হইতেও সমান আনন্দ আছে। এই আনন্দের উৎসর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও বৎস। যন্ত্র ভাবিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তোমাকে কখনও কর্ম্মফল আকাঙ্খা করিয়া উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত হইতে হইবেনা। কর্ম্মসাফল্যে স্বার্থকতা ও বিফলতায় হতাশ হইবেনা। কর্ম্মরত বা কর্ম্মহীন হওয়ায় সুখ বা দুঃখ হইবে না। যন্ত্রী, যন্ত্র ও কর্ম্ম এই তিনটী উপকরণের সম্বন্ধটী তোমার ভ্রান্ত ধারণায় গোল করিয়া বুঝিতে পার নাই বলিয়াই এত মোহগ্রস্ত হইয়াছ। তোমার

সহস্র সঙ্কীর্ণ বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, নিজের লাভালাভ খতাইয়া, জীবনের স্বার্থকতার ও ব্যর্থতার চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছ, তাহাতেই এত দুঃখ অনুভব করিয়া কষ্ট পাইতেছ। তাহাতেই বারবার পথপরিগ্রহ করিতে জীব বাধ্য হয়, এবং যতদিন না এই সত্য উপলব্ধ হইবে ততদিন জন্ম জরামরণের অগ্নিকুণ্ডে পরিশোধিত হইতে বাধ্য হইবে।

এসকল ভ্রান্তি, জীবের অসম্পূর্ণ প্রবৃত্তির অন্তরেই নিহিত আছে এবং এই অসম্পূর্ণকে পূর্ণত্বে পরিণত করাই প্রকৃতির কার্য্য। এই অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট মন প্রাণ ও জড় দেহের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃতির কর্ম্ম। বৎস, অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস কর যে জীব মাত্রই যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র মাত্র; বিচার করিয়োনা কি কর্ম্ম করিলে, কি করিবে। যাহা ইচ্ছা যন্ত্রী জীবের—যন্ত্রের দ্বারা করাইয়া লইবেন, তাহাতে দুঃখ নাই সুখ নাই, যশ নাই অযশ নাই, পাপ নাই পুণ্য নাই; যন্ত্রের মত নির্ভরতা অভ্যাস কর।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার গুহরায় প্রণীত "পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা" সমালোচনার্থে পাইয়াছি। গ্রন্থকার কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জীবন কাহিনী প্রকাশছলে আভিধানিক প্রায় সকল শব্দই সুকৌশলে বিন্যাস করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিচিত্র এই—উপন্যাসের মত প্রতি বর্ণের কাহিনী চিত্তাকর্ষক এবং শব্দ সংযোজন করা সত্ত্বেও কোথাও ভাবচ্যুতি হয় নাই। পুস্তকখানি আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, আমরা আর কি বলিব যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক তাঁহারা অসার উপন্যাস পাঠ না করিয়া এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক উপকার পাইবেন। নগেন্দ্র বাবুকে আমরা সর্ব্বান্তকরণে উৎসাহ দিই তিনি অমর হইয়া বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করুণ।

সাধনা।

আমাদের সমস্ত জীবনটাই সাধনা। সিদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা জীবন-মরণের মধ্য দিয়া জন্ম-জন্মান্তর আসা যাওয়া করিতেছি। সিদ্ধি অর্থে নির্ব্বাণ নহে, শেষ নহে—আমি সৎ, আমার অস্তিত্ব জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পুরুষের আনন্দ হেতুই আমার আগমন—পুরুষের লীলা চরিতার্থ হেতুই আমার বিকাশ—পুরুষের ইচ্ছা পূরণের জন্যই আমার হাসি খেলা,—এইটা বুঝিয়া, এইটা মানস প্রত্যক্ষ করিয়া যে দিন আমি সকল দ্বন্দ্বের পরপারে দাঁড়াইয়া, সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরকের কাল্পনিক চিত্র পদদলিত করিয়া যুগধর্ম্মরক্ষার জন্য জ্ঞানতঃ কুণ্ঠাশূন্য হৃদয়ে আসা যাওয়া করিব—সেই দিন আমার সিদ্ধির সাফল্যের দিন—সেই দিন মুক্তির দিন—সেই দিন আমি সচ্চিদানন্দ নিত্যানন্দের অধিকারী। বিচিত্র এই আমি এ তত্ত্ব বুঝি আর নাই বুঝি এই খেলাই আমার জীবনের মধ্য দিয়া অবিরাম চলিয়াছে। আমি জ্ঞানতঃ এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করি আর না করি—একটা বিপুল মহাশক্তির আমি যে যন্ত্রপুত্তলিকা ইহা অবধারিত। বুঝিলে দ্বন্দ্ব থাকে না, সব সমান হইয়া যায়—অহমিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যায়—হাসি কান্নার ভিতর অফুরন্ত আনন্দ ফুটিয়া উঠে।

পৌরাণিক লৌকিক যে কোন নির্দ্দিষ্ট সাধন পদ্ধতির দ্বারাই যে এই মহাসত্য জীবনের মধ্যে বিকাশ হইয়া উঠে এরূপ নহে। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, কঠোর সংযম, নিরামিষ আহার, সায়াহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণ প্রভৃতি বাহ্যিক সাধন সাহায্যে যে আমরা জীবনের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, তাহা নহে। এই সকলের দ্বারা জীবনের একটা অংশ বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, পরন্তু সমগ্র জীবনটা অনন্ত শক্তি সমুদ্রে শক্তির ইচ্ছামত অবাধ গতিতে ভাসিতে নাচিতে পারে না—অনন্ত প্রকৃতির অবাধ লীলা জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে না। আংশিক উন্নতি জীবনের লক্ষ্য নহে—আমরা চাই একটা পূর্ণ মনুষ্যত্ব, মানবজীবনের সম্যক্ পরিণতি।

হঠযোগ সাধনে মানবের অন্নময়কোষের পরিণতি আসে, মানব শরীর কর্ম্মসহিষ্ণু হয়, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতির সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবল তাড়না সে যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু এই হঠযোগে সিদ্ধ হইতে হইলে, একটা মানুষকে তার সমস্ত জীবনটা কঠোর যত্নের সহিত ইহা অভ্যাস করিতে হয়, অনেকের ভাগ্যেই সিদ্ধি ঘটে না—যদিও সিদ্ধি আসে, মানব-শরীরের অনিত্যতা হেতু, শরীরের ঐশ্বর্য্যে অনন্ত মানব-জীবনের সাফল্য কোথায়? এই স্নায়ুময় দেহযন্ত্রের পরিণতি লাভেই যদি জীবনের মূল সূত্র বাহির হইত, তাহা হইলে কোনই কথা ছিল না, কিন্তু তাহা ত হইবে না। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষগুলি শুদ্ধ করিবার জন্য রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সাধন করিতে হইবে। হায় অন্নগ কলির জীবত—প্রাচীন পৌরাণিক সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দুর্নিবার জীবনসমুদ্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইতেছ কিন্তু কালের অভবাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা কি বুঝিতেছ না? প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের বীর্য্য, স্থৈর্য্য বর্ত্তমানে নাই, প্রাচীন যুগের দীর্ঘ পরমায়ু বর্ত্তমান ভারতে অতীব বিরল। সে অনুকূল অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন কর।

শাণিত যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে ইহা শাণযন্ত্রে ধরিতে হয়; যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ফিরিয়া আসে। যন্ত্র সীমাবদ্ধ, কিছুক্ষণ শানযন্ত্রে ধরিলেই ইহা কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। আমাদের এই জীবনযন্ত্র কিন্তু অনন্ত; ইহাকেও ইহার সাফল্য সাধনের জন্য একটা শানযন্ত্রে ধরিতে হইবে, কিন্তু অনন্ত কালের জন্য ধরিয়া রাখিতে হইবে। এই শানযন্ত্র ভাব, মানুষকে ভাবে থাকিতে হইবে। এই ভাবসাধনার কথাই বলিতেছি। অবিচ্ছেদ ভাবপ্রবাহ আপনার ভিতর প্রবাহমান রাখাই সাধনা। কিছু করিতে হইবে, কিছু হইতে হইবে, একটা সাধু, একটা যোগী, একটা বীর, বা যে কোনরূপে একটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইবে—এইরূপ বাহ্যিক ভাব সমূহ ভিতরে রাখিলে জীবনের আসল তত্ত্বটা ধরা যায় না। মনে রাখিতে হইবে আমার কিছু হওয়া, সে একেবারেই আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের সমস্ত জীবনটাই যোগ—আমাদের জীবনের সকল ঘটনাই সাধনা। আত্মদৃষ্টি থাকিলে অনায়াসেই আমরা বুঝিব যে আমাদের বুদ্ধি অবিরত কত কল্পনার সৃষ্টি করিতেছে, মনঃ ভাবের রসে তাহাকে রঞ্জিত করিতেছে, প্রাণ কামনার সৃষ্টি করিয়া

তাহা ঘটাইবার জন্য সমস্ত শরীরযন্ত্রের দ্বারা কত আয়াস করিতেছে, কিন্তু ঘটিতেছে যাহা কখনও কল্পনা করি নাই—যাহা কখনও ভাবি নাই, যাহা কখনও কামনা করি নাই, তখন কি জীবের চৈতন্য হয় না যে মনঃ প্রাণ বুদ্ধি, শরীর ব্যতীত আর একটা কিছু আছে, যে আমায় নাচায়, কাঁদায়, হাসায়, যে আমায় চুরি করায়, দানকরায়, ধ্বংস করায়, সৃষ্টি করায়, যে আমায় মূর্খ করে, বিদ্বান্ করে, ধার্ম্মিক করে, অধার্ম্মিক করে। সে কে? সেই প্রকৃতি যাঁহার অঙ্গুলী হেলনে আমার জীবন, আমার উৎপত্তি আমার স্থিতি, আমার মৃত্যু। কথা বড় সহজ কিন্তু দৃঢ়ভাবে এই ভাব আয়ত্ত করা বড় কঠিন। বাহিরের কার্য্য দেখিয়া উহার প্রতিকার পরায়ণ হইলে ভিতরের এই গুপ্তরহস্য কোন কালেই আমরা বুঝিব না। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি, জীবনের বহির্বিকাশের বিবরণ মাত্র—উহা দিয়া জীবনের সমস্যা কোনও কালেই পূরণ হয় নাই, হইবেও না

মানুষকে বুঝিতে হইবে যে সে যাহা করে তাহা ভগবদিচ্ছায়, যাহা ঘটে তাহা ভগবদিচ্ছায়, প্রতিনিয়ত শ্বাসে প্রশ্বাসে, শয়নে, ভোজনে সর্ব্বদাই সর্ব্বকর্ম্মে এই প্রকৃতির লীলারই সে কেন্দ্র মাত্র ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতির অবাধ ইচ্ছা পূরণের জন্যই তার জীবন—তার অনন্তকাল স্থিতি। মানুষ তখনই নিত্যানন্দের অধিকারী হইবে, যখন ভিতরের এই আসল সত্যটাকে সে ধরিতে শিখিবে।

বাংলার শ্যামল পল্লীক্ষেত্র কাঁপাইয়া যে মহাসাধক এই অধ্যাত্মযোগের কথা গ্রাম্য ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন, আজ তার প্রতিবর্ণ আয়ত্ত করিবার দিন আসিয়াছে—

ওরে মন বলি ভজ কালী, তোর ইচ্ছা হয় যে আচারে।
গুরুদত্ত সাধনমন্ত্র দিবা নিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
তুমি নগর ফের, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মার মন্ত্র বটে
মা যে পঞ্চাশৎবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
তুমি আহার কর মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মারে।

আজ সাধক রাম প্রসাদের অমর সঙ্গীত ভারতের জাতীয় জীবনের উপাদান হইবে—এইরূপ আশা করা যায়।

দেবজন্ম।

ইহলোকে এই স্থূল জগতেই আমরা রহিব। যাহা কিছু উপলব্ধি করিবার যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত করিবার তাহা জীবনের মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিব, জীবনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিব, জীবনের অতীত হইয়া নয়। বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রয়াস উৎসর্গ করিয়াছিলেন—দেবায় জন্মনে। এই দেব জন্ম লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য; দেবতার সত্ত্বা দিয়া আমাদের সত্ত্বার প্রতি স্তর সত্ত্বপূর্ণ করিয়া গড়িব, দেবতার জীবন দিয়া জীবনের প্রতি অঙ্গ অমৃতময় করিয়া তুলিব।

ভগবান্‌কে কে চায় না? কিন্তু সকলে চায়, সেই ভগবান্‌কে যিনি শুধু ভাবগত। অন্তরে একটা অনন্ত আনির্দ্দেশ্যর বোধকেই সাধারণে ভগবৎ উপলব্ধি বলিয়া জানে। সন্ন্যাসীর চক্ষে জীবন ও জগৎ যেন কেমন স্বপ্নবৎ। জরামরণ, সুখদুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, শক্তি অশক্তি তাঁহার কাছে সকলই সমান, কাহারও বিশেষ কিছু মূল্য নাই। তিনি শুধু দেখেন অথবা দেখিয়াও দেখেন না। তিনি মগ্ন এক সমরসাত্মক বিপুল বৈরাগ্যে। জগতের খেলায় তাঁহার উচ্চ বাচ্য করিবার কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাকেই ভগবানের পরমাসৃষ্টি অনির্ব্বচনীয় লীলা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তাহাতেই মুগ্ধ হৃদয়ে ভাসিয়া চলেন। কুয়াসাবৃত প্রকৃতির দৃশ্য নিকট থাকিয়াও যেমন অস্পষ্ট দূরগত, সাধুর চিত্তে এই জগৎ ও তেমনি সম্বন্ধহীন সুদূর প্রবাসস্থলেরই মত।

আমরা কিন্তু ভগবান্‌কে শুধু ভাবগত করিয়া রাখিতে চাহি না, আমরা তাঁহাকে বস্তুগত করিয়া তুলিব। জগতের খেলায় তাঁহাকে জাগ্রত মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিব। ভগবান্ শুধু অনন্ত নহেন, তিনি সান্ত, তিনি শুধু অনির্দ্দেশ্য নহেন, তিনি নির্দ্দেশ্য, তিনি শুধু এক নহেন, তিনি বহু। তিনি চৈতন্যমাত্র নহেন, তিনিই শক্তি। তিনি শুধু শান্ত শিব নহেন, তিনিই আবার রুদ্র। নিখিল সৃষ্টির পশ্চাতে ভগবান্ শুধু নিথর সত্ত্বামাত্র নহেন, তিনি প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে এক ঋতপূর্ণ প্রেরণারূপে কাজ

করিয়া চলিয়াছেন। ভগবান্ শুধু কবি নহেন, তিনি কর্ম্মী, জগৎকে জীবকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে চালাইয়া লইয়াছেন,প্রতিমুহূর্ত্তে উহাদিগকে একটা বিশেষ কিছুকরিয়া গড়িয়া উঠিতে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন।

আমাদিগকে একটা বিশেষ মূর্ত্তি লইয়াই গড়িয়া উঠিতে হইবে। ভগবান্ যে ভাবে চালান সেইভাবেই চলিয়া যাইব এইরূপ অন্ধ আলস্যপূর্ণ নির্ভরতাই সাধনার শেষ কথা নয়। ভগবানের হস্তে আমরা যন্ত্রমাত্র, সত্য কথা। কিন্তু আমরা বুঝিয়া লইব ভগবানের কোন্ উদ্দেশ্যটী আমদের মধ্য দিয়া ফলবান্ হইতে চাহিতেছে, কি উপায়ে এই উদ্দেশ্যটী সাধিত হইতেছে। জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষেত্রে ভগবানের সেই বিশেষ ইচ্ছাটীকেই চিনিয়া লইব, স্থূলের মধ্যে তাহাকে শরীরী করিব। অস্পষ্টভাবকে জ্ঞানের দ্বারা চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে, শক্তির দ্বারা উহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ ভাবে কিছু পাওয়া বা হওয়া নয়, বিশেষভাবে কিছু পাওয়া বা হওয়াই সিদ্ধি।

মানুষের সাধারণ জীবন যেমন স্পষ্ট, জাগ্রত, লক্ষ্যযুক্ত, দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনকে মানুষ যেমন সংহত সুবিন্যস্ত ফল প্রসূ করিয়া এক সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছে, আমরাও আমাদের জীবনকে সেইরূপই করিব; তবে পূর্ণতর দৃঢ়তর, শুদ্ধতর ভাবে। সাধারণ মানুষ, তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের দৃষ্টি দিয়া, আমরা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিব দেবতার দৃষ্টি দিয়া।

* * *

মনুষ্যজীবনের কেন্দ্র হইতেছে বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ জীবনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। বিচারের দ্বারা সে স্থির করিয়াছে কি ভাল কি মন্দ, কি সম্ভব কি অসম্ভব এবং এই বিচারের সিদ্ধান্তানুসারে তাহার প্রেরণাকে চলিতে শিখাইয়াছে। তর্ক দ্বারাই সে সত্য নির্ণীত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু বিচার বিতর্কের দ্বারা সত্যের অংশবিশেষ, আভাস বা ছায়াবিশেষ পাইলেও প্রকৃত সত্য বস্তু কখনও পাওয়া যায় না। বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ গোধূলি আলোকে আমরা পাই শুধু, কি সম্ভব, কি হইলেও হইতে পারে। একটা সম্ভাবনীয়তাকেই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তাই জগতে শৃঙ্খলতার মধ্যে বিশৃঙ্খলাই বাহির হইয়া পড়িতেছে, সামঞ্জস্য ভেদ করিয়া দ্বন্দ্বই ফুটীয়া উঠিতেছে। আমরা চাই সত্য। যাহা যথার্থ বস্তুর মধ্যে যাহা অন্তরতম প্রকৃতি, যে গুহ্যতম ধর্ম্ম সকল পরিণতির অন্তরালে, তাহার উপরেই আপনাকে, মনুষ্যজাতিকে গড়িয়া তুলিব। একটা সম্ভাবনা মাত্রকেই ভর করিয়া জীবন কাটাইয়া দিব না; ঋতকেই

মর্ত্ত্যে বহন করিয়া আনিব। তাই মানসিক প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে চাই দিব্যদৃষ্টি। সসীম খণ্ডতাকে, ইন্দ্রিয়দত্ত পৃথকত্বকে অতিক্রম করিয়া আত্মায়, বৃহতে পৌঁছিতে চাই। বিচারকে পরিণত করিতে হইবে বিবেকে, বুদ্ধিকে পরিণত করিতে হইবে বোধিরূপে। এই নবজন্মের আরম্ভে আমরা চাই কবিদৃষ্টি। এই কবিদৃষ্টিকেই জীবনের কেন্দ্র করিতে হইবে। এই কবিদৃষ্টি দ্বারাই জীবনকে বৃহৎ পূর্ণ করিতে হইবে, জীবনে সে দৈবশৃঙ্খলা সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে হইবে। মানুষ কি জানে, কি বুঝে, মানুষের কি সুবিধা কি অসুবিধা তাহা দেখিব না। ভগবানের দৃষ্টি দিয়া দেখিব ভগবান্ কি চাহেন, ভগবানের জ্ঞান দিয়া জানিব তাঁহার উদ্দেশ্য কি, সত্যের যে ঋতময় প্রেরণা তাহার দ্বারাই জগৎকে নির্ম্মিত করিব।

সত্যদৃষ্টির জন্য, জ্ঞানের জন্য আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইবেন সেই বৈদিক সূর্য্যদেব। মিত্রদেবকে আহ্বান করিব বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য। মানুষের হৃদয় রাজ্যে সুখদুঃখই যুগল সম্রাট্। প্রিয়বস্তুতে মানুষের বিপুল হর্ষ, অপ্রিয়ে ততোধিক বিষাদ। মিলন ও বিরহের আলোক আঁধারেই তাহার প্রেমের খেলা। আমরা কিন্তু প্রিয়কে অপ্রিয়কে সমানভাবে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া লইব। শুধু তাহাই নহে, অপ্রিয় বলিয়া কিছু রাখিব না, অপ্রিয়কে প্রিয়ই করিয়া তুলিব। সুখদুঃখ অতিক্রম করিয়া আনন্দের স্রোতঃ ডাকিয়া আনিব। মিলন ও বিরহের দ্বন্দ্বের মধ্যে নয়, একাত্মানুভূতির মধ্যে প্রেমকে সদাতুষ্ট রাখিব। আনন্দ হইতে আনন্দের মধ্য দিয়াই আনন্দেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিব। এ আনন্দে ক্ষয় নাই, সীমা নাই, মলিনতা নাই—সদাই উজ্জ্বল, সদাই উচ্ছ্বসিত। ভূমানন্দ সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে হৃদয়স্পন্দনকে উঠিতে পড়িতে শিখাইব। পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ পদার্থই আমাদের জন্য আনন্দরস ক্ষরণ করিবে। কোথাও আমরা বিমুখ হইব না, কোথাও বীতশ্রদ্ধ হইব না, কোথাও দ্বন্দ্ব-ভোগী হইব না। বাসনা সকল দুঃখের মূল। বাসনাই ত আমাদিগকে খর্ব্ব করিয়া রাখে। কিন্তু বাসনার মধ্যে যে সত্য ঈষণা আছে, ভগবানের যে ইচ্ছাটুকু কার্য্যকরী হইতে চাহিতেছে তাহাকেই শুদ্ধ করিয়া লইব, সেই অনুসারেই চলিব। আমার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই ঢালিয়া দিব, সেই ভগবৎ শক্তিরই অবাধগতি মুক্ত করিয়া দিব। প্রাণের যে বিভিন্নমুখী উন্মার্গগামী অন্ধ চেষ্টারাজী, তাহাকে চিৎশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণ করিয়া সার্থক করিয়া লইব। আমার ইচ্ছা, আমার প্রেরণা বলিয়া কিছু থাকিবে না; ভগবানের অদম্য প্রেরণাই বীরজীবনের কর্ম্ম পরিচালক হইবে। অগ্নিদেবের জ্ঞানদীপ্ত যে তপঃশক্তি

হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, জগৎ প্রতিনিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, সেই আদ্যা-শক্তির আধার আমাদিগের কোন্ প্রয়াস বিফল হইবে, কোন্ লক্ষ্য অলভ্য রহিবে?

সকল লীলার প্রতিষ্ঠাভূমি এই শরীরকে আমরা গঠন করিব সৎবস্তুর দ্বারা। যে সৎপদার্থ সমস্ত সৃষ্টিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাকে লইয়া অস্তিত্ব, তাহারই দ্বারা এই স্থূলদেহ। রোগ দৌর্ব্বল্য, জরামরণ অতিক্রম করিয়া এই ভগবৎ সত্তার মধ্যে শরীরকে প্রতিষ্ঠিত করিব। দূর করিব সেই মায়া, সেই অন্ধসংস্কার—যাহার বশে শরীর আপনাকে ক্ষণবিধ্বংসী, রোগবীজ পূর্ণ জড় মাত্র বলিয়া জানে। অমৃতত্বের দ্বারা শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে, কারণ অমৃতত্বই শরীরের আদি উপকরণ। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, বীর্য্যে শরীরকে ভরিয়া তুলিব। বিশ্বলীলার যে বিপুল তরঙ্গা গঙ্গা, তাহাকে ধারণ করিবে এই শরীর। এই শরীরকে ভিত্তিভূমি করিয়া দেবজন্মের সেই স্বর্গস্পর্শী সৌধ নির্ম্মিত করিতে হইবে।

* * *

মানুষের জীবন চারিটী লোকে বিভক্ত, চারিটি উপকরণে গঠিত। দেহ, প্রাণ, চিত্ত ও মন। মানুষ আছে, মানুষ কর্ম্ম করে, মানুষ ভোগ করে আর মানুষ জানে—ইহাই মানুষের সব খানি। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয় ইহা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি। ইহা রূপমাত্র, বহির্মুখমাত্র—পশ্চাতে, প্রত্যেকেরই অন্তরালে যে স্বরূপ রহিয়াছে তাহা লইয়াই পরা প্রকৃতি বা দেব প্রকৃতি। দেহ, প্রাণ, চিত্ত ও মনের উৎস স্থানে হইতেছে যথাক্রমে সৎ, চিৎ, আনন্দ ও বিজ্ঞান। সৎএর ছায়া দেহ, চিৎএর ছায়া প্রাণ, আনন্দের ছায়া চিত্ত, ও বিজ্ঞানের ছায়া মন। যাহাকে মানবপ্রকৃতি বা ইহলোক বলিয়া থাকি তাহা দেবপ্রকৃতি বা পরলোকেরই ভিন্নদিক; বিকার, বা খণ্ড মূর্ত্তিমাত্র। আমাদের কর্ত্তব্য শুধু যাহা কুটিল তাহাকে ঋজু করা, যাহা বিকৃত তাহাকে স্বাভাবিক করা, যাহা খণ্ড তাহাকে পূর্ণ করা। তাই অনুমানের পরিবর্ত্তে চাই সাক্ষাৎ জ্ঞান, সুখের পরিবর্ত্তে চাই আনন্দ, চেষ্টার পরিবর্ত্তে চাই ভগবচ্ছক্তি আর লীলাক্ষেত্র স্বরূপ চাই অমৃতময় শরীর। ইহা লইয়াই দেবজন্ম, ইহা লইয়াই কৃতযুগের ধর্ম্মরাজ্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ।

আমরা পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্বজননীর লীলা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যখণ্ডে কি ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষ ও আদান প্রদানের ফলে কি ভাবে সত্যযুগ গঠনোপযোগী উপাদানের সৃষ্টি হইয়া জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিতেছে, সেই সম্বন্ধে বিশদ ভাবে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এই ব্যাপারটী এতই অভিনব এবং ইহার ফল এতদূর প্রসারী যে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে সাধকের এই নবযুগ 'প্রবর্ত্তনে' যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কোনওরূপ সহায়তা করা একরূপ অসম্ভব ; কেন না, আমরা আজ যে সত্যযুগের আবাহন-গীতি গাহিতেছি এবং যাহা অদূর ভবিষ্যতে সত্যসত্যই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে যুগে ধর্ম্ম এক নূতন অর্থ প্রাপ্ত হইবে ; তখন ধর্ম্ম এখনকার মত কোনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্ম বিশেষকে না বুঝাইয়া জগতের যাবতীয় বিরাট অনুষ্ঠানকেই বুঝাইবে। সে অনুষ্ঠানের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্রবের প্রকৃত মূল্য কি তাহা জানা চাই।

প্রাচ্যভূমিখণ্ড বলিতে আমরা সাধারণতঃ এশিয়া, মহাদেশকেই বুঝিয়া থাকি এবং পাশ্চাত্যভূখণ্ড বলিতে আমরা ইউরোপকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। নূতন মহাদেশ অর্থাৎ আমেরিকা বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হইয়া একটী তাড়িতযন্ত্র স্বরূপ (Electric battery) হইয়া পরস্পর ভাব আদান প্রদানের সহায়তা করিতেছে। অতীতে আফ্রিকামহাদেশও অনেকটা এইরূপ মধ্যবর্ত্তী তাড়িতাধার-যন্ত্রের কার্য্যই নিষ্পন্ন করিয়াছিল। আফ্রিকা মহাদেশ এক্ষণে মৃত বা সুষুপ্ত ; সেই জন্য ভবিষ্যৎ-সভ্যতা-ভাণ্ডারে তাহার যে কিছু দিবার আছে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। আমেরিকা, এশিয়া ইউরোপের মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া এবং ভাব-আদান-প্রদানের সহায়তা করিয়া ভবিষ্যতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার পন্থা কতকটা সুগম করিয়া দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারও যে একটা পৃথক্ সত্তা আছে, এরূপ ত বোধ হয় না। আমাদের যেন মনে হয় যে আমেরিকা সর্ব্ববিষয়ে ইউরোপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে,

কেবল দেশকাল পাত্র ভেদে অনুকরণ প্রবৃত্তি নবভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে মাত্র। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস যে ভাবী সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার গুরুভার এসিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে; কেন না, বর্ত্তমানে আমরা কেবলমাত্র তাহাদেরই পৃথক্ সত্ত্বা অনুভব করিতে পারিতেছি এবং স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে এই দুই মহাদেশই আজ মায়ের অনন্তশক্তির আধার ও লীলা ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই শক্তিস্রোতঃ আজ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুই মহাদেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। যে দিন মায়ের অঙ্গুলী সঙ্কেতে এই স্রোতঃ পুনরায় মিলিত হইয়া এক নদীগর্ভ দিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইবে, সেই দিনই এই জগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা আজ তাহার পূর্ব্বাভাষ অনুভব করিতেছিমাত্র। এইজন্য আমরা এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সংশ্রব একটু বিষদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে এসিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশের মধ্যে একটী যখন উন্নতির চরমশিখরে অধিষ্ঠিত তখন অপরটী অবনতির চরমসীমায় উপনীত; একটী যখন আলোকে উদ্ভাসিত, অপরটী তখন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। এই ভাবে আলোক ও অন্ধকার এই দুই মহাদেশের উপর আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাও বোধ হয় 'মা'য়ের অভিপ্রেত কেন না দুইএর মধ্যে পার্থক্য যত বেশী পরিমাণে থাকিবে, তাহাদের সামঞ্জস্য-বিধানও তত শীঘ্র সম্পন্ন হইবে, ইহাই জগতের রীতি। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই যে এশিয়া ও ইউরোপ প্রত্যেকেরই একটী করিয়া জাতীয় ভাব আছে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়াই যুগে যুগে এই দুই মহাদেশের উন্নতি ও অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ কোন স্থানে লিখিয়াছেন "প্রাচ্যে মোক্ষলাভ এবং পাশ্চাত্যে ধর্ম্মপালনই জীবনের মূল লক্ষ্য।" প্রাচ্য 'আত্মতত্ত্ব' লইয়াই ব্যস্ত, কেন না ইহাই প্রাচ্যের জাতীয় ভাব। যখনই প্রাচ্য বহির্জগতের অনুষ্ঠান সমূহকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া তাহাদিগকে আত্মারই বিকাশ বা বহিঃপ্রকাশ মনে করিয়া আত্মজ্ঞানানুশীলনকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তখনই আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আবার যখনই সঙ্কোচের ভাব বলবতী হইয়া বহির্জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে একটা ভেদভাবের সৃষ্টি করিয়া প্রাচ্যকে বহির্জগৎ উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, তখনই প্রাচ্যের অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে। অন্যপক্ষে, পাশ্চাত্যে 'ধর্ম্মপালন' অর্থাৎ কর্ম্মশীলতাই জাতীয়-জীবনের কেন্দ্র; বহির্জগতে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানই ইউরোপের মূল নীতি।

ইউরোপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বড় একটা ধার ধারে না—সে এই বাস্তব-জগতের যে সমস্ত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অসামঞ্জস্য দেখিয়াছে, বুদ্ধিসহায়ে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপ অদ্যাপি ব্যবহারিক জগতে আত্মাকে মানিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু বহির্জগতে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তাহার চরম উৎকর্ষসাধনের দ্বারা সে একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছে বলিলেও হয়। আমরা ইহাকেই উপরে দ্বিধাবিভক্ত শক্তিধারা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

এইবার আমরা অতীতযুগে এই দুই মহাদেশের ঐশ্বর্য্য আদানপ্রদানের ফলে জগতের অভ্যুত্থানের ইতিহাসে বর্ত্তমানে আমরা কোথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আবহমান কাল ধরিয়া ভারতবর্ষেই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত—ইহা অহঙ্কারের কথা নয়, বাস্তব সত্য। চিরকালই ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মবন্যা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে—আজ পর্য্যন্ত বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে। ইউরোপের সভ্যতা কর্ম্মমূলক বলিয়া কোথায় যে ঠিক তাহার ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চিত বলা দুষ্কর; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে অতীতে কিছুকাল গ্রীস ও রোম পাশ্চাত্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থানীয় ছিল, তৎপরে ভারকেন্দ্র ফরাসীবিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে সরিয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে (অর্থাৎ নেপোলিয়ানের পর হইতে) অদ্যাবধি সেই ভারকেন্দ্র ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে যে ইউরোপব্যাপী মহাযুদ্ধ চলিতেছে তাহা জর্ম্মণীর লণ্ডন হইতে বার্লিনে এই সভ্যতাকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা প্রসূত। বলা বাহুল্য, জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড প্রমুখ মিলিত শক্তির জয়লাভ অনিবার্য্য। কেন না, আজ বিধাতার মঙ্গল বিধানে ইংলণ্ডের সহিত ভারবর্ষের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আজ ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা অনুভব করিতেছে, তাহা কার্য্যকরী হইবার জন্য ভাবী ধর্ম্মবন্যা ইউরোপকে নূতনভাবে প্লাবিত করা চাই এবং এই আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের জন্য ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে হইবে। ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ভাবে জয়ের পথ সুগম করিতে হইলে ইংলণ্ডেই ইউরোপের ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই। একটী কথা আমরা এইখানে বলিয়া রাখিতে চাই, যে অহঙ্কারাশ্রিত বুদ্ধিই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তাহার উপরেও যে আত্মা বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই যে যথাসর্ব্বস্ব নহে, ইহা ছাড়া যে আরও একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ বর্ত্তমান, এই সত্য ভারতকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়া ইউরোপের শিক্ষা করিবার দিন সমাগত এবং

সেই জন্যই আজ এই মহাকুরুক্ষেত্রে অহঙ্কারাশ্রিত যাহা কিছু অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান তাহা নির্দ্দয়ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। যে দিন ইউরোপ এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, সেই দিন জগতে সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে।

বহু প্রাচীন কালে সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য এবং বিশেষভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ মিশর (Egypt) প্রভৃতি দেশের সভ্যতার মধ্য দিয়া গ্রীসদেশের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে পিথাগোরস, প্লেটো, এরিসটটল, সক্রেটিশ প্রমুখ দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক গ্রীসে এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়; সেই সভ্যতা কালে রোমকে আশ্রয় করিয়া রোমকসাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু সে সভ্যতা অহঙ্কারাশ্রিত বুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র ছিল না। তবুও সেই সভ্যতায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার ফলে, ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ ও সংযতভাব ধারণ করে। কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের মধ্য দিয়া ইউরোপের উপর দ্বিতীয়বার প্রভাব বিস্তার করে। এইবার ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মের নামে আধ্যাত্মিকতা ও সন্ন্যাসকে একরূপ বরণ করিয়াই লইয়াছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত জর্ম্মণ পৈশাচিকতার প্রথমাভিনয় হওয়ায় আধ্যাত্মিকতার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। এসিয়ার ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহদ্বারা অভিভূত করিবার তৃতীয় চেষ্টা বাস্তবিকই জগতের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এইবার এসিয়া তাহার চিরাচরিত ভাবরাজ্যে প্রভাববিস্তারের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবজগতে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিস্তারদ্বারা পাশ্চাত্যে প্রাচ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমরা মুসলমানকর্ত্তৃক ভূমধ্যসাগরোপকুলস্থিত স্পেন প্রভৃতি দেশজয়ের কথা বলিতেছি। কি কারণে এসিয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ইউরোপানুসৃত নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম ও মোসলেম সভ্যতা সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়ে। সেইজন্য উপস্থিত আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলাম না। এই তৃতীয় চেষ্টার ফলে ইউরোপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির সূচনা হয়। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রাচ্যের ভারকেন্দ্রস্বরূপ কতটা পরিমাণে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এইবার সবে মাত্র চতুর্থ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে—অতীন্দ্রিয়বাদ (Spiritualism) বলিয়া যে তরঙ্গ ইউরোপে ও আমেরিকায় আজ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্ষীণ স্রোতোধারা মাত্র।

অন্য পক্ষে ইউরোপ একবার সেকান্দারের অধীনে গ্রীকসভ্যতা লইয়া এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত ও ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল; বলা বাহুল্য, তাহা

কিছুদিন মাত্র আধিপত্য করিয়া মুসলমান সভ্যতার মধ্য দিয়া পুনরায় ইউরোপে ঘুরিয়া গিয়া প্রত্যাহত হয়। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের মধ্য দিয়া দ্বিতীয়বার ইউরোপের এসিয়ার উপর রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

আমরা এসিয়া কর্ত্তৃক ইউরোপের এই শেষবার আক্রমণ ও ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার এই শেষবার আক্রমণের মধ্যে একটি সত্য প্রস্ফুট হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি। এসিয়ার কেন্দ্র ভারতবর্ষ যখন আধ্যাত্মিক সত্য সমূহের উপর আধিপত্য রক্ষা করিতে গিয়া বাস্তবজগতের উপর নিজের প্রভাব হারাইয়া ফেলিল, যখন সে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য বিস্মৃত হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বুঝিতে গিয়া জড়জগৎকে মায়িক ব্যাপার বলিয়া মনে করিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের জড়বাদমূলক সভ্যতা ভারতবর্ষের উপর রাষ্ট্রীয়আধিপত্যবিস্তার করিল। আজ এই একশত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক সত্য সমূহের আধারভূমি ও লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষ নিজের অস্তিত্ব একরূপ হারাইয়া ইউরোপের পদতলে বসিয়া "মানবজীবনও যে তুচ্ছ নহে, ইহাও সেই ব্রহ্মেরই বিকাশ" এই বিস্মৃত মহাসত্য পুনর্ব্বার শিক্ষা করিয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা এই জীবনের সাড়া পাইতেছি। আবার এসিয়ার ভাব সমূহ ইউরোপকে শেষবার আক্রমণের ফলে ইউরোপের জড়বাদমূলক সভ্যতা একেবারে চূর্ণ হইতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইউরোপে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা প্রচারিত হইতে হইলে অহং মূলক জড়বাদ একেবারে ধ্বংস হওয়া চাই; কেন না অহঙ্কার সহজে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। আমরা মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি যে ইউরোপ ধ্বংসের মধ্য দিয়া শাশ্বত শান্তি বা আনন্দলাভের পথে ছুটিয়াছে। এই বিশাল জড়বাদের যন্ত্র ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ভারত-হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহে অধিকারী হইবে।

এইবার সত্য সত্যই সেই যুগাবতারের আবির্ভাবের কাল উপস্থিত হইয়াছে কেন না আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে ইউরোপ এসিয়ার ও এসিয়া ইউরোপের অভাব পূরণ দ্বারা সেই চিরবাঞ্ছিত সত্যযুগের সূচনা করিয়া জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পন্থা সুগম করিয়া দিতেছে। কালে ইহার প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, কেননা কালের গতিরোধ করিবে কাহার সাধ্য? কিন্তু যাহাতে এই ধর্ম্মের অভ্যুত্থান বক্রগতিতে না হইয়া ঋজুরেখায় ত্বরিতগতিতে সাধিত হয়, সেই জন্য এসিয়া ও ইউরোপের উপর সমভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। সেই গুরুভার সম্যক্‌রূপে পালন করিতে হইলে আমাদিগকে মায়ের চেতন যন্ত্র হইয়া ভুলচুকের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শুদ্ধা চিন্তাশক্তির আধার হইতে হইবে। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য যাহাতে পালন করিতে

পারে, তজ্জন্য তাহাকে বিশেষভাবে একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যেন পাশ্চাত্যের নিকট সত্যের অর্দ্ধাংশ শিক্ষা করিতে গিয়া ভারতবর্ষ অনুকরণ প্রবৃত্তির দাস হইয়া তাহার নিজের সত্ত্বা হারাইয়া না ফেলে; ভারতবর্ষ যেন ভুলিয়া না যায় যে সে ঋষিগণ অধ্যুষিত পুণ্যভূমি, তাহার অতীতের সভ্যতার আদর্শ এই সকল ভাঙ্গাচুরার মধ্যে এখনও মস্তক উন্নত করিয়া অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মাণ আছে এবং ভবিষ্যতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে তাহাকেই প্রধান উদ্যোগী হইতে হইবে। অন্যপক্ষে, ইউরোপকেও একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে ইউরোপে অহঙ্কারাশ্রিত বুদ্ধি যে ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে ইউরোপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহকেও অহঙ্কারের মধ্য দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারে; বলা বাহুল্য, যে এরূপ হইলে ইউরোপ কোনও দিনই দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিবে না। সুখের বিষয়, ইউরোপকে শিক্ষা দেওয়ার ভার আজ মা প্রত্যক্ষভাবে নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আশা আছে যে ইউরোপও এই নবযুগ আনয়নে সহায়তা করিবে।

এইবার আমরা দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের সংঘর্ষের যুগ এতদিনে শেষ হইয়া আসিতেছে প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে বন্ধু ভাবে দেখিতে শিখিয়াছে এবং পাশ্চাত্যও প্রাচ্যকে শিক্ষাদাতা ও গুরুরূপে মানিয়া লইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। ইউরোপীয় সুধীমণ্ডল কর্ত্তৃক আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের অভ্যর্থনা, ব্রজেন্দ্রনাথের সম্মান এবং রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা এই বিষয়েই সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কলির প্রাতঃসন্ধিকাল গত প্রায় এবং অরুণ রাগরঞ্জিত কলির সত্যযুগের ঊষাকালে মৃদুমন্দ মলয় মারুত প্রবহমান হইয়া জন-সাধারণের হৃদয়ে আনন্দ তরঙ্গ তুলিয়াছে। সেইজন্যই আজ আমরা চারিদিকে আর্ত্তের পরিত্রাণ, নারায়ণের সেবা, লোক শিক্ষা প্রভৃতি দেশভক্তিজনিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। আমরা পাঠকবর্গকে এই সমস্ত সৎকার্য্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করিতেছি। যুগে যুগে শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের পূর্ব্বাহ্নে এই সমস্ত চিহ্নই দেখা যায় এবং এবারও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আসুন, পাঠকবর্গ, আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি লইয়া বৈদিক যুগের ঊষার আহ্বান স্তোত্রগুলির ন্যায় সমস্বরে একযোগে শ্রীভগবানের আবাহনগীতি গান করি—তিনিই আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের অজ্ঞানাশ্রিত পৃথক্ সত্ত্বা ভুলাইয়া আমাদিগকে প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবেন এবং যাহাতে আমরা যুগাবতারকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পূজা যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারি, তদনুরূপ শক্তি ও সাধনার অধিকারী করিবেন। তাঁহার কৃপায় সিদ্ধি আমাদের করায়ত্ত হইবে।

গুরু ও শিষ্য।

গুরু—বৎস, যন্ত্রীর হস্তে যন্ত্রস্বরূপ যদি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পার, তাহা হইলেই ত সুখ দুঃখের, পাপপুণ্যের দায় হইতে রক্ষা পাইবে। মানুষ তাহা অহঙ্কার বশতঃ পারে না বলিয়াই ত এই স্বর্গ নরকের সৃষ্টি, এত শোকতাপের রচনা, মানুষ আপনার মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মী বা প্রকৃত প্রভুর সন্ধান না পাইয়া আপনার দেহ, প্রাণ বা বড় জোর বুদ্ধিগত অহঙ্কারকে কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতি বা প্রভুরূপে ধরিয়া লয় বলিয়াই, কর্ম্মের সাফল্যে উৎসাহিত ও বিফলতায় নিরুৎসাহ হয়, এত সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। এ কর্ম্ম এইভাবে করিলে ইহারফল এই প্রকার হইত, হায়, হায়, এ বুদ্ধিটুকু যোগায় নাই বলিয়াই কার্য্যটী সফল হইল না এবম্প্রকার মানুষী বুদ্ধির পরিচালনাদ্বারা মানুষ আপনার জীবনে সুখদুঃখ সৃজন করে, বার বার এই সংসারে যাতায়তের পথ প্রস্তুত করে। মানুষের আত্ম প্রকৃতি মানুষকে এই ভাবেই মাজিয়া ঘসিয়া আপনার মনোমত করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন।

শিষ্য—গুরুদেব, আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বলুন। মানুষের এই আত্ম প্রকৃতি, যাঁহাকে আপনি প্রকৃত কর্ম্মী বলিতেছেন, তাহা কি ?

গুরু—শুন বৎস! তোমার একটী আত্ম প্রকৃতি আছে, ইহা ঠিক কেবল তোমার নহে, ইহা সকলেরই; তুমি, আমি, সর্ব্বভূতেরই অন্তরালে এই প্রকৃতি বিরাজমানা, এই প্রকৃতি সসীমা, তোমাতে আমাতে কাহারও মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। বাহ্য প্রকৃতি যাহা তোমার বাহিরে বলিয়া মনে কর, তাহা তোমার এই আত্মপ্রকৃতি বলিয়াই জানিও, ইহা তোমা হইতে বিভিন্ন নহে। বৎস, তোমার এই মহীয়সী প্রকৃতিদেবীই এই সূর্য্য ও সৌরমণ্ডল রচনা করেন, এই পৃথিবীও তন্নিবাসী জীবনিবহ সৃষ্টি করেন ; যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, বোধ করিতেছ, চিন্তা করিতেছ, সবই তোমার এই প্রকৃতির কল্পনা। তোমার শত্রুমিত্র, তোমার জননী ও তোমার সংহার কর্ত্তা, তোমার প্রণয়ী ও নির্য্যাতন কারী, তোমার আত্মীয় ও অপরিচিত, তোমার আনন্দ নিরানন্দ, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সাহসিকতা দুর্ব্বলতা, জ্ঞান অজ্ঞান সবই তোমার প্রকৃতিকর্ত্তৃক বিকশিত। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটীই তোমার প্রকৃতি নহে, ইহারা সকলে তাঁহারই অপরিস্ফুট ছায়ামাত্র, প্রকৃতির আত্মপরিচিত হইবার অসম্পূর্ণ প্রয়াসমাত্র। প্রকৃতি সুখও নহে, দুঃখও নহে, সাহসও নহে দুর্ব্বলতাও নহে—এই সকল অবস্থার অন্তরালে যে একটা মৌলিক আত্মা একটা অনন্ত শক্তি আছে, যাহা অনন্ত গুণশালিনী, তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিও তোমার একটা নিজস্ব, ব্যক্তিগত গতি আছে ; একটী বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, স্বভাব ও শক্তি আছে। সাগরগামিনী নদী

যেমন ক্রমশঃ বিস্তৃতা হইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হয়, তেমনি তোমার এই বিশিষ্টা গতি এবং শক্তিও সেই মৌলিক গতি, আদ্যাশক্তির সহিত সম্মিলিত হইতে ছুটিয়াছে। সেই গতির, সেই শক্তি প্রবাহের অনুসরণ করাই বিধি। এই তোমার আমার শক্তি, প্রকৃতি—যাহা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে উহার গন্তব্য সেই মূল শক্তিস্রোতঃ, সেই অনন্ত উৎস—ইহা জানিয়া জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিলেই ভগবানের অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্ম করা হয়।

বৎস, এই জড়জগতে তোমার এই দেহপিণ্ডকে একটী গ্রন্থী বলিয়া জানিও—এই গ্রন্থী যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চের রচনা মধ্যে একটী অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। তোমার এই ক্ষুদ্র মনটী বিশ্ব-মানসের একটী তরঙ্গ হিল্লোল মাত্র। তোমার এই ক্ষুদ্রজীবন বিশ্ব-জীবন-সাগরের একটী ঘূর্ণাবৃত্ত মাত্র। তোমার মন ও জীবন ক্ষুদ্র অনুমিত হইলেও ইহাদের যথাযত কার্য্য ও আবশ্যক আছে। তোমার শক্তি এই বিশ্ব শক্তিরই অনুপরমাণু। এই শক্তি অপরের শক্তির সহিত জড়িত বলিয়া জানিও। কোন শক্তিই কোন শক্তির বহির্ভূত নহে। তোমার জ্ঞান সেই অমানুষী অনন্ত-জ্ঞানেরই দীপ্তিকণা মাত্র। যে সকল কর্ম্ম তুমি করিতেছ তাহা তোমার জন্ম পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জানিও। এই সমস্ত সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তোমার অহমিকারূপ ভ্রম হইতে বিমুক্ত হও।

যখন এই জ্ঞান সম্যক্ অর্জ্জিত হইবে ও এই অবস্থা উপলব্ধ হইবে, তখন তোমার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও কি সত্য আছে তাহা বুঝিতে পারিবে। তোমার শক্তি এবং মহিমা, সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানগরিমায় ভূষিত হইয়া মুক্ত আনন্দ ভোগে সমর্থ হইবে। আবার শক্তি ও জ্ঞান, মহিমা ও গরিমা হইতে বঞ্চিত হইলেও সমান আনন্দই উপভোগ করিবে। কারণ এ সমস্তই সেই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নটরাজ পরম পুরুষেরই অভিনয়ার্থ বেশবৈচিত্র্যমাত্র। এ সকলই আত্মারূপী মহাভাস্করের ভিন্ন ভিন্নভাবে আত্মপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ মাত্র।

বৎস, নিজেকে সসীম মনে করিয়া কেন আত্মাকে খর্ব্ব কর? এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তুমিও যে অনন্ত আনন্দেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে পার। অঙ্গচ্ছেদকারী তরবারীর মধ্যেও যেমন, প্রেমিকের প্রেমালিঙ্গনে তেমনিই আপনার অস্তিত্ব অনুভব করিতে শিখ। সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যে, পৃথিবীর নৃত্যে, বিহঙ্গের সঙ্গীতে সমান ভাবেই আত্মোপলব্ধি কর। যাহা কিছু অতীত হইয়াছে, যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহাকিছু ভবিষ্যগর্ভ হইতে বহিরুন্মুখ সমুদয়েরই অন্তরালে তোমার নিজের সত্তা নিহিত। অনন্তসত্তার অনন্ত আনন্দের অভিষেক তোমাতে সম্ভব, কেন ইহা বিশ্বাস করিতেছ না?

সকল কর্ম্মের কর্ত্রী তোমার এই আত্ম প্রকৃতি। সেই মহীয়সী প্রকৃতিরাণী সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাস্পদ পুরুষোত্তমের আনন্দও সম্ভোগ করেন। কারণ পুরুষের আনন্দবিধানের জন্যই প্রকৃতি সমুদয় সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি জানেন যে তিনি পুরুষেরই চিন্ময়ীশক্তিরূপা, পুরুষেরই জ্ঞান ও জ্ঞানভাতিরূপিনী, তাঁহারই একত্ব ও বহুত্ব, তাঁহারই অনন্তত্ব ও সসীমত্বস্বরূপিনী। বৎস, পূর্ব্বে তোমাকে আমি যে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র হইবার সাধনার কথা বলিয়াছি, সে সাধন শিক্ষা যখন সুসিদ্ধ হইবে, তখন আপনাকে এই সর্ব্বকর্ম্মকারিণী প্রকৃতি শক্তির সহিত একীভূত করিয়া জানিতে অভ্যাস করিও। প্রকৃতি রূপে আপনাকে জানিয়া প্রেমময় পরম পুরুষের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

শিষ্য—দেব, প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রভুর মধ্যে কি বিভিন্নতা?

গুরু—বৎস, কেহ কেহ অপনাকে যন্ত্রীর হস্তে যন্ত্র রূপে চিনিতে পারিয়াও কর্ম্মশীল প্রকৃতিকে কর্ম্মের প্রভু বলিয়া বুঝিবার ভ্রম করিয়া থাকেন। সেই জন্য ইহারাও সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন না। যন্ত্র, সীমাবদ্ধ দেহীরূপে সেই পুরুষের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি বিশ্বব্যাপিনী হইলেও পুরুষের আত্মপ্রচার-মাত্র, উভয়ের কেহই প্রভু নহেন, কারণ কেহই প্রকৃত পুরুষ স্বরূপ নহেন।

অবশেষে সেই গভীর তম আত্মাকেই পরম পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিবে। সেই আত্মার রূপ নাই, বিবরণ নাই, গুণ নাই। তোমার সত্তার মধ্যে সেই নির্গুণ পুরুষের সহিত একীভূত, সম্মিলিত হও। তোমার সত্তাশ্রিত চৈতন্যের মধ্যে সেই পুরুষের সহিত প্রেমসূত্রে সংবদ্ধ হও, তোমার চৈতন্যানুপ্রাণিত শক্তির মধ্যেই তাঁহারই অনুমতির অনুবর্ত্তন কর, তোমার আনন্দময় কোষে তাঁহাকেই প্রেমস্পর্শ কর ও তাঁহারই দ্বারা প্রেমস্পৃষ্ট হও, তোমার দেহ, প্রাণ ও মানসিক যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকেই প্রচার করিয়া ধন্য হও। তখনই তোমার ভিতরে একটী উদ্দীয়মান অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ পরম পুরুষের আবির্ভাব হইবে। দেখিবে তিনি তুমি, আবার তিনি শুধু তুমি নহেন, তিনি সর্ব্বভূতস্থ বহু আবার বহু অপেক্ষাও বহুতর, তিনিই তোমার সমুদয় কর্ম্মের নিয়ন্তা এবং ভোক্তা তিনিই প্রকৃতির প্রভু এবং তিনিই যন্ত্র, তিনি এই বিশ্বনৃত্যে উন্মত্ত, ব্যস্ত, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তরতম নিগূঢ় প্রদেশে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত স্থির, নিথর, বিরলে একাকী তোমারই সহিত অনুস্যূত।

ইহা উপলব্ধ হইলে তোমার আর জয় করিবার কিছুই থাকিবে না। কারণ তখন তোমার আত্মসমর্পণ করা সম্পূর্ণ হইবে। তখন তিনি আপনাকে তোমার হাতে ধরিয়া দিবেন। দেখিবে সর্ব্ববস্তু, সর্ব্বজীবের সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বপ্রাপ্তি, সর্ব্ব অধিকার, সর্ব্বভোগ করগত হইবে—আর তাহাও তোমার আয়ত্তাধীন হইবে যাহাকে কেহ কখনও বিভক্ত করিতে পারে নাই। তুমি আপনার মধ্যে নিজেকে পাইবে এবং সকলকে পাইবে এবং সর্ব্বাতিরিক্ত যাহা কিছু তাহাও প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্মযোগের ইহাই পরাকাষ্ঠা, কর্ম্মমার্গের ইহাই লক্ষ্য।

ভগবানে বিশ্বাস।

মানুষ তখনই নিত্যানন্দভোগ করে, যখন সে তার ভিতরের মূল তন্ত্রটাকে ধরতে পারে। এই মূল তন্ত্রটাকে ধরাই জীবনের উদ্দেশ্য। আর যা সব ঘট্‌ছে, সেগুলি কেবল বুঝিয়ে দেয়—যে আমরা এখনও জীবনের আসল সূত্র খুঁজে বার্ করতে পারি নাই।

জীবনের উপরের কার্য্যগুলি—যা আমরা সহজেই ধরতে পারি, বুঝ্‌তে পারি—তাদের ধারা, তাদের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করি, কিন্তু তা দিয়ে বেশী দূর যেতে পারি না। সেই সকল বাহিরের জ্ঞান কতকদূর নিয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়—আমরা ঘুরেফিরে আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে আসি। এই রকম করে জীবনের আসল উদ্দেশ্যটার সন্ধান জন্ম জন্ম আমরা করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

প্রকৃতির আসল অভিসন্ধির অভিব্যক্তি বাহিরে এমন বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে আছে, যে সকলকে গুছিয়ে একত্র করাই যায় না—তার পর তা থেকে প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপন করা ত দূরের কথা। জীবনের সমস্ত ঘটনার অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে একটা যে বিপুল মহাশক্তি বিরাজ কর্‌ছে তাঁকে ধরে ফেল্‌তে হলে, বাহিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিতরের-দিকে চাইতে হবে। প্রথম দৃষ্টিতে সে দিকটা ভীষণ অন্ধকার—অন্ধকারের উপর নিবিড় অন্ধকার জমাটবেঁধে আছে—কিন্তু খুব কঠোর সঙ্কল্পের সহিত সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লে সেই গভীর আঁধার ভেদ করে একটা শুভ্র জ্ঞানের আলো ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছে দেখ্‌তে পাবে—সে আলোক একবার দৃষ্টিপথে পড়্‌লে আর ভাব্‌তে হবে না।

প্রথমে কিছু দেখ্‌তে না পেলেও, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত একটা বিকট আঁধারের দিকে চেয়ে থাকাও সাধনা। অন্ধকারের পেছনে আমার আকাঙ্খিত বস্তু আছে—এ ধ্রুব বিশ্বাস না থাক্‌লে আমরা কখনই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য একদিকে চেয়ে বসে থাক্‌তে পারি না।

ভগবানের উপর যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁরা যে সকলেই তাঁকে দর্শন করেছেন এরূপ নহে—সকলেই যে তাঁকে মানস প্রত্যক্ষ করে', তাঁর প্রতি বিশ্বাসবান্ হয়েছেন এমনও নহে—যাঁকে দেখি নাই, যাঁর মুখের কথা শ্রবণ গোচর করি নাই—যিনি স্পর্শের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ভাবের অতীত—তাঁকে যা দিয়ে আমাদের মনে এমন অটল আসন পেতে দিতে সমর্থ হয়েছি—সেই জিনিষটাকে ধরে ফেলতে পারলেই সাধনার অনেক জটিল রহস্য সরল হয়ে আসবে।

সেটা কি? বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আকাশথেকে পড়ে নাই। একদিনের শ্রবণেই ইহার ভিত্তি এমন দৃঢ় হয়ে উঠে নাই, শরীর পুষ্টির জন্য নিত্য যেমন আহার্য্য গ্রহণ করেছি—এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য সেইমত আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত শুনে এসেছি—যে তিনি অবাঙ মনসো গোচরঃ হলেও আছেন। বাস্তবিক ভাবলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয় কেমন করে এই বিশ্বাস অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের হৃদয়মন্দিরে এসে স্থান পেয়েছে। অতি শৈশবে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ে পাঠ করেছি "তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান্"। এ বিশ্বাস সে দিন এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে নাই। কিন্তু আজ অবধি ঐ একই কথার দ্যোতনা দিবানিশি শুনে শুনে শোণিতের প্রবাহ মধ্যে ঐ বিশ্বাস সেঁদিয়ে গিয়েছে—যুক্তি নাই, তর্ক নাই—তিনি আছেন, প্রমাণ নাই, বিচার নাই—তিনি আছেন। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এ জ্ঞান আমার অটল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমরা বলেছি—জীবনটাই আমাদের যোগ, জীবনের সকল কার্য্যই সাধনা। কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করলেই আমরা একটা নূতন সংস্কারের দাস হয়ে পড়ব, একটী সঙ্কীর্ণ রেখার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যাব।

ভগবানের নাম যেমন করে আমাদের কাণে স্বভাবক্রমেই পৌঁছে গেছে, তিনি আছেন, তাঁকে জানি আর নাই জানি, তবুও তিনি নিশ্চয়ই আছেন—এ বিশ্বাস যেমন সহজ জীবন প্রবাহের স্বাভাবিক গতিতেই আমাদের মনের উপর অটল আসন পেতেছে, জীবনের চরম সাফল্যও তেমনি প্রকৃতির বশে একদিন এসে উপস্থিত হবে। মনে রেখো আস্তিক্য বুদ্ধিও মানব জীবনের একটা মস্ত সিদ্ধি—সাধনার ফল।

একনিষ্ঠা।

আমরা চলিয়াছি। দিনের পর দিন চলিয়াছে, মাসের পশ্চাতে মাস অনুবর্ত্তন করিতেছে, দীর্ঘ বৎসরের অবসানে দীর্ঘবৎসর আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে—আমরাও চলিয়াছি। কালস্রোতঃ যেমন নিবৃত্তি জানে না, নদীবেগ যেমন স্থৈর্য্য মানে না, মানুষও সেইরূপ দাঁড়াইবার প্রয়োজনবোধ করে না। কালও সে আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, পরশ্বও স্থবির হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া, সে বসিয়া থাকিবে না।

* * * *

মানুষের ভিতরেও যেমন, সমগ্র বিশ্বের ভিতরেও তদ্রূপ দেখিতে পাইবে। অনন্ত বিশ্বপ্রবাহের কেহ ইয়ত্তা করিতে পার কি? অনন্ত ঘটনাতরঙ্গ, বিচিত্র লীলাভঙ্গী, অশ্রান্ত ঊর্ম্মিমালা পৃষ্ঠে তুলিয়া জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড চলিয়াছে। কবি, তাঁহার হৃদয়রসামৃতে সৌন্দর্য্য শতদল অভিষিক্ত করিয়া, দলের পর দল উন্মোচন করিয়া, কে জানে কোন্ অনন্ত সুন্দরের সুষমার অন্বেষণ করিতে নিরত। দার্শনিক, তাঁহার সূক্ষ্ম, সমন্বয়দর্শী দৃষ্টির সাহায্যে চারিদিক হইতে সত্যরাজি লুফিয়া লইয়া, কি জানি কোন্ এক সনাতন সূত্রে বহুকে গ্রথিত করিতে প্রবৃত্ত। কর্ম্মী, তাহার সবল মস্তিষ্ক ও হৃদয় লইয়া, দিনের পর দিন, কে বলিবে কোন্ অনন্ত লীলাময়ের চরণে তাঁহার কর্ম্মরাজি ডালি দিতে দিতে চলিয়াছে। এমনি করিয়া জড়, অজড়, ব্যষ্টি ও সমষ্টি লইয়া, অনাদি অতীত কাল ব্যাপিয়া, বর্ত্তমানকে ছাইয়া, জানি না কত অনাগত ভবিষ্যযুগ ধরিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে।

* * * *

এ পথ চলা শেষ হইবে কি না—এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কখনও কেন্দ্র সত্য মিলিবে কি না,—এ বিচিত্র জটিল জীবন প্রশ্নের কখনও কোনও মীমাংসা সমাধান হইবে কি না—সকল মানুষ কিছু এ সব ভাবিয়া অগ্রসর হয় না। কিন্তু একটা কিছু লইয়া, একটা কিছু সম্বল গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেকেই পথ অতিবাহন করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকলেই আপন আপন মনোমত পাথেয় সঙ্গে লইয়া দীর্ঘ জীবন যাত্রার যাত্রী।

অনন্ত মত, অনন্ত পথ হইলেও যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, যাঁহারা বাস্তবিক একটু উৎসাহী পথিক, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, একটী সাধারণ

বাজারে, একটী সাধারণ মূল্যে সকলকেই সেই পাথেয় ক্রয় করিয়া লইতে হয়। নহিলে বড় বেগ, বড় ঝঞ্ঝা ঝাপট, বড় দিক্‌হারা হইবার ভয়—নহিলে এ জীবনপথে একরকম অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই মূল্য একটা বিশ্বাস, একটা একনিষ্ঠা। যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুন, এই বিশ্বাস ও এই একনিষ্ঠা ব্যতীত কখনও নিরাপদে পথ অতিবাহন করিতে পারিবেন না। গন্তব্যলক্ষ্যে পৌঁছান যাউক আর নাইই যাউক, এই বিশ্বাস ও একনিষ্ঠা যদি থাকে, তাহা হইলে অনন্ত পথ চলাতেও ক্লান্তি আসিবে না—সিদ্ধি বিলম্বেই হউক আর শীঘ্রই হউক, সাধনাতেই একটা তৃপ্তি, একটা আনন্দ মিলিবে, তাহাই মানুষকে সিদ্ধির পথে চলিতে অনন্ত ধৈর্য্য প্রদান করিবে।

* * * *

এই একনিষ্ঠাই তপস্যা। তপস্যা কেবল অরণ্যবাসী ঊর্দ্ধবাহুদের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। সে সংসারী হউক, সে বৈরাগী হউক, সে কর্ম্মী হউক, সে ত্যাগী হউক, যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে, তপস্যায় সকল মানুষের সাধারণ অধিকার। প্রত্যেক মানুষের জীবনই এক একটা তপঃক্ষেত্র, প্রত্যেক গৃহই যোগাশ্রম। প্রত্যেক মানুষকেই আপন আপন জীবন সমস্যার সমাধা করিয়া লইতে হইবে। মহাপুরুষগণ, অবতারগণ মানুষকে সহজে ধাঁধার বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য এমন এক একটা চিত্তাকর্ষক পন্থা আবিষ্কার করিয়া দেন, যাহা দেখিয়া সে আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারে না। তখন একনিষ্ঠ হইয়া সে সেই পন্থানুসরণে মনঃস্থ করে। এইরূপে সে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একনিষ্ঠাই শিক্ষা করে, অবলম্বন করে।

* * * *

একনিষ্ঠাই এই সংসার-সমুদ্র তরণের একমাত্র তরণী। তরুণ ভারত সন্তানকে যদি কিছু শিখাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে এই অমূল্য একনিষ্ঠ তপস্যা করিতেই শিক্ষা দাও। তাহারা এমন একটী সর্ব্বজয়ী বিশ্বাসের অধিকারী হউক, যাহা পর্ব্বত প্রমান বাধা তুচ্ছ করিয়া, প্রবলতম ঝঞ্ঝা ঝাপট উপেক্ষা করিয়া, অকুণ্ঠিত উৎসাহে, অপ্রতিহত বেগে তাহাদিগকে, জীবন যাত্রায় মাতাইয়া লইয়া চলিবে—ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইতে দিবে না; 'পাহাড় ভেদিয়া, সাগর ছেঁচিয়া' পথ কাটিয়া দিবে। তাহারা

ঘোর আত্মবিশ্বাসী হউক—সত্য লইয়া, বিশ্বাস লইয়া পাগল হইতে শিক্ষা করুক।

* * * *

কত সুন্দর মনোরম সেই দৃশ্য, যখন এইরূপ একটী পাগল সর্ব্বত্যাগ করিয়া, সত্যসর্ব্বস্ব হইয়া অপূর্ব্ব দেবতার মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়! চিরযুগ এইরূপ পাগলের দ্বারাই বিশ্বের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক নবযুগের প্রবর্ত্তক এইরূপ উন্মাদশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের পার্শ্বচর জনে জনে এইরূপ পাগল ছিলেন। তাঁহারা পাগল —মানুষের সঙ্কীর্ণ বিচার যুক্তির আলোকে তাঁহারা সত্য নিণয় করেন না—তাঁহারা সত্যকে দেখেন, অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন—তাই তাঁহারা পাগল; তাঁহারা স্বার্থের মাপ কাটিতে লাভালাভ মাপিয়া অগ্রসর হন না—কিন্তু স্বর্গাগত দৈব প্রেরণার চরণ মূলে সমগ্র জীবনকে ঢালিয়া দেন—তাই তাঁহারা পাগল। কিন্তু সমগ্র জগৎ সবিস্ময়ে চিরদিনই দেখিয়াছে—এই উন্মাদ মণ্ডলীই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে, মানুষের, জাতির জীবন সংগ্রামকে সফল সিদ্ধি বিমণ্ডিত করিয়াছে, অধর্ম্মের অবসান করিয়া বিশ্বে ধর্ম্মযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

—:o:—

ত্যাগের আদর্শ।

আমরা এই প্রবন্ধে ভগবচ্ছক্তির নিকট কি উপায়ে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া যথার্থ ত্যাগী হইতে পারা যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের যুগ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজ ত্যাগ করিয়া যাওয়াই ত্যাগের চরম আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই অবধি আমরা রাজর্ষি জনকের আদর্শ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই নবজাগরণের পূর্ব্বাহ্নে সেই বৈদিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য আমরা 'ত্যাগ' শব্দ 'কর্ম্মত্যাগ' অর্থে ব্যবহার না করিয়া গীতোক্ত 'কর্ম্ম ফলত্যাগ' অর্থেই ব্যবহার করিতেছি এবং কি করিয়া আমরা যথার্থ ভাবে কর্ম্ম ফলত্যাগ করিয়া ভগবানের যন্ত্র হইয়া শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী বা ত্যাগী হইতে পারি, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাঁহারা মনে করেন কর্ম্ম কেবল নিকৃষ্ট অবস্থাতেই সম্ভব, মুক্ত অবস্থায় কর্ম্ম থাকিতে

পারে না, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য হইবে। আমরা বিশ্বাস করি ভগবানের যখন অবতার ভাবে কর্ম্ম করা আমাদের শাস্ত্রমতে অসম্ভব বা নিষিদ্ধ নহে, তখন মুক্ত অবস্থাতেও ভগবানের যন্ত্র স্বরূপ কার্য্য-দ্বারা সচ্চিদানন্দের আনন্দ উপভোগও অসম্ভব নহে। জগতে যখন নানা ধর্ম্মমত স্থান পাইয়াছে আমরা আশা করি এই মত ও সাধারণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

প্রকৃত ত্যাগী হইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে আমাদের সমস্ত কর্ম্মেই আমা-দিগকে ভগবচ্চরণে আত্ম নিবেদন করিতে হইবে। আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি যে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম এই বিশ্বের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে ও সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত ভগবানের নিকট আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

এই আত্ম সমর্পন সম্বন্ধে দুইটী দিক বুঝিবার আছে। প্রথমতঃ, কর্ম্ম ও যে ভাব লইয়া তাহা করা হয়, সেই সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ ধারণা; এবং যাঁহার নিকট আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম আহুতি দেওয়া হইতেছে তাঁহার পূজা বা আরাধনা। প্রথমতঃ, আমরা কর্ম্ম ও যেভাবে তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য যে যিনি ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার কর্ম্ম কখনও নীচ স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতার ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইতে পারে না। তাঁহার পক্ষে যতদূর উচ্চধারণা করা সম্ভব, তিনি তাঁহার কর্ম্মকে ঠিক সেই সুরে বাঁধিয়া লন, কখনও তিনি কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুপ্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কখনও হয়ত তাঁহার কর্ম্ম জীবে দয়া ও সহানুভূতি হইতে অনুষ্ঠিত হয়, কখনও হয়ত তিনি সাধারণের হিতার্থে বা জগতের হিতার্থে কর্ম্ম করিয়া যান এবং কখনও বা তিনি, তাঁহার নিকট যিনি শ্রীভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ ও সর্ব্ববিধ জ্ঞানের আধারভূত, সেই শ্রীগুরুর আদেশ পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্ম যত উচ্চভাব লইয়াই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, যদি কর্ম্মফলে স্পৃহা বা আসক্তি থাকে তাহা হইলে সে কর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে ভগবানের নিকট উৎসর্গীকৃত না হইয়া অহংভাবের নিকটই আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হয়, ফলে তাহা আমাদিগকে বদ্ধজীবশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখে। আমরা আর সচ্চিদা-নন্দের প্রকাশময় লীলা উপভোগ করিতে পারি না। এই ভাবেই সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মকেই বন্ধনের হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন "সৎ কর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্ম" উভয়ই বন্ধন। তবে

প্রভেদ এই যে লোহার শিকল ও সোনার শিকল। আমাদিগকে উভয় কর্ম্মেরই পরপারে যাইতে হইবে।" যখন আমরা কর্ম্মফলে আসক্তি রাখিয়া নানারূপে সৎকর্ম্ম করিয়া যাই, তখনই আমরা উচ্চ ভাবসমূহদ্বারা অহং ভাবকে আবৃত রাখিয়া, ভগবানের নামে সেই অহংকারেরই পূজা করিয়া আত্ম প্রতারণা করিয়া থাকি। যোগাভ্যাসের প্রথমাবস্থায় এই অহঙ্কারই আমাদিগের প্রধান শত্রু। তথাপি অহঙ্কার নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগের ভিতর থাকিয়া ছলনা করিলেও, আমাদিগের হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তবে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন আমরা সর্ব্ববিধ আবরণের মধ্যে এই প্রবল শত্রুকে চিনিতে পারি এবং নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে প্রতিবার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে পারি। এই অবস্থায়, ভগবানের সেই অর্জ্জুনের প্রতি আদেশবাণী আমাদের ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ—"কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ফলে অধিকার নাই। "কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পিত," আমরা যেন এই মহাসত্য কখনও ভুলিয়া না যাই। বলা বাহুল্য যে, এই আদেশবাণী সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিতে চলিতে আমরা কর্ম্ম-ফলত্যাগের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিব।

কর্ম্মযোগী, ভগবানের নিকট কর্ম্মফল অর্পণ করিতে করিতে ক্রমে বুঝিতে পারেন যে তিনি সর্ব্বভূতে, সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টপদার্থে এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মে বিরাজিত। এই মহাসত্য মানিয়া লওয়াই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিকট ভগবানের আরাধনা। যেদিন হইতে আমরা এইভাবে তাঁহার আরাধনা করিতে সক্ষম হই; সে দিন হইতে সর্ব্বভূতে একাত্মবোধ আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এবং এই তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে বিদ্যমান বলিয়া আমরা বিদ্বান্ ও মূর্খ, সাধু ও পাপী, বন্ধু ও শত্রু, মানব ও পশুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোনই প্রভেদ দেখিতে পাই না, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত যখন যে মূর্ত্তিতে যতটা আত্মপ্রকাশ বা আত্মগোপন করা আবশ্যক হয়, তাহাই করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বন্দ্ব ও ভেদভাবের সৃষ্টি হইলেও, যিনি সাধক তিনি স্পষ্টই দেখেন, যে সেই একই সচ্চিদানন্দ তাঁহার লীলা প্রকট করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। ক্রমে আমরা জড়জগতেও রাগ ও দ্বেষের অতীত হইতে পারি—সে সময়ে আর আমরা, সুখদায়ক ও কষ্টদায়ক,

ভাল ও মন্দ, উচ্চ ও নীচ, সুন্দর ও কুৎসিৎ, পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বস্তু সমূহের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না, কেন না তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে বিকাশের তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্ববিধ অবস্থাতে সচ্চিদানন্দের লীলার কোনও এক মহাসত্যের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে এবং ভবিষ্যতের সত্যযুগগঠনের উপাদান সংগ্রহের সময়ে প্রত্যেক ভগ্ন ইষ্টকখানিরও কোনও এক বিশেষ আবশ্যকতা বিদ্যমান থাকিবে। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া সাধক সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্নের ক্ষণিক বিকাশে কোনরূপ ভীত বা পশ্চাৎপদ না হইয়া তাহাদের মধ্যে এই মহাসত্যেরই অন্বেষণ করেন এবং সর্ব্ববিধ মায়িক আবরণভেদ করিয়া সেই পরমসুন্দর পুরুষেরই পূজা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, যেদিন আমরা বিকাশের তারতম্য ঠিক এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব, যেদিন আমরা বুঝিব যে পূর্ণ, শাশ্বত ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ বস্তু ও অনুষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদের দ্বারা এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইতেছেন এবং তদ্দ্বারা সত্যযুগের সামঞ্জস্যবিধান সুগম হইয়া আসিতেছে, সেইদিন আমরা এই সৃষ্টিরহস্য ঠিকভাবে ধারণা করিতে সক্ষম হইব। তৃতীয়তঃ, আমাদিগকে সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই সমতা অভ্যাস করিতে হইবে। যখন শ্রীভগবান্ সকল কর্ম্মের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান্, তখন লাভ ও অলাভ, জয় ও পরাজয়, সুনাম ও কলঙ্ক, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত ফলাফলই আমাদিগকে সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা যেন কখনও ভুলিয়া না যাই, যে আমাদের দুঃখ ও অভাব, সুখ সম্পদের মত জগতের অভ্যুত্থানের জন্য সমভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে বিরোধ, দ্বেষভাব প্রভৃতির জীবনে আবশ্যকতা থাকিলেও, ও প্রথমাবস্থায় সাধনের সহায় হইলেও তাহা অজ্ঞান প্রসূত এবং সাধক যতই সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তিনি স্পষ্টই ধারণা করিতে পারেন যে পূর্ণতার মধ্যে কোনও বিরোধ বা দ্বন্দ্বভাব থাকিতে পারে না।

এই সমজ্ঞান দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা ও কঠোর আত্মসংযম ব্যতীত লাভ করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কামনা প্রবল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমতা যে কি তাহা আমরা কেবলমাত্র অবসাদের সময়ে ক্ষণিক উপলব্ধি করিতে পারি মাত্র। অধিকন্তু এই সমতা লাভেরও একটা ক্রমিক বিকাশ আছে, ইহাও অভ্যাস সাপেক্ষ। প্রথমে আমাদিগকে রাগদ্বেষ

প্রভৃতি দ্বন্দ্বের মধ্যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন শিক্ষা করিতে হয়। এই অবস্থাতে যাহা কিছু ক্লেশকর তাহাই বর্জ্জন না করিয়া এবং যাহা কিছু সুখকর তাহারই প্রতি ধাবিত না হইয়া, স্থির ও অবিচলিত ভাবে যাহা আসে সমস্তই গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিতে হয়। এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠেন অর্থাৎ আমাদের আত্ম-শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং আমরা বাহ্যসংস্পর্শে বিচলিত হই না। এই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার সময় আমাদের একটী বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান হইতে হয়। কারণ উক্ত অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক অবস্থা আসিতে পারে, যাহাতে জগতের সর্ব্বজীবের প্রতি একটা কঠোর তুচ্ছজ্ঞানের ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন আর সেই গীতোক্ত সর্ব্বভূতহিতে রত ভাব সহজে হৃদয়ে আনিতে পারা যায় না এবং দিন দিন আমরা অধিকতর নির্ম্মম হইয়া যেন জগতের সহিত সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। যাহাতে এইরূপ ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিফল করিতে না পারে, সেইজন্য সহিষ্ণুতা অভ্যাসের প্রথম হইতেই যাহাতে হৃদয়ে ভগবচ্ছক্তির নিকট আত্মসমর্পনের ভাব বদ্ধমূল হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমরা যেন কখনও ভুলিয়া না যাই, যে সেই মহাশক্তি আমাদিগকে পূর্ণত্ব উপলব্ধির পথে চালিত করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই সহিষ্ণুতা কতক পরিমাণে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদিগকে আত্মার উদাসীনতার ভাব অভ্যাস করিতে হয়। এই অবস্থায় আত্মা উৎসাহ ও নিরুৎসাহ, আনন্দ ও নিরানন্দ জনিত মানসিক বিকার হইতে মুক্ত হন। কিন্তু এই উদাসীনতা কর্ম্মবৈরাগ্য অথবা পরিতৃপ্ত বা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা এবং প্রতিহত অহঙ্কার জনিত বিরক্তি নহে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে সাধারণে, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপালন একার্থবোধক জ্ঞান করিয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় দ্বারা কর্ম্মজীবনের সহিত নিজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাকেই ধর্ম্মপালন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য বা কর্ম্মে বিরক্তি, ধর্ম্মজীবন লাভে অধিকাংশস্থলেই সহায় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তি ভবিষ্যতে বন্ধনের সৃষ্টি করে এবং আমরা জীবনে যে পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে চাহিতেছি তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। আমরা যে উদাসীনতার কথা বলিতেছি তাহা গীতোক্ত আত্মার দ্রষ্টা ও অনুমন্তার ভাব। তিনি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানেরই দ্রষ্টা

ও ভোক্তা বটেন, কিন্তু তিনি উদাসীন ; কোনরূপ ফলের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ হন না। এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে আত্মা জাগতিক কোনরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা বিচলিত না হইয়া 'শান্তি'র অধিকারী হন। এই শান্তির অধিকারী হইবার পর, ক্রমে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন আমরা আনন্দলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। এই অবস্থা আনয়নের সুবিধা করিবার জন্য আমাদিগকে আবার নূতন ভাবে আত্মসমর্পন অভ্যাস করিতে হয় এবার আর কেবলমাত্র ভগবচ্ছক্তির নিকট আত্মসমর্পন না করিয়া, তিনি যে প্রেমময় ইহা জানিয়া, ভগবদ্‌প্রেমের নিকট আত্মসমর্পন অভ্যাস করিতে হয়। ইহার ফলে আমরা ভূমানন্দের উপভোগ করিয়া, প্রেমময়ের লীলা এই জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই। তখন আর আমরা এ জগতে অভাব, দুঃখ, দুর্ব্বলতা, ভয়, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি বিকার সমূহ দেখিতে পাই না, তখন আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল আনন্দময়ের আনন্দ ও প্রেমলীলা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা সর্ব্বত্র সেই একেরই স্ফূরণ দেখিতে পাই। ইহার ফলে আমরা স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকি এবং আমাদের সমতা জ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ করে।

কামনাত্যাগ এবং সমতালাভে এইরূপে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে হইলে, কর্ম্ম ফল ও ফলাকাঙ্খা ভগবানে সমর্পন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে কর্ম্মের অহঙ্কারও ত্যাগ করিতে হয়। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই আত্মসমর্পনের ফলে সাধক কামনার মধ্যে অহঙ্কার ত্যাগ করিলেও, তিনি কর্ম্মী বলিয়া যে অহঙ্কার তাঁহা ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করেন তিনি কর্ম্মকর্ত্তা এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে এবং তিনিই সমস্ত কর্ম্মের জন্য দায়ী। ইহাও সেই অবিদ্যারই অহঙ্কার এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যষ্টিভাব দূরীকরণই যোগসাধনের উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'সাধক কেবল বিদ্যার 'আমি' নিজে রাখিতে পারেন, তাহাতে কোনরূপ বন্ধনের ভয় নাই। অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞানাশ্রিত যে অহঙ্কার তাহা নির্দ্দোষ, কেন না তাহার ফলে সাধক 'সচ্চিদানন্দের' লীলা বিকাশের কেন্দ্র স্বরূপ হন এবং তাঁহার চেতন যন্ত্র স্বরূপ হইয়া ব্যষ্টিভাবে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন।

এই 'কর্ম্মে অহঙ্কার ত্যাগ'ও অভ্যাস সাপেক্ষ। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ধারণা করা চাই, যে আমাদের কর্ম্মফল যেমন ভগবানের প্রাপ্য, সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে আমাদের কর্ম্মও তাঁহারই কর্ম্ম। কেবল তাহার দ্বারা তিনি আমাদের ব্যষ্টিভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু এইভাবে কর্ম্ম ধারণা করিতে গিয়া আমরা অধিকাংশ স্থলেই 'অহংভাবের' সহিত ভগবান্‌কে মিশাইয়া ফেলি এবং ভগবচ্ছক্তির নিকট আত্মসমর্পনের নামে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার ভাব এমন কি, কামনা ও রিপুসমূহের সেবা করিয়া থাকি। সেই জন্য এই ভাব আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে সাধককে নিষ্কাম ও সমতালাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে অথবা তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই এবং অহঙ্কার যাহাতে অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। সেই জন্য, সেই সঙ্গে সাধককে, ভগবানের শক্তি তাঁহার ভিতরে কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহা দ্রষ্টারূপে সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখা অভ্যাস করিতে হয়। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; এই তিন গুণকে আশ্রয় করিয়া সেই শক্তি আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মিকা, ইহার ফলে যাহা সত্য তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, রজঃগুণের বলে আমরা রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের বশীভূত হইয়া, বদ্ধজীবের ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাই এবং তমোগুণ, মোহের সৃষ্টি করিয়া আমাদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়। সাধককে প্রথম হইতেই সাক্ষী স্বরূপে এই তিন গুণের পৃথক্‌ভাবে ও মিলিত ভাবে ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ধারণা করিতে হয়; তাহা হইতে তিনি 'অনুমন্তা'ভাবে প্রকৃতিকে, তাঁহার মধ্যে রজঃ ও তমোগুণকে সত্ত্বের বশীভূত করিতে, রাজি করিতে পারেন এবং কালে সত্ত্বগুণকেও জয় করিয়া ত্রিগুনাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারেন। সাধক একবার এই অবস্থায় উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ভগবানে সমর্পন করিবার উপযোগী হন এবং সেই অবস্থায় তিনি মুক্তজীবের ন্যায় তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। তখন তাঁহার নিকট প্রকৃতি আর কোনও অবিদ্যার আবরণ রাখেন না, তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দসাগরে মীনরূপে যথেচ্ছা খেলা করিয়া বেড়ান। তখন আর তাঁহার কর্ম্মে কোনও চেষ্টা নাই, ভোগে কোনও আসক্তি নাই, কর্ম্মত্যাগেও কোন স্পৃহা নাই। তখন এই সৃষ্টিচক্রপ্রবাহ তাঁহার ভিতর দিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যায়।

আজ আমরা শ্রীগুরুর নামে আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে প্রকৃত ত্যাগের আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

আমরা চাই সেই ত্যাগ, যাহার বলে সাধক সমতালাভ করিয়া, নির্ব্বিকার ভাবে জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবেন এবং তাহার ফলে পৃথিবীতে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই অবস্থা লাভ, কঠোর সাধন সাপেক্ষ। আশা করি, ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে তদুপযোগী উদ্যম ও শ্রদ্ধার অভাব হইবে না।

রাসলীলা।

জ্ঞানযোগে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই সনাতন। আবার কর্ম্মযোগে যাহা বুঝিতেছি তাহাকেও অলীক বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না। আমি যোগ শব্দ সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিলাম—কেহ গুরুতর ভাবে লইবেন না।

জ্ঞান—যাহা বুদ্ধি দিয়া অধিগম্য—বিষয়ের সংস্পর্শে দৈহিক সংযোগ না ঘটিয়াও যাহার 'ফটো' অনবরতই উঠিতেছে—সে ভাল হউক, মন্দ হউক—তবে সজ্জন সমাজে যাহার ভাল বলিয়াই খ্যাতি আছে—আচ্ছা আরও একটু চড়াইয়া বলা যাউক, যাহাকে সকলে অতীন্দ্রিয় নিত্যশাশ্বত বলে—আমি তাহাই অনুভূতিতে আনিতেছি। যাহা অসার, যাহা ক্ষণবিধ্বংসী, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা অতি সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিতেছি।

প্রত্যেক বস্তুর সহিত আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিতে না ঘটিতেই আমার অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানশক্তি—আর একটু না হয় নামাইয়া বলিলাম—বিচারশক্তি তন্ন তন্ন করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বস্তুর অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া, আমায় একটু উচ্চে দাঁড় করাইয়া দিল। আমি অনিত্য ছাড়াইয়া নিত্যের সন্ধানে আর এক ধাপ আগাইলাম।

জ্ঞানের অনুচর বুদ্ধি, বিচার, যুক্তি অনবরতই আমায় বাহ্যবস্তুর বিশ্লেষণ দেখাইতেছে। প্রকৃতই আমি অসার, অনিত্য ছাড়াইয়া চলিতেছি—যাহা আসে এবং যাহা যায় তাহার মায়া কাটাইয়া, জানি না কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বস্তু বিশেষের সহিত আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই—তাহার সহিত মাখামাখি করিবার আমার অবসর কোথায়? আমি চলিয়াছি অনিত্য, অসার, ধ্বংসশীল পার্থিব পদার্থের মায়া কাটাইয়া নিত্যের সন্ধানে—পরমাত্মার সন্ধানে—বিশ্বসত্তার সন্ধানে। আমি শাস্ত্র জানি না, সাধনা জানি না—ইহাকেই আমার ভাষায়, আমার কথায় জ্ঞানযোগ বলি। আমার প্রকৃতি যাহা বুঝাইয়াছে তাহাকেই আমি শ্রেষ্ঠ আসন দিব—ইহাই আমার জ্ঞানযোগ।

তার পর আমার কর্ম্মযোগের কথা। বড়ই বিচিত্র। জ্ঞানযোগে থাকা সত্ত্বেও আমি যখন কর্ম্ম করি, তখন পৃথিবীর সহিত, অতি সতর্ক হইলেও, একটা সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়—একটা খুব নিকট আত্মীয়তা, খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জমকাইয়া উঠে। জ্ঞান সূক্ষ্ম, কর্ম্ম বড় স্থূল। তার প্রকাশ আমার চক্ষে উৎকট ভাবে প্রকটিত। ইহার প্রকাশ আমি বড় কম

অনুভব করি না। আমি খুঁজিয়া পাই না—উপরোক্ত জ্ঞানের সঙ্গে আমার কর্ম্মের ধারার মিল কোথায় আছে। এমনি করিয়া গোঁজামিল দিয়া কত কাল কাটাইব—আজ একটা মীমাংসা হইয়া যাউক। ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা যমুনা এক হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে সে সঙ্গমের সৃষ্টি হইবে—স্বর্গ হইতে যে জ্ঞান এবং কর্ম্মধারা আমার পার্থিব জীবনের উপরদিয়া প্রবাহিত, তাহার মিলন না হইলে জীবন মধুময় হইবে কেন, পুণ্যতীর্থ হইবে কেন, ধর্ম্মক্ষেত্র হইবে কেন? আমি যে মনুষ্য-জীবনকে বড় ভালবাসি—এই খানেই যে আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, আমার ভক্তি, মুক্তি, শান্তি, সিদ্ধি।

আমার কর্ম্মযোগের কথা আরও স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা ভাল। আমি যাহা করি আমার তাহাই কর্ম্ম। আহার, বিহার, ভ্রমন, উপার্জ্জন-চেষ্টা, ভগবদ্‌নামশ্রবণ, সাধুসঙ্গ, দেশসেবা, অতিথিসৎকার, ভাল মন্দ আমি যাহাই করি না কেন এসকলি আমার কার্য্য এবং ইহাই আমার কর্ম্মযোগ। স্রোতস্বিনী, কোনও নৈসর্গিক প্রস্রবণ অথবা বিপুল জলশালিনী নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে—ইহাদের সহিত নিশ্চয় ইহার সংযোগ আছে, নতুবা সরস হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইত, তৃণলতায় গহ্বর পূর্ণ হইয়া যাইত। আমারও কর্ম্মশক্তি কোনও অফুরন্ত, অসীম শক্তিকেন্দ্র হইতে নামিয়া আসিতেছে নতুবা কোনও কর্ম্মকরিবারই আমার ক্ষমতা থাকিত না—আমি জড় হইয়া থাকিতাম—ধরাপৃষ্ঠে আমার সঞ্চরণ শক্তি একেবারেই থাকিত না। তাই আমার ধারণা, যে আমার সকল কার্য্যই কর্ম্ম এবং ইহাই আমার কর্ম্মযোগ। এই যোগ কোথায়, তাহা নয় নাই জানিলাম।

জ্ঞানে যাহাকে অসার বলে আমার কর্ম্ম তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা কে করিবে? একটা নূতন সাধন, গুরু আমায় দিয়া গিয়াছেন। সে সাধন যে নূতন কথাটী বলিয়াছে তাহা এই—"অসার কিছুই নহে, সবই ভগবান্, সবই সনাতন, সবই আনন্দময়।"

এই আশার কথা শুনিয়াই আমি আশান্বিত হইয়াছি—অসার কর্ম্মে এবং জ্ঞানে সমতার সূত্র বাহির করিবার ক্ষমতা পাইয়াছি, নতুবা জীবনটা মরুময় হইয়া যাইত। কে কোথায় আনন্দে দিন কাটাইতে পারিত, যদি বিচ্ছেদে মিলনের আশা না থাকিত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্ম করিতে গেলে বাহ্য বস্তুর সহিত একটা সম্পর্ক

না পাতাইয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে সেগুলিকে যদি অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তবে এই সম্বন্ধ সংস্থাপনের অবসর থাকে না অথচ এই হাড়মাসের অনিত্য খাঁচাটীকেই বা কাঁহাতক জানিয়া শুনিয়া বহন করা যায়! সত্য সত্যই এই নিত্য অনিত্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য যদি না থাকে আর এই সমতা যদি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে জীবনটা কি দুর্ব্বিসহ হইত!

জীবনের ঘটনা ধরিয়াই কথা বলি। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া সংসর্গ পরবশ যাহাদের সহিত যে সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়াছে, তাহাদের দেখিলেই সেই সেই সম্বন্ধানুকূল ভাবের স্বতঃই উদয় হয়। ইহা হইতেই রসের সৃষ্টি।

বলিতে পারেন কি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে দেখিয়া সুখ পাই কেন? যাহাকে ভালবাসি তাহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রতি শব্দ আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করে কেন? যাহাকে ভালবাসি তাহার অঙ্গস্পর্শে আমার সর্ব্ব-শরীর পুলকে নৃত্য করে কেন? যাহাকে ভালবাসি তাহার অধরসুধায় এত মধুর আস্বাদ পাই কেন? অবশ্য এক জনের ভিতরদিয়াই এই সকল আস্বাদ আমরা না পাইলেও, যাহার সহিত যে সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে তদনুরূপ রসাস্বাদন করিয়া থাকি। যদি সংযমের বিষম বেড়ায় এগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়—আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। আমি কিন্তু ছুটিয়া যাইব আমার প্রিয় বস্তুর দর্শনে—উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিব, যদি শুনিতে পাই আমার প্রিয়জনের মধুর শব্দ—হৃদয় পাতিয়া থাকিব আমার হৃদয়রঞ্জনের স্পর্শসুখ-লালসায়। ইহাতে আমার লজ্জা মান ভয় নাই—যে যাহাই বলুক না কেন এ পথে আমি ছুটিয়া চলিব।

এই আসঙ্গলিপ্সা যে শুধু আমার আছে আর যে কাহারও ছিল না এমন নহে। জীবের এ ভাব, ভক্তের এ ভাব স্বাভাবিক। সেও এমনি শারদীয়া পূর্ণিমারজনী। শরতের শশী পেঁজা তুলাছড়ান নীল আকাশের কোলে ভাসিয়া ধরা বক্ষে রজতশুভ্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিতেছিল। যমুনার কালোজল সে আলোকে পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। পুলিনে, অসংখ্য বৃক্ষের বিবিধ কুসুম—তাহার গন্ধ বাতাসে মিশিয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। বিহঙ্গকুল আকুল হইয়া কুজনে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। মদনমোহন শ্যামরায় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মোহন বাঁশী ফুকারিয়া সারা বিশ্বে মদনোন্মাদনার ভাব ছড়াইয়া দিতেছিলেন।

সে বাঁশরীর মধুর রাগিনী সেদিন মর্ত্ত্যবাসীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। শ্রীহরির সে আহ্বানে মাদকতা ছিল, আকুলতা ছিল। সে উদাস, আবেশবিভোর সঙ্গীত শ্রবণ মাত্রেই ব্রজের গোপীরা মত্ত কুরঙ্গিনীর মত যমুনার তটে উপস্থিত হইয়াছিল—মানে নাই লোক লজ্জার ভয়, আত্মসম্মান। সংসারের সব বাঁধন কাটাইয়া কিসের জন্য আসিয়াছিল, বলিতে পার? অনেকে রুচির দিক দিয়া এক আধ্যাত্মিক অর্থের সৃষ্টি করিবে; কিন্তু আমি বলিব তাহাদের আঁখিতারা প্রিয় পুরুষের মাধুরী সন্দর্শনে উন্মাদ হইয়াছিল—শ্রুতি, সে বাঁশরীর ধ্বনি দূর হইতে শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছিল না—অঙ্গ, সে বাঁশরী বাদকের শ্রীঅঙ্গস্পর্শ লালসায় এলাইয়া পড়িতেছিল—রসনা, সে শ্রীহরির অধর-সুধার পিপাসায় লালায়িত হইয়াছিল—বনমালীর অঙ্গসৌরভ ভোগের জন্য নাসারন্ধ্র, সবেগে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। কেন জান? শ্রীহরি যে পূর্ণ পরাৎপর পুরুষ; একাধারেই সকল বাসনার পরিতৃপ্তি সেখানে সম্পূর্ণভাবেই সম্ভবপর। সকল কামনার, সকল সুখের নিলয় সে শ্যামচাঁদ— তাঁহাকে যে জানিয়াছে, তাহার নিকট রুচির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইহা পুরাণের কথা। বাস্তব বলিয়া ইহাকে কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, ইহাই সাধনার প্রথমস্তর। সেই অনাহত আহ্বান সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, এই সান্ত শ্রীহরির চরণে শরণ লইবার জন্য যে না উন্মত্ত, তাহার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ।

আমরা জীব, আমাদের সকল সুখের অধিকার আছে—সে সকল ত্যাগ করিব কেন? যে আমার সকল কামনার, সকল বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটাইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছি।

গোপীরা যমুনার তটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন শুনিয়া মুগ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "ছি, ছি, কুলনারী হইয়া একি করিয়াছ। স্বামী সেবা, পিতা মাতা সেবা তোমাদের কুলধর্ম্ম। যাও, বাড়ী যাও। আমার বাঁশী শুনিয়াছ—ঐ দেখ যমুনা জোছনা মাখিয়া কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা—কি মনোহর কুসুমগন্ধে বনভূমি আমোদিতা—বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী কেমন সুধাবর্ষণ করিতেছে—সকলি দেখিলে, এখন বাড়ী যাও।"

মদনমোহনের এই চাতুরী অথচ যুক্তিপূর্ণ বচনে কতজন আবাসে ফিরিয়া গেল—গেল না তাহারাই যাহারা কিছু আছে বলিয়া বাহির হয়

আই, একবারে উন্মাদিনী হইয়া যাহারা বাহিরে আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের সর্ব্বস্ব তাহারা কিসের জন্য ফিরিবে? তাহারা কি সুন্দর উত্তর করিল—"হে মাধব! এ তোমার কেমন কথা? আমাদের আর কে আছে? তুমিই যে আমাদের সর্ব্বস্ব—আমাদের স্বামী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন—সর্ব্বস্বই যে তুমি। তোমায় ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। এস সখা, অবলার সর্ব্বস্বের অধিকারী, আর আমাদের বঞ্চনা করিও না, তোমার অধর সুধাপানে পরিতৃপ্ত হই।"

সব গোপবালার এই এক কথা। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী রাখিলেন—অনাসক্ত, অরূপ, অব্যয় ভগবান্ এই অনিত্য শরীরের সম্ভোগবিধান করিলেন। যখন গোপীরা তাহাদের চিরবাঞ্ছিত মদনানন্দে অলস, বিভোর, আত্মহারা—শ্রীভগবান্ পলায়ন করিলেন।

ইহাই সাধনার দ্বিতীয়স্তর। এই বাঁশী শুনিয়া যাহারা আসে, তাহারা ভগবানের চাটুবচন, তত্ত্বকথা মনে করিয়া আবার গৃহে ফিরিয়া যায়। কিন্তু যাহারা ভগবান্‌কেই সর্ব্বস্ব দিতে আসিয়াছে—অর্থাৎ যাহারা ভগবদ্ লাভের যথার্থ অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের পার্থিব ভোগ অনন্ত পুরুষের সংসর্গে চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। তাহারা ভগবান্ ব্যতীত আর কোথাও কোনও পুরুষের সহিত এ কামের চরিতার্থতা পায় না। সাধক এই অবস্থায় আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে। আত্মবিকাশ ঘটে বলিয়াই সাধক এই অবস্থাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবান্ এই সময়ে তাই পলায়ন করেন। সাধক ভগবান্‌কে দেখিতে না পাইয়া আবার দৌড়িতে থাকে—সাধনায় সে আরও অগ্রসর হয়।

শ্রীকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে গোপীদিগের সে কি বিলাপ—সে কি উন্মত্ততা! অনলে অনিলে জলে স্থলে লতায় পাতায় তখন শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ কেহ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া অন্য গোপবালাকে আবেগে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কেহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর অভিনয় করিতে লাগিল। অবতারগণও এই সব অভিনয় করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিরহে শ্রীকৃষ্ণানুভব এ ভাবও টুটিয়া যায়, তখন ভগবান্ স্থায়ীভাবে সকলের অন্তর আলোকিত করিয়া বিরাজ করেন। প্রতি গোপী তখন স্ব স্ব হৃদয়ে এই পরাৎপর পুরুষের অবস্থান সন্দর্শন করেন। সকল মলিনতা, সকল অশুদ্ধতা, কাটিয়া গেলেই জীবের হৃদয়ে রাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। যুগলরূপ দেখিয়া তোমরা কি ধন্য হইবে না? রাসলীলার জন্য তোমরা কি বাহির হইবে না?

পরিবর্ত্তন।

পরিবর্ত্তন জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আজ মানুষের ভিতর যে ইচ্ছা, যে প্রবৃত্তির জাগরণ পরিলক্ষ্য করিতেছ, কাল দেখিবে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কাল যাহাকে শিশু, নিরীহ ক্রীড়াকৌতুক ও পাঠশিক্ষায় রত দেখিয়াছ, আজ সে যৌবনোচিত উদ্যম, উৎসাহ, আকাঙ্খা, প্রতিভার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব রহস্য যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারাই যথার্থ নেতা, শিক্ষক, গুরু এবং নৃপতিরূপে জগৎ শাসন করিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তনের একটা স্বাভাবিক ক্রম আছে, ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই একদিনে বড় হইতে পারে না—এই ক্রম মানিয়া সকলেই মঙ্গলময়ের শুভ উদ্দেশ্যের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

মানুষের জীবনের মত জাতীয় জীবনেও এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আজ যে জাতি দুর্ব্বল, ভীরু, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর—সে যে চিরকাল এই ভাবেই কালাতিপাত করিবে—এইরূপ কখনই ঘটিতে পারে না। এ বিশ্ব বাস্তবিকই বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল।

এরূপ কেন হয়? প্রকৃতিদেবীই জগদ্‌বিকাশের আদি রাণী। প্রকৃতি নিত্য ক্রিয়াশীলা। তাঁর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরাম অক্লান্ত ছুটিয়াছেন। তাঁহার পূর্ণত্ব পুরুষের সম্মিলনে। এ মিলন না ঘটা অবধি তাঁর নিত্য নূতন বিকাশ। এই বিকাশই তাঁর অবিরাম গতির অভিব্যক্তি। তাই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

এই পরিবর্ত্তনের পথ দিয়া, প্রকৃতি পুরুষের অভিসারে গমন করেন। লতায় পাতায়, ফলেফুলে, জলে স্থলে, কাননে পর্ব্বতে, কীট পতঙ্গে, পশু পক্ষীতে জগতের যাবতীয় পদার্থেই পরিবর্ত্তনের খেলা দেখিতে পাইবে—এটা গতির লক্ষণ, প্রকৃতি রাণীর পদচিহ্ন। মানব তাঁর প্রধান যন্ত্র যাহা দিয়া তিনি চিন্তা করেন—সে চিন্তা পুরুষের, আনন্দময় মহাদেবতার, যাঁর

সম্মিলনে জগতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। মানুষের মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষের চিন্তা করেন, মানুষের মধ্যে থাকিয়া তিনি তাঁকে ভালবাসেন, মানুষের মধ্যে থাকিয়া তাঁকে নিত্যকালের জন্য হৃদয়ে ধরিবার বাসনা পোষণ করেন। তাই মানব শ্রেষ্ঠ, মানব মহামহিমান্বিত। তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন।—

"মন ভুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পড়ে, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।"

এই পুরুষকে পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য মানুষের মধ্যে স্মরণাতীত যুগ হইতে কত চেষ্টা হইয়াছে; কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে। মানুষকে লইয়াই এক একটা জাতির সৃষ্টি, সুতরাং জাতিগত কত পরিবর্ত্তন ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং বলিতেছে—এখনও যাহা গড়িতেছে, তাহা ভাঙ্গিবে, আবার গড়িবে, আবার ভাঙ্গিবে—কোনও খুঁত থাকিতে সনাতনের প্রতিষ্ঠা হইবে না এবং এই সত্যযুগের নূতন সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের ভাব, মানুষের চেষ্টা, মানুষের কার্য্য ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়াই চলিবে।

আমরা আজ যে যুগে অবস্থান করিতেছি, তাহা এইরূপ মহা পরিবর্ত্তনের যুগ। অতীতের মানব সমাজ, মানব সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভ্রান্ত সে, যে তাহার পদতলের মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। সাধক তাহাতেও আনন্দযুক্ত, কেন না সে নিরহঙ্কার—সে জানে প্রকৃতির হাতে সে পূর্ণ হইবার জন্য আবার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

হিন্দুর বিশ্বাস—ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয় আবাস; যুগ যুগান্তরের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর বিশিষ্টলীলা এইখানেই পূর্ণ প্রকট। অতএব হে ভারতের সাধকমণ্ডলী, আজ সমগ্র জগতের এই বিপুল পরিবর্ত্তনের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া হতাশ্বাস হইও না, পরন্তু উল্লসিত হও, কারণ সমগ্র বিশ্ব, সনাতনের পথে আজ দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে—প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভেদ ভাঙ্গিয়া স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে তৎপরা। শীঘ্রই এই যুগলরূপ দেখিয়া আমরা ধন্য হইব।

আমাদের লক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা অতিক্রমনেই প্রকৃত জ্ঞানের আরম্ভ। এ জ্ঞানের পথে বিচারই প্রথমে সহায়, বিচারই আবার শেষে অন্তরায়।

যখন সকল প্রয়াস নিষ্পন্দ হইয়া যায়, তখনই শক্তি বিকশিত হইতে থাকে। শক্তি-লাভের পথে চেষ্টাই প্রথমে সহায়; চেষ্টাই আবার শেষে অন্তরায়।

যখন সকল ভোগস্পৃহাকে অতিক্রম করিব, তখনই প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইব। আনন্দের পথে বাসনাই প্রথমে সহায়, বাসনাই আবার শেষে অন্তরায়।

অহং জনিত ব্যক্তিত্ব বোধ হইতে মুক্ত হও, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হইবে। এ মুক্ত ব্যক্তিত্বের পথে অহঙ্কারই প্রথমে সহায়, অহঙ্কারই আবার শেষে অন্তরায়।

বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব ছাড়াইয়া উঠ, প্রকৃত মানুষ হইবে। প্রকৃত মানুষ হইবার পথে পশুত্বই প্রথমে সহায়, পশুত্বই আবার শেষে অন্তরায়।

* * * *

বিচারলব্ধ জ্ঞান চাহি না। চাহি সহজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান প্রভায় জীবন উজ্জ্বল হউক। ইহাই তোমার লক্ষ্য।

যত্ন চেষ্টা প্রয়াস চাহি না। চাহি আত্মস্থ পুরুষের স্বতঃ প্রবাহিত নিত্য বিজয়ী শক্তি। তোমার সমস্ত জীবন শক্তিময় হউক। ইহাই তোমার লক্ষ্য।

কামনাতৃপ্ত সুখ চাহি না। চাহি আনন্দ—অপ্রতিহত, অপ্রচ্ছন্ন, আত্মরত আনন্দ। আনন্দে তোমাকে ভরপুর কর। ইহাই তোমার লক্ষ্য।

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বোধ বিসর্জ্জন দাও। সারা বিশ্ব লইয়া তোমার ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠুক। মানুষ দেবতা হউক। ইহাই তোমার লক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা পশুপতি হও। তোমার সমস্তই কৃষ্ণময় হউক। ইহাই তোমার লক্ষ্য।

* * * *

অসম্ভব বোধই ভাবী সম্ভাবনা উদ্বোধন করিয়া দেয়। আজ যাহা করিতে অকৃতকার্য্য হইতেছি, তাহারই মধ্য দিয়া কাল যাহা করিতে পারিব তাহাই দেখা দিতেছে। এই কালাবচ্ছিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিন অসম্ভববৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল বলিয়াই, অনন্তদেব স্বীয় সত্তা হইতে উহা সৃজন করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের অসম্ভববোধ ভবিষ্যতের বহু মহত্তর সম্ভাবনারই ছদ্মবেশী রূপ। উহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, কোন্ পথে আবার অগ্রসর হইতে হইবে, কোন্ স্থানে পৌঁছিতে হইবে।

মনুষ্যজাতির উন্নতি যদি তোমার ঈপ্সিত হয়, পূর্ব্বকল্পিত সকল সংস্কার বর্জ্জন কর। নব উদ্ভাবিত চিন্তাই নূতন সৃজনে সমর্থ।

মানবাত্মা নিজের কেন্দ্রটুকুর চতুর্দ্দিকেই শুধু ঘুরিতেছে না। চিরদীপ্ত, অক্ষয় জ্ঞানসূর্য্যকে বেড়িয়াই ইহার মহত্তর পরিক্রমণ।

প্রথমে আত্মস্থ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ কর। তার পর চিন্তা ও কর্ম্ম কর। প্রতি তেজোগর্ভ চিন্তামাত্রই এক একটী নূতন জগতের উদ্বোধন। প্রতি কর্ম্মই চিন্তার স্থূল বিকাশমাত্র। স্রষ্টার অন্তর্নিহিত আত্মচৈতন্যে কোন দিন এ বিশ্বের কল্পনা জাগিয়াছিল বলিয়া এই স্থূল জগতের অস্তিত্ব।

* * * *

চিন্তা আমাদের সত্তার চিরন্তন প্রকৃতি নহে বা উহার কারণও নহে। চিন্তা আমাদের অবস্থা বিবর্ত্তনের সহায় মাত্র। চিন্তা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়া দেয় আমরা তাহা করিতে পারি, চিন্তা আমাদিগের অন্তরে যাহা ব্যক্ত করে আমরা তাহা হইতে পারি। এই বিশ্বাসই হৃদয়ে দৃঢ় কর। ভগবান সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজিত।

মানুষে যাহা চিরকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি আমাদের কার্য্য নহে। নূতন নূতন তথ্যের বার্ত্তা বহিয়া আন, অকল্পিত বিষয়ে বিজয় লাভ কর। কাল ও জগৎ আমাদের ক্ষেত্র, দিব্যদৃষ্টি, সৃজনকারী কল্পনা ও অপরিসীম আশা আমাদের পরিচালক, শক্তি চিন্তা ও শ্রম আমাদের অব্যর্থ আয়ুধ।

নূতন করিয়া কি কিছু আমাদের সাধন করিবার নাই? প্রেম বলিয়া আমরাত শুধু ঈর্ষা ঘৃণা ও অহংতুষ্টিকে আলিঙ্গন দিয়াছি; জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিকেই পোষণ করিয়াছি; আনন্দের পরিবর্ত্তে সুখ দুঃখ ও উদাসীনতা-

কেই বরণ করিয়া লইয়াছি ; শক্তির নামে দুর্ব্বলতা, প্রয়াস, ব্যর্থ বিজয়ের গৌরবই অর্জ্জন করিয়াছি ; জীবনের পরিবর্ত্তে জন্ম, বন্ধন ও মরণের পথেই চলিয়াছি ; ঐক্য ছাড়িয়া সংগ্রাম ও সঙ্ঘ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি।

প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি, জীবন, ঐক্য—এক কথায় দেবত্ব, সকলই জগতে নূতন। মানুষ এই সকলেরই সাধনা কর। মানুষ, তুমি দেবতা হও। ধরণী ত্রিদিবে পরিণত হউক।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

আমরা এই প্রবন্ধে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিষয়টী অতিশয় জটিল এবং এসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু বলিতে যাওয়াও সুবিধাজনক নহে, কেননা সাধারণে হয়ত আমাদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন। সেই জন্য আমরা এই বিষয়ের মূল তত্ত্বটী ভাবরাজ্যের সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব, বলা বাহুল্য, ব্যবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই, কেননা রাজনীতি উপস্থিত আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল প্রমুখ দেশের রাজনীতিবিৎ নেতৃবৃন্দের উপর ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত রহিলাম, আমরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা থাকিলে সাধক উত্তরোত্তর তাঁহার যোগমার্গে উন্নতিলাভে সক্ষম হইবেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা পাঠকবর্গকে প্রথম হইতেই বলিয়া রাখিতে চাই যে যেসকল বিষয় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের যোগ-সাধনের সহায়, সেই সমস্ত বিষয় ছাড়া আমরা অবান্তর কোন কথারই আলোচনা করিব না ; অনেকস্থলে হয়ত সাধনার সহিত সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের আশা আছে যে যথাসময়ে সাধকের হৃদয়ে সত্য আপনা হইতেই প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আজ হঠাৎ এই বিষয়ের আমরা কেন অবতারণা করিতেছি, সেই সম্বন্ধে আমরা কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দেশ, কাল ও পাত্র উপযুক্ত না হইলে কোন ভাবই প্রকৃত কার্য্যকরী হয় না এবং আমরাও সত্যযুগের পূর্ব্বসূচনা অনুভব করিতে না পারিলে, আজ এই ভাব প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতাম না। জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠায় এবং সত্যযুগের সঙ্ঘমধ্যে ভারতের স্থান কোথায় তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। আমরা যে দেশবিচার করিয়া এই ভাব প্রচার করিতে যাইতেছি তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। এই ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত নানারূপ ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও শ্রীভগবানের লীলার স্মৃতি সমূহ নিজবক্ষে ধারণ করিয়া রাখিযাছে—'সে রামও নাই, সে অযধ্যাও নাই' বটে, কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে এখন পর্য্যন্ত বাল্মিকী রচিত রামায়ণ পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য করিতেছে, এখনও 'পঞ্চবটী' 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতিস্থান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্ররূপে আমাদের নিকট তীর্থস্থানরূপে পূজিত হইতেছে; আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসকে ভুলিতে পারি নাই—আজ এই ইউরোপের মহা কুরুক্ষেত্রের দিনে স্বতঃই আমাদের মনে দ্বাপরযুগের শেষঅঙ্কের অভিনয়ক্ষেত্র 'ধর্ম্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের কথা মনে উঠিতেছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের ধারনা বা প্রচার করিবার উপযুক্ত দেশ (কর্ম্মক্ষেত্র) এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বর্ত্তমান জড়বাদমূলক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্য মহাদেশ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে চতুর্দ্দিক বৈদিক স্তোত্র-গীতিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ বেদ, উপনিষৎ, ষড়-দর্শনের জন্মভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা বেদোক্ত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সর্ব্বপ্রথম এই ভারতবর্ষেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত ভারতের প্রতি ধুলি কণায় সেই সমস্ত সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল কারণেই আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষকেই এই সমস্ত সত্যপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে করায় আমাদের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় নাই।

এইবার আমরা কালদোষ বিচার করিব। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে কোন মহৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কালপ্রতীক্ষা করিতে হয়, অসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। প্রকৃতিতেও আমরা এই সত্য প্রস্ফুট হইয়াছে দেখিতে পাই—অসময়ে উর্ব্বরক্ষেত্রে

বীজবপন করিলে কোনই ফললাভ হয় না। সেইজন্য এই কালবিচার কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যে আমরা 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আলোচনা কালবিচার না করিয়া আরম্ভ করিনাই। আমাদের মতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সম্বন্ধে ভাবপ্রচারের উপযুক্ত কাল সমাগত, এই সুযোগ অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে আর এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ঘুরিয়া আসিবে না। কি কারণে আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও জগতের অবস্থা একটু আলোচনা করিতে হইবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে সত্য বটে এবং নানারূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা ভারতবাসীকে উদ্যোগী হইয়া কর্ম্ম করিতে দেখিতেছি ইহাও ঠিক ; কিন্তু এখনও আমরা জোর করিয়া এমন কথা বলিতে পারি না, যে আমরা সিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। গত এক বা দেড় বৎসরের মধ্যে কতকগুলি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া লইতে বাধ্য হইল, কত স্বদেশী অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল, বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলের অবস্থাও শোচনীয়—এই সমস্ত নিষ্ফলতা কি শিক্ষা দিতেছে ? যাহাদের ভাব আছে তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে উপযুক্ত সাধনার অভাবে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় নাই বলিয়াই এই সমস্ত সদনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া গেল। একথা আমরা অস্বীকার করি না যে প্রথম অবস্থায় নিষ্ফলতার মধ্য দিয়াই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, নিষ্ফলতায় আমাদিগের যা শিক্ষাকরিবার আছে, তাহা শিক্ষা করিতে না পারিলে কেবল ভুলচুকের মধ্যদিয়া দিন দিন ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতে হয়। ভারতবাসীর মনে ভাব জাগিয়াছে—সেই ভাব, সাধনার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করার অভাবে এই দশ বৎসরের বহু সদনুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে। যে জাতীয় চরিত্রের অভাবে এই নিষ্ফলতা তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত জাতীয় জীবনের ২য় অধ্যায় আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে—ভবিষ্যতই সেই চরিত্র গঠন করিবে বলিয়া, আমরা আজ এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আভ্যন্তরীণ অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে জাতীয় সাধানায় এই সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিবার কাল সমুপাস্থত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিয়া এই সত্য প্রতিপন্ন

করিতে চেষ্টা করিব। ইউরোপে আজ যে মহাকুরুক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহার ফলে আজ সমস্ত জগত আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইতেছে সেই মহাযুদ্ধের কি কোনই শিক্ষা নাই? দ্বাপরের কুরুক্ষেত্রের ফলে এই জগত গীতামৃত আস্বাদনে অধিকারী হইয়াছে, এই বর্ত্তমান মহা কুরুক্ষেত্রের ফলে জগতের সম্মুখে কি কোন মহাসত্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে না। এই সৃষ্টিতে যখন কোন কার্য্যই লক্ষ্যহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে না, সকল কার্য্যের মধ্যেই যখন মঙ্গলময়ের মঙ্গলনীতি আনন্দ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে তখন ইহা কিরূপে সম্ভব, যে এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞরূপ জগত চক্রানুগমন ব্যাপারে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা নিহিত নাই? অবশ্যই আছে। শ্রীগীতায় আমরা দেখিয়াছি যে দ্বাপরের রণক্ষেত্রে যেখানে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধার্থে ব্যূহরচনা করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া দণ্ডায়মাণ, সেই কুরুক্ষেত্রে রণরঙ্গিনী মায়ের তাণ্ডবলীলাভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তকেই শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত সত্যপ্রচারের উপযুক্ত কাল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আজ এই জগতব্যাপী মহাপ্রলয়ের অনুষ্ঠানের কালই 'সত্যযুগধর্ম্ম' আলোচনা করিবার উপযুক্ত কাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। জড়বাদমূলক সভ্যতা যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহকে উপেক্ষা করিয়া স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না, আত্মাতেই যে জড়জগতের স্থিতি এই সত্য আজ এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি সময় থাকিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই মহাসত্য স্বীকার করিয়া লইয়া পাশ্চাত্যকে শাশ্বত শান্তির অধিকারী না করে, তাহা হইলে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ড এক মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে এবং ধ্বংসের দ্বারা পুরাতনের আবরণ অপসারিত হইলেই নূতন আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। এবারে যে কেন এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহার কোনই কারণ নাই। যাহাতে এই ধ্বংসযজ্ঞের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের আবির্ভাব হয় এবং জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য এখন হইতে তদুপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভাবজগতে তাহার সংরক্ষণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের নিকট 'ভারতের ভবিষ্যৎ' ও 'জগতের ভবিষ্যৎ' একার্থবোধক, কেননা এই আগত নবযুগে জগতের স্বার্থই ভারতের স্বার্থ। বলা বাহুল্য, যে সেই জন্য কালাকাল বিশেষভাবে বিচার করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ, আমরা পাত্রাপাত্র বিচার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতে এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন—যখন ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্বালোকচ্ছটায় উদ্ভ্রান্ত ও সম্মোহিত, ঠিক সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের সনাতন আদর্শ সংরক্ষণ করিয়া যান। আমরা আজ তাহাদের কার্য্যের সুফল প্রত্যক্ষ করিতেছি—আজ আমাদের ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ নিষ্কামভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে শিখিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে এই সেবাই সকল সাধনার মূল, আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে ইহাই সাধনার উচ্চতম অবস্থা কিন্তু ইহা যে সকল সাধনার ভিত্তি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতীয় যুবকবৃন্দ আজ সেই সেবাভ্যাসের দ্বারা সংযত ও পূতচিত্ত হইয়াছেন এবং যুগাবতারের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া জগতে ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনরূপ গুরুভার স্কন্ধে বহন করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। উপযুক্ত আধার, উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র ও অনুকূল কাল—বর্ত্তমানে এই তিনের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে, এক্ষণে কেবল শক্তিবীজ বপনেরই অভাব। আমরা আজ শ্রীভগবানের আদেশে তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ হইয়া ফলাফল তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া এই ভাব প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। সেইজন্য এই 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আলোচনা।

আমরা আজ যুগপরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, এ সময়ে বর্ত্তমানে শক্তির বহিঃপ্রকাশ হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করা একবারেই অসম্ভব। এক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, মানবীয় বুদ্ধির এমন শক্তি নাই যে এই লীলা বৈচিত্রের মধ্যে সে যুক্তি বিচার সহায়ে পরা প্রকৃতির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এযুগ সাধকের যুগ, এযুগে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী 'কবি'ই ('Seer') ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা এবং তিনিই ভগবানের বাণী প্রচারক। যাঁহাদিগকে অস্থিরচেতা কাল্পনিক ('Impatient idealist') বলিয়া সাধারণে উপেক্ষা করিতে অভ্যস্থ, আজ কালের বিবর্ত্তনে তাঁহাদেরই চিত্তপটে ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহাই সম্ভব হইবে—যেখানে দুর্ব্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি প্রবল সেখানে ভবিষ্যতে 'সাম্য' 'মৈত্রী' প্রভৃতি একতামূলক ভাব সমূহ স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হইবে

এবং আজ আমরা যেখানে একতা বা পরিপূর্ণতা (perfection) দেখিয়া চমকিত হইতেছি, সেস্থান অচিরে চিরদ্বন্দের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, আমরা ভারতবর্ষ ও ইউরোপের কথা বলিতেছি। ভারতবর্ষের যাহা কিছু দুর্ব্বলতা তাহা মজ্জাগত নহে, তাহা অজ্ঞানপ্রসূত আবরণ মাত্র। অন্যপক্ষে ইউরোপ অহঙ্কার বশে আধ্যাত্মিকতাকে বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া তাহার এই রাজসিকতা মজ্জাগত। ইহা সহজে দূর হইতে পারে না এবং ইহা বর্ত্তমানে দূর হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এই ইউরোপ ব্যাপী মহাযুদ্ধের অবতারণা এবং সেই জন্যই আজ আমরা, এই মহাসমরের শেষ অঙ্কাভিনয়ের পূর্ব্বে যাহাতে সন্ধি স্থাপন না হইতে পারে, তজ্জন্য সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিতেছি। যতদিন না এই মজ্জাগত অহঙ্কার দূর হয় ততদিন এই মহাসমরের নিবৃত্তি ঘটিবেনা এবং সম্মিলিত শক্তিবৃন্দ রাজনৈতিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা অলক্ষিত ভাবে এই অহঙ্কার ধ্বংসের সহায় হইয়া ভবিষ্যতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার পন্থা সুগম করিয়া দিতেছেন বলিয়া, আজ আমাদের চিত্ত তাঁহাদের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা এইবারে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এই মহাযুদ্ধের অবসানে জগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সে যুগে এসিয়ার আধ্যাত্মিকতা ও ইউরোপের জড়বাদ, এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে এক মহান্ আদর্শ গঠিত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্য যে আধ্যাত্মিক জগৎ ও জড় জগৎ এক পরমব্রহ্মেরই বিকাশ; সেই হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকা সাধকের উচিত নহে। কিন্তু এতদিন দুই ধারা বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আবার তাহারা 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই দুই মহাসত্য নূতন ভাবে প্রচার করিবে। আজ ১৫০ বৎসর ধরিয়া এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ ইউরোপের পদতলে বসিয়া পাশ্চাত্যকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়া তাহার নিকট জড়বাদের শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং নিজের আধ্যাত্মিকতার তুলাদণ্ডে তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিয়া বুঝিয়াছে—যে তাহাও সেই মহাসত্যেরই একদিক। 'আদান' ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, ভবিষ্যতে ভারতের 'প্রদানের'

যুগ আসিতেছে—এই সমাগত সত্যযুগে আধ্যাত্মিকতা-বুভুক্ষু ইউরোপ যখন ভারতবর্ষকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া লইবে, তখন ভারতবর্ষ যাহাতে ইউরোপের আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে সক্ষম হইতে পারে, সেই জন্য আজ এই হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সাধনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্য আজ দাক্ষিনাত্য প্রবাসী 'ঋষি' তত্ত্বজ্ঞানবলে বেদের অধুনা লুপ্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাশী পুনরাবিষ্কারে প্রয়াসী। এইযে চতুর্দ্দিকে জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে আমরা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানযুগের ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এক অভিনব সাধন বল সহায়ে ভারতবর্ষ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইবে। যতটা পরিমাণে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য উপায় অবলম্বন করিয়া, এই যুগের মূল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা পাইবে, ততটা পরিমাণে ভারতবর্ষ ইউরোপকে বুঝিতে সক্ষম হইবে মাত্র, তাহার জগতকে উদ্ধার করিবার যে শক্তিধারা তাহা অন্যত্র প্রবাহিত হইতেছে। সাধন সহায়ে সেই শক্তি কেন্দ্র বাহির করিয়া জগতকে উদ্ধার করিবার ভার আজ আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা আজ সেই ভবিষ্যৎকে আবাহন করিবার জন্য বসিয়া আছি—যখন ভারতবর্ষ পুনরায় জগতে প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিবে। ভারতকে দীক্ষাগুরুরূপে মানিয়া লইয়া, তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া, তাহার পদতলে বসিয়া জগৎ আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা করিবে, এবং তৎসহায়ে নিজেদের অহঙ্কার পদতলে দলিত করিয়া দৈবীভাবে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। সেই যুগ সমাগত; আসুন পাঠক, আমরা যথারীতি সেইযুগের আগমনী গান করি।

পাগলের চিঠি।

কিছুতেই দেখ্‌ছি আমায় তোমরা তোমাদের সংস্রব ত্যাগ কর্‌তে দেবে না। আমি যে দিন দিন স্থানু হয়ে যাচ্ছি, সে খবর বুঝি তোমরা রাখ না। মুখ ত প্রায় বন্ধ হয়েছে। হাতের লেখাও ত আর বার হতে চায় না। তোমাদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে এক নিঃশ্বাসে কিছু লিখে দিতে বাধ্য হলুম।

দেখ, যত তোমাদের ভিতরে সম্পূর্ণতা আস্‌বে, ততই বুঝবে জগৎটা খেলার সামগ্রী। ছেলের খেলার ঝোঁক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে খেল্‌নার মোহে থাকে। ঝোঁক শেষ হলে খেল্‌না ফেলে স্থানান্তরে চলে যায়। আমরা যা কচ্ছি সবের ভিতর একটা ঝোঁক আছে, এ ঝোঁক চির-কালের নয়, সাময়িক, এ কথাটী বুঝে রেখো।

মানুষ হতে গেলে খুব যে চেষ্টা চরিত্র করে কিছু হওয়া যায়, একথা ভুল। ভগবান্ যাকে মানুষ করেন, সেই মানুষ হয়। ভগবানের হাতে সমস্ত ছেড়ে দাও, দেখ্‌বে যা হবার তাই হচ্ছে, যারা মানুষ হবার তাদেরই এ বিশ্বাস হবে।

আর এক কথা মনে রেখো—খুব নিরীহ হলেই মানুষ হওয়া যায় না। তোমাদের ধারণা, হিসাবের খাতায় "আমায় দে মা তবিলদারী" লিখ্‌লেই বড় রকমের মানুষ হওয়া যায়। হিসাবের কড়ি গুলিয়ে ফেলা, খাতায় কৈফিয়ৎ কেটে প্রতিদিন দু আনা দশ আনার গরমিল করা, মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়, অবশ্য সময়ে সময়ে কোনও বিশিষ্ট ভাবের তন্ময়তায় ঐরূপ ঘট্‌তে পারে। কিন্তু সেইটাই শ্রেয়ঃ নহে। এগুলি সব দিক দিয়ে অসম্পূর্ণতার লক্ষণ। এ যুগের মানুষকে চৌকোশ হতে হবে। পাছে অহঙ্কার ফুটে ওঠে সেইজন্য পূর্ব্বেই ভগবচ্চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পনের কথা নবযুগের অবতার প্রচার কর্‌ছেন। মানুষ—সে সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে, ভিতরে বাহিরে সব দিকেই। ভিতর যত পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, বাহিরের কার্য্য তত সাফাই হবে।

ভিতরের বড় জিনিষটা হচ্ছে মন। সে এত ব্যস্ত কাজের লোক যে অহঙ্কারে ফেটে পড়্ছে। সে সব জান্তা। তাকে জব্দ কর্তে পার? অর্থাৎ তার ঐ কর্তৃত্ব অভিমানটা কিছু দিন কমিয়ে দিতে পার? জান ত আতসী কাঁচের ভিতর দিয়া সূর্য্য কিরণ আনয়ন করিলে, সে আলোকে খড় কুটো পুড়ে যায়, তার মানে বিস্তৃত সূর্য্যরশ্মিকে এক কেন্দ্র মধ্য দিয়ে আনয়ন করিলে, তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়। মনকেও চতুর্দ্দিক হইতে গুটাইয়া তার অসীম কার্য্যকরী শক্তিকে একদিকে আরোপন কর, দেখিবে সে কত বড় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বাজে কাজে মন দিলে চলিবে না—মন দিবার জিনিষ যদি থাকে ত সে ভগবান্। দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া এই ভগবানে মন দিয়া কিছু দিন পড়িয়া থাকিতে পার? তবে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। দেখ ভায়া, অনেকের ধারণা এ কার্য্যটা বড় কঠিন; যোগী ঋষি না হলে এরূপ কার্য্য বুঝি করা যায় না। সংসার কর্লে সব ভেস্তে যায়, আমি এ কথা স্বীকার করি না। তবে সংসারীকে একটু বেশী খাট্তে হয়, কেন না সংসারীর সাধন পথে খোঁচা অনেক। সাধ করে সে এই সব খোঁচর সৃষ্টি করেছে, অথবা পূর্ব্বসংস্কারের দায়ে সে এই অনর্থক বোঝা মাথায় তুলেছে। যতক্ষণ পার ভগবানে মন অর্পণ করে থাকা চাই। পিছল রাস্তায় পড়ে উঠা বাহাদুরী, না সামলে চলা ভাল, এ কথা তোমরা অনায়াসে বুঝতে পার।

এ খাটা অর্থে মানুষের অমানুষিক চেষ্টা মনে করোনা—তবে সঙ্কল্পটা আন্তে যে গোলমাল সেইটাকে আমি খাটা বল্ছি। একবার সঙ্কল্প যদি দৃঢ় হয়, তা কে জানে সংসারী, আর কে জানে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, তার আর পতন নাই।

ভিতরের অশুদ্ধতা যতই ভগবান্ বাহির করে দিবেন, ততই তোমার অস্থিরতা আস্বে। এই অস্থিরতাকে দ্বন্দ্ব বলে। ভিতরের সম্পূর্ণ গলদ্ নিষ্কাষিত হতে অনেক বিলম্ব হয়, অথচ পূর্ণ শুদ্ধি না আস্লে জীবের ভগবদ্দর্শন হয় না, সেই জন্য তোমার অসাধারণ ধৈর্য্যের আবশ্যক। মনে রাখ্তে হবে, যে তুমি অমর, এ ধারণা না জন্মালে তুমি সাধনাই কর্তে পার্বে না। অনন্ত জীবন তোমার সম্মুখে; সুতরাং ভিতরের অশুদ্ধতা যতই ধীরে-ধীরে বাহির হউক না কেন, তুমি অসীম ধৈর্য্যসহকারে অনায়াসে আধার

যন্ত্রকে অটল রাখবে। যে যত শীঘ্র কাজের যোগ্য হবে, তার তত বেশী দ্বন্দ্ব, কেননা তার ভিতর থেকে ভগবান্ খুব শীঘ্র শীঘ্র গলদ সমূহ বাহির করিয়া দেন। passenger train আর mail train একই রাস্তায় উভয়েই যায় বটে, কিন্তু mail শীঘ্র যায় বলে তার গতির জোর কত।

গলদ অনেক রকমের—একটা অনাবশ্যক মিথ্যা কওয়া থেকে ব্যাভিচার পর্য্যন্ত। এর ঠিকানা তোমায় করতে হবে না, ভগবান্ নিজেই যখন তোমার ভিতর থেকে কার্য্য করবেন, তখন ওসব ভাবনার তোমার দরকার নাই। ভাবনা কেবল একটী রাখবে যে তুমি ভগবান্‌কে সর্ব্বস্বই দিয়েছ তোমার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক—এটা মনে রাখাই বিষম ভাবনা। এটা অবিরাম কেমন করে মনে রাখবে তার ভাবনা নিরবধি তোমার করা চাই। এই চিন্তা ধারাবাহিক হলেই, বুঝবে মন তোমার বাঁধা পড়েছে, সঙ্কল্পও দৃঢ় হয়েছে।

যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে চিঁড়ে কুটছে। এক মাগী ধান ভান্‌ছে, সেঁকেল দিচ্ছে, পয়সার হিসাব কচ্ছে, ছেলে কাঁদ্‌চে তাকে টেনে মাই দিচ্ছে, কিন্তু হাত ঠিক চল্‌ছে, ঢেঁকির মূষল হাতে পড়্‌ছে না—কেন না এই সব কাজের ভিতরেও দৃষ্টি আছে তার মূষলের দিকে—তা না হলে হাত যে ছেঁচে যাবে। মানুষকেও তাই করতে হবে, চোখে দেখছে, কাণে শুন্‌ছে, হাতে কাজ কর্‌ছে, পায়ে চলে বেড়াচ্ছে, মন কিন্তু পড়ে আছে ভগবানে। তা না হলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মন যদি এমনিতর বাঁধা পড়ে, তবে আর সব যন্ত্র আপনা আপনি থেমে যাবে। কলের ইঞ্জিন ঘর যদি না চলে, তবে তাঁতঘর, নলীঘর সব বন্ধ হয়ে যায়, সেই রকম মন ভগবানের পাদপদ্মে স্থির হ'লে, সব স্থির হয়ে যাবে।

এরূপ স্থির হয়ে যাবে বলে, মনে কর না যে তুমি জড়পিণ্ড হয়ে যাবে। যে ভগবানকে তুমি সব দিচ্ছ, তিনি নিজেই অস্থির, পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি একমুহূর্ত্তও নিশ্চেষ্ট নহেন—অতএব তোমার জড় হবার ভাবনা কেবল কল্পনা মাত্র। তুমি ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব সমর্পন করলে, এই হবে যে তিনি তোমায় তাঁর পথেই ভাল রকম চালাবেন। শরীর যন্ত্র তখন তাঁরই নির্দ্দেশ মত চলতে থাকবে; এতদিন সে তার ইচ্ছামত বিপথে চল্‌ছিল, তাকে থামিয়ে মোড় ফিরিয়ে নিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা

আরও দ্রুতগতিতে সে চল্‌বে, কেন না মনের চেয়ে ভগবান্ শরীর যন্ত্রের সন্ধান অধিক রাখেন, কোন্ কল টিপ্‌লে কি কার্য্য হবে সে ভগবান্ যতদূর জানেন, তোমার সর্বজান্তা মন তত নিশ্চয়ই জানে না। ঐ আমার এক কথা, প্রভুত্ব পরায়ণ মনদেবতাকে ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করাতেই হবে। প্রাণ শক্তিই মনের মস্ত অনুগত খোসামুদে ভৃত্য। সে একদিকে ভৃত্যও বটে, আবার প্রভুও বটে। সে অনেক সময় মনকে যথেচ্ছাচার খাটাইয়া লইতে ত্রুটি করে না। প্রাণের কার্য্য জান ত? ল্যাংড়া আম খাবার ইচ্ছা থেকে স্বর্গের অপ্সরাভোগের বাসনা পর্য্যন্ত তার ভিতরে অবস্থান কর্‌ছে। সে যতই কেন হরেক-রকমের তরঙ্গ তুলুক না কেন, মন যদি তাতে সাড়া না দেয় তার বেগ স্বভাবতঃ কম হবেই। ঐ যে বল্‌লুম স্বাভাবিক ভাবেই তার বিকারগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রাণ রোধ কর্‌বার আর তোমার স্বতন্ত্র চেষ্টা কর্‌তে হবে না। তার পর চিত্তের কথা—প্রাণ যদি বাসনামুক্ত হয়, চিত্ত আর কিসের নেশায় মাত্‌বে। মদের ভাঁটি বন্ধ কর্‌লে, মাতাল হবে কিসে? চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হলে বুদ্ধি স্থির হবে। বুদ্ধি স্থির হলে বুঝ্‌বে তোমার সাধনা খুব অগ্রসর হয়েছে। এই অবস্থায় সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, মানে অপমানে, লজ্জায় ভয়ে সাধক আর বিচলিত হয় না। বুদ্ধি স্থির কর্‌তে পারলেই সমতা আস্‌বে। সমতা না আসা পর্য্যন্ত তোমার দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সাধন চালাতে হবে। বোম্বাই না পৌঁছান পর্য্যন্ত বোম্বাই মেলের আর নিস্তার নাই—ঘ্যাচ্, ঘ্যাচ্, ঘ্যাচ্, অবিশ্রান্ত তাকে চল্‌তেই হবে।

তবে ভায়া আজ এই পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতে আবার সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছা রইল।

পুরুষের আনন্দ।

ব্রহ্ম যদি শুধু নিরাকার ও নির্গুন হইতেন, এবং আমাদের বাস্তব সত্তাকে আপাত আমরা যেরূপ বোধ করি, চিরযুগ যদি তিনি তাহার বিরোধী হইতেন, নির্ব্বাণই জগতের প্রকৃত পরিনতি দাঁড়াইত। কিন্তু প্রেম, আনন্দ এবং আত্মজ্ঞানকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

এ বিশ্ব শুধু গণিতশাস্ত্র নয়, যে সংখ্যা ও রাশি নামক কতকগুলি নিরাকার-মানস-বস্তুর মধ্যে সমন্ধ আবিষ্কার করিয়া, শেষে একটা শূন্য বা মূল্যহীন রাশি বাহির করিতে হইবে; সেইরূপ ইহা কতকগুলি শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জড়বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া মাত্রও নহে। এ বিশ্ব আত্মপ্রেমে বিভোর প্রেমিকের আনন্দ, শিশুর খেলা, অনন্ত সৃষ্টি শক্তির আনন্দে আত্মহারা কবির অনন্ত আত্মমূর্ত্তি।

পরম পুরুষ যেন একজন গণিত শাস্ত্রবিদ—সংখ্যার সাহায্যে বিশ্বরূপ অঙ্কের সমাধানে নিমগ্ন, অথবা তিনি যেন একজন মনীষী—পরীক্ষা দ্বারা বস্তু ও শক্তিনিচয় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসায় নিরত। শুধু এইভাবে তাঁহার বর্ণনা শেষ করিলে চলিবে না। তিনি প্রেমিক, বিশেষ ও বিশ্বজনীন, সঙ্গীত সাধনে নিরত, তিনি শিশু, তিনি কবি। শুধু ভাবের দিকে চাহিলেই চলিবে না, রসাংশকেও আমাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। ভগবদানন্দের অমৃত শ্বাসে পরিপূর্ণ না থাকিলে ভাব, শক্তি, বস্তু, তত্ত্ব—সকলই অন্তসারশূন্য আধার মাত্র।

এ সকলই চিত্রমাত্র, সর্ব্ব বস্তুই প্রতিরূপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভাবের দ্বারা বিশুদ্ধ ভগবদ্ তত্ত্ব ধারণায় আনিতে পারি, রসাশ্রিত রূপের সাহায্যে ভগবান্‌কে জীবন্তরূপে অনুভব করিতে পারি।

চিন্ময় শক্তি জগতের মূল তত্ত্ব বটে, কিন্তু পুরুষের আনন্দই এই চিৎ-শক্তির আদি কারণ। অনন্তদেব অনন্তভাবে আপনার ভিতরে আনন্দের কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া জগদ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুরুষের চিৎশক্তি এবং আনন্দই আদি কারণ এবং ইহারাই আবার জগতের চরম পরিনতি। অজ্ঞানতা জ্ঞানের মধ্যপথের মূর্চ্ছাবস্থা বা উহার তমোময় ভাবের সুপ্তভাব মাত্র। শোক, দুঃখ, মৃত্যু অন্যত্র অন্যভাবে আপনাকে পাইবার জন্য পুরুষের আনন্দেরই মূর্ত্যান্তর মাত্র।

পুরুষের আনন্দ কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন নহে। এ আনন্দ আদি হীন, অন্তহীন। ভগবান এক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন মাত্র।

ভগবান তবে কি?—ভগবান চিরযুগ ব্যাপী ক্রীড়াক্ষেত্রে, চিরলীলায় নিরত চিরযুগের শিশু।

সহজ কথা।

যে বস্তু জীবনের চরম সাফল্য তাহা সহজ এবং সরল নহে, এইরূপ ধারণাই মানুষকে বাঁকা পথ অবলম্বন করায়। ভগবান্—যাঁহাকে কোটী কোটী জন্ম তপস্যা করিয়াও মুনি ঋষিগণ জ্ঞানগম্য করিতে পারেন নাই, তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যাঁহার আদিহীন তত্ত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, তিনি কেমন করিয়া সহজ ও সরলভাবে মানুষের বোধগম্য হইবেন? তাই তাঁর জন্য অতি কঠোর সাধন অবলম্বন করিতে হয়, জন্ম জন্ম তপস্যা করিতে হয়, সকল ভোগ দূরে রাখিয়া অরণ্যবাসী হইতে হয়, ইন্দ্রিয়জয়ী হইবার জন্য হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ জিহ্বা প্রভৃতিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, উপবাস করিতে হয়, জপ হোম, যাগযজ্ঞ কতবিধ উপায় এবং অনুষ্ঠান যে অবলম্বন করিতে হয়, তাহার নিরাকরণ করা যায় না।

একদিন স্বপ্নযোগে একজন তপস্বীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাঁহার মাংসপেশীশূন্য অস্থিচর্ম্মসার শরীর এখনও আমার নয়ন সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। তিনি পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছেন, মাথার চুল জটিল [illegible] ওষ্ঠ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ খড়িময়। কত বৎসর, কত যুগ তাঁহার [illegible] গিয়াছে, তিনি এখনও ভগবানের ধ্যান-নিরত। [illegible]য়া জানিলাম, তাঁহার এখনও ভগবদ্দর্শন হয় নাই, [illegible] উদ্দেশ্যেই তিনি যোগনিরত। আমি শুনিয়া [illegible] ভারতবর্ষটাই আমার এইরূপ মনে হইল, [illegible] জগতের সমস্ত উপদ্রবের বাহিরে এক

ভগবান্‌কে আমরা যখনই কোনও গণ্ডীবদ্ধ মনে করি, তখনই সাধনার পথ জটিল এবং উৎকট হইয়া উঠে। তিনি যে অতি সরল এবং সহজ এইটা আমাদের ধারণায় আসে না অথচ হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছে তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তিনি ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত, সকল যত্ন চেষ্টার বহির্ভূত। তিনি আছেন। সর্ব্বত্র আছেন। সর্ব্ব কর্ম্মে আছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য কিছুই করিতে হয় না, এইটা যখন আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে আঁকিয়া বসে, তখনই এই সত্য ভাসিয়া উঠে, জীবের অন্তরে তিনি অনন্ত ভাবে, রসে, রূপে বিকশিত হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টা করিয়া যখন আমরা বিফল মনোরথ হই, বহু জন্ম কঠোর তপস্যায় যখন আমরা হতাশ হইয়া কোন্ অজ্ঞানিত মহাদেবতার উদ্দেশে আকাশের দিকে চাই, তখনই তাঁহাকে আমরা পাই, অন্তর্দেবতার সমস্তটাকে এই দুটো বাহু দিয়া তখন জড়াইয়া ধরি।

এক্ষণে কথা হইতেছে, আমাদের তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টার কি ত্রুটি হইয়াছে, তপস্যার কি অভাব হইয়াছে, সাধনার কি শেষ হইতে বাকি আছে? হে ভারতের ঋষি পুত্রগণ! তোমরা কি পুণ্যভূমি ভারত বর্ষে এই প্রথম জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমাদের অতীত জীবনের কঠোর তপস্যার কথা কি স্মরণ নাই? জগতের কোন্ দেশ তোমাদের মত ভগবৎ লাভের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিয়াছে? তোমরা না করিয়াছ কি? স্থূল শরীরের সমগ্র মর্ম্মবোধের জন্য অতি কঠোর হঠযোগ [redacted] জীবনের সূক্ষ্মশিল্প অবগত হইবার জন্য যাবতীয় সাধনই [redacted] একে অবলম্বন করিয়াছ—এখনও তাহার নিদর্শন [redacted] সন্ন্যাসীর উৎকট তপস্যা মূর্ত্তিমান হইয়া গিরি[redacted] বিদ্যমান্। তোমাদের মত ভগবদ্‌তত্ত্ব বো[redacted] কে আছে? আত্মবিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুন[redacted] কর্ম্মবই কেন পুনর্বানয়ন করিতে চাহিতেছ

গোলক ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে—আমরা ভগবানের নিকটে থাকিয়াও সাধনার আড়ম্বরে তাঁহাকে এতদিন দেখি নাই, তাঁহাকে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। ওগো এই তিনি—এই সরল, এই সহজ—আমারই মত, তোমারই মত—প্রত্যেক ঘটে ঘটে লীলারত। এইখানে রাম প্রসাদের একখানা অমর সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের বুঝাই।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গবো কি হাঁড়ি চাতরে?
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সহিভ্যারে
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে?
রামপ্রসাদ বলে বল্‌বো কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে।

নূতনের পূজা ॥

যিনি পুরাণ, শাশ্বত ও সনাতন, তিনিই আবার চির নূতন। একই সনাতনী প্রকৃতি, পুরাতন পরিচ্ছদ পরিবর্জ্জন করিয়া নববেশে নূতন সাজে সাজিয়া আসেন। এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন, প্রকৃতিদেবীর এই নিত্য নবভাব ও নবরূপ গ্রহণের জন্যই জড়জগতে ষড়ঋতুর আবর্ত্তন, এবং মানবজগতে যুগ বৈচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের জীবনক্ষেত্র কোনও দুইটী যুগে অবিকল সমতুল্য হয় নাই। ইতিহাসে পুনরুক্তি দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা প্রবচনমাত্র নহে। যেমন দুইটী বস্তু, দুইটী মানুষ, দুইটী জাতি সর্ব্বপ্রকারে এক হইতে পারে না, সেরূপ দুইটী যুগও কখনও এক হইতে পারে না। মানুষের ভিতর দিয়া বিভিন্ন যুগে জগন্ময়ী প্রকৃতি বিভিন্ন জীবনক্ষেত্রে ও অবস্থায় বিভিন্ন সাধন আশ্রয় করিয়া পুরুষের সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। একদিন পূর্ণ মিলন ঘটিবে। তাহারই জন্য তিনি যুগে যুগে খণ্ড খণ্ড ভাবে খণ্ড সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছেন। আজ পূর্ণ সিদ্ধির দিন সন্নিকট। এ কথা বিশ্বাস কর এবং হৃদয়ে ধারণা কর।

সিদ্ধি ভেদে সাধনারও বিভিন্নতা আছে। যাহার দ্বারা খণ্ড সিদ্ধি উপার্জ্জিত হয়, তাহা খণ্ড উপায়। পূর্ণ সিদ্ধির জন্য পূর্ণ উপায়ই প্রয়ো-

জন। মানুষের আর আংশিক সাধনার দ্বারা আংশিক জীবন অর্জ্জন করিলে চলিবে না। এক একটী অঙ্গের সাধনা আমরা বহুদিন করিয়া আসিয়াছি। জানিয়া, না জানিয়া, সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাসীরাই সাধনার ধারা বলিয়া ইহা এতদিন মানুষের পূর্ণ দৃষ্টিকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। অপরা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতির পূর্ণাদর্শকে খণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তাই পূর্ণত্বের সাধনা করিতে গিয়া মানুষ চিরদিনই ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে। মুক্তি অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা ব্যক্তিগত মুক্তিই খুঁজিয়াছি, ত্যাগের সাধনা করিতে গিয়া অরণ্যাশ্রয়ই লইয়াছি, পরিপূর্ণতা বুঝিতে গিয়া আমরা চির নির্ব্বাণই আদর্শ বলিয়া ধারণা করিয়াছি। কিন্তু খণ্ডের উপাসনায় আর মানুষের তৃপ্তি সম্ভবে না। আজ আমরা চাই সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি, অখণ্ড উপাসনা, পরিপূর্ণ জীবন। আজ তাই আমরা অবলম্বন করিব পূর্ণ নিষ্ঠা, পূর্ণ উৎসর্গ, পূর্ণ আত্ম নিবেদন।

ভগবানকে পূর্ণভাবে পাইতে হইলে যাগ নহে, যজ্ঞ নহে, মন্ত্র নহে, উপবাস, আসন, প্রাণায়াম কিছুই নহে, কেবল একমাত্র আত্মসমর্পন যোগই পর্য্যাপ্ত ও প্রশস্ত। কিন্তু বলিয়াছি ত সনাতনই নূতন রূপে দেখা দেন। এই আত্মসমর্পন যোগেরই বীজ রোপন করিয়াছিলেন যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যখন তিনি তাঁহার সেই সরল সতেজ গ্রাম্য ভাষায় বুঝাইয়া গিয়াছিলেন "জীব ও পরমাত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই 'অহং' আছে বলে। জলের উপর একটা লাঠি ফেলিলে যেমন জল দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক আছে সেই একই জল। লাঠিটী তুলে লও আবার যে এক জল, সেই একজলই দেখিবে। অহং লাঠি তুলিয়া লইলে সেই ব্রহ্মই থাকেন"। অঙ্কুরিত বীজ যে আজ পল্লবিত, মুঞ্জরিত, পুষ্পিত হইয়া উঠিবে, এ আর বিচিত্র কি? 'ঋষি' আজ সেই সনাতন মহামন্ত্রই নববেশে ভূষিত, জলন্ত, শক্তিপূর্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন। কে আছ বিশ্বাসী, কে আছ সর্ব্বত্যাগী, আজ মহামন্ত্র বরণ করিয়া শুদ্ধ হও, মুক্ত হও, পূর্ণ ভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও।

কোনও রূপ অহমিকা রাখিলে এ যোগে সিদ্ধি সম্ভবে না। মানুষী বুদ্ধির ঊর্ণনাভ তুল্য অনার্দ্র সৃষ্টির আশঙ্কায় বিপর্যস্ত হইতেছে? ভয় কিসের ভাই, সে মানুষীবুদ্ধিটাকে বলির ছাগের ন্যায় বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গ করাই এ যোগের প্রথম অক্ষর—তবে আর মিথ্যার মায়াজাল বুনিয়া কে

ভুলাইবে ? স্বার্থ সেবার কূট বৃত্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উদ্ভ্রান্ত করিতে পারে ? স্বার্থতরুর মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাতই এই যোগের কেন্দ্র সত্য। তবে আর স্বার্থঃ কামকাঞ্চনাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় সাংসারিক ভোগ বাসনা তোমায় আত্মহারা করিয়া জন্ম জন্ম ঘুরাইতে থাকিবে কিরূপে ? "চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।" যেখানে শ্যামার নৃত্য, সেখানে মানুষীবুদ্ধির আরোপ, স্বার্থভোগ বাসনার আশঙ্কা করিতে যাওয়াই কি বিষম বুদ্ধিভ্রম, কলুষিত কল্পনা ও দারুণ অহঙ্কার নয় ?

"নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবির উদ্দাম কল্পনা, অস্পষ্ট স্বপ্নরাজ্যের কুহকপূর্ণ উচ্ছ্বাস নহে। বাক্‌পটু দার্শনিকের স্বেদসিক্ত স্ব-কপোল কল্পিত মায়াজাল মাত্রও নহে। শুদ্ধ, সরল, অকপট চিত্তে যিনি এই মহামন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহাকে পাপ পুণ্যকে এক করিতে হয়, সুখ দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, সকল ক্ষুদ্র ভোগ, সঙ্কীর্ণ বাসনা জলাঞ্জলি দিতে হয়। অহং বুদ্ধির লেশমাত্র থাকিতে, পার্থিব [illegible] অনুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, মায়িক ভাব-প্রবণতার বিন্দুমাত্র বিদ্যমান থাকিতে, আত্মসমর্পন সম্পূর্ণ হয় না—জীবনের মধ্যে পূর্ণ ভগবদ্‌ভাবের আবির্ভাব হয় না।

কিন্তু এ যোগপন্থার আরম্ভ, মধ্য ও চরম লক্ষ্য, কোথাও প্রাচীন একদেশ দর্শিতা, খণ্ড বুদ্ধির স্থান নাই। এই স্থূলজগৎ, এই মানবদেহ, মানবচিত্ত, মানবজাতির লক্ষ্য ও আদর্শ কিছুই বর্জ্জনীয় নহে—এ সকলের কোনটাই ত ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্জ্জিত নহে ! আমরা এ কথা স্বীকার করি না যে মানব যে পূর্ণতার আকাঙ্খা করে পূর্ণনিবৃত্তি, পূর্ণ নির্ব্বাণেই তাহার পর্য্যবসান হইবে। ভগবানের অনুপ্রেরণা আজ আমাদের নিকট একটা নূতন কথা শুনাইয়াছে, একটা সুপ্রাচীন আবদ্ধ স্মৃতির নবোন্মেষ করিয়াছে, একটা গভীর অতল জ্ঞানের নয়ন খুলিয়া দিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, আমরা বুঝিয়াছি, আমরা সার সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এই জীবন, এই জগৎ, এই মানবযন্ত্রের ভিতর দিয়া ভগবানেরই জ্যোতিঃ, আলোক, মহিমা বিকাশিত করিতে হইবে। পরিবর্জ্জন করিয়া নহে, কিন্তু পরিপূর্ণ করিয়া, অহঙ্কারের দ্বারা যাহা বিকৃত হইয়াছে তাহাকেই পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু পলায়ন নহে, নিবৃত্তি নহে, নির্ব্বাণ নহে, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া এই বিকৃত রূপেরই স্বরূপ গড়িয়া তুলিতে হইবে,

এই ভগ্ন প্রতিমা পূর্ণাঙ্গ দেববিগ্রহে পরিণত করিতে হইবে, জগৎ কবির এই রহস্যময় কবিতাকেই সুন্দরতর, স্ফুটতর, ও সরল ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আনন্দেই জীবন ও জগতের আদি, আনন্দের মধ্য দিয়াই তাহার গতি, আনন্দ হইতে আনন্দেই তাহার অবিরাম পরিক্রমণ। খণ্ডতা, বিকৃতি, ভগ্নভাব, এ সমস্ত মধ্য পথের একটা অস্থায়ী, যদিও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতামাত্র।

ভারতবর্ষে, ভারতীয় জীবনে আজ আমরা এই সচ্চিদানন্দেরই পূর্ণ বিকাশ, পরিপূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চাই। আমরা ঘোর জড়বাদের সর্ব্বদোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই, তাহার মধ্যে সত্যের যে বিকৃত মূর্ত্তি নিহিত আছে তাহাও অস্বীকার করিতে চাই না। কিন্তু ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে যাহা এখনও পরিস্ফুট হয় নাই, ভগবৎ প্রয়োজন সাধনের জন্যই যাহা গুপ্ত, লুক্কায়িত ছিল, তাহাকেই পূর্ণ প্রকাশিত করিতে হইবে। সেই প্রাচীন ভারতেরই মহীয়ান্ আদর্শকে আমরা নূতন বেশে, স্ফুটতর, পূর্ণতর অর্থে ও আকারে ফুটাইয়া তুলিব। আর ভারতের এই নব সাধনায়, সমগ্র জগৎ লাভবান্ হইবে, সমগ্র মানবজাতিরই জীবন সমস্যার সমাধান হইবে।

মানবজাতির একতার আদর্শ।

জীবনের বাহ্য অবস্থা গুলি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ; কারণ উহাদের নিয়ম, বিশিষ্ট গতি ও কার্য্যকারিতা আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই রহিয়াছে ; খুব শীঘ্র ও সহজেই আমরা উহাদিগকে ব্যবহার করিয়া উহাদের দ্বারা যথেষ্ট কার্য্য করাইয়া লইতে পারি। কিন্তু তাহাদের সাহায্যে আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি না। ঐ গুলি আমাদের দৈনিক বাহ্যকার্য্যবলীর সহায় হইলেও, উহারা জীবনের গভীর সমস্যা গুলির মীমাংসায় অসমর্থ। পক্ষান্তরে জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি, শক্তিময় রহস্য নিচয়, অন্তর্নিহিত নিখিল জগৎ পরিচালক নিয়ম সমূহের জ্ঞান আমাদিগের নিকট অতীব দুরূহ ও কঠিন। জীবনের গভীরতম প্রদেশ

গুলিকে পরিমান করিবার কোনও যন্ত্রই আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; উহা আমাদের নিকট একটা অতি অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট জগৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; সে গভীর তমসাবৃত রহস্য হইতে আমাদের মন স্বতঃই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উপরের ফেণোন্মিমালা, বাহিরের উজ্জ্বল তরল রশ্মিজাল লইয়াই খেলা করিতে চায়। কিন্তু আমাদিগকে জীবনের যদি মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হয়, তাহা হইলে এই গভীর প্রদেশ সমূহই বিদিত হইতে হইবে। উপরে আমরা প্রকৃতির কতিপয় গৌণ নিয়ম ও কার্য্যের ধারা প্রাপ্ত হই মাত্র; তৎসাহায্যে আমরা সাময়িক বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং প্রকৃতির অবিরাম পরিবর্ত্তন প্রবাহকে কতক শৃঙ্খলিত ও সুপরিচালিত করিতে পারি, কিন্তু আমরা তাহাদিগের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

মানবজাতির এই সমাজ ও সমষ্টিগত জীবনটা কোন্ শক্তির প্রেরণায় চালিয়াছে, কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখেই বা তাহা প্রধাবিত এ সমস্যার অপেক্ষা কুহেলিকাবৃত, বুদ্ধির অনায়ত্ত তত্ত্ব মানবের আর নাই। সমাজ তত্ত্ব এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করে না, কারণ সমাজ, অতীতের যে বাহ্য অবস্থা পরম্পরার ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আসিয়াছে, উহা তাহারই ইতিবৃত্ত আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করে। ইতিহাসও তদ্রূপ আমাদিগকে কিছুই শিক্ষা দেয় না ইহা ঘটনা ও ব্যক্তি সমূহের অসংলগ্ন ধারা কিম্বা পরিবর্ত্তনশীল প্রতিষ্ঠান সমূহের চিত্র পরম্পরা মাত্র প্রদান করে। এই পরিবর্ত্তনের এবং কালস্রোতে প্রবহমান মানবজাতির এই অবিরাম গতির আমরা প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা উপলব্ধি করি শুধু পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল ঘটনা প্রবাহ, কতকগুলি সহজলভ্য সিদ্ধান্ত এবং আংশিক ভাব ও সত্য। আমরা গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, ব্যষ্টিবাদ ও সমষ্টিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়ত্ববাদ, রাষ্ট্র ও সমাজ, মূলধন এবং পরিশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করি; আমরা তাড়াতাড়ি কত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হই, কত ব্যবস্থা সমাজ সুন্দর বলিয়া আজ গভীর প্রত্যয় সহকারে ঘোষণা করি, কিন্তু কালই আমরা আবার সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমরা এমন অনেক আদর্শ বরন করিয়া লই, এমন অনেক সাগ্রহ উৎসাহ ও আশা পোষণ করি, যাহাদের সাফল্য অচিরেই ব্যর্থতায় পরিণত হয়; তখন আমরা সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, যেগুলিকে ধ্বংস করিবার

জন্য ব্যগ্রশীল হইয়াছিলাম, হয়ত সেই গুলিকেই বরণ করিতে ধাবমান হই। মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, এবং কঠোর পরিশ্রম, প্রচুর অশ্রু ও রক্তপাত করিয়া তাহা অর্জ্জন করে; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগকে এই সংগ্রামের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, সে কেবল ইহা ভোগ করিয়া যায়; সুতরাং বালকের স্বপ্নের ন্যায় তাহা পরিহার করিয়া নূতন সুখের আশায় ছুটিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই সকল যে ঘটে, তাহার প্রধান কারণ, আমাদিগের সমষ্টিবদ্ধ জীবন সম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য গভীরতা ও দূরদর্শিতাবর্জ্জিত। উহা একটা সুদৃঢ়, গভীর, পূর্ণ জ্ঞানের অন্বেষণে তৎপর নহে, সেরূপ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিতও নহে। তাই বলিয়া মানবের জীবন, তাহার কর্ম্মস্পৃহা, তাহার উৎসাহ, আদর্শ, সবই যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল এরূপ নহে। পরন্তু, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও আদর্শের নির্ণয়ার্থে গভীর, উদার ও ধীরতর অন্বেষণই যে আবশ্যক, ইহাই তাহার শিক্ষা ও উপদেশ।

মানবজাতির মহামিলনের আদর্শ আজ অল্পাধিক স্পষ্টভাবে আমাদের জ্ঞানের পুরোভাগে স্থান অন্বেষণ করিয়া লইতেছে। মানুষের বুদ্ধিতে কোনও আদর্শের উদয়, প্রকৃতি দেবীর তৎসম্বন্ধিনী ইচ্ছারই পরিচয় দেয়, কিন্তু সকল সময়েই সে ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় না। সময়ে সময়ে কোনও বিষয়ে তিনি যে প্রয়াস করেন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাহার সাময়িক ব্যর্থতা অবধারিত করিয়া দেন। কারণ প্রকৃতিদেবী ধীরা এবং তাঁহার কার্য্য-প্রণালী ধৈর্য্যগুণ বিশিষ্ট। তিনি কতকগুলি কল্পনা করেন, কল্পিত বস্তু গুলি অর্দ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া রাখিয়া দেন, পরে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট যোগা-যোগের সহায়তায় ঐ গুলিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য পুনগ্রহণ করেন। মনুষ্য জাতি প্রকৃতি দেবীর চিন্তাযন্ত্র। তাই তিনি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাহারা তাঁহার অভীপ্সিত আদর্শ সাধনের কতটা অধিকারী হইয়াছে। তিনি মানুষকে কর্ম্মে উদ্দীপ্ত করিয়া ব্যর্থ উদ্যম করান, উদ্দেশ্য—ব্যর্থতার শিক্ষায় ভবিষ্যতে তাহার অধিকতর সুচারুরূপে কর্ম্ম করিবার শক্তি জন্মিবে। তথাপি আদর্শটী যখন চিন্তার পুরোভাগে জাগিয়াছে, তখন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যম হইবেই। তাই আশা করা যায়, এই মানবজাতির মহামিলনের আদর্শটী ভাবী যুগের জীবন নিয়ামক ভাবসমূহের মধ্যে

একটী প্রধান স্থান অধিকার করিবে। কারণ বর্ত্তমান যুগের মানবের বুদ্ধি এবং তাহার বাহ্য অবস্থা এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। বিশেষতঃ যখন দেখি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি আমাদের পৃথিবীকে এমনি গোষ্পদতুল্য করিয়া তুলিয়াছে, যে ইহার বৃহত্তম রাজ্যগুলিও একটী দেশের ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহের অপেক্ষা অধিক বড় বলিয়া বোধ হয় না, তখন মনে হয় এ ক্ষেত্রে এ আদর্শ স্থাপন অপরিহার্য্য।

কিন্তু এই বাহ্য অবস্থার আনুকূল্যই আবার আদর্শের ব্যর্থতা আনয়ন করিতে পারে। কারণ যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোনও পরিবর্ত্তনের অনুকূল হয়, তখন সেই-সঙ্গে জাতির হৃদয় ও বুদ্ধি, বিশেষতঃ হৃদয় যদি বাস্তবিক প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সে আন্দোলন যে ব্যর্থ হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই বলা যাইতে পারে। তবে যদি মানুষ সময় থাকিতে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত ভিতরের পরিবর্ত্তনটাকেও বরণ করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলেই সাফল্য সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যের বুদ্ধি জড়বিজ্ঞানের দ্বারা এতই শৃঙ্খলিত ও যন্ত্রবৎ হইয়া উঠিয়াছে, যে, সে আজ যে পরিবর্ত্তনের আভাস পাইতেছে, তাহার সাধনা করিতে গিয়া প্রধানতঃ অথবা হয়ত একমাত্র বাহ্য উপকরণ, যথা সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লবেরই আশ্রয় লইতে যাইবে। কিন্তু এইস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রধানতঃ অথবা একমাত্র এই উপায়গুলির দ্বারাই মানবজাতির একতা স্থায়ী ও সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে একটা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনীতিক ঐক্য মাত্রই যে বরণীয় হ বে, এরূপ নহে। ইহা যে পরিমাণে একটা উৎকৃষ্ট, উপাদেয়, অধিকতর সুখজনক ও শক্তিশালী ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া তুলিবার উপযোগী ভিত্তি প্রদান করে, সেই পরিমাণেই ইহা মূল্যবান্ ও অনুসরণ যোগ্য। কিন্তু এ যাবৎ মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারা এ কথা সমর্থণ করা যায় না যে, সুগঠিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ, বিপুল মানব সমষ্টি সতেজ ও সম্পৎশালী মানবজীবনের বিকাশে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে। বরং যখনই দেখা যায়, সমষ্টিজীবন স্বল্প পরিধির মধ্যে, সরল ও সহজ ব্যবস্থার ভিতরে আপনাকে নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই ইহা স্বচ্ছন্দ, আনন্দ ও বৈচিত্র্যময় এবং ফলপ্রসূ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতীতের ইতিহাস যতদূর জানা যায় তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে

পাই, যে মানবজীবনেতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা সজীবতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ যুগ সেই গুলিই, সবচেয়ে প্রচুর সম্পৎ শালী, বহুমুল্য সুফলপ্রসূ জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে সেই সব স্থানেই, যে সকল যুগে ও যে সকল স্থানে মনুষ্য-জাতি আপন জীবনকে এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছে, যেখানে স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমন্বিত হইয়াও পরস্পরের স্বতন্ত্র সত্তা মিশাইয়া একটী মাত্র সত্তায় পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই তৃতীয়াংশ, মানবেতিবৃত্তের এই প্রকারের তিনটী শুভ মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রথম বিকাশ, ইস্রেইল নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাজাতিগুলির ও তৎপরে ক্ষুদ্র ইহুদিজাতির ধর্ম্মজীবনে; দ্বিতীয় বিকাশ, গ্রীসের ক্ষুদ্র 'জনপদ-রাজ্য'গুলির (city states) বহুমুখী জীবনে; এবং তৃতীয় প্রকাশ, গ্রীসেরই অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর মধ্যযুগের ইতালীর কলা ও বিদ্যারত জীবনে। এসিয়াখণ্ডেও আমরা দেখি, সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগে (heroic age) যখন ভারতবর্ষ আধুনিক জেলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল, সেই সময়ে যেরূপ শক্তিশালী, স্থায়ী অতুল ঐশ্বর্য্যসমন্বিত যুগের বিকাশ হইয়াছিল এরূপ আর কখনও হয় নাই। যদি আমাদিগকে বিচার দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কিছু গ্রহণ করিতে হয়, তবে অপর সমস্তই পরিহার পূর্ব্বক আমরা যে অদ্ভুত কর্ম্মময় জীবন ও চিরস্থায়ী, জলন্ত কীর্ত্তিসমূহকেই বরণ করিয়া লইব, তাহা সেই যুগেই সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী যুগে যাহা যাহা হইয়াছিল উৎকর্ষতা হিসাবে তাহা তন্নিম্নে দ্বিতীয় স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু সেগুলিও পল্লব, পাণ্ড, চোল, চের প্রভৃতি অনতিবৃহৎ ক্ষুদ্র জাতি ও রাজ্যের মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই সমুদায়ের তুলনায়, ভারতবর্ষ তাহার মোগল, গুপ্ত ও মৌর্য্য প্রভৃতি বিশাল সাম্রাজ্য সমূহের নিকট হইতে রাজনৈতিক ও শাসন সম্বন্ধীয় শৃঙ্খলা ও মধ্যম শ্রেণীর কিছু স্থায়ী কীর্ত্তি ব্যতীত বড় বেশী কিছু পায় নাই।

কিন্তু তথাপি এই সমস্ত ক্ষুদ্র জনপদরাজ্যগুলিতে কিম্বা প্রাদেশিক সমষ্টিজীবনে, এমন একটী দোষ বরাবরই থাকিয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য ইহাদের মধ্যে বৃহৎসংঘবদ্ধ হইবার আকাঙ্খা দেখা যাইত না। সে দোষ এই, যে রাজ্যগুলি প্রায় পরিবর্ত্তনশীল, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, বিশেষতঃ বৃহত্তর সংঘের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় অক্ষম হইত এবং তাহাদের

মধ্যে একটা ব্যাপক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে যথেষ্ট সামর্থ্যের অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হইত। এই সকল কারণে উক্ত প্রথমযুগের সংঘবদ্ধজীবন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে বড় বড় জাতি, রাজ্য ও সাম্রাজ্য সংগঠিত হইতে লাগিল।

এই স্থলে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, যে বড় বড় জাতি ও অতিকায় সাম্রাজ্যগুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির মধ্যেই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানেই সমষ্টিজীবন বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই উহা নিজের শক্তি ও উর্ব্বরতা হারাইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন, ইতালী, জর্ম্মনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ —ইহারাই ইউরোপের প্রকৃত প্রাণ; পাশ্চাত্য ভূমির নূতন সভ্যতা ও উন্নতির সমস্তটাই এই সকল স্থানেই উদ্ভূত হইয়াছে, বিপুলকায় রোমের ধর্ম্মসাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) অথবা রুষ সাম্রাজ্যে তাহা হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলি পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের দ্বারা যে প্রবল কর্ম্মময় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ জীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সহিত যখন আমরা এসিয়ার বৃহৎ মানবসমষ্টিগুলির তুলনা করিয়া দেখি, তখন আমরা পুনরায় সেই একই সত্য প্রত্যক্ষ করি। এসিয়ার এই জড়তা-পূর্ণ দীর্ঘ যুগগুলিতে বড় বড় যুদ্ধ বিপ্লব খুব অল্পই হইয়াছে, যাহাও বা হইয়াছে তাহা সাময়িক এবং অতি স্বল্প ফলই প্রসব করিয়াছে; দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সে অকাতরে নিদ্রা গিয়াছে, সে বিশ্বজীবন হইতে ক্রমশঃ আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে নিশ্চল স্থবিরত্বের অভিমুখে যাত্রার ইচ্ছা দেখাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই, এই সংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাঁহারা সমধিক শক্তিসম্পন্ন জীবন লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রধান স্থানে, কোনও কেন্দ্রে, প্যারিস্, লণ্ডন, রোম বা অন্য কোনও রাজধানীতে তাঁহাদের জীবনীশক্তিকে কোন অস্বাভাবিক রূপে কেন্দ্রীভূত করিতে হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃতিদেবী সুবৃহৎ সংঘ ও পূর্ণ ঐক্যের উপকারিতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন ক্ষুদ্র "জনপদ"-রাজ্যগুলিতে স্বল্প স্থানে নিবদ্ধ এবং নিবিড় কর্ম্মশীলতার যে অমূল্য মহাশক্তি অর্জ্জিত হইত, তাহাও কিয়দংশে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সুবিধাটী অর্জ্জন করিতে গিয়া যেমন একদিকে রাজধানী ও মহানগরী গুলিতে প্রবল, সজীব কর্ম্মশীলতার বিকাশ হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে

অবশিষ্ট জেলা, ক্ষুদ্র নগর ও পল্লী সমূহকে নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণ, নিদ্রালস জীবনের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিতে হইয়াছে।

জাতীয়ত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক সমষ্টিবদ্ধ জীবন কিরূপ হয়, রোমক সাম্রাজ্যে তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখিতে পাই। এইরূপ একতার উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়ই উক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। অতি চিত্তাকর্ষক সংহতি ও শৃঙ্খলা, শান্তি, সুদূরব্যাপী সুশাসন, স্বচ্ছলতা ও সুখসম্পদ—এই সকল গুলিই ইহার সুফল। আবার ইহার কুফলও আছে, যথা, প্রত্যেক ব্যক্তি, নগর ও প্রদেশকে স্ব স্ব স্বাধীন জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যন্ত্রবিশেষের প্রাণহীন অংশমাত্র হইয়া উঠিতে হইয়াছিল; জীবনের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য্য, বহুমুখিতা, স্বাধীনতা, উর্ব্বরতা, আত্মবিস্তারের প্রবল আবেগ—এই সকল অন্তর্হিত হইয়াছিল। সমষ্টিটী বিশাল ও মনোহর বটে, কিন্তু ব্যষ্টি ক্রমশঃ বৃহতের আবছায়ায় পড়িয়া খর্ব্ব ও হৃতশক্তি হইত; ফলতঃ, অবশেষে ব্যষ্টির সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতার জন্য বিশাল সংহতিটাও ধীরে ধীরে তাহার আত্মসংরক্ষণ শক্তি হারাইয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বাহ্যতঃ পূর্ণায়ত ও পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত থাকিলেও, উহার অবয়ব জরাগ্রস্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অবশেষে বাহির হইতে প্রথম আঘাতেই চূর্ণ ও বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ সংহতি ও এইরূপ যুগ সংরক্ষণের খুব উপযোগী। পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী গুলিতে যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য আহরিত হইয়াছিল রোমক সাম্রাজ্য তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ যুগ ও সংঘ জীবন বিকাশের ও উন্নতির অন্তরায়।

সুতরাং এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেরূপ সামাজিক এবং রাজনীতিঘটিত মানবজাতির একতার স্বপ্ন কেহ কেহ আজ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যদি সফল করিতে হয়, তাহা হইলে একটা সুবৃহৎ সংহতির আবশ্যক—যাহার গুরুভারে, বৃষ্টি, বায়ু ও সূর্য্যকিরণের অভাবে ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের ন্যায়, ব্যক্তিগত ও প্রদেশগত জীবন সঙ্কুচিত, সংপেষিত ও তাহাদের অত্যাবশ্যকীয় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবে। এবং তাহার ফলে মনুষ্যজাতি, প্রথম একটা তৃপ্তি ও আনন্দ উৎসাহের উচ্ছ্বাসের পর যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে দীর্ঘযুগ ধরিয়া সংরক্ষণ মাত্র চলিতে পারে, কিন্তু ক্রমশঃ স্থবিরত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া

অবশেষে ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু তথাপি, মনুষ্যজাতির একতা যে প্রকৃতিদেবীর অভীপ্সিত ও তাহা যে শেষে আসিবেই ইহা অবধারিত। তবে ইহার জন্য অন্যরূপ উপায় এবং অন্য এমন সকল ব্যবস্থার, আবশ্যক যাহার সাহায্যে মানবজাতির জীবনের মূলপ্রদেশ অব্যাহত ও অবিকৃত থাকিবে।

যোগ।

একটা মানব জীবনের বিশ্লেষণ করিলেই জগদ্ রহস্যের আদি সূত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। জগতের যাবতীয় পদার্থের কারণ এক হইলেও মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদান, যাহার ভিতর দিয়া অনায়াসেই আমরা আদিকারণে উপনীত হইতে পারি। তাই মানবজীবন সাধনার জন্য। এ দুর্লভ জন্মলাভ করিয়া সাধনমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুবৃত্তি অবলম্বন করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আমাদের বিশ্বাস এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকারী। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "যে আপনাকে অপদার্থ মনে করে তাহার মত অধম আর জগতে নাই।" মানুষ অপদার্থ হইতেই পারে না। তাহার ভিতর যে দেবত্ব আছে তাহা নষ্ট হইবার নহে। আজ তুমি তোমার অসীমত্ব, তোমার দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছ বলিয়াই তুচ্ছ কারণে আপনাকে অধম জ্ঞান করিতেছ। পরন্তু সাধন অবলম্বনে আপনার আমিত্ব উপলব্ধি কর, দেখিতে পাইবে, তুমি অনন্ত শক্তির যন্ত্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি মুক্ত, তুমি অমর।

সাধারণ মানবজীবন ছাড়াইয়া, যে উপায়ে বা যে প্রণালীতে আপনার ভিতর এই দেবভাব উপলব্ধ করা যায়, তাহাকেই যোগ বলে। অতএব যোগ শব্দ শুনিয়াই ইহা অসম্ভব বা কঠোর কষ্টসাধ্য কিছু মনে করিয়া উপেক্ষা করিও না। এক একটা মানুষ বাসনা পরবশ হইয়া অলীক 'কাঁচা আমি'র তৃপ্তি সাধনার্থ যে সকল উৎকট কার্য্য সম্পাদন করে তাহার তুলনায় 'পাকা আমি' হইবার জন্য যে কোনও প্রকার যোগসাধন অধিকতর কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

যোগ বলিতেই অনেকে প্রাণায়াম করা মনে করেন। অধুনা দেশে মহাপুরুষগণের আগমন হেতু যে ধর্ম্মের বাতাস বহিয়াছে তাহার

ফলে অনেকেই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন ; কিন্তু অতীতের ধর্ম্মসংস্কার এখনও প্রভাবহীন নহে ; সুতরাং ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলেই পুরাতনের আশ্রয় লইতে হয় ও এই জন্য আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি হঠযোগের অনুষ্ঠান গুলিই যোগ, এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখা চাই যে অতীতের আবিষ্কার অতীতের জন্য কিন্তু তাহার প্রভাব বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে একেবারেই বিদ্যমান না থাকিবে তাহা নহে। অতীত, জাগতিক গঠনকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবর্ত্তন হইবে, অতএব যাহা দিয়া অতীতের ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল আজও যে তাহা দিয়াই উহা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কি সম্ভব ?

আমাদের সমাজ, আমাদের রাজনীতিকক্ষেত্র, আমাদের যাহা কিছু, সকলের ভিতর এমন একটা নূতনের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার পূজা পুরাতন উপকরণে আর চলে না। এ পরিবর্ত্তন অমঙ্গলের এ কথা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে ঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠেন নাই ইহা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিব, কেন না তিনি মঙ্গলময় এবং জগতের মধ্যে পূর্ণানন্দ ভোগেচ্ছায় প্রকৃতির দ্বারা জগতের ক্রমোবিকাশ ঘটাইয়া মরজগতেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিবেন। যাহা ঘটিতেছে তাহা এই মঙ্গল উদ্দেশ্যেই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হইলেও সাময়িক, পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে এ অবস্থা অস্বাভাবিক নহে।

অতএব যে সকল উপাদান এবং অনুষ্ঠান দিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সেই প্রাচীন উপাদান এবং অনুষ্ঠান পুনরানয়ন করিলে আমাদের সমস্ত উদ্যম যে ব্যর্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

চাই একটা নূতন প্রণালী, নূতন ভাব, নূতন অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ নূতনকে বরণ করিতে যদিও সঙ্কোচ বোধ করে, তথাপি সত্য আপনি আবিষ্কৃত হয়। বর্ত্তমান বিষম সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এরূপ একটা নূতনের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা বলিতেছি, যে উপায় অবলম্বনে ভারতবাসীর আজ এই পরিণতি ইহার পরিপুষ্টি বিধানের জন্য সেই সকল প্রাচীন উপায়ই যথেষ্ট নহে। প্রাচীন উপায় দ্বারা আমাদের যাহা হইয়াছে, তাহা অল্প নহে

কিন্তু আমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না॥ সুধীবর্গ স্মরণ রাখিবেন, গাছ পুঁতিলেই ফল প্রসব করে। ভারত বর্ষের আজ যে অবস্থা ইহা নিশ্চয় পুরাতন সাধনারই ফল; এই অবস্থা মন্দ আমরা স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ যোগ ভূমি, প্রাচীন সাধনার সিদ্ধি স্বরূপ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা। অন্তর্জগতের বহু দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজ আমাদের করায়ত্ত। কিন্তু তথাপি তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। তাই আজ অসম্পূর্ণতা বর্জ্জন করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে আরও আমরা কতটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি হঠযোগ সাধনে কিসের পরিণতি হয়। আমরা বুঝিয়াছি রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—আমরা বুঝিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকটীই আমাদের জীবনের খণ্ড বিকাশে সহায়তা করে। আমরা বুঝিয়াছি একই মানব জীবনে এ সকলগুলির অনুশীলন সম্ভবপর নহে—আমরা বুঝিয়াছি আমাদের জীবন অনন্ত, আমরা ঋষির সন্তান, আমরা জন্ম জন্ম সাধনান্তর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখনই আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান আমাদের আগমনকে এই প্রথম বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়, তখনই আমরা আমাদের অতীত ঐশ্বর্যের কথা ভুলিয়া যাই, পরন্তু আমরা একটা আত্ম বিস্মৃত মহাজাতি।

প্রথম যখন আমরা পার্থিব ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সর্ব্বাগ্রে স্থূল শরীরের উপরেই আমাদের লক্ষ্য ছিল। শীত তাপ, জরামৃত্যু, প্রভৃতি প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়মে আমরা বদ্ধ, এই জন্য ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন আবশ্যক হইয়াছিল এবং ইহার ফলে কঠোর হঠযোগ সাধনে আমরা শীততাপ জরা প্রভৃতির উপদ্রব হইতে আমাদের শরীর যন্ত্রকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহা করিয়াই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শরীরের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াও আমাদের জ্ঞান পরিপুষ্ট হইল না। তখন ইহারও উপরের অপর একটী যন্ত্রে দৃষ্টি পড়িল—উহা প্রাণযন্ত্র—বাসনার কেন্দ্রস্থল। উহার সূক্ষ্ম গতিবিধির পরিচয় জানিবার জন্য আবার এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া বাসনার নিবৃত্তি আসে কি না? অথবা প্রাণ সংযমে সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়?

ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাবিধ সাধনার সৃষ্টি হইল। বাহ্য শরীরযন্ত্রের সম্যক জ্ঞান লাভান্তর অভ্যন্তরস্থ এই সূক্ষ্ম প্রাণ শক্তির সন্ধান পাইবার জন্য সে এক মহা সাধনার যুগ আসিয়াছিল। উহাই তান্ত্রিক সাধনা—তান্ত্রিক সাধনার সাহায্যে এই প্রাণের অদম্য শক্তির খেলা বড় সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির জ্ঞান লাভ করিয়াও সর্ব্বানন্দ লাভ হইল না। ইহারও উপরে মানস ও চিত্তে যে আবেগের খেলা দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত না হইলে যেন পূর্ণ জীবন লাভ হয় না। তাই বিষয় সংযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া মনে যে স্পন্দন অনুভূত হয়—সেই মধুর স্পন্দনে সমস্ত জীবনটাকে রাঙাইয়া তুলে কি না, অথবা এই মনই সূক্ষ্ম প্রাণের আদি কারণ কি না বুঝিবার জন্য সাধককে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সাধনায় প্রেম, বিরহ, অনুরাগ আবেগে এক একটা মনুষ্যজীবনকে জন্ম জন্ম কতবার ঘুরাইয়া লইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

পরন্তু এইখানেই যে মানুষের সর্ব্ব সাধনার পরিসমাপ্তি এরূপও নহে—ইহারও ঊর্দ্ধে বুদ্ধি বিরাজমান—তাহার অনন্ত লীলাভঙ্গী উপলব্ধি করিয়া সমস্ত মনুষ্য জীবনটার একটা সার মর্ম্ম বুঝিতে হয়। এই সার আনন্দ স্বরূপ জ্ঞান-সর্ব্বানন্দ লাভ। এক একটী সাধনা পর পর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে পর যখন মানুষের অন্তর বাহির প্রকাশ হইয়া পড়ে, পরাজ্ঞান লাভ হয়, তখনই সে মুক্ত ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে—আজও যদি আমাদের হঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পূর্ণযোগ সাধনার পথে আসিতে হয়, তবে চক্রপথে ঘূর্ণায়মান বলদের মত ক্রমাগত আমরা একই রাস্তা পরিক্রমণ করিব। আমাদের অদ্ভুত অতীত পরায়ণতার সংস্কার আমাদের আত্মজ্ঞানের সাধনাটাকে এমন এক কিম্ভূতকিমাকারস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে, যে সাধনা বলিতেই আমরা সেই অরণ্যবাসী কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর কথা মনে করি, সেই বৌদ্ধ-যুগকে, সেই শঙ্করযুগকে পুনরানয়নের প্রবৃত্তি আমাদের জাগিয়া উঠে।

আজ আমরা এক নূতন সাধনার কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—ইহা অধ্যাত্মযোগ বা আত্মসমর্পন যোগ। এই আত্মসমর্পন যোগ হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এমন কি ত্রিমার্গযোগ অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ, কেন না ইহা মানুষকে পূর্ণ করিয়া তুলবে। আমরা ক্রমশঃ এ তত্ত্ব আলোচনা করিব।

বসন্ত উৎসব

শীতের কুয়াসা কাটাইয়া দখিনের উন্মাদ বাতাস এক নূতন বার্ত্তা আনিয়াছে, মরজগৎ তাই শুনিবার জন্য নূতন সাজে আজ পথে দাঁড়াইয়া। সকল জড়তা ছাড়িয়া, সকল দীনতা ভুলিয়া জগতের সব বিটপীবল্লরী নবকিশলয়ে অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া বাহিরে আসিয়াছে, আলোকে বাতাসে মাখামাখি হইয়া নূতন বার্ত্তা শুনিতেছে।

সে মধুর বার্ত্তায় কি উন্মাদনা আছে, কি মাদকতা আছে, কি উৎসাহ আছে যে তাহা শ্রবণে তাহাদের জীবন ভরিয়া উঠে, ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া নিজের ও বিশ্ববাসীর জীবন সার্থক করিয়া তুলে। লতাবিতানের কুঞ্জপ্রাঙ্গনে বসিয়া, যে বিহগটী প্রবাসের দুঃখ ভুলিয়া আজ মধুর সুরে হাঁকিতেছে সে বুঝি আজ ঐখানে প্রাণের সুর খুঁজিয়া পাইয়াছে। সে সুর কি বাতাস সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, না লতা বিতানের প্রাণে সে নবীন সুর সুপ্ত ছিল?

সহকার শাখা মুকুলিত, সুগন্ধে সারা দিক্ পরিপূরিত, কে স্বর্গের সুর মরতে কে আনিয়া দিল? যাহার ঘ্রাণে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, কি যেন একটা অভাবের কথা প্রাণে জাগিয়া উঠে — পাই, পাই, পাই না সে তাজা, সে প্রাণমাতান চিরসুন্দর সুরটী। সে সুরটী এই সুযোগে ধরিতে পারিলে একটা অবিচ্ছেদ অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া ফেলিতে পারি; সে সুরটী আলাপ করিতে পারিলে লতা পুষ্পে, আম্র মুকুল গোলাপের গন্ধে একটা মিলন ঘটিয়া যায় — চির নবীন, চির আনন্দ, চির স্বর্গের দুন্দুভি বাজাইয়া সমগ্র জগৎকে চিরদিন মাতাইয়া রাখিতে পারি।

সে সুর আমারই প্রাণের তাজা আনন্দবার্ত্তা। সে বার্ত্তা ভুলিয়া যাই দীনতায়, সে বার্ত্তা ভুলিয়া যাই অহঙ্কারে স্বার্থপরতায়। কিন্তু সেত ভুলিবার নয়, অনুকূল বাতাসে সে জাগিয়া উঠে, আপনি বিকশিত হয়; আবার আঘাত পীড়নে ঝড়িয়া পড়ে, আমারই ভিতর সুপ্ত হইয়া থাকে।

আজ এই নবীন অনুকূল বাতাসে, এই মহা মাহেন্দ্রক্ষণে ঐ উদ্যানের পুষ্পবটিকার মত আমি পাতায় ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিব, আমি ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ হইব। আমার জড়তা, আমার দীনতা, আমার নির্জ্জীবতা চির দিনের নয়, কিছুক্ষণের বিশ্রাম শয্যা।

আজ এই বসন্ত উৎসবে সকলকেই যোগদান করিতে হইবে। টান দিয়া ফেলিয়া দাও এতদিনের আত্মপর্যাটাকে—এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দুঃখ হলাহলটাকে পান করিয়া অমৃতশ্বাস গ্রহন কর, সমস্ত জীবন ভরিয়া উঠুক লাল,নীল,শ্বেত,পীত কুসুম স্তবকে; তাহার অতুল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হউক সমস্ত পৃথিবী —তাহার স্বর্গীয় সৌরভে ভরিয়া উঠুক সমগ্র জগৎ। আনন্দে, উন্মাদনায় নাচিয়া উঠুক বসন্তের উৎসব প্রাঙ্গনে, একই দেবতার চরণতলে, ধরণীর বিভিন্ন মানবজাতি।

আর বলিও না ইহা কিরূপে সম্ভবে? কৃশ, নির্জ্জীব বৃক্ষ যেমন করিয়া মুকুলিত হইল, ইহাও সেই রূপে হইবে।

কেবল বাহির হইয়া আইস নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বিশ্বমানব মহালীলার যজ্ঞ স্বরূপ, পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। স্বামীজির কথাটী এই খানে উদ্ধৃত করি "মনে রাখিও তোমার স্ত্রী, তোমার জীবন, তোমার ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগের জন্য নয়; ভুলিও না—তুমি জন্মিয়াছ তোমার নিজের জন্য নয়, জননী জন্মভূমির জন্য। আমরা এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছি, পৃথিবীর কল্যাণ সাধনাই আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

মুক্তি

আমরা শুদ্ধ, আমরা মুক্ত, আমরা দেবত্বের আধার—এই জ্ঞান, এই উপলব্ধি আমাদের আসে না বলিয়াই আমরা জন্ম জন্ম মায়ার বন্ধনে বদ্ধ; বাস্তবিক আমরা বদ্ধ নহি, আমরা চিরমুক্ত। অপরা প্রকৃতি আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আমরা আমাদিগকে বদ্ধ মনে করি। ভগবান্ বহু দূরে, মানুষের পক্ষে তাঁহাকে কি কখনও পাওয়া সম্ভব হইতে পারে? এই রূপ ধারণাই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা আমাদিগের বুদ্ধিদোষে নিজ ধারণা দিয়াই মুক্তিকে দূরে, বহুদূরে রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু ভগবান আমাদিগের অতি নিকটে, এই দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করিয়া যদি একবার তাঁহাকে হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারি; দেখিব সকল বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, মায়াঘোর অপসারিত হইয়াছে। তখন আমরা আমাদিগের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুখ দুঃখ, পাপ-পুণ্য, আশা নিরাশা, ভোগ ত্যাগ, সকলের মধ্য দিয়াই মহানন্দে জীবনটাকে অতিবাহন করিতে সমর্থ হইব। নিজহস্তেই আমাদিগের মুক্তি, অথচ স্বেচ্ছায় আমরা বদ্ধ, কারন অজ্ঞানতা বশতঃ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না আমাদিগের মধ্যেই যে দেবত্ব নিহিত রহিয়াছে, এটা আমরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি।

আত্মা চিরমুক্ত, সুখ দুঃখ ইহার নাই। আমরা এই চিরমুক্ত আত্মার আধার, কিন্তু সে কথা আমরা মনে রাখি নাই, তাই আমরা সুখ দুঃখকে এক করিয়া লইতে পারি না, তাই আমরা দ্বন্দ্বভোগী। আমরা সুখ চাই, তাই আমাদিগকে দুঃখ কষ্টও ভোগ করিতে হয়; আমরা শক্তি চাই, তাই আমরা দুর্ব্বলতা হইতেও মুক্ত নহি; আমরা শান্তি চাই, তাই আমাদিগকে সংগ্রাম ও কলহের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। আমরা এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত বাসনা ভগবচ্চরণে বলি দিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা কর্ম্মের সাফল্যে আনন্দ ও বিফলতায় নিরানন্দ ভোগ করি। একমাত্র আত্মসমর্পণই এই সমস্ত দ্বন্দ্ব হইতে নিষ্কৃতির উপায়। যে মহাসাধক আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিদ্যা, মান, অর্থ, যশঃ, বুদ্ধি, সকলই ভগবৎ চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই যথার্থ নির্দ্বন্দ্ব, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই মুক্ত।

* * *

এ আত্মসমর্পণ যোগে সকলের সমান অধিকার। এখানে জাতি নাই, এখানে ধর্ম্ম নাই, এখানে সম্প্রদায় নাই। জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, সকলেই এই আত্মসমর্পণ যোগ গ্রহণ করিতে ও অভ্যাস করিতে পারেন—এ যোগ সার্ব্বজনীন, এ যোগ সনাতন। দ্বাপর ও কলি যুগের সন্ধিস্থলে, কুরুক্ষেত্রের প্রলয়-প্রাঙ্গনে যখন ঝঞ্ঝাগ্রস্ত পার্থ মুহ্যমান হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম সুহৃদকে এই আত্মসমর্পণ যোগই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান, পূর্ণ উপলব্ধ না হইলে [illegible] হইতেছে।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

আমরা বধির হইয়াছিলাম, সেই কুরুক্ষেত্রের প্রলয়কাল হইতে কত যুগযুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে আমরা সে বাণী শুনি নাই। ভারতের সেই লুপ্ত ঐশ্বর্য্যকে ভারতই আজ পুনরায় বরণ করিয়া লইয়াছে। মার চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিয়া আজ ভারতের ঋষি শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী প্রচার করিয়া জগৎকে ধন্য করিতেছেন। ভারতের চিরপুরাতন সম্পদকেই তিনি আজ নূতন আকারে চক্ষের সমক্ষে ধরিতেছেন।

* * *

জগৎ মুক্তির জন্য ব্যগ্র, কিন্তু বিচিত্র এই, প্রেয়কেই সে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছে শ্রেয়ঃকে বরণ করিলেই যে মুক্তি করগত হইবে, এ সোজা কথাটা তাই সে বুঝিতেছে না। মানবের পক্ষে শ্রেয়ঃ কি? জীবনের কেন্দ্রস্থলে ভগবান্‌কে সমাসীন দেখা, সর্ব্ব কর্ম্মে ও সর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করা, অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া

তৎস্থলে প্রকৃত কর্ত্তা, ভোক্তা, নিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা। এই অহঙ্কার ত্রিবিধ তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক; এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যাহা দ্বারা আমরা নিজেদিগকে হীন, অধম, অপদার্থ মনে করি ও আলস্য, ভয় ও নিরাশার দ্বারা অভিভূত হইয়া যাই তাহাই তামসিক অহঙ্কার। যাহা হইতে কর্ম্ম করিবার আকাঙ্খা ও কর্ম্ম ফল স্পৃহা জাগিয়া উঠে, তাহাই রাজসিক অহঙ্কার। আমাদিগকে এই উভয় অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া, শুদ্ধ, নিরলস, অনাসক্ত ভাবেই কর্ম্মশীল হইতে হইবে। তারপর সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কথা। এই বিদ্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার পরিহার করা আরো দুরূহ। সাধনমার্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, এই অহঙ্কার জাগিয়া উঠে। আমরা সাধনায় এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, আমরা জ্ঞানী, আমরা ভক্ত ইত্যাকার চিন্তাই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের চিহ্ন ও রূপ। সাধারণ কর্ম্মজগতে এইরূপ অহমিকার কিছু সুফল এবং সার্থকতা থাকিলেও, সাধককে ইহারও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। ভগবানের সত্তা দিয়া জীবনটাকে পূর্ণভাবে প্লাবিত করাই যোগের আদর্শ।

* * *

ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত ভোগ নিহিত। সকল ভোগবাসনা পরিহার করিয়া আমাদিগকে যথার্থ ত্যাগী হইতে হইবে—দেখিব, সকল ভোগই আমাদিগের করায়ত্ত হইয়াছে। যথাসর্ব্বস্ব মায়ের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে—এই উৎসর্গ পূর্ণ হইলেই বুঝিব যে আমরা আমাদিগের জন্য নহি, পরন্তু আমরা সমগ্র জগতের জন্য। তখন আমাদিগের হৃদয় মধ্যে এক সনাতনের প্রতিষ্ঠা হইবে—যে সনাতনের প্রতিষ্ঠায় জগতে সত্যযুগ বিরাজ করিবে; ইহাতেই আমাদিগের মুক্তি, আমাদিগের সাধনার সিদ্ধি। তখন আমাদিগের আত্মজ্ঞান বিশ্বজ্ঞানে পরিপূরিত হইবে—আমরা বুঝিব আমরা অনন্ত, আমরা মৃত্যু হইতে মুক্ত, কেন না আমাদিগের জীবন অমর সত্তার অংশমাত্র। আমরা বুঝিব আমরা দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত, কেন না যে অনন্ত সমুদ্র অগণিত তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াও স্থির, নিশ্চল, আমরা তাহাই। আমরা বুঝিব আমরা দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত, কেন না যে অনন্ত আত্মা সকল সুখ দুঃখের অতীত আমরা তাহারই স্বরূপ। তখন ভগবান অনন্ত রূপে আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকিবেন, মুক্তি আমাদিগের করায়ত্ত হইবে।

মানবজাতির একতার আদর্শ

(২)

ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা সমীকরণ ও সামঞ্জস্যস্থাপন প্রয়াসই প্রকৃতির চিরন্তন লীলা। এই দুইটী ভাবের ঘাত প্রতিঘাত ফলেই ইহা সম্ভবপর, অতএব সমগ্র বিশ্বজীবনে এই খেলাই নিরন্তর পরিদৃষ্ট হয়। সংঘ বা সমষ্টির ক্রোড়ে ব্যষ্টি পরিপুষ্ট হয়, আবার ব্যষ্টিই সমষ্টির গঠনের উপাদান। মানবজীবনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় মধ্যেই মানবজীবনের পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজ ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ সার্থকতার আনুকূল্য করে, সেই সমাজই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; আবার ব্যক্তিগত জীবনের পরিণতির সাহায্যে যদি তাহার সমাজ, ক্রমে ক্রমে সমস্ত মনুষ্যজাতি, এই বিশাল বিশ্বমানবপরিবার পূর্ণতার পথে না আসে, তাহা হইলে এইরূপ পরিণতিকে অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

প্রকৃতির নিয়ত বিবর্ত্তনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আজ সমগ্র মানবসমষ্টির একটা উদার, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা প্রদান করিতেছে। এতদুভয়ের মধ্যে এই চরম একতার একভাবে সহায়, আবার অন্য ভাবে অন্তরায় স্বরূপ বহু ক্ষুদ্রতর সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য উন্নতিশীল মানব সভ্যতার স্তরবিশেষে এরূপ সমষ্টি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। দেশগত(sp e) অসুবিধা, সংঘবন্ধে প্রতিবন্ধকতা, ও মানব হৃদয় এবং বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত, সমষ্টি গুলি প্রথমে ক্ষুদ্র, ক্রমে বিশাল, পরে বিশালতর হওয়াই বিশেষ আবশ্যক; তাহা হইলেই তৎসাহায্যে মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনীন ভাবে উপনীত হইতে পারিবে। পরিবার, মণ্ডলী, দল, শ্রেণী, জনপদ-রাজ্য, শাখাজাতি, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য এই সমুদয়ই উক্ত উন্নতি ও ক্রমোবিকাশের সোপানাবলী। বৃহত্তর সমষ্টি গুলি সুগঠিত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্ষুদ্র সমষ্টিগুলি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে এই ক্রমোবিবর্ত্তনে কোনও জটিলতা থাকিত না, কিন্তু প্রকৃতিদেবী এই পদ্ধতির অনুশীলন করিয়া চলেন না। তিনি একবার যে ছাঁচগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন সে গুলি সাধ্য পক্ষে কখনও নষ্ট করেন না। কেবল যাহাদের প্রয়োজনীয়তা একান্তই চলিয়া গিয়াছে, সেই সকলকেই তিনি ধ্বংস করেন। অবশিষ্ট তাঁহার প্রয়োজন সাধনের জন্য অথবা তাঁহার বৈচিত্র্য, বিলাস ও বহু ভাবের প্রতি অনুরাগ

বশতঃই রাখিয়া দেন। কেবল তিনি যে বৃহত্তর সমষ্টি সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাকে সুগম করিবার জন্য, ইহাদের বিভেদকারী-রেখা গুলিকে মুছিয়া দেন, অথবা ইহাদের গুণ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করেন মাত্র। এই জন্যই মানুষকে তার প্রতি পদক্ষেপে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়; এই সমস্যাগুলি শুধু যে ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজের অনৈক্যহেতু উদ্ভুত তাহা নয়, পরন্তু ইহারা ক্ষুদ্র সমষ্টি এবং বৃহত্তম সমষ্টির মধ্যে অসামঞ্জস্য হেতুও ঘটিয়া থাকে।

প্রভূতশিক্ষাপূর্ণ এইরূপ বহু সফল ও বিফল প্রয়াসের ঘটনাকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সেমিতীয় ইহুদী ও আরব জাতিদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই, এই প্রচেষ্টার পরিণামে ইহুদী জাতি দুইটী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং ইহাই উহাদের চির দুর্ব্বলতার কারণ স্বরূপ হইয়া রহিল; অপর জাতির মধ্যে সম্মিলনকারী ইস্‌লাম শক্তি সহসা প্রাদুর্ভূত হইয়া এ চেষ্টার একটা সাময়িক মীমাংসা করিয়াছিল। কেল্টিক জাতিদের মধ্যে সম্প্রদায় জীবনগুলিকে একত্র করিয়া সংঘবদ্ধ জাতি গঠনের ব্যর্থ প্রয়াসই দেখিতে পাই; আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়, ওয়েল্‌সের সাম্প্রদায়িক জীবন অবশেষে বৈদেশিক শাসন ও সভ্যতা কর্ত্তৃক একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই সেথায় ইহার সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীসের ইতিহাসে জনপদরাজ্য ও ক্ষুদ্র জাতি সমূহের মধ্যে সম্মিলিত হইবার একটা বৃথা চেষ্টা দেখা যায়, আবার রোমক ইতালির বিবর্ত্তনে তাহারই সাফল্য হইয়াছে দেখিতে পাই। গত দুই সহস্র বৎসরের ভারতের অতীত একটা বিপুল প্রয়াসের ইতিহাস মাত্র। পরিবার, সম্প্রদায়, বর্ণ, ক্ষুদ্র প্রদেশগত জীবন, বিশাল একভাষাভাষী সমাজ, ধর্ম্মসংঘ, রাষ্ট্রের ক্রোড়গত রাষ্ট্র প্রভৃতি অগণ্য বিচিত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন উপাদান গুলির বহুধাচারিনী শক্তি সমূহকে সংহত করিবারএই বিপুল প্রচেষ্টা বহুবার সফল হইতে হইতে রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ একথা বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতিদেবী এই স্থলে যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার জটিলতা অসাধারণ, বৈচিত্র্য অত্যদ্ভুত। কারণ এই ক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়েই যত প্রকারের বিঘ্ন ও অসুবিধা আছে, সকলই একত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে বুঝি সমস্যা অসমাধেয় প্রতিপন্ন হইল, অথবা আপাততঃ তাহার মীমাংসা হইল না; এইজন্য প্রকৃতিদেবী তাঁহার সচরাচর ব্যবহৃত বৈদেশিক শাসন যন্ত্রেরই প্রয়োগ করিলেন।

প্রকৃতি এ পর্য্যন্ত যত সংহতির বিকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাষ্ট্রই সর্ব্বাপেক্ষা

বৃহত্তম। কিন্তু সুগঠিত রাষ্ট্রেও সর্ব্বসময়ে পূর্ণ একতা ঘটিয়া উঠে না। যদি আর কোনও বৈষম্যের উপাদান নাও থাকে, শ্রেণী বিশেষের সহিত অন্য শ্রেণী বিশেষের বিরোধ থাকা সর্ব্বদাই সম্ভব। আর এই ঘটনার ভিতর প্রকৃতির বিকাশের আর একটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ আকারে মানব একতা সম্ভবপর হইবে, তাহার আলোচনা কালে এই নিয়মটী বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সমাজে, কালক্রমে পূর্ণাবয়ব বিশ্বমানব সংঘে ব্যক্তিগত জীবনের পরিপূর্ণতাই প্রকৃতির চরম লক্ষ্য। অবশ্য এই পূর্ণতা আমরা আপেক্ষিক ও অভিব্যক্তিশীল অর্থেই গ্রহণ করিতেছি। সকল ব্যক্তির উন্নতি সমভাবে, তুল্যবেগে অগ্রসর হয় না। কেহ কেহ অগ্রগামী হয়, অপরে অল্পাধিক অথবা সম্পূর্ণভাবেই দাঁড়াইয়া পড়ে, অন্য অনেকে আবার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। ফলে জাতিসমূহের মধ্যে যেমন প্রবল হইয়া জাতিবিশেষের উদ্ভব অনিবার্য্য, সেইরূপ জাতির ক্রোড়ে আবার শ্রেণী বিশেষের প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠা অপরিহার্য্য। প্রকৃতির আবশ্যকানুযায়ী গুণ ও স্বভাব যে শ্রেণীগুলি আপনাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, তাঁহারি অগ্রগমন কখনও কখনও বা তাঁহার পশ্চাদাবর্ত্তনের উপাদান স্বরূপ সেই গুলিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। যদি শক্তি ও চরিত্রবল গঠনের তিনি আকাঙ্খা করেন, তাহা হইলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; যদি জ্ঞান বিজ্ঞান তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবীগণ; যদি কর্ম্মকুশলতা, নৈপুণ্য, মিতব্যয় ও সুশৃঙ্খলার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বৈশ্যশ্রেণী; প্রায় ব্যবহারজীবীই তখন তাহাদের উপর নেতৃত্ব করে; আর একটা ব্যাপক সুখসাচ্ছন্দ্য ও পরিশ্রমের সমবায়ই যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শ্রেণী বিশেষেরই হউক, অথবা জাতিবিশেষেরই হউক এই যে শ্রেষ্ঠতা ইহা একটা সাময়িক প্রয়োজন ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। বহুজনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া মুষ্টিমেয়ের মঙ্গল সাধন কখনও প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অথবা মুষ্টিমেয়ের অমঙ্গলের বিনিময়ে বহুজনের হিত ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। মানবজাতির অধিকাংশের অবনতি ও অধীনতার পরিবর্ত্তে মুষ্টিমেয়ের পূর্ণতাও তাঁহার অভিপ্রেত কিছুতেই হইতে পারে না এই সমুদায় অচিরস্থায়ী উপায় মাত্র। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ শ্রেষ্ঠতার ধ্বংসের বীজ তাহার নিজের মধ্যেই নিহিত থাকে। উহার বিনাশের

জন্য অত্যাচারী সম্প্রদায়ের পরিহার অথবা ধ্বংস, অথবা একটা সংমিশ্রণ ও সমীকরণের আবশ্যক হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীদ্বয় হয় পরিত্যক্ত অথবা জনসাধারণের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। দুইটী সুদৃঢ় ভেদবিশিষ্ট শ্রেণী এখনও বর্ত্তমান—ধনী সম্প্রদায় ও শ্রমজীবিকুল। আর বর্ত্তমান যুগের উৎসাহপূর্ণ আন্দোলন গুলির উদ্দেশ্য, এই শেষোক্ত শ্রেণীবিভাগও বিদূরিত করা। এই প্রচেষ্টার ভিতর প্রকৃতির বিবর্ত্তন ধারার শুধু একটি প্রধান নিয়মই ইউরোপ অনুসরন করিয়া চলিয়াছে—সেটি একটী চরম সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। অবশ্য, সকলে সম্পূর্ণ একই ভাবের হইয়া উঠুক ইহা যেমন সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নহে; সেইরূপ সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য আগমন করুক ইহাও তেমনি সম্ভবপর না হইতে পারে; কিন্তু একটা মূলগত সমতা, যেটা থাকিলে বৈষম্যের খেলা আর হানিকারক হইবে না, মানবজাতির একটা প্রকৃত পরিপূর্ণতার পক্ষে ইহা একান্তই আবশ্যক।

সুতরাং প্রভুত্বকারী ক্ষুদ্র শ্রেণী বিশেষের পক্ষে সুযুক্তি পূর্ণ উপদেশ ইহাই, যেন সে সমষ্টির অবশিষ্ট সকলের, অন্ততঃ যাহারা উন্নতি প্রয়াসী তাহাদের মধ্যে নিজ আদর্শ, গুণ, ভাব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করে। যেখানে এইরূপ ঘটে, সেখানে সমাজ স্বাভাবিক ভাবে, কোনওরূপ দ্বন্দ্বভোগ, কোনও গুরুতরআঘাতলাভ ও ব্যাধিগ্রস্ত না হইয়াও উন্নত হইতে পারে; নতুবা অশান্তিপূর্ণ উন্নতির আগমন অবধারিত। কারণ প্রকৃতি যাহা সত্য সত্য চাহেন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তাহাকে কখনও মানুষের অহমিকা দ্বারা ব্যর্থ হইতে দিবেন না; যেখানে প্রবল সম্প্রদায় প্রকৃতির দাবী উপেক্ষা করে সেখানকার সমাজের অদৃষ্টে ভীষণতম দুর্দ্দশাই লিখিত থাকে। ভারতবর্ষে

স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিতেই পারেনা। কিন্তু মানুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চায় এবং পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতির সীমা অতিক্রম করিবার ও বাসনা রাখে। আর একদিকে বিশ্বজনীন ভাবও যেমন, অপরদিকে এই আত্মরতি ভাবও সেইরূপ —উভয়েই তাহার পরিপূর্ণতার মৌলিক অপরিহার্য্য উপাদান। সুতরাং সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমাজ পদ্ধতিগুলি পরিবর্ত্তিত অথবা বিলুপ্ত হওয়া যেমন আবশ্যক, সেইরূপ আবার যে সকল সমাজ সংহতি ব্যক্তির পূর্ণতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় ও তাহাকে তাহাদের সসীম আধার এবং তাহাদের সঙ্কীর্ণ সাধনা ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত অথবা জাতিনিবদ্ধ স্বার্থের মধ্যে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ রাখিতে চায়, তাহাদেরও কাল পূর্ণ হইবে এবং ঊর্দ্ধগামিনী প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় পদভরে তাহাদেরও পরিবর্ত্তন অথবা বিলোপের দিন সমাগত হইবে, ইহা অবধারিত।

যোগের উদ্দেশ্য

যোগের ফল মুক্তি, তোমরা চিরকাল এই কথাটি শুনিয়া আসিতেছ। আমি যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি তোমরাও যদি সেই পন্থায় চলিতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে মুক্তি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একটু বদলাইতে হইবে। আমি মুক্তি অর্থে "লয়" বুঝি না। লয়কে অন্বেষণ করা উচিত নয়, তাহার প্রার্থনা করাও উচিত নয়। ভগবানের যখন ইচ্ছা হইবে, এইভাবে শুধু তাহার অপেক্ষা করা উচিত। গোড়া হইতেই যদি লয়কেই তোমার লক্ষ্য বলিয়া ধর তবে আত্মার পরিণামকে তুমি খণ্ডীকৃত করিয়া লইতেছ, ভগবানের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে তোমার ইচ্ছারই প্রতিষ্ঠা করিতেছ। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি অর্থে অজ্ঞান হইতে মুক্তি, অহঙ্কার হইতে মুক্তি, সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি। তারপর মনে রাখিও মুক্তিই যোগের একমাত্র বা শেষ কথা নয়। যোগের চারিটি পর্ব্ব বা অঙ্গ—মুক্তি তাহার একটি। এই চারিটি অঙ্গ হইতেছে (১) শুদ্ধি (২) মুক্তি (৩) ভুক্তি (৪) সিদ্ধি। ভবিষ্যতে আমি যোগের এই চতুরঙ্গ বিশেষ করিয়া বুঝাইব। বর্ত্তমানে এইটুকু বলিতে চাই যে

শুদ্ধি ও মুক্তি যোগের প্রথমপাদ মাত্র—উদ্দেশ্য ক্ষেত্রটিকে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলা, কিন্তু যোগের পূর্ণ সার্থকতা ভুক্তি ও সিদ্ধি লইয়া। সমস্ত পুরাতন অভ্যাস, গতানুগতিক অন্ধসংস্কার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু কি জন্য? অন্য প্রকার অভ্যাস, অন্য প্রকার সংস্কার—ভগবৎ প্রেরণার যে অভ্যাস, যে সংস্কার, তাহাতেই পরিপূরিত হইবার জন্য। মানুষভাব হইতে মুক্ত হও দেবভাব পাইবার জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগকেই চিনিয়া লইও—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। আর জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে, প্রেমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে তুমি যখন পূর্ণ, ভগবানেরই ন্যায় তুমি অন্তরে যখন স্বরাট, বাহিরে যখন সম্রাট তখনই তোমার যোগের সিদ্ধি।

আজ এই কথাটিই তোমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। যে মূল ভাবটি আমার যোগকে পরিচালিত করিয়াছে সেভাবে তোমরা অনেকেই ঠিক অভ্যস্ত নও। বৈরাগ্যকেই যদি তোমরা সকল জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ বলিয়া মনে কর তবে আমার শাস্ত্রে তোমাদের তৃপ্তি হইবে না। বৈরাগ্য সনাতন ভাব নহে। আমি মনে করি বৈরাগ্য মনের একটি সাময়িক অবস্থামাত্র। সাধনার একটি বিশেষ পর্য্যায়েই ইহার প্রয়োজনীয়তা। যখন কোন পুরাতন দৃঢ়মূল সংস্কারকে কেবল অভ্যাস বা চেষ্টা দ্বারা দূর করা যায় না, ভগবান তখন এই বৈরাগ্যকে জাগরিত করিয়া সেই সংস্কারের নিরসন করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত চিত্ত কিছুতেই নিশ্চল হয় না, মন কোনরূপে শান্ত হয় না, সে পর্য্যন্ত এই চাঞ্চল্য, এই অশান্তি—জ্ঞানকে, ভগবৎ প্রেরণাকে সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে, ইহাকে অপ্রতিহতভাবে কার্য্যকরী হইতে দেয় না। এবং তখনই হয় অভ্যাস না হয় বৈরাগ্য দ্বারা এই বন্ধন কাটাইতে হয়। কিন্তু মন যখন স্থির হইতে শিখে, বিষয়ের সম্পর্কে আসিলে যখন উহার মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারের আন্দোলন আর খেলে না, তখন জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে; শক্তি স্বপ্রেরণা বশেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তোমাদের আর প্রকৃতপক্ষে কোন সাধন নাই, আছে কেবল সিদ্ধির ক্রমবর্দ্ধনশীল বিকাশ। সে সিদ্ধি কোন পূর্ব্বকল্পিত বা স্থির নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে না। প্রকৃতির যে সহজসিদ্ধ, নিয়মবশে মানুষ চলা ফেরা করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে সেই স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মবশেই তোমাদের যোগ নিয়মিত, পরিচালিত হইবে, প্রকৃতির অন্তঃস্থ অদম্য শক্তি বলেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। চেষ্টাসাধ্য অভ্যাসেরই বা তখন প্রয়োজন কি, বৈরাগ্য

বিমুখতারই বা সার্থকতা কি ? সব রকম আসক্তিই পরিত্যাগ করিবে। বৈরাগ্যের প্রতি যে আসক্তি সেও আসক্তি। লোভও যেমন পরিবর্জ্জনীয়, বৈরাগ্যও তেমনি পরিবর্জ্জনীয়। ক্ষেত্র বিশেষে, অবস্থা বিশেষে উভয়ই প্রয়োজনীয় আবার উভয়ই অনিষ্টকর।

আবার যদি তুমি বৌদ্ধভাবের ভাবুক হইয়া বল যে জগৎ অর্থই দুঃখ, কোন না কোন রকম অবসান বা নির্ব্বাণই পরম পুরুষার্থ অথবা মায়াবাদীদিগের সহিত একমত হইয়া বলিতে থাক যে জগৎ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই আমরা জগতে আসিয়াছি, তবে আমি তোমাদিগকে আবার বলি আমার পন্থা তোমাদিগের জন্য নহে, অন্যত্র তোমরা দীক্ষালাভ কর। আমি বৈরাগ্যিক বটে কিন্তু ততোধিক তান্ত্রিক। আমি জানি এই জগৎ আনন্দ হইতেই উদ্ভূত, আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত, আনন্দ হইতে আনন্দেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বৈদিক দ্রষ্টাদিগের জ্ঞানই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। আনন্দ ও শক্তি এই দুইটি সত্যের উপরই সকল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ ও দৌর্ব্বল্য উহাদের বিকার মাত্র। তাহার মূল অজ্ঞান। যে মহতে, যে সত্যম্ ঋতম্ বৃহতে আমাদের প্রকৃত সত্তা তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অজ্ঞান আসিয়া তাহাকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমি জানি বিকার বিকারমাত্র, শাশ্বত নহে; সঙ্কীর্ণ দেশ কালেই আবদ্ধ ও ততটুকু হিসাবে সত্য। উহার বিকাশ এই কলিযুগেই, উহার লীলা প্রধানতঃ আমাদের এই পৃথিবীতেই। এই দুঃখ ও দৌর্ব্বল্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে হইবে, দেশের ও কালের যে সঙ্কীর্ণ কোণটুকুতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে তাহা হইতেও উহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ব্যক্তিগত হিতার্থে, মানবজাতির হিতার্থে এই পৃথিবীর উপর দেবলোকেরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কলির অবসান করিয়া সত্য যুগকেই স্থাপনা করিতে হইবে। যে মতবাদ জগৎকে দুঃখময়ই বলিয়া জানে, মানুষকে সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ হইতে বিমুখ হইতে বলে, মানুষকে শিখায় যে নৈষ্কর্ম্ম্য ও বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র পন্থা, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আমি তাহাতে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করি না। ভগবান স্বয়ং মঙ্গলময়, দ্বৈতদ্বেষহীন কিন্তু তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার রূপ এই যে সৃষ্টি তাহা কেবল অমঙ্গলেরই নিদান, সকল দোষেরই বাসস্থান—এ কোন্ যুক্তি, এ কোন্ জ্ঞান আমি বুঝিয়া পাই না। আমি কখনই স্বীকার করিব না জীবন একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন, শূন্যগর্ভ মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। এ জ্ঞান আমি বৈদিক ঋষিদিগের মুখ হইতে পাই না। আমার নিজের উপলব্ধির সহিতও ইহার কোন সামঞ্জস্য দেখি

না। আমার নিজের উপলব্ধ প্রতিপদেই আমাকে দেখাইয়া চলিয়াছে সৃষ্টি কি মহৎ সত্য, কি শাশ্বত আনন্দে ইহার প্রতিষ্ঠা, কি পরাজ্ঞানে ইহা সদা বিধৃত। আমার উপলব্ধি আমাকে সতত শিক্ষা দিয়াছে সৃষ্টির এই বিরাট কর্ম্মস্রোতের মধ্যেই থাকিতে, আপনার কর্ম্মপ্রেরণাসকলকে কেবল বাসনা নির্ম্মুক্ত করিয়া নিখিল কর্ম্মসাগরেই মিশাইয়া দিতে। কর্ম্মের প্রেরণাকে নষ্ট করিতে বলে নাই। বস্তুতঃ আসক্তিহীন কর্ম্মী গীতার "নিষ্কাম কর্ম্মী," যে জ্ঞানে উদ্ভাসি, যে আনন্দে পরিপ্লুত, যে পূর্ণতার আধার, সে জ্ঞান, সে আনন্দ, সে পূর্ণতা কর্ম্মত্যাগী উদাসীন কোথায় পাইবে? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন,

"জগতে কেহ বা কর্ম্ম শিক্ষা দেয়, কেহ বা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয় আমি কিন্তু যাহারা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয় সে দুর্ব্বলচেতাদিগের মতাবলম্বী নহি"—

ন মে মতম্ তস্য দুর্ব্বলস্য।

বিশ্ববীরয়িতা দেবকুল যে ভাবে তাঁহাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সেই মহৎ আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। প্রাকৃতিক শক্তি সঙ্ঘের পশ্চাতে গ্যেতে (goethe) যে আত্মপ্রতিষ্ঠ শান্তি, যে উদার ধৈর্য্য, যে শ্রান্তিহীন অটুট প্রেরণাবেগ সদা বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের কর্ম্মরাজিকেও ঠিক সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারকার মতনই আমাদের কর্ম্মাবলী অবিরাম গতিতে ছুটিতে থাকিবে, স্বার্থ বা অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকিবে না, কুণ্ঠার ছায়াও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

এই আদর্শটিকেই ভাল করিয়া বুঝিও। আবার, বলিও না "আমি অজ্ঞান, আমি বদ্ধ, আমার শক্তি নাই"। আমি ত জানি আমি যে কখন অজ্ঞান কখন দুর্ব্বল কখন বদ্ধের ভাব দেখাই তাহা দেখাই মাত্র, খেলাটি জমাইয়া তুলিবার জন্য। এ সংসারনাট্যে অভিনেতাদিগের মত দুঃখভোগের অভিনয়ই করিতেছি, বাস্তবিক আমি দুঃখ ভোগ করি না। দুঃখও যে আনন্দের প্রকারভেদ তাহাই উপলব্ধি করি। ইচ্ছা করিলেই এ ভূমিকা ত্যাগ করিতে পারি। সে ত আমার উপর নির্ভর করে। কে বলে আমি অধম কীট, আমিইত ব্রহ্ম। সোঽহং অহং ব্রহ্মাস্মি। পাপ কোথায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে? কে বলে আমি পাপী, কোথায় আমার দুঃখ? আমিইত ভগবান, সমস্ত আনন্দই আমার মধ্যে বহমান। কে বলে আমি দুর্ব্বল? সেই অনন্তশক্তিমানের সহিত আমি একাত্মা। তিনি এক, তিনিই আবার বহুধা হইয়াছেন। তিনিই অনন্ত সমষ্টি তিনিই ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে তিনি তবু অনন্তই

রহিয়াছেন। সৃষ্টির ইহাই গুপ্ততন্ত্র, ইহাই সেই উত্তমম্ রহস্যং। এই সেই গুহাস্থিত অপূর্ব্বতত্ত্ব তর্ক যাহাকে খুঁজিয়া পায় না কিন্তু শ্রদ্ধাবানের দৃষ্টিতে যাহা স্বতঃ উদ্ভাসিত।

তোমার বৃহত্তর 'আমি' প্রকৃত 'আমি', এই 'তাঁহাকে' চিনিয়া লও। বাসনার খেলার মধ্যে মত্ত ও বদ্ধ হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে পাইবে না। আবার বৈরাগ্যের দ্বারা সকল বন্ধনের একান্ত পার হইয়া গেলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না। বাসনাও চাই না বৈরাগ্যও চাই না—আমি চাই আত্মসমর্পণ। বুঝিয়া লও তুমি একান্ত তোমারই নও। তোমার প্রকৃতি তোমার জাগতিক খেলা তাঁহারই ঈশ্বর ভাব তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই শ্রী। তোমা হইতে তোমাকে সরাইয়া ফেলিয়া তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠা কর। তোমার সব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার বুদ্ধির মধ্যে তাঁহারই সত্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, হৃদয়ে তাঁহারই আনন্দ ও প্রেম উচ্ছলিত হইবে কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্যকরী হউক আর তোমার শরীর তাঁহার এই সমস্ত লীলাভার বহন করিতে থাকুক। তাঁহারি ইঙ্গিতে কখন হও তুমি ঝঞ্ঝা বাত্যার ন্যায় রুদ্র, কখনও বা জোৎস্নার ন্যায় হাস্যময় কোথাও ভূমিকম্পের ন্যায় নির্ম্মম ধ্বংসকারী, কোথাও বা স্রোতস্বতীর ন্যায় কল্যাণময়ী। ভগবান যদি চাহেন, আকাশের মত বিরাট হইও আবার শিশির কণাটির মত ক্ষুদ্রদপি-ক্ষুদ্র হইতেও কুণ্ঠিত হইও না। বাহিরে এই অনন্তমূর্ত্তি অনন্ত ভাব, এই নানাত্ব, এই বৈচিত্র কিন্তু অন্তরে সদা নিশ্চল শান্তি, প্রসন্ন বিমলতা, তাঁহারই সমাধিমগ্ন নিথর আত্ম প্রতিষ্ঠা—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য।

আমি কে ?

(পাগলের উক্তি)

লোকে আমায় পাগল বলে, অতএব আমি পাগল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? দশচক্রে ভগবানও ভূত হন আমি ত কোন্ ছার। সে জন্য আমি আজ সত্য সত্যই পাগল। আজ আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'মা'য়ের কাছে কেবল এক আব্দার জানাইয়া আসিতেছি 'আমায় দে মা পাগল করে'; এতদিন পরে 'মা আমার'

ছেলের আব্দার শুনিয়াছেন। কিন্তু একটা বড় মজা হইয়াছে, আমি পাগল বলিতে যাহা বুঝিতাম এবং যাহা হইবার জন্য মায়ের কাছে কাতর হইয়া কাঁদিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সে ভাবে পাগল করেন নাই তিনি আমাকে এই নবযুগের 'প্রবর্ত্তক' রূপে এক নূতন রকমের পাগল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমি সেই পাগলামী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই।

যখন আমি প্রথম মায়ের নিকট পাগল হইবার আব্দার করি তখন সমাজের লোকেরা পাগল বলিতে যাহা বুঝে আমার তাহাই হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কেন যে এরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এক্ষণে আমি কিছু বলিতে অক্ষম যাহা হউক আমি পাগলের একটী ছবি কল্পনাতে গড়িয়া লইয়াছিলাম—ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় গায়ে ধুলা কাদা মাখিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইব, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা 'ঐ পাগল যায় ঐ পাগল যায়' বলিয়া পিছু পিছু দৌড়াইয়া আসিবে ও গায়ে ধুলা দিবে এবং আমিও আনন্দে আটখানা হইয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতে থাকিব; আমার ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া কাহারও দরজায় গিয়া খাইতে চাহিব এবং গৃহলক্ষ্মী যখন খাবার লইয়া আমাকে খাইতে দিতে আসিবেন তখন আমি 'হোঃ হোঃ' করিয়া হাসিয়া 'অন্নপূর্ণা যাহার মা, তাহার আবার খাইবার অভাব? ' বলিয়া ছুটিয়া পলাইব; কখন বা দুষ্ট (বাস্তবিকই কি দুষ্ট?) লোকের হাতে বদমাইস পাগল বলিয়া উত্তম মধ্যম প্রহারও পাইব। মোটামুটি এই ছিল আমার পাগলের ছবি।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই 'মা' বুঝাইয়া দিলেন যে গজকাটিতে মাপিয়া নিজেকে পাগল করিয়া তুলা যায় না পাগলের পাগলামীতে কোনও রূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম বা তাহার মূলে কোনও রূপ স্পষ্ট ধারণা থাকিতে পাইবে না। এক কথায় 'অহঙ্কারের' দ্বারা চালিত হইয়া পাগল হওয়া যায় না। 'মা' আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রথমেই আমার মনগড়া ছবি কোথায় উড়াইয়া দিলেন। আমি কোন্ পথে কোথায় কি হইতে যাইতেছি সব ভুলিয়া গেলাম, অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আমার যাত্রা হইল। পরে যখন ক্ষীণ আলোক দেখা দিল তখন দেখিলাম যে এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও পাগলামী, কিন্তু পূরাদস্তুর পাগলামী।

আমার ছিল সব, বিদ্যা যশঃ মান ধন সংসার সুখ এসকল কিছুরই অভাব ছিল না; এক কথায় আমাদের সমাজের লোকেরা যেমনটী হইলে বাঃ বাঃ বেশ বেশ বলিয়া নিজেদের ছেলেদের নিকট আদর্শ বলিয়া ধরিতে

পারে আমাতে সে সমস্তই ছিল। অবস্থাপন্ন কন্যাকর্ত্তার সুপাত্রে কন্যাদান করিবার সময়ে আমার দিকে নজর পড়িত। তারপর অন্ধকার দিয়া যাইবার সময়ে কখন সে সমস্ত পদতলে দলিত ও নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গেলাম তাহা আমার কিছুই স্মরণ নাই। যখন আলোকে আসিয়া পৌছিলাম তখন দেখিলাম যে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে এবং সেই ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া কে ? নৃমুণ্ড মালিনী বরাভয়দায়িনী আমার মা। সেই দিন হইতে আমি পাগল।

আমার আছে সবই, কিন্তু সমাজের চক্ষে আমার সব থাকিয়াও কিছুই নাই, আমার বিদ্যা আছে কিন্তু সমাজের লোকে যাহাকে বিদ্যা বলে সে বিদ্যা আমার নাই। তাহারা তুলাদণ্ডে অর্থের সহিত বিদ্যার ওজন করিয়া তাহার গুরুত্ব বিচার করে, সে হিসাবে আমি গণ্ডমূর্খ বলিলেও হয়; কেন না সমস্ত জিনিষের সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তিকেও পদতলে দলিত করিয়াছি; সেইজন্য আজ সাধারণের চক্ষে আমি পাগল, লেখা পড়া শিখিয়াও আজ আমি মাটি হইয়া গেলাম, কেন না, এ গাছে সোণা ফলিল না, অর্থাৎ এ ভাগ্যে অর্থোপার্জ্জন হইল না। যশোমান সম্বন্ধে আর কি বলিব ? যাহারা আমারই মত পাগল তাহারা, আমি অযোগ্য হইলেও, আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ আমায় মাথায় করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা শতমুখে আমার প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারে না। সামাজের লোকে অর্থাৎ সংসারী লোকে একটু ভয়ে ভয়ে প্রশংসা করিয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের বাড়ীর ছেলেরা শুনিতে না পায়; ভয় পাছে তাহারাও আমারই মত বিগড়াইয়া গিয়া সংসার বা অর্থোপার্জ্জনে মন না দেয়। অর্থ লইয়া যে কি হয় তাহা আর আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না; অর্থোপার্জ্জন একেবারে যে বন্ধ করিয়াছি তাহাও নহে; তবে যাহা কিছু রোজগার করিয়া আনি তাহাও খরচ করিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময়ে টাকা লইয়া জলে ছিনি মিনি খেলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে; ইহা আমার পাগলামীর একটী প্রধান অঙ্গ। সংসার বলিতে আমার সবই আছে, আবার লোকে যাহাকে সব বলে তাহার কিছুই নাই। আমি সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসার ভুলিয়া মনের সুখে পাগলামীতে দিন কাটাইয়া যাইতেছি আর নানা লোকে আমার 'মঙ্গল' কামনা করিতেছে, অর্থাৎ যে চিন্তা আমার কখনও মনে উঠে না, তাহার চিন্তায় তাহাদের ঘুম হইতেছে না।

চিঠি শেষ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমি কে তাহা ত বলা হইল না। আমি পাগল বলিলে কতকটা আত্মপ্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু কই কাহারও ধারণা ত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল না ? আমি পাগলের ভাষায় হেঁয়ালিতে একটু আমার

পরিচয় দিব, পাঠকের ধরিবার সাধ্য থাকে ধরিবে। আমি বিশ্বমানবের অগ্রদূত, সত্যযুগের আবাহনগীতি গাহিবার জন্য 'মা'য়ের যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, লোকে বুঝে না তাই পাগল সাজিয়াছি, নানা রকম পাগলামীর ছলে মায়ের লীলা খেলিয়া যাইতেছি। ইহাই আমার পাগলামী। আমি ভাবের পাগল। পাঠক তোমার ভিতর যদি কিছু রসবোধ থাকে, তাহা হইলে যেখানে সংসারের ঘোর বিষয়ীরা কাহাকেও পাগল নাম দেয়, সেইখানেই জানিও' তোমার মনের মানুষ পাইয়াছ, সেই আমি। আমি একজন নহি, আমি দুইজন নহি, আমি দশজন নহি, যেখানে এইরূপ দেখিতে পাইবে সেইখানেই আমি রহিয়াছি বলিয়া জানিও। আমি ভাবরূপে বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতেছি, আবার ভাবরূপেই শত সহস্র ব্যক্তির ভিতরে ফুটিয়া উঠিতেছি।

শেষ কথা এই, তুমি কি এই পাগলের সঙ্গে মহাযাত্রায় সঙ্গী হইবে? ভিতরে সে শ্রদ্ধা ও বীর্য্য আছে ত? কামিনী, কাঞ্চন, মান, যশঃ, অহঙ্কার সব মায়ের নামে পদতলে দলিত করিতে পারিবে, মায়ের উপর এ বিশ্বাস আছে ত? ঝড়, তুফান, বিপদ, দুঃখ সব মায়ের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিবে ত? কোনও দিকে, না তাকাইয়া সেই এককে লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে কাঁটাখোঁচা না মানিয়া দৌড়িতে পারিবে ত? যদি তাহা পার, তবে এস, এই অদ্ভুত পাগলের সাথী হও, পাগল পথ দেখাইয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে, কিন্তু একটী কথা শপথ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে—পথিমধ্যে কোনও দিন আর কতদূর পথ বাকি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবে না এবং চিরকাল পাগলের উপর বিশ্বাস হারাইবে না।

ভ্রম সংশোধন।

প্রবর্ত্তকের ৭ম সংখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠায় নিম্ন হইতে তৃতীয় লাইনে "যাইত না" স্থলে "যাইত" হইবে।

গতির পরিবর্ত্তন।

আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া চমক হইল—এ কোথায় চলিয়াছি? যাহাকে অস্তিত্বের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলাম, যাহার জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিলাম, যাহার জন্য নির্য্যাতন, অপবাদ, দারিদ্রকে অঙ্গের আভরণ করিলাম, সে যে জীবনবিহীন। এ গলিত শবকে লইয়া কি করিব?—আজ ব্যর্থ প্রয়াসের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে মনে হইতেছে—বুঝি পণ্ড হইয়াছে! জীবনের পথে চলিতে চলিতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই গতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, আজ আমিও গতি-পরিবর্ত্তন করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। এতদিন যাহাকে বহিয়া চলিয়াছি, গতির আবেগে তাহার দিকে লক্ষ্য করি নাই, শবের ভীষণ বোঝা বহিয়া এক একবার ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের আশায় শীতল ছায়ার আহ্বান করিয়াছি কিন্তু কে যেন আগে চল, আগে চল ভাই বলিয়া আমায় চালাইয়া লইয়াছে। আজ যাহার জন্য এত শ্রম তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—আমার বোঝা প্রাণহীন। কিন্তু এই বোঝাই আমার অবলম্বন, ইহা ব্যতীত আমার জীবন শূন্য—অতএব বোঝা চাইই। ইহাকে বহিয়াই আমি মানবজন্ম সার্থক করিব। সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া এমনই আবেগে ত্রিপুরারি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নৃত্যে ধরাতল রসাতলে প্রবেশ করে বুঝিয়া শ্রীবিষ্ণু, শিবের চৈতন্য ফিরাইয়া আনিলেন। উমানাথ মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন—ফলে পার্ব্বতী নবজন্ম লাভ করিয়া মন্মথ-

নহি—উমার মত ইহাকে আবার নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। নূতন জীবন, নূতন অবয়ব, নূতন বেশ দিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিব। ইহার জন্যই আজ আমি আমার গতির পরিবর্ত্তন করিতেছি।

আমিই এই আমূল পরিবর্ত্তনের মেরুদণ্ড। আমি অনাদি কাল হইতে ইহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, পাপপুণ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছি—ইহার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারই অনুরূপ আমার জীবন গঠন করিয়া তুলিয়াছি—আমি না হইলে আমার সমাজের নবজীবন কে আনিয়া দিবে? তাই আজ আমি ইহার জন্য উন্মাদ হইতে চাই—নদীয়ার ঠাকুর একদিন যেমন, প্রেম যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে বিলাইয়া ছিলেন, আজ আমিও সঞ্জীবনী মন্ত্র ঘরে ঘরে বিলাইব—গৌরাঙ্গের প্রেমের স্রোতে বাংলা একদিন ডুবিয়াছিল, আজ আমার মন্ত্র শক্তিতে বাংলাকে নবজীবন দান করিব।

সে আমার নূতন গতি, সে আমার নূতন পথ—তাই গতির পরিবর্ত্তন করিব বলিয়াছি। আমি আজ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকেই পুরোভাগে ধরিব—জড়শক্তির আশ্বাস পরিহার করিয়া ভগবচ্ছক্তির, আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব—কুটিল স্বার্থের পরিবর্ত্তে প্রেমমন্দাকিনীতে অবগাহন করিব। আমি উন্মাদ হইব জ্ঞান শক্তি প্রেমে, আমি আমার দেশকে জাগাইয়া তুলিব, নাচাইয়া তুলিব, পাগল করিয়া তুলিব জ্ঞান শক্তি প্রেমে—আমার দেশ অমরার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, সে পৃথিবীর জ্বালা ভুলিয়া স্বর্গে পরিণত হইবে। আমরা দেবতার মত এই সোণার দেশকে মাথায় করিয়া নাচিব—আমাদের কথা সমগ্র জগৎকে শুনাইব—সে মর্ম্মভেদী মহাসত্য আগুনের মত চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিবে, ভারতের সনাতন জগতের জন্য, ইহাই প্রমান করিব—তাই আমার এই গতির পরিবর্ত্তন।

সংসার ও সন্ন্যাস

যাঁহারা সংসারী তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মসাধনা তাঁহাদের ভাগ্যে নাই। তবে দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য সকালে সন্ধ্যায় একবার করিয়া ভগবানের নাম করেন মাত্র। এই ভগবানের নাম করাও কাহারও পক্ষে একটা দায়ের কথা। না করিলে যেন নয়; এই ভাবে যেকোনও প্রকারে ইষ্টমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটী করেন।

* * *

সংসারে চৌদ্দ আনা লোকেরই এই অবস্থা। বাকী দুই আনা লোক ভগবানের জন্য উৎকট তপস্যার অনুরাগী। ফলে সংসার ত্যাগ না করিলে, যে মানুষের মুক্তি নাই, এরূপ ধরণা সমাজের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভগবানের জন্য উৎকট পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রচার করেন—সংসারী লোকের মুক্তি নাই, সংসার করিলেই বাসনা কামনার বেড়াজালে আবদ্ধ হইতে হয় ইত্যাদি। বস্তুতঃ বাহির হইতে এইরূপ দেখায় বটে, কিন্তু ইহাই কি বাস্তব?

* * *

সংসারী কে নহে? আমি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া ইষ্টক-নির্ম্মিত-ভবনে বাস করিতেছি, তুমি শিষ্য, শিষ্যা প্রভৃতি লইয়া নাহয় পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছ; আমার সংসারের উপাদান পুত্র কলত্র, তোমার সংসারের উপাদান হয়ত ধর্ম্মবন্ধু, ছাত্রমণ্ডলী—যাহার যেমন সংগ্রহ, সে সেই মত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে লীলা করিতেছে। তুমি ভিক্ষার ঝুলি লইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছ, শাস্ত্রবচন বিতরণ করিয়া দশের অর্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের সেবা, সন্ন্যাসীর মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছ; আমি ব্যবসা বাণিজ্য রাজসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, দরিদ্রছাত্রদিগের অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিতেছি। তুমিও তোমার মণ্ডলীর জীবন চালাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থে সদনুষ্ঠান করিতেছ, আমিও আমার পরিবার মণ্ডলীর অত্যাবশ্যকীয় খরচ সঙ্কুলান করিয়া দশের ও দেশের কার্য্যে সাহায্য করিতেছি—এরূপ হইলে, তোমার সন্ন্যাসে ও আমার সংসারে প্রভেদ কি?

কিন্তু সচরাচর এরূপও হয় না। সে না হওয়া, তোমার তীব্র ত্যাগমন্ত্রের মধ্যেও আছে, আমার মুগ্ধকরী সংসার খেলায়ও আছে। এক্ষণে চিরযুগের ত্যাগ ও ভোগের বিরোধ মিটাইয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ভগবানের সকল লীলার মধ্যেই পূর্ণরূপে যে তিনি বিরাজমান একথা প্রচার করিতে হইবে—কেবল বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেই চৌদ্দ আনা সংসারী লোক, দেশের বোঝা বৃদ্ধি করিতে কোনও যুগেই দৌড়াইবে না ; বরং তাহাদের স্ব স্ব অবস্থাতেই তাহাদিগকে রাখিয়া সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে, আত্মচৈতন্যের উন্মেষ করিতে হইবে।

* * *

শিক্ষাদ্বারাই জ্ঞানোন্মেষ ঘটে। এক্ষণে শিক্ষাপেক্ষা শিক্ষার আড়ম্বর অধিক হইয়াছে। উপনিষদ, বেদ, দর্শন, প্রভৃতি শিখিয়া জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে ; শান্ত, শুদ্ধ লোকপ্রিয় না হইয়া ঘোরতর তার্কিক গড়িয়া উঠিতেছে, বিনয়ী না হইয়া অহঙ্কারী হইতেছে। উপায় কি ?

* * *

উপায় ভগবান। সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাহিতচিত্তে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলে আমরা জটিল লীলারহস্য অবশ্যই বুঝিব। বিদ্যাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিলাষ, সাম্প্রদায়িক ভাব, সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে—একমাত্র ভগবানকেই আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তখন আমরা খণ্ডতার মোহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণতার আস্বাদ পাইব, তখন বুঝিব এতদিন যাহা বুঝিয়াছি সব ভ্রম, অতএব যাহা শিখিয়াছি সবই ভুলিতে হইবে।

* * *

কি বুঝিব ? বুঝিব যে বাসনা পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগ করিতে চলিয়াছি-সে বাসনা সংসারে জড়ান নাই--আছে আবেগময় মনে ; এই মন লইয়া যেখানে যাইব, সেইখানেই বিষয়সংস্পর্শে বাসনার জাল বুনিয়া ফেলিব। মূর্খতায়, হীনতায়, অজ্ঞানতায় আমরা বাসনার বিষয় মধ্যে আনন্দের অন্বেষণ করি, কিন্তু ভগবান্ বিষয়রূপে আসিয়াছেন, ইহা বুঝি না ; এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলেই "পাঁকাল মাছের" মত সংসারে আমরা বাসনা পরিশূন্য হইয়া নিয়ত ভগবৎসঙ্গই লাভ করিয়া সদানন্দে বিভোর থাকিতে পারিব।

* * *

যে শক্তি কর্ত্তৃক আমরা চালিত সে যে ভগবানের। ভগবান্ স্বয়ং লীলাচ্ছলে অসংখ্য বিকাশ ঘটাইয়া আনন্দভোগ করেন। আমরাও একটা বিকাশ

বৈতনয়—আমাদের সমগ্র স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান ভগবচ্চরণে লীন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দে কেন না নৃত্য করিব? আমরা তাঁহারই যন্ত্র, তাঁরই শক্তি-সঞ্চালনে নানা রঙ্গ করিতেছি। মনে নাই রাম প্রসাদের গান "বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচি"?

* * *

একবার কায়মনোবাক্যে স্পর্দ্ধা করিয়া বল, "তোমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের"। কর্ম্মসূত্র বাহ্যমূর্ত্তিকেই নাচায়, নিয়মিত করে। আত্মা চিরমুক্ত, সকল সূত্র সেইখানেই কেন্দ্রগত; একবার এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিয়ত এই সত্যমন্ত্র জপ কর যে, "তোমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের।"

* * *

এইরূপ করিতে পারিলেই বুঝিবে বাহ্যজীবনের কোনও বিশেষ অবস্থায় মুক্তি পাওয়া যায় না। সংসার ত্যাগ করিলেই যদি ভগবান্ লাভ হইত, তাহা হইলে বনত অমৃতে কাহার অসাধ, শঙ্করাচার্য্যের আহ্বানে জগতের সর্বলোকই সন্ন্যাসী হইত। তাহা হয় নাই, হইবে না, মানুষ যে অবস্থায় আছে, তাহা তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, ভগবানের ইচ্ছাতেই সকল অবস্থার সংঘটন। তবে দরিদ্রতার পীড়নে, প্রাচুর্য্যের সম্ভোগে, সংসারনাট্যে, সন্ন্যাসবৈরাগ্যে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না কেন? এই সরল কথাটা বুঝিয়া হে মোহগ্রস্ত বাংলার কোটী কোটী সন্তান স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও অবস্থায় থাকিয়াই অমৃতের অনুসন্ধান কর।

আমাদের আশা

প্রতীচ্যের প্রথম আলোকপাতে প্রাচ্য যেরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে সে সংক্ষুব্ধভাব আর নাই। পরিবর্ত্তনযুগে জগতের সর্ব্বত্রই উন্নতিশীল জনগণকে অল্পাধিক ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, ইহার ফলে অনেকক্ষেত্রে নূতনের আবাহন করিতে গিয়া অনেককেই স্বাতন্ত্র্য হারাইতে হয়—প্রাচ্যের মহাতীর্থ ভারতবর্ষে এবং তাহার স্বরূপস্বরূপ বাংলায় এইরূপ একটা আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই ঘটে নাই।

রেভারেণ্ড লালবিহারী ঘোষ, কালী কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকবি মধুসূদন প্রভৃতি মনীষিগণ পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্রদূত। অতীতের বিকৃত কুসংস্কারের বেড়াজালে, বাংলা যখন গতপ্রাণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, অজ্ঞাতসারে ইহারাই তাহার হৃতচেতনা ফিরাইয়া আনিবার কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। ফলে, নবভাবের আদিঋষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সমাজ সংস্কারক রাজনারায়ণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ইহাদের অদম্য সঙ্কল্প এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাবলে বাংলার স্বাতন্ত্র্য নাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরে অদ্ভুত প্রতিভা লইয়া কেশবচন্দ্র যখন, না প্রাচ্য না প্রতীচ্য এরূপ একটা নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যত হয়েন, তখন বাংলার উন্নতিস্রোতঃ আবার এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করে। এই গতিই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, পরে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মবল ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে নবভাব প্রবাহিত করিয়াছিল এখনও সেই স্রোতঃই বহিতেছে। এইবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা। বাংলার ভাবজগতে যখন তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে তখন যুগাবতার দক্ষিণেশ্বরের কালিমন্দিরে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে জগতের আদিশক্তি মহাকালীর উপাসনায় রত ছিলেন। সিদ্ধিলাভান্তে, তৎকালীন বাংলার উন্নতিশীল শিক্ষিতযুবকগণের হৃদয়ে, এমন একটী অমর ভাব সঞ্চারিত করিলেন, যাহার ব্যাপ্তিতে অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া ভারতের নিজস্ব যে সনাতন তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতে প্রচার করিলেন যে ভারত ধর্ম্মের কাঙ্গাল নহে, সে সমগ্রজগতে সত্যধর্ম্ম বিতরণ করিবে। আশ্চর্য্য, তাঁর জলদমন্দ্রে সমগ্র ধরনী কাঁপিয়া উঠিল। ভারতে এবং জগতে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। জগতের বর্ত্তমান ঘটনাবলী, এই মহাপরিবর্ত্তনের বহির্বিকাশ মাত্র।

এত কথা বলিবার কারণ আছে। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীর বক্ষে আপতিত—তাই সে উৎফুল্লা, ফলে ফুলে বিকশিতা। কেন না—মার্ত্তণ্ডতেজ পরিপাক করিবার তাহার সামর্থ্য আছে। যাহার সে সামর্থ্য নাই, সে জ্বলিয়া পুড়িয়া ঝলসিত হইয়া, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত করিবে। প্রতীচ্যের তীব্র আলোকে ভারতবর্ষ মুহূর্ত্তমাত্র বিচলিত হইয়া কিরূপ ভাবে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল, ইহা দেখিবার বিষয় এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব আপনার ভিতর সংহরণ করিয়া ভবিষ্যতে কত মহৎ হইবে তাহাও চিন্তনীয়।

এক্ষণে অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে বাংলার এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের আশা-কাহিণী শুনিয়া সমগ্র ভারতের অথবা বিপুল জগতের কি হইবে; আমরা বলি, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্তটাই মনুষ্য শরীর, কিন্তু ভাব বা কল্পনা হস্তে পদে না হইয়া মাথাতেই হইয়া থাকে—সেইরূপ সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান এই ভারতবর্ষ—এইখানেই সকল যুগের কেন্দ্রসত্য যেরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাংলা ভারতের হৃদয়—হিমাচলের ঋষিগণ, ভাবরাজ্যে যে শক্তি সঞ্চারন করিতেছেন, তাহাই বস্তুগত হইয়া বাংলায় দেখা দিতেছে।

এ কথা বাঙ্গালীকে অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না—প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পাইলে পরোক্ষ বিচারে কে কোথায় সময় নষ্ট করে! জ্ঞানশক্তির প্রকটমূর্ত্তি স্বামী বিবেকানন্দ ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পর যে সকল জটিল কর্ম্মস্রোতঃ বাঙ্গালার বক্ষ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাংলার যাহা কিছু মলামাটী আবর্জ্জনা ছিল, সকল বিধৌত হইয়া যাইতেছে—চিরে বঙ্গদেশই সত্য, প্রেম ও ত্যাগের অবতার স্বরূপ সমগ্র জগতে পূজনীয় হইবে।

ভারতের ভাবরঙ্গাকল্পে এই যে পুনঃ পুনঃ প্রকৃতির অদম্য প্রয়াস, ইহার কারণ কি; আমরা "মানবজাতির একতার আদর্শ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে "প্রকৃতি একবার যে ছাঁচগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন, সেগুলি সাধ্যপক্ষে কখনও নষ্ট করেন না; কেবল যাহাদের প্রয়োজনীয়তা একান্তই চলিয়া গিয়াছে, সেই সকলকেই তিনি ধ্বংস করেন।" "she seldom destroys entirely types she has once made, or only destroys that for which there is no longer any utility" (Arya, 2nd year, Page 189—190) ভারতের ভাব, বহু বিপর্য্যয়েও নষ্ট হয় নাই—অতএব ভারতের ভাব জগতের আবশ্যকে আসিবে, একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। আজ এই যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে ভারতবাসীকেও যোগদান করিতে হইবে—ইহার ভিতর দিয়া যে মহা আদর্শটী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার জন্যই আমাদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

একদিন, ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল; অমনি ইউরোপের সকল জাতি ভারতের নানা স্থানে তাহাদের পণ্য বিপণী খুলিয়া বসিল—ভোগৈশ্বর্য্যের একটা জমকাল আদর্শ ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিল; কিন্তু ভারতের নিজস্ব পূর্ণবিকাশের সামগ্রী হইলেও উহা নিত্য, সেই জন্য

যায় নাই—এই প্রেম দিয়াই বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক কাপুরুষনাম মোচন করিবে এবং ইংরেজরাজের মনে, বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন সম্বন্ধে নূতন ধারণার সূত্রপাত করিবে।

তার পর ফরাসী অধিকৃত ভারতে, যখন প্রজাতন্ত্র ফরাসী প্রতিনিধির ঘোষণা পত্র বাহির হইল, বাংলার ক্ষুদ্রতম অংশ চন্দননগরে এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল; কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থে তাহারা জাগে নাই—জাগিয়াছে একটি কথায়—ফরাসী প্রতিনিধি বলিয়াছেন সর্ব্বগ্রাসী জার্ম্মণীর রণসাধ মিটাইয়া মনুষ্যজাতির মুক্তির জন্য আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে (for the liberation of the human race)। এ মনুষ্য জাতির একতায় আদর্শকল্পে ভারতের প্রাণে অমরমন্ত্র সুপ্ত আছে—মনে নাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরাঙ্গনেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রচার করিয়াছিলেন। আজ এই সমন্বয়ের যুগে ইংরেজ ফরাসীই প্রধান কর্ণধার—এই উভয় জাতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যে অমর ধর্ম্মভাব আমাদের হৃদয়ে অনাদিকাল হইতে নিহিত আছে, তাহা এই সুযোগেই প্রচার করিতে হইবে। মৃত্যুর মন্দিরেই শান্তির মন্ত্র শুনায় ভাল—তাই বলিতেছি আমাদের এতদিনের স্বাতন্ত্র্য আজ বুঝি সফল হইতে চলিল। মিলিত রাজশক্তির সমবায়েই আমাদের সম্পূর্ণ সফলতা নির্ভর করে।

যোগ।

যোগ সাধনার। দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা ধারণা করিয়াছি—তাহা ভাষার সাহায্যে একদিন লিখিয়া দিতে পারি, পাঠকও একই নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সাধন না থাকিলে যোগের তত্ত্ব আয়ত্বে আসে না। খুব ধৈর্য্য সহকারে, একাগ্রচিত্তে যোগরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য একটা অটল সঙ্কল্প করা চাই; এই সঙ্কল্প যত দৃঢ়, যত স্থায়ী হইবে, যোগের পথও ততই সুগম বোধ হইবে। ভোগবিলাসের জন্য আমরা সময়ে সময়ে যেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ি, এই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্যও তদপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা চাই। সঙ্কল্প সাধনই যোগের প্রথম উপাদান। সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তিরই সাধনা স্বল্পায়াসে সুসিদ্ধ হয়। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই, সে অসার অপদার্থ। একটি দিনের অটল সঙ্কল্প দেবব্রত ভীষ্মের জীবনে অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি ভারতেতিহাসে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়াই বলশালী বৃকোদর দুঃশাসনের রক্তপানে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঞ্চালী, সঙ্কল্পসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কেশপাশ মুক্তই রাখিয়াছিলেন; সঙ্কল্প বলেই বীর জয়দ্রথকে মুণ্ডিত-মস্তক করিয়াছিলেন, অশ্বত্থামার মাথার মণি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাহার জীবনে সঙ্কল্প নাই সে ভোগের অধিকারীই হইতে পারে না, তা যোগসাধনা করিবে কি প্রকারে? সংসারের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে যাহার প্রাণে একটি সঙ্কল্পেরও উদয় না হইয়াছে তাহার জীবনই বৃথা। আমি শুদ্ধ হইব, সত্যবাদী হইব, প্রাণ দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিব, এরূপ যে কোনও একটি সঙ্কল্প যোগ সাধনার ভিত্তিভূমি।

আমাদের এই অধ্যাত্মযোগ গ্রহণপ্রয়াসী সঙ্কল্পপরায়ণ ব্যক্তি আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করিবেন। কেমন করিয়া, কোথায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, যোগের ধারা কি প্রকার, ইত্যাদি বিষয় এইবার বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

যোগ বলিতে সাধারণতঃ আসন, প্রাণায়াম, কুম্ভক, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপেরই আশ্রয় লইতে হয়, কেননা দেহ এবং প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible]

আমরা কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত সাধন প্রণালী হঠযোগীদের—বৈদান্তিকগণ বুদ্ধি হইতে সাধন আরম্ভ করেন। আমরা তান্ত্রিক—তন্ত্রের পথই মহৎ পথ। আর শক্তি হইতে সাধন আরম্ভ করাই প্রকৃত, সত্য ও একমাত্র তন্ত্রমার্গ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ পথই জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রথমেই শক্তি উপাসনা কর, মা কৃপা করিলেই তুমি সৎ প্রাপ্ত হইবে।" এই শক্তি উপাসনা করিতে গিয়াই, প্রচলিত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর সঙ্কল্প-পরায়ণ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানবিশিষ্ট চরিত্রবান্ ব্যক্তিই যোগসাধনার অধিকারী। এই অধিকারী না হইলেই ভ্রান্ত পথ অবলম্বন স্বাভাবিক। দেশে রক্তবস্ত্র পরিহিত, সিন্দুরের টিপ্ পরিয়া যে সকল নরনারীকে প্রায়ই সমাজের ইতস্ততঃ দেখিতে পাও—ইহারাই উক্তকথিত তান্ত্রিক। ইহারা ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি সাধনা করেন। হিন্দু সমাজের অবলা বিধবাগণ ইহাদের কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মের নামে যে দুর্নীতির অনুসরণ করেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। লেখক ভুক্তভোগী, অবসর পাইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমি কিন্তু যে শক্তি উপাসনার কথা বলিতেছি, উহা উক্ত আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক সাধনা হইতে বিভিন্ন প্রকার। মনে রাখিতে হইবে—প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পুংস্ত্ব এবং স্ত্রীত্ব বিদ্যমান। ঐ পুং—পুরুষ বা পরমেশ্বর। ঠাকুর স্বামীজিকে এই কেন্দ্রসত্য ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখ, মনে রাখিও তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই ঈশ্বর—তুমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পার, আবার ইচ্ছা করিলে নরকের কৃমিকীট হইতে পার।"

তোমার ভিতরে স্ত্রীরূপিণী শক্তি অধিষ্ঠিতা। এই পুরুষের ইচ্ছা হইলে, ঐ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য ভিতরে একটা শক্তি জাগিয়া উঠে এবং উহা সম্পন্ন করাই শক্তির উদ্দেশ্য।

এই ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে। বাসনা বা চেষ্টা ইচ্ছার বিকৃতি। পরন্তু বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নানা কার্য্য করিতেছ। যে শক্তির সাহায্যে তুমি কার্য্যাদি সম্পন্ন কর, উহা অসীম কিন্তু মোহগ্রস্ত বলিয়া সাধারণ জীবনে যে যোগরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইতেছ।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিব। যোগ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতে হইবে, আমার ভিতরেই ভগবান্ আছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাই, বাসনা হউক, চেষ্টা হউক যে কোন প্রকারে কুণ্ড-

লিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে এবং শক্তি, পুরুষের ইচ্ছা বা বাসনানুযায়ী দেহ-যন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছেন। মানুষ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ যোগ অভ্যাসই করিতেছে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জীবনের প্রতি ঘটনার অন্তরালে এই শিবশক্তির খেলা দেখিয়া কৃতার্থ হয়েন মাত্র।

ইচ্ছা যখন বাসনার আকারে দেখা দেয়, তখন বুঝিতে হইবে জীব মোহগ্রস্ত; জীবণ অশুদ্ধতাই ইহার কারণ। এই মোহ, এই অশুদ্ধতা, সাধন সাহায্যে বিনাশ করিয়া শুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছা, বাসনা বা চেষ্টা নহে, বরং ইহার বিপরীত। ভগবানের বাসনা বা চেষ্টা ছিল না—তাঁহার ইচ্ছামাত্রই জগতের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য এই বিকাশ কার্য্যকারণ সংঘটিত, স্থান এবং কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

জগতের প্রতি ঘটনা, প্রতি বিকাশ, কল্পারম্ভে তোমার মধ্যে সুপ্ত ছিল—ভগবানের ইচ্ছায় কেবল স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে মাত্র। অতএব যাহা তুমি স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়াছ, তোমার বাসনা বা চেষ্টাদ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পার না; কেবল সাক্ষীরূপে সেই সকল কল্পিতবস্তুর শক্তি কর্ত্তৃক বিকাশ দৃষ্টিগোচর করিতে পার। মনে রাখিতে হইবে তুমি তোমারই ভগবান্, ব্যক্তিগত ঈশ্বর; আর পরমেশ্বর নিখিল ভুবনের অধীশ্বর। স্থান, কাল, অবস্থা, কিছুরই চিন্তা তোমার পক্ষে অনাবশ্যক—সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছা তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার ভিতর দিয়া যাহা করিবার তাহা করিতেছেন—সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিলেই সমতা আসিবে, প্রতি ঘটনার ভিতর দিয়া আত্মচৈতন্য পুনরাবর্ত্তন করিবে, বাসনা বা চেষ্টা অন্তর্দ্ধান করিবে। এই বাসনা বা চেষ্টার তিরোধান হইলেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। এই জ্ঞানোদয় একবার যদি হয়, তাহা হইলে আর বাসনা চেষ্টার ভয় থাকিবে না। এক্ষণে এই মহতী ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হও, এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া তোল। জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, জ্ঞানই প্রাণসংযম করিয়া মনের চঞ্চলতা দূর করে, এইরূপে এই সকলের ভিতর দিয়া শরীর ও জীবন অমৃতময় হয়—এই মহৎ পথই তোমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। এই ভগবদ্ ইচ্ছার প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকিলে, তোমার বাসনা চেষ্টা কিছুতেই থাকিতে পারে না—মনে রাখিও তুমিই ঈশ্বর, তোমাতেই শক্তি অধিষ্ঠিতা। তুমি অনুমন্তা রূপে আদেশ কর, সাক্ষী স্বরূপ প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর, ভোক্তা স্বরূপ আধারযন্ত্রকে বজায় রাখিয়া

প্রকৃতিকে সাহায্য কর—তামসিক উদাসীনতা অথবা রাজসিক উত্তেজনায় ইহাকে ধ্বংস করিও না। তোমার ভিতর ইচ্ছারূপিণী যিনি আছেন, অজ্ঞানতঃ, আপাততঃ যাহার স্বরূপ, বোধে আসিতেছে না, তিনি নিষ্কর্ম্মী নহেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেই যে জড়ত্ব আসিবে, এরূপ কল্পনা যাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সমুদিত হয়, তাহারা অহংরূপী ব্রহ্মের উপর নিশ্চয় আস্থাবান নহেন। তুমিই জ্ঞাতা। প্রকৃতি যাহা কিছু জ্ঞেয় আহরণ করিতেছেন—তাহা গ্রহণ কর। যেরূপ বলিতেছি ঠিক এই ভাবেই জীবনের প্রতি কার্য্য সম্পাদন কর, দেখিবে তোমাকে কিছুই করিতে হয় না—সমস্তই শক্তিরূপিণী কালী করেন। ব্যস্ত হইও না—চিন্তা করিও না—ধৈর্য্য হারাইও না—তোমার সম্মুখে অনন্ত জীবন—এত ব্যস্ততা কিসের জন্য? কেবল লক্ষ্য রাখিবে, তামসিকতায়, অলসতায়, যেন জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট না হয়।

ক্রমশঃ

মানুষ না পুরুষ?

ভগবান্ যেমন প্রকৃতির অভিমুখী না হইয়া থাকিতে পারে না, মানুষও সেইরূপ ভগবন্মুখী না হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কখনও উভয়ে পরস্পর হইতে বিমুখ হয়, কিন্তু সে বিরাগ মিলনকে নিবিড়তর করিয়াই তুলে।

মানবের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্যময়ী হইয়া ভোক্তার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়েন। অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি এই ভোক্তাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছেন, মনোপ্রাণ তাঁহাকে পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যাখান করিয়া আবার পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। জগন্ময়ী প্রকৃতি পরমপুরুষকে অবগত নহেন, কারণ তিনি আপনাকেই জানেন না। যখন তিনি আপনাকে বিদিত হন, পুরুষের অনাবিল আনন্দও তাঁহার অধিগত হয়।

অদ্বৈত সত্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলা নয় কিন্তু আপনাকে পাওয়া, ইহাই নিগূঢ় রহস্য। ভগবান ও মানুষ, জগৎ ও জগদাতীত তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরকে বিদিত হইলেই এক হইয়া যায়।

অজ্ঞানই যেমন দুঃখ ভোগের কারণ, তাহাদের মধ্যে বিভেদও সেইরূপ

অজ্ঞানতার মূল। মানুষ প্রথম অন্ধভাবেই অন্বেষণ তৎপর হয়, এমন কি সে বুঝিতে পারে না, যে সে তাহার নিজের দেবস্বরূপ অন্বেষণ করিতেছে। কারণ সে তমসাবৃত জড় প্রকৃতি হইতেই সাধনা আরম্ভ করে, এবং এমনকি যখন সে প্রথমে নয়নোন্মিলন করে, তাহার পর বহুকাল পর্য্যন্ত নিজেরই আলোক ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। ভগবানও তাহার অনুসন্ধানের ফল অস্পষ্টভাবেই প্রদান করেন। মাতা যেমন অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ ক্ষুদ্র শিশুর সঞ্চালিত সুকুমার কর স্পর্শ উপভোগ করেন, ভগবানও সেইরূপ অন্ধসাধকের ব্যাকুল অনুসন্ধান অভিলাষও সম্ভোগ করেন!

ভগবান এবং প্রকৃতি দুইটী প্রেমবিভোর বালক বালিকার মত লীলারত। তাঁহারা কখনও আত্মগোপন করিয়া থাকেন আবার পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দৌড়িয়া পলায়ন করেন, পুনরায় অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করেন।

মানুষই ভগবান, প্রকৃতি হইতে আত্মগোপন করিয়া আছেন মাত্র —প্রকৃতিকে ছল বল ও কৌশলের দ্বারা অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভগবান্ বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত মানুষ, স্বীয় স্বরূপ হইতে আত্মগোপন করিয়া মানুষের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। পশুও ছদ্মবেশী মানুষ, চতুষ্পদ, লোমস চর্ম্ম আবৃত মাত্র। কীটও মানুষ, তাহার মানবত্ব বিকাশের জন্য সঞ্চরণ করিতেছে। স্থূল জড়বস্তুও মানুষ—শরীর গঠনের প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ফলতঃ সর্ব্বভূতই পুরুষ।

কারণ মানব অর্থে আমরা কি বুঝি? সেই জন্ম রহিত, অবিনশ্বর আত্মা, যিনি স্বীয় উপাদান সংযোগেই মন ও শরীর রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

—:+:—

যুগাবতার রামকৃষ্ণ

চক্ষের সমক্ষে ইন্দ্রজালের মত কি হইয়া গেল; ভ্রান্ত বাঙ্গালী তাহা দেখিয়াও দেখিল না। এমনই তারা মোহাচ্ছন্ন, এমনি তারা দৃষ্টিহীন! এই যে দলে দলে বেলুড়ের পুণ্যতীর্থে বাঙ্গালী ছুটিলে, কিসের জন্য? মেলা দেখিবার জন্য, হৈ হৈ করিবার জন্য, তাহা নয়ত আর কি বলিব? কৈ জাগিলে না ত? সে বৈরাগ্য প্রদীপ্ত অমৃতশীতল কণ্ঠের জাগরণ মন্ত্র তোমাদের অন্তরে পশিল না ত? তোমরা সত্যের জন্য, ত্যাগের জন্য, প্রেমের জন্য ঠাকুরের মত সর্ব্বস্ব জননীর পদমূলে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ হইলে কৈ? মনের কালিমা মনে রাখিয়া, ভগ্ন ও হতাশ কণ্ঠে, "জয় গুরু মহারাজের জয়" বলিয়া কয়েক ঘণ্টা মেলা করিয়া, ঘরে ফিরিয়া আসিলে, এমনই প্রতিবৎসর ঠাকুরের পুণ্যতীর্থের মহিমা খর্ব্ব করিতেছে!

ঠাকুর আসিয়াছিলেন—কেন আসিয়াছিলেন? পাপভারে বাংলা রসাতলে যায় দেখিয়া দয়াল হরি দক্ষিণেশ্বরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে পাপের বোঝা তিনি লইয়া গিয়াছেন—হে বিশ্বাসী ভক্ত, বেলুড়ের মৃত্তিকা মাখিয়া এ জ্ঞান দৃঢ় কর—তুমি উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বল "আমি নিষ্পাপ, আমি মুক্ত, আমি দেবতা।" বেলুড়ের উৎসব ইহারই জন্য—বিশ্বাসীর জন্য, ভক্তের জন্য, মোহগ্রস্ত কপটচিত্তদের জন্য নহে।

তীর্থের এ মহিমা নূতন নহে। কুলিয়ার মহা মেলায় এখনও লক্ষ নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে—ভক্ত সেথায় গড়াগড়ি দেয়, জীবের সকল অপরাধ খণ্ডন হয়, তাই তার অপর নাম অপরাধভঞ্জন মেলা। কেন জান? সেও এক নূতন প্রভাতে নদীয়ার গোরাচাঁদ প্রেমের পসরা মাথায় বহিয়া ওখানে "কে নিবি? কে নিবি?" বলিয়া অনেক অধমের দুষ্কৃতি মোচন করিয়াছিলেন। আজও সেথায় তাঁর পবিত্র চরণের অমর ধূলিকণা ছড়ান আছে সেই আশায়, সেই বিশ্বাসে, সেই মহারেণুস্পর্শে পবিত্র হইবার আকাঙ্খায় বহু নরনারী সেথায় গমন করে।

ভগবানের অবতার সাধুজনের জন্য। ভক্ত বিশ্বাসীদের জন্য। এই

বেলুড়ের উৎসব তাঁহাদেরই জীবন ধন্য করে যাঁরা ঠাকুরের চরণে একান্তভাবে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

হে রামকৃষ্ণউৎসব হইতে প্রত্যাগত জনসংঘ! ঠাকুরের অমিময় উপদেশ মাথায় বহিয়া আজও কি জীবন ধন্য করিবার সময় আসে নাই? এই উৎসব ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার সেই দিব্যরূপ মনে কর—দেখ সে কি বিরাট, সে কি অসাধারণ শক্তিসমন্বিত। অতীতের সকল সংস্কার নিমেষে সংহরণ করিয়া ও কি নূতন মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন! মুক্ত, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ, সূর্য্যসদৃশ স্বামীজি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিবর্ণ জলদমন্দ্রে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে বাণী, সে মন্ত্র কি বিফল হইবে? নিদ্রাতুর বাঙ্গালী, স্বপ্নঘোরে কামিনী কাঞ্চন সম্ভোগ লালসায় জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ কি হেলায় হারাইবে—অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন গোলক ধাঁধায় পড়িয়া জ্ঞানের উজ্জ্বলমূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে চিনিয়া লইবে না? আজ পুণ্যদিনে স্বামীজির আকুল আহ্বানে আমরা কি এমনি নীরব রহিব? তিনি বলিয়াছিলেন—"What the world wants today is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God. Who will go? * * * * * * Why should one fear? If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?"

"যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া সাহস করিয়া বলিতে পারিবে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই, এইরূপ রমণী ও পুরুষেরই পৃথিবীতে আজ কাল প্রয়োজন হইয়াছে; অধিক নহে, বিশজনমাত্র হইলেই চলিবে। কে কে ঐরূপ করিতে প্রস্তুত আছ? ভগবানের নামে এরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে ভয়ই বা কেন? ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে পাওয়া যায়, একথা যদি সত্য হয়, তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায়? আর ঐ কথা যদি সত্য না হয়, তবে জীবন ধারণের আর কিই বা আবশ্যক আছে?"

কুড়িজন কেন—ভগবানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য দলে দলে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী স্বামীজির পন্থানুসরণ করিয়া ঠাকুরের প্রকৃত পূজার বিধান কর।

সমালোচনা

অমৃতবার্ত্তা—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য এক আনা। শ্রীশ্রীজগবন্ধু সেবাভাণ্ডার কর্ত্তৃক উয়াড়ী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার নবযুগের অমৃতবার্ত্তা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি অনেক আশার কথা কহিয়াছেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত অধিক অসম্ভব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন যে সেগুলি বাদ দিলেই পুস্তকখানির শ্রী থাকে।

শ্রীভগবান কথিত গীতার 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য' শ্লোকটীর মর্ম্ম সেই যুগেরই উপযোগী যে যুগে মানুষ মানুষের মাংস আহার করিত এরূপ কথাও গ্রন্থকার সাহস করিয়া বলিয়াছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের সময় সমাগত ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করেন এই আখ্যান এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যিশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু প্রেম ও বিনয়ের জন্যই দেশে, দেশে শ্রীভগবানরূপে পূজিত! গ্রন্থকার ক্ষাত্রশক্তির বিরোধী, তাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ চরিত্রের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ গ্রহন করিয়া স্বীয় অভিমতের অনুকূল ভাবটুকুই পত্রস্থ করিয়াছেন। মোট কথা নগেন্দ্রবাবু সনাতন ভাবের পরিবর্ত্তে পুরাতন খণ্ডধর্ম্মই প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছেন, এইজন্য বৃন্দাবনের রসময়ী শ্রীরাধা বিশ্বনায়িকারূপে আবির্ভূতা হইবেন এরূপ আশা করিয়াছেন।

যাহা হউক তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং পুস্তকখানিতে অনেক ভাল কথা আছে।

বাহান্ন চাষ—

কৃষিতত্ত্ববিৎ শ্রীনগেন্দ্র নাথ শেঠ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং কলিকাতা, পোষ্ট বিডন স্কোয়ার রয়েল গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত; মূল্য ।৵০। কৃষি-প্রধানদেশে শিক্ষিতলোক কৃষিবিষয়ের আলোচনা করিতেছেন ইহা আশার কথা।

প্রতিভা—

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। প্রতিভা কার্য্যালয় ঢাকা হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৵০।

প্রতিভা প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগেরই পাঠ্য কেন না ইহাতে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে উৎকৃষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। যাহারা ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহারা প্রতিভা হইতে বিশেষ উপকৃত হইবেন এ বিষয় সন্দেহ নাই। প্রতিভার বিশেষত্ব এই উহা আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদের প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠাসহকারে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আমরা প্রতিভার বিস্তৃত প্রচার কামনা করি।

বাণী

আজ বাংলা দেশে যে সঙ্কোচ, যে অস্পষ্টতার আভাষ চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা শীঘ্রই অপসারিত না করিলে, আমরা যে আরও অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব, ইহা ধ্রুব সত্য।

কিসের জন্য এতটা আত্মগোপন—কিসের জন্য বন্ধু বন্ধুকে সংশয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করে—কিসের জন্য সহোদর সহোদরকে, পিতা পুত্রকে, প্রতিবাসী প্রতিবাসীকে বিশ্বাস করিতে পারে না? আজ এই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যে অনুদারতা, যে সঙ্কুচিত ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহার আশু প্রতীকার করিতে হইবে।

বাংলার প্রতি কার্য্য আজ যেন সংশয়পূর্ণ, তার জীবনবিকাশের পথ যেন অবরুদ্ধ, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাময় জীবন যাপনই যেন তার ধর্ম্ম। হে বাঙ্গালী, একটা মস্ত মোহ তোমাদের এমনই বিপন্ন করিতেছে, একটা কুহক তোমাদের অপদার্থ করিয়া তুলিতেছে, একটা অকিঞ্চিৎকর ত্রাস তোমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে। তোমরা সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্; তোমরা পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় স্বরূপ ফুটাইয়া তোল; সমস্ত অবসাদ দূরে অপসারিত করিয়া নির্ভয়চিত্তে হাঁকিয়া বল, 'তুমি মঙ্গলময়, তোমাদ্বারা কাহারও অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা নাই।'

তোমরা আজ জীবনধারণের জন্য মুষ্টিমেয় অন্নমাত্র সম্বল করিয়া, লজ্জানিবারণকল্পে জীর্ণবস্ত্রটুকু কটিতটে জড়াইয়া, সোণার বাংলায় সেই দিব্যযুগ ফিরাইয়া আন—যে যুগে বঙ্গভূমি, সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা ছিল—যে যুগে বাঙ্গালীর বীর্য্য ছিল, সাহস ছিল—যে যুগে বাঙ্গালী সরল, উদার, ধর্ম্মপরায়ণ ছিল—তোমাদেরই দ্বারা সে সুদিনের আগমন সম্ভব হইবে। সৎকর্ম্মে ভগবান্ সহায়; তোমরা শুদ্ধচিত্তে জন্মভূমিকে ভালবাসিবে, সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি স্বরূপ যে নিষ্কাম সাধনায় স্বদেশের কল্যাণ হইবে—সে সাধনার অনুষ্ঠান হইবে কবে?

আজ প্রতি বাঙ্গালীর বাসস্থান স্বর্গে পরিণত হউক, বাঙ্গালীর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দেবচরিত্র লাভ করুক ; সহস্র বাধা বিপত্তি পদতলে দলিয়া বাঙ্গালী সত্য হউক, সুন্দর হউক ; বাঙ্গালী বিকশিত হউক, পরিপূর্ণ হউক।

মা ভৈঃ

প্রকৃতি যখন উদাসীনা হন, তখন তাঁর প্রত্যেক যন্ত্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ফলে দেহ প্রাণ চিত্ত মন বুদ্ধি সমস্ত বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই মূঢ় ভাবই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থায় আমাদের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলাময় এবং জগতের প্রভূত অমঙ্গল কারক।

* * *

সেই লোকই মনুষ্যজাতিকে ঊর্দ্ধপথে আনয়ন করে, যার ভিতরে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়াছেন। এই শক্তি পুরুষের আহ্বানে জাগিয়া উঠেন। পুরুষ ত্রিলোক ছাড়িয়া সহস্রদলে অবস্থান করেন; প্রকৃতি মূলাধারে সুপ্তা, অবসাদগ্রস্তা, তাই দেহ প্রাণ মন যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবকে জন্ম জন্ম জন্মমরণের মধ্যে পরিক্রমণ করাইতেছে।

* * *

পুরুষ নির্ব্বিকার সদানন্দময় নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। প্রকৃতি পুরুষের সেবিকা। এই পুরুষের ইচ্ছা মাত্র প্রকৃতি তৎপরা। আজ ভাবময় ভগবান্ বাস্তব হইবার জন্য ভাবরাজ্য হইতে মূর্ত্তিমান হইয়া জগতে অবতরণ করিবেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছা, ইহা তাঁহার লীলা। তাই জগতের এত পরিবর্ত্তন। যে কুসংস্কারে, যে বিকৃতিতে ধরাতল অপরিচ্ছন্ন, প্রকৃতি সম্মার্জ্জনী দিয়া সে সমস্তই দূর করিয়া পুরুষের আগমন সম্ভব করিয়া তুলিবেন।

* * *

হে মানব! তোমার ত্রিলোক দেহ প্রাণ মন; আজ এই দেহ প্রাণ মনে, ভগবান্ আগমন করিবেন, তাই এ সকলের উপর প্রকৃতির আঘাত পড়িয়াছে। এই আঘাতে তোমার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবেনা, বরং তোমাকে নির্ম্মল ও অমৃতময় করিয়া তুলিবে। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও। মা ভৈঃ!

বর্ত্তমান সমস্যা

এই প্রবন্ধে আমরা বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য এই সমস্যা সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ হইতে পারে; যাঁহার যেখানটীতে বাধিয়াছে, তিনি সেইটীকেই সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন—সাহিত্যিক বলিবেন যে সাহিত্য-চর্চ্চার অভাবেই আজ এই জাতীয় অধঃপতন, পল্লীসংস্কারক বলিবেন পল্লীস্বাস্থ্য নষ্ট হওয়াতেই আজ আমাদের এই দুর্গতি; শিক্ষাসংস্কারক বলিবেন যে জন-সাধারণ অশিক্ষিত থাকাতেই আমাদের সমস্ত সদনুষ্ঠান পণ্ড হইতেছে; সমাজ-সংস্কারক বলিবেন যে বিবাহে পণগ্রহণপ্রথা যতদিন না উঠিয়া যাইতেছে, ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই; কেহ হয়ত বলিবেন যে স্ত্রীশিক্ষার অভাবেই এই দুর্দ্দশা; আবার যাঁহারা অর্থনীতিবিৎ, দেশের অর্থাভাবই তাঁহাদের নিকট প্রধান সমস্য হইয়া দাঁড়ায়; আমাদের দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়া রাজনীতি-চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিবেন যে সরকারী সভায় সাধারণের মনোনীত সভ্যের সংখ্যাধিক্য না থাকা হেতু আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন এই সমস্ত মত সমর্থন করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব হইতেছে না, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল মতেই 'সত্য' একদিক দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, নতুবা 'মিথ্যা' কখনও এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। আমরা ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি দেখিয়াছি, নূতন ভাবে দলাদলি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই কিন্তু আমরা এই সমস্ত মত সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কেননা আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে সর্ব্বত্র কেবল মত প্রচারই আছে, তাহাতে সিদ্ধিলাভের জন্য কার্য্য করা একরূপ নাই বলিলেও হয়। জাতীয়জীবনে ত্যাগের আদর্শ আমরা একবারে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি; যাহা না থাকিলে ত্যাগের বিকাশ হয় না সে 'চরিত্র' ও কোথাও দেখিতে পাইতেছিনা। বলা বাহুল্য, আমরা 'চরিত্র' কথাটী সাধারণে যে ভাবে ব্যবহার করে, সে অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। আমরা 'চরিত্র' বলিতে 'দেবচরিত্রকে' লক্ষ্য করিতেছি, তাহা কোন দিন সমাজের গজকাঠির মাপে নিজেকে গড়িয়া তুলে না। আমরা

বলি, সেই দেবচরিত্রের অভাবেই আজ সমস্ত নষ্ট হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, সাহিত্যকে কখনও জাতীয় জীবনের কারণ বলিয়া মানিতে পারা যায় না। অবশ্য, যে সকল ভাব প্রচারের উপর জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠা নির্ভর করে, সাহিত্য যদি কেবল সেই সমস্ত ভাবই প্রকাশ করে, তাহা হইলে সাহিত্যকে জাতীয় জীবনগঠনে একটী প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সে সাহিত্যও তাহার পুষ্টি লাভের জন্য সেই জাতীয় ভাবের পুষ্টি সাধনের উপর নির্ভর করে। সেইরূপ জাতীয় সাহিত্য দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি জাতীয় জীবন কতদূর পরিপুষ্ট হইয়াছে; অন্য কোন কার্য্য সাহিত্য দ্বারা কখন হয়ও নাই এবং হইবেও না। অন্যপক্ষে সাহিত্য কেবলমাত্র এই ভাবপ্রচার কার্য্যেই ব্রতী নহে, সে তাহার গণ্ডী বাড়াইয়া লইয়া সেই পরিমাণে নিজের দায়িত্ব কমাইয়া লইয়াছে। এক্ষণে এমন বিষয় নাই যাহা লইয়া সাহিত্য আলোচনা করে না কিন্তু জাতীয় জীবনের কষ্টীপাথরে ঘসিতে গেলে তাহার মূল্য খুবই কম। এক কথায় সাহিত্যকে এক্ষণে পয়সা রোজগারের উপায় করিয়া লওয়া হইয়াছে, দেশের লোক যাহা চায় ও পছন্দ করে, সাহিত্য তাহা লিখিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করে, সাহিত্যিকের যে অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য আছে এরূপ ত বোধ হয় না। দেশের লোকের এক্ষণে অধঃপতনের অবস্থা, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়; এরূপ অবস্থায় তাহারা যাহা চায় তাহাদিগকে তাহা দেওয়া ও বিকারগ্রস্ত রোগীকে তেঁতুলের আচার খাইতে দেওয়া একই কথা। যে সমস্ত সাহিত্যিক আজ এই ভাবে নীচ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিতেছে, তাহারা আজ দেবতার দান শয়তানের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে; বলা বাহুল্য তাহারা দেশের ও সমাজের শত্রু। ইহার ফল এই হইয়াছে যে যদি কেহ সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়জীবন গঠনোপযোগী ভাবপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে কেহ সহজে সে ভাব গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। সেই জন্যই এই ভাবপ্রচার কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে এবং বর্ত্তমানের সফলতার দিকে কোনরূপ দৃক্‌পাত না করিয়া ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, কেননা তাঁহারা ভবিষ্যতেরই অগ্রদূতস্বরূপ। সেইজন্য সাহিত্যিকদিগের সহিত কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়া এক্ষণে আমাদিগকে ধীর ও অবিচলিত ভাবে কাল-প্রতীক্ষা করিয়া নিঃশব্দে কতকগুলি ভাব-কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, বলা

বাহুল্য, এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠায় কোনরূপ বিরোধের স্থান নাই ও থাকিতে পারে না।

এইবার আমরা পল্লীসংস্কারকের মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। পল্লীগ্রামের দুরবস্থাই তাঁহার মতে জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ এবং সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমেই পল্লীসংস্কারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমাদের ধারণা, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলনীতি ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্য এই মায়াবিনী মরীচিকার কুহকে পড়িয়াছেন; বাস্তবিক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কার্য্য একেবারেই অসম্ভব। এমন একদিন ছিল, যখন পল্লীজীবনই জাতীয়-জীবনের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল, তখন 'দেশ' বলিতে আমরা পল্লীগ্রামকেই বুঝিতাম এবং পল্লীতেই সমস্ত ভাব ও কর্ম্মশীলতা আপনা আপনি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইত। ভালর জন্যই হউক আর মন্দর জন্যই হউক, আজ আর দেশের অবস্থা সেরূপ নহে। কালস্রোতঃকে যেরূপ ফিরাইয়া আনা চলে না, সেই-রূপ পুরাতনকেও আর ঠিক পূর্ব্বের মত প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। এক্ষণে এই বিশাল ভারতবর্ষ, আর ভারতবর্ষই বা বলি কেন, এই সমগ্র জগৎ, একই সভ্যতা-জালে জড়িত হইয়াছে এবং এই নবযুগে 'দেশ' বলিতে আমরা ভারতবর্ষকেই বুঝি এবং 'নগর'কেই জাতীয়জীবনের কেন্দ্র বলিয়া দেখিয়া থাকি। ইহাই বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতবর্ষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এক্ষণে নগরই জাতীয়জীবনের ভাব-ও-কর্ম্ম-কেন্দ্র, কেননা পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালীতে এই [illegible]ক্ জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং নগরে যেরূপ সর্ব্ববিধ সুবিধা ভোগ [illegible]ত্ব পাওয়া যায় তাহার ফলে দেশের বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মশীলতা, ভাবপ্রবণতা সমস্তই নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে এই জাতিকে চিনিতে হইলে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না, ভারতবর্ষের সহরগুলি একবার বিশেষভাবে বুঝিয়া লইতে পারিলেই ভারতবর্ষকে বুঝা হইল। অবশ্য যাঁহারা অতীতের স্মৃতি লইয়া হা হুতাশ করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতে চাহেন তাঁহারা, পল্লীগুলি আজ মহা-শ্মশানে পরিণত হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা, বর্ত্তমানে যাহা আসিয়াছে বীরভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে চাহি। আর বাস্তবিক আমাদের আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই; নগর যদি জাতীয়জীবনের কেন্দ্র না হইত তাহা হইলে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী কি কখনও স্বদেশীকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত? বলা বাহুল্য, এজন্য আমরা বর্ত্ত-মান শাসনপ্রণালীর নিকট কৃতজ্ঞ। যাঁহারা পল্লীজীবনের পক্ষপাতী, তাঁহারা

হয়ত বলিবেন যে নগরকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র বলিয়া মনে করা একটা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা নগর যদি অস্বাভাবিক হয় তাহা হইলে যে প্রণালী প্রতিষ্ঠায় নগর প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাও অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় (ইহা অবশ্য কেহই স্বীকার করিবেন না)। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও এক একটী নগর হইতে এক একটী মহাভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এক একটী সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, এখানেও যে ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? আমাদের ধারণা যে নদীতে বান আসিলে যেমন খাল, বিল, ডোবা, গর্ত্ত শুকাইয়া গেলেও আপনা হইতে আবার পুরিয়া যায় সেইরূপ বর্ত্তমানে নগরের ভাবকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই পল্লীজীবন আপনা হইতে গড়িয়া উঠিবে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে যতদিন দেশে সহর থাকিবে, ততদিন পল্লীসংস্কার অসম্ভব আবার যখন সহরগুলি নানারূপ অসুবিধা বা অন্য কোন কারণে ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইবে তখন পল্লীসংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। সেইজন্য পল্লীসংস্কারককে আমাদের অনুরোধ যে তিনি যেন দেশের শক্তিকে এইভাবে ভুল পথে চালিত না করেন কেননা তাঁহার চেষ্টা সদিচ্ছা প্রণোদিত ও নিঃস্বার্থ হইলেও তাহাতে মূল প্রশ্ন মীমাংসিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

এইবার আমরা শিক্ষাসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা স্বীকার করি যে দেশের লোকের অজ্ঞতা জাতীয় জীবন গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে শিক্ষালাভ করিয়াও শতকরা ৯৯ জনকে আমরা জাতীয়তা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে দেখিতে পাই না। এই সত্যটী উপলব্ধি করিলে দেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে আর জাতীয় জীবন গঠনে প্রধান উপাদান বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না। দেশের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণই যখন স্ব স্ব স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই ব্যস্ত, তখন জনসাধারণ কেবল মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়া দেশের আর কি দুঃখ দূর করিবে ? অবশ্য, যদি গবর্ণমেণ্ট নিজের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করেন, তখন তাহার মধ্য দিয়া আমরা কতদূর সুবিধা লাভ করিতে পারি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই শিক্ষা প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা করার কি আবশ্যকতা, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহারাই যদি মানুষ হইত তাহা হইলে এই শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য চেষ্টা করার

কি আবশ্যকতা থাকিত। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার সার্থকতা আছে, তাহা আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে শিক্ষা দেওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা, তাহা কেহ কোন-দিন ভাবিয়াছেন কি? অর্থবল, লোকবল সমস্ত সংস্থান হইলেও যে তাহা সহজ-সাধ্য নহে। 'জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তাহা হইতে যে সোনা ফলাইবার কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে কি? অথবা হইবার আশা আছে কি? সেই জন্যই বলিতেছি যে জাতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অন্যপক্ষে জাতি গঠন আবার শিক্ষা সাপেক্ষ। এই দুইটী সত্য ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ছকিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, যে এই শিক্ষা-কার্য্য নিঃশব্দে অলক্ষিতে করিয়া যাইতে হইবে; কলিকাতায় আফিস্ খুলিয়া বা পল্লীগ্রামে পাঠশালা করিয়া একার্য্য সিদ্ধ হইবার নহে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আর কি বলিব? যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ধুয়া ধরিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বলিতে বি এ, এম্ এ পাশকরা বুঝিতেছেন ইহা বাস্তবিকই দেশের দুর্ভাগ্য। শিক্ষা, সুশিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রচা-রের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বযুগেই আবশ্যকতা আছে ও থাকিবে কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা নামে যে মেকী জিনিষ বাজারে চলিতেছে, তাহার আর অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া দেশকে উৎসন্ন দিবার দরকার নাই। স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত স্কুল কলেজ না থাকি-লেও তাহা অন্যভাবে দেওয়া যাইতে পারে; সে পন্থাটা অবলম্বন করা হইয়া-ছিল কি?

এইবার সমাজ সংস্কারক সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব। এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল, কেননা সমাজ সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করিতে গেলে 'ঠক্ বাছিতে গাঁ উজাড়' হইয়া যায়। সমাজে সকলেই ভণ্ড, কেবল নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক একটা 'ভেক্' লইয়াছে মাত্র। আমরা সমাজের একটী বিষয় লইয়া দুই একটী কথা বলিতে চাই, কেননা অনেক শিক্ষিত লোককে গভীর খেদের সহিত এই কথা বলিতে শুনিয়াছি; তাঁহারা বলেন, যে সমাজে কন্যার পিতার প্রতি বরের পিতা মুখ তুলিয়া চাহে না, পরন্তু তাঁহাকে কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত করেন, সে সমাজের আর মঙ্গল কোথায়? দুঃখের বিষয়, কন্যার বিবাহের সময় দারে ঠেকিয়া আক্ষেপ করেন, কিন্তু পুত্রের বিবাহে তিনিই আবার ৫০০০৲ হাঁকিয়া বসেন! এরূপ অবস্থায় বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা যে কিরূপভাবে উঠিয়া যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সব ত ভণ্ডামির বহির্বিকাশ,

যতদিন ভণ্ডামি থাকিবে, ততদিন ইহা উঠিবে না। আবার আমরা ইহাও বুঝি না যে এই প্রথা উঠিয়া গেলেই কি করিয়া আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ একাধারে লাভ হইয়া যাইবে। মোট কথা, আমরা এই সমস্ত বাহিরের প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমাদের মূল লক্ষ্যটী হারাইয়া বসিতে পারি না অর্থাৎ আমরা দেশের যুবকবৃন্দকে একথা বলিতে পারি না 'তোমরা বিনা পণে বিবাহ করিয়া সমাজে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি কর, তোমরাই দেশের আশাভরসাস্থল, তোমরাই এই বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধার কর।'

তারপর অর্থনীতিবিদের কথা। তিনি বলিবেন যে দেশের অর্থ কমিয়া যাওয়াতেই এই জাতীয় অধঃপতন। এ কথায় আমাদের বলিবার কিছুই নাই, কেননা ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত কিন্তু তিনি যেভাবে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা দেন, তাহাতে মনে হয় যে তিনি মুখে 'দেশের অর্থ' বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তিনি বলেন 'অর্থছাড়া কবে কোন্ মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে? দেশের লোকের খাইবারই সংস্থান নাই, তাহাদের স্বাধীন চিন্তা করিবার অবসরই বা কোথায় এবং কোন মহৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে তাহার মনের ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যায়। সেইজন্য সর্ব্ব-প্রথমে আমাদের অর্থোপার্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত; পরে যখন যথেষ্ট সংস্থান হইবে, তখন আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব।' বলা বাহুল্য, এই যুক্তি শুনিয়া আমাদের হাসি পায়। দেশের অধঃপতন হইলে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তিনি সেইরূপ মত জাহির করিয়া বাহাদুরী লয়েন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সেই সমস্ত মতানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছি। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কত ভাল ভাল যুবক এই অর্থোপার্জ্জনের কুহকে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। আমরা তাঁহাদিগকে একবার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলনীতিটী ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যদি অর্থোপার্জ্জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইবে, তবে সমাজে বৈশ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল কেন? ব্রাহ্মণ জ্ঞান বলে অর্থলিপ্সাকে পদতলে দলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নহে কি? ব্রাহ্মণের কি কখনও দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিবার পথে অর্থের অনাটন বলিয়া কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছিল? কোন মহৎ কার্য্য করিতে গেলে অর্থের আবশ্যক হয়, ইহা অস্বীকার করিনা; কিন্তু তাহা বলিয়া যাহারা ভাবের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে যদি অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর কখনও কিছুই করিয়া উঠিতে

পারেন না। তারপর অর্থের এমন একটা মোহ আছে, যে যতই অর্থোপার্জ্জন করা যায় কিছুতেই আর পরিতৃপ্তি হয় না এবং কিছুদিন যাইতে না যাইতে সেই ব্যবসার চিন্তাই মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন আর অন্য চিন্তা ভাল লাগে না। সেই জন্য আমরা চাই যে দেশে একটী সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণের দল গড়িয়া উঠুক (আমরা উপবীতধারী ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি না, আমরা ভাবরাজ্য লইয়া আলোচনা করিতেছি); তাঁহারা ভাবের আধার হইয়া ভাবপ্রচার দ্বারা এমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করুন, যাহাতে যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, এক্ষণে সমাজে যে রাজসিক ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা অচিরে শুদ্ধ হইয়া, সেই ব্রহ্ম তেজের সৃষ্টি হইবে, এবং তাহার ফলে আপনা আপনি ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়া মূল প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

সর্ব্বশেষ রাজনীতিবিদ্‌গণের কথা। রাজনীতি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, সেইজন্য আমরা তাঁহাদের প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব না। তবে আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে অন্যান্য মতের ন্যায় তাঁহাদেরও মত লক্ষ্যহীন ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। তাঁহারা রাজদ্বারে যে সমস্ত প্রার্থনা করেন তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন ভিক্ষুক গৃহস্বামীর নিকট মুষ্টিভিক্ষা না চাহিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে বসতবাটী, জমিদারী প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। যদি সেই ভিক্ষুক অগাধ ধনের অধিকারী হইয়া লোকতঃ ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষা করিতে আসে, তাহা হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র। এক সময়ে বামনাবতার বলিরাজার নিকট এই ভাবেই ত্রিপদভূমি ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক ভিক্ষুকগণের যে একটী কাণাকড়ি পর্য্যন্ত সম্বল নাই। সেই জন্য দেশের যুবকবৃন্দকে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। ইংরাজজাতি আত্মমর্য্যাদার সম্মান করিতে জানেন, তখন আর তাঁহাদের নিকট কুক্কুরের ন্যায় তারস্বরে চিৎকার করিয়া নিষ্ফল কাতর প্রার্থনা জানাইতে হইবে না; যাহা এতদিন গলাবাজী করিয়া পাওয়া যায় নাই; তাঁহারা সেই স্বায়ত্তশাসন বিনাবাক্যব্যয়ে গলদেশে পরাইয়া দিবেন।

এইবার আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা প্রায় সকল মতগুলির আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে জাতির জীবনমরণরূপ যে মূল সমস্যা তাহা কোন একটী বিশেষ সংস্কার সাধনের দ্বারা

মীমাংসিত হইতে পারে না। আরও আমরা দেখিয়াছি যে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও থাকিত তাহা হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তির একান্ত অভাব। যে সাধনার অভাবে আজ যাহা কিছু আরম্ভ করা যাইতেছে তাহাই পণ্ড হইয়া যাইতেছে ; তাহা যতদিন না পুরণ করা হইতেছে ততদিন আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। আমরা জানি যে জলে না নামিয়া সাঁতার শিক্ষা করা যায় না কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে হাত পা বাঁধিয়া গলায় কলসী ঝুলাইয়া সাঁতার দিতে নামিলে ডুবিয়া মরা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। আমরা প্রায়ই এই কথা শুনিয়া থাকি যে কেহই কখনও ভুলচুকের মধ্য দিয়া না গিয়া কোন মহৎ কার্য্যে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন নাই ; কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে সে ভুলচুকের মধ্যে বেশ একটী ধারা আছে—একবার যে ভুলটী হয় সেটী আর দ্বিতীয় বার হয় না এবং প্রতিবার ভুলের পরে কর্ম্মী সিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে একই রকমের ভুল বারবার অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সমস্ত ভাসিয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া হতাশ হইলে চলিবেনা, কেননা আমরা অসাধ্য সাধনকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আবশ্যক হইলে মণি আহরণের জন্য জলধিতলে ডুব দিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমরা সকলকে হতাশ করিবার জন্য এই সমস্ত কথার অবতারণা করিতেছি না, ইহা বোধ হয় বলা বাহুল্য। আমরা কেবল প্রত্যেক কর্ম্মীকে স্থিরচিত্তে এই মূলতত্বটী একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। বাস্তবিক আমরা কি বালির ভিত্তির উপর রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছিলাম ? এ চেষ্টা কি কোন দিন সফল হইবার সম্ভাবনা আছে ? কেবল প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে ও কেবল আমরা প্রাসাদ তুলিতে চেষ্টা করিব, ইহাই কি আমাদের উদ্যমের পরিসমাপ্তি ? সেইজন্য আমাদের প্রত্যেককে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রথমেই ভিত্তিটী সুদৃঢ় করিবার দিকে নজর দেন। পুরাতন যাহা তাহা সবদিক দেখিয়া আরম্ভ করা হয় নাই বলিয়া ধ্বংস হইতে বাধ্য কিন্তু যাহাতে সেই ধ্বংসের মধ্য হইতে 'নূতন' নবজীবন লাভ করিয়া উত্থিত হয় তাহার চেষ্টা আমাদিগকে এখন হইতেই করিতে হইবে। ইহাকেই আমরা নবযুগের সাধনা বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি এবং তাহাকেই আমরা 'দেবচরিত্রগঠন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

এই দেবজন্ম লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথম হইতে

আত্মসমর্পণ ভাবটী অভ্যাস করিয়া তাহা স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে হইবে; শেষ পর্য্যন্ত যেন 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি' ভাবটী কেবল মাত্র দোহাই দিবার না হইয়া কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের উপর আপনা হইতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্য দৈনন্দিন জীবনে আমাদিগকে 'যন্ত্রের' ভাবটী অভ্যাস করিতে হইবে এবং ছোট ছোট কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া আমাদের কতদূর পরিমাণে সেই ভাব আয়ত্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রথমাবস্থায় যেমন চারা গাছকে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেই রূপ ছোট ছোট কার্য্যগুলি অপরের অলক্ষিতে নিঃশব্দে সম্পন্ন হওয়া চাই, আত্মপ্রকাশ হইলেই বুঝিতে হইবে যে আধার অশুদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে এবং তখন সেই দিক সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় একটু চেষ্টা করিয়া করিতে হইলেও ভবিষ্যতে ইহা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া যাইবে; তখন আমরা যতই উচ্চতর মার্গে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং ভগবানের বিশ্বলীলা আমাদের সম্মুখে প্রকটিত হইবে; তখন আমরা প্রতিপদক্ষেপে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহারই কার্য্য করিয়া যাইবার জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিব। তখন সিদ্ধি আকাঙ্খা না করিলেও তাহা আমাদের করায়ত্ত, কেননা তখন আর রাজসিক চেষ্টা বা তজ্জনিত নিষ্ফলতার বেদনা আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিবে না। ইহা কবিকল্পনা বা ভাবুকের সুখস্বপ্ন নহে, ইহা এই বাস্তব জগতে একদিন সত্যে পরিনত হইবে। সেই দিন সমাগত, পাঠক, শ্রদ্ধাসহায়ে সেই দিনের ভাবে মাতোয়ারা হও, ইহাও একপ্রকার সাধনা।

যোগের কথা

যোগের অঙ্গ চতুষ্টয়।

আজ তোমাদিগকে যোগের যে অঙ্গচতুষ্টয় বা চারিটি সোপান সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার যোগ সন্ন্যাসীর যোগ নয়, আমি নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া আবার ইউরোপীয় অনুশীলন (culture) বাদীদিগের মত আমি মনে করি না যে শুধু প্রবৃত্তির চেষ্টার

বলে প্রবৃত্তির উন্মেষণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টি করাই মানুষের চরম আদর্শ। নিবৃত্তি চাই কিন্তু সে নিবৃত্তি অন্তরে, প্রবৃত্তি চাই সে প্রবৃত্তি বাহিরের খেলার মধ্যে। পুরুষ নিবৃত্ত হইবে কিন্তু প্রকৃতি নিত্য নবরচনায় প্রবৃত্ত হইবে। পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে না,—গীতা যেমন বলিয়াছে, "বিমূঢ়" হইয়া পড়িবে না। আপনাকে সরাইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে প্রকৃতির হস্তে, প্রকৃতি আপন শক্তিবলে, আপন সাজ সরঞ্জাম দিয়া সৃষ্টি করিবে, অবাধে আপন ইচ্ছামত ফুটিয়া উঠিবে। পুরুষ শুধু দেখিবে, অনুমতি দিবে আর আনন্দ গ্রহণ করিবে। পুরুষ যেখানে নিবৃত্ত সেখানেই প্রকৃতি আপনার গভীরতর প্রেরণা অনুসারে চলে, আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, আপনার ঋতম্ভর মূর্ত্তিকে প্রকটিত করিতে থাকে—তখনই যোগের প্রকৃত ভিত্তিস্থাপন।

তুমি যে দিন তোমাকে আর তোমার কর্ম্মের নিয়ন্তারূপে বোধ করিবে না, তোমার প্রকৃতির উপর সকল ভার সমর্পণ করিবে, যে দিন তুমি দেখিবে তুমি নিজে শান্ত, নির্লিপ্ত, বিশ্বপ্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার বাহিরে সব করিয়া চলিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তোমার যোগের দীক্ষা। সেই দিন হইতে দেখিবে প্রকৃতি তোমার মধ্যে, তোমার আধারের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া চলিয়াছে। আধারের এই পরিবর্ত্তন সাধনই সমস্ত যোগ সাধনা। তখন দেখিবে নিজে তুমি চেষ্টা করিয়া কিছু করিতেছ না, অথচ তোমার মধ্যে কত পুরাতন প্রবৃত্তি খসিয়া পড়িতেছে, কত নব নব প্রবৃত্তির উন্মেষে তোমার জীবন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের নির্লিপ্ততা—বৈরাগ্য আমি বলিতে চাই না—তোমাকে জগৎ হইতে ছাড়াইয়া লয় নাই, বরং জগতের বিরাট হইতে বিরাটতর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আধারের পরিবর্ত্তন সাধনের চারিটি স্তর। আমি বলিয়াছি উহা হইতেছে শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি। প্রথমে চাই আধারকে দোষনির্ম্মুক্ত করা, পুরাতনকে দূর করা, প্রকৃতির অন্ধ প্রবৃত্তি সমূহের খেলাকে বন্ধ করা। তাহাই হইতেছে শুদ্ধি ও মুক্তি। তৎপরে নূতনের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির জ্ঞানোদ্ভাসিত উচ্চতর প্রবৃত্তির বিকাশ ও পরিপূর্ণতা, তাহাই হইতেছে ভুক্তি ও সিদ্ধি। ক্ষেত্রটি হইতে প্রথমে আগাছা সব নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর বীজবপন ও তারপর শস্যের আবির্ভাব।

এখন আধার বলিতে কি বুঝি? বুদ্ধি, মন, চিত্ত, প্রাণ ও শরীর এই

পাঁচটি স্তর লইয়া জীবের আধার। এই পাঁচটি স্তরের মধ্যেই শুদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি, ও সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই তোমার পূর্ণযোগ। সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে শুদ্ধি হইতে। শুদ্ধিরও আবার আরম্ভ বুদ্ধি হইতে। কারণ মানুষ বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিই তাহার কেন্দ্রস্থল, এযুগে বুদ্ধির মধ্যেই সে আপনাকে স্থাপনা করিয়াছে। মানুষ বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছে সেই অনুসারেই জীবনকে ও জগৎকে গঠিত করিতে চাহে। তোমার চিন্তার গতি যেমন কার্য্যও অলক্ষিতে ক্রমে ২ তদনুরূপই হইয়া পড়ে। মানব-সাধারণের মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, বুদ্ধিরই প্রভাব তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে। বুদ্ধির উপরই মানুষকে যদি এত খানি নির্ভর করিতে হয়, তবে বুদ্ধিকে এরূপভাবে গঠিত করিতে হইবে যে তাহার উপর যেন সত্যসত্যই নির্ভর করা যায়। সকলের আগে তাই প্রয়োজন বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। বুদ্ধির দোষ কি? বুদ্ধির দোষ কূটতর্ক, বুদ্ধির দোষ কল্পনায় মায়ামরীচিকা রচনা, বুদ্ধির দোষ একদেশদর্শিতা। বুদ্ধি বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না—যে দিকটি সহজেই নজরে পড়ে, যাহা সহজেই বোধগম্য সেই টুকুই ধরিয়া বসে। এই খণ্ডজ্ঞানটুকুর দ্বারাই সকল বস্তু বুঝিতে চায়, এই টুকুর দ্বারাই জগৎকে পরিমাপ করিতে অগ্রসর হয়। তাহার ফলে আমরা সত্যটি হারাইয়া ফেলি, এক কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বসি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর এক প্রকার জ্ঞান আসিয়া জোর করিয়া এই সৌধটিকে না ভাঙ্গিয়া ফেলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে একমাত্র কল্পান্তস্থায়ী সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি। বুদ্ধির এই সকল দোষকেই নিরাকৃত করিতে হইবে। বুদ্ধির মুখ হইতে সেই উগ্র হিরন্ময় পাত্রটি অপসারিত করিতে হইবে। বুদ্ধি হইবে প্রশান্ত, উদার। বুদ্ধির কাজ সৃষ্টি নয়, বুদ্ধির কাজ বুঝা। ঊর্দ্ধলোক হইতে যে জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে তাহাকে ধারণ করা, তাহার অর্থ গ্রহণ করা, তাহাকে যথাযথ প্রতিফলিত করা। বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানের আধার হইলে, বুদ্ধির শুদ্ধি হইলে মনের শুদ্ধি। মন হইতেছে অনুভূতির (Sensation) ক্ষেত্র—পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহিরের জগতের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া যে রূপ রস প্রভৃতির পরিচয় পাইতেছে তাহারই আলেখ্য মন। মনের দোষ চাঞ্চল্য, বিষয়ের দাসত্ব। স্থূলইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যদ্বারা যে জ্ঞানকে ধরিতে পারি না মন তাহাতে বিশ্বাস করে না, অথবা তাহার কোন খোঁজ রাখে না। পশুর যে জ্ঞান, যে চৈতন্য তাহা এই মনের জ্ঞান, মনের চৈতন্য। এই স্থূল অনুভূতিলব্ধ চিন্তাকেই

মন আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিন্তা করিতেছে। মন কিন্তু কখন একটি বিষয়ের উপর অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকিতে পারে না—সর্ব্বদাই সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনকে তাই শান্ত করিতে হইবে—বহির্জগতের তাড়না অনুসারে উহাকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিও না, চিরাভ্যস্ত অনুভূতিরই দাস করিয়া রাখিও না। মন স্থির ও শান্ত হইলে শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান তাহা মনের নূতন সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া দিবে, উহার দ্বারা বিষয়ের যে প্রতীতি তুমি পাইবে, তাহাই সত্য প্রতীতি। মনের পর চিত্ত। চিত্তের দুইটি স্তর। নীচের স্তরটি হইতেছে এক রকম ভাণ্ডারঘর—মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে, চিন্তা করে, অনুভব করে তাহার সার-অংশটি ঐখানে রহিয়া যায়। মানুষের সকল রকম অভিজ্ঞারই শিকড় এই স্তরের মধ্যে। তুমি ভুলিয়া যাও বা না যাও একবার কোন রকমে যে বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ তাহার চিহ্ন এই চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মানুষ চিত্তের অন্তর্গত এই সকল সংস্কারেরই বশীভূত—ইহাদের দ্বারাই জ্ঞানে অজ্ঞানে পরিচালিত। চিত্তের শুদ্ধি অর্থ তাই এই সকল সংস্কারগত স্মৃতিকে দূর করা, একটা অন্ধ অজ্ঞানের ছায়া যে ইহাদিগকে ঘিরিয়া আছে তাহাকে অপসারিত করা। যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তন-সংঘর্ষের ফলে তুমি আজ যাহা হইয়াছ তাহাই তোমার সব, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, চিত্তের যে এরূপ একটা তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক প্রেরণা আছে তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। অতীতের স্মৃতিকে ধারণ করাই চিত্তের একমাত্র কার্য্য নয়। ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষও যাহাতে চিত্তে প্রতিফলিত হয় সেই জন্য চিত্তকে উদার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। চিত্তের উপরের স্তরটি হইতেছে হৃদয়ের অনুভবের, ভাব-প্রবণতার ক্ষেত্র। যাহারই সহিত চিত্ত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, সে হৃদয়াবেগ দিয়া সেই সম্বন্ধটিকে অতিমাত্র তীব্র করিয়া তুলে। ফলে চিন্তার জগতে তুমি অধীর অসহিষ্ণু হইয়া পড়; গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি তোমার আর থাকে না। হৃদয়বৃত্তির জগতে লজ্জা ঘৃণা ভয় ক্রোধ প্রভৃতি বিকৃত-বৃত্তি তোমার সাহস বীর্য্য প্রেম প্রভৃতি সত্য-বৃত্তিকে কলুষিত আবরিত করিয়া রাখে। কর্ম্মের জগতে তোমার কর্ম্মের নিয়ামক হয় রাজসিক উত্তেজনা। চিত্তের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে হইবে—বিকারজনিত যে ভাব তাহার পরিবর্ত্তে সত্য নিত্য ভাবকে স্থাপিত করিতে হইবে। চিত্তের শুদ্ধির পর প্রাণের শুদ্ধি। প্রাণ হইতেছে ভোগের ও কর্ম্ম প্রেরণার ক্ষেত্র। বাসনাই ইহার প্রধান দোষ, এমন কি এক-মাত্র দোষ বলিলেও চলে, কারণ বাসনা হইতেই আর যাহা কিছুর উৎপত্তি।

তোমার বাসনা, ইহা হইতে উহা পাইতে, কামনার ধন পাইলে তোমার হর্ষ, না পাইলে দুঃখ—শত চেষ্টার মধ্যে এইরূপে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছ। এই বাসনাকে দূর কর, কোন কিছু বাসনা করিও না, তবে তোমার চেষ্টার মত্ততাও দূর হইবে, তবেই তুমি প্রাণে সত্যশক্তি ধারণে সমর্থ হইবে, তবেই তোমার মধ্যে সত্য প্রেরণার খেলা হইবে, সত্যপ্রেরণা তাহার তৃপ্তিকেও আপনার সঙ্গে বহিয়া আনিবে। বাসনার তিন রকম মূর্ত্তি—আসক্তি, কামনা ও রাগদ্বেষ। যখন তুমি এরূপ বোধ কর যে একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তু তোমার চাইই, না পাইলে বুঝি বিশ্বজগৎই উল্টাইয়া যাইবে তখনই তোমার আসক্তি। আবার এরূপ উগ্রভাব দূর হইলেও, পাইবার জন্য একটা আকাঙ্খা রহিয়া যায়, সর্ব্বদাই প্রাণটি সেইদিকে পড়িয়া থাকে, ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেও সামান্য কারণেই জাগিয়া উঠে—ইহাই হইতেছে কামনা। কামনাও দূর করিতে পারিলে থাকে তোমার রাগদ্বেষ অর্থাৎ কতকগুলি জিনিষের সংস্পর্শে আসিলে তোমার সুখ বোধ হয়, আবার কতকগুলির সংস্পর্শে আসিলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর। এই রাগদ্বেষও দূর করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব বস্তুতে পূর্ণ সমতা পাইলে প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি। সর্ব্বশেষে হইতেছে শরীরের শুদ্ধি। রোগ জরা মৃত্যু শরীরের দোষ—শরীর ইহাদের দাস। শরীরের সংস্কার, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মবশে তাহার রোগ হইবে, সে জরাজীর্ণ হইবে, পরিশেষে মৃত্যুর কবলে তাহার অবসান। যোগী কিন্তু জানেন স্থূল প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য নহে, তাঁহার শরীরও উহার ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র নহে! যোগীর শরীর হইবে নিরোগ, যুবকজনোচিত স্বাস্থ্যে পূর্ণ, যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু।

আধার যদি শুদ্ধ হইল, মুক্তিও তবে উহার করায়ত্ত। মুক্তি শুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। শুদ্ধির পূর্ণতাই মুক্তি। কারণ মুক্তি অর্থ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি, আর আধারের দোষ হইতেছে এই দ্বন্দ্বের দাসত্ব। মন বুদ্ধির দ্বন্দ্ব হইতেছে সত্যাসত্য পাপ পুণ্য বোধ। তোমার সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য কি? মানুষ আপাততঃ যাহার কোন অর্থ, জগৎ ব্যাপারে যাহার কোন সামঞ্জস্য কিছু করিতে পারে নাই তাহারই নাম দিয়াছে পাপ, অসত্য ইত্যাদি। অধিকাংশ স্থলেই সুবিধা অসুবিধার মান দণ্ড দিয়া, নিজের মনগড়া এক আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সেই আদর্শ অনুযায়ী যাহা সত্য তাহাই সত্য পুণ্যকর আর সব পাপ অসত্য। যোগীর অন্য আদর্শ নাই—তাঁহার আদর্শ ভগবান্ স্বয়ং। ভগবান্ ত সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে। তোমাকে মানুষের দ্বারা স্থিরীকৃত পাপপুণ্য সত্যাসত্য বিচার করিয়া চলিতে হইবে না—চলিতে হইবে ভগবানের প্রেরণায়। ভগবান্ যাহা ত্যাগ করিতে বলেন তাহা ত্যাগ

করিব কিন্তু অসত্য বলিয়া নয়, পাপ বলিয়া নয়, ভগবান তাহা চাহেন না বলিয়া। ভগবান যাহা গ্রহণ করিতে বলেন তাহা গ্রহণ করিব পুণ্য বলিয়া নয় ভগবান তাহা চাহেন বলিয়া। চিত্তের দ্বন্দ্ব বোধের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রিয় অপ্রিয় বোধ, মঙ্গল অমঙ্গল বোধ, মান অপমান বোধ এ সব হইতেছে চিত্তে অহংকারের ঢেউ। সুখ-দুঃখ, আকাঙ্খাবিতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাণের বন্ধন আর শরীরের বন্ধন ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণ বোধ, শরীরের সুখ ও বেদনা বোধ। এ সকলের অতীত হইয়া তোমাকে শান্ত স্থিতসত্ত্ব হইতে হইবে। ত্রিগুণের খেলা হইতে যখন তুমি মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির যখন তুমি দাস নও, যখন কোন সংস্কার দ্বারাই তুমি আবদ্ধ নও, তখন তুমি স্বরাট, মুক্ত।

যখন তুমি শুদ্ধ ও মুক্ত, চির প্রথাগত সংস্কার সমূহকে, প্রাক্তনকে যখন তুমি কাটাইয়া উঠিয়াছ তখনই আরম্ভ হইবে তোমার মধ্যে নূতনের খেলা, মানুষভাবের পরিবর্ত্তে দেবভাবের বিকাশ। তাহার আরম্ভ ভুক্তি—অর্থাৎ সমস্তখানি আধারের মধ্য দিয়া আনন্দের ক্রীড়া। আধার ক্লেদ মুক্ত, বন্ধন মুক্ত, এখন সেই নির্ম্মল আনন্দস্রোত অব্যাহত গতিতে বহমান থাকিবে। এই আনন্দ সাগর হইতেই সকল সৃষ্টি। চিন্তায় তোমার আনন্দ সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে বাক্‌যুক্ত করিয়া। মনের অনুভূতিতে আনন্দ—সকল বস্তুর, সকল ঘটনার সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের রসভোগ করিয়া। প্রেম, মৈত্রী তোমার চিত্তকে ভরিয়া দিয়াছে। যাবতীয় সুখভোগ্য পদার্থ তোমার সজীব শক্তিপূর্ণ প্রাণকে তৃপ্ত করিতেছে। শরীরও তাহার আপন আনন্দ খুঁজিয়া লইয়াছে।

যোগের শেষ হইতেছে সিদ্ধি। সিদ্ধিই যোগের লক্ষ্য, শুদ্ধি মুক্তি ভুক্তি চাই এই সিদ্ধির জন্য। আধার যখন পুরাতনকে একেবারে দূর করিয়াছে, পুরাতনেরই মত অথবা তাহা হইতেও প্রভূততর ধন রত্নে নূতনের মধ্যে আবার সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে তখনই তুমি সম্রাট, তখনই তোমার যোগসিদ্ধি।

এই সিদ্ধির কথা তোমাদিগকে আমি আগামী বারে বলিব। একটি বিষয়ের প্রতি শুধু তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমার এবারের কথা শেষ করিব। আমি যে প্রথমে শুদ্ধি, তারপর মুক্তি, তারপর ভুক্তি ও সর্ব্বশেষে সিদ্ধি অথবা বুদ্ধি মন চিত্ত প্রভৃতি একটির পর আর একটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বলিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য। মনে করিও না তোমাদের যোগ এইরূপ একটির পর আর একটি শেষ করিয়া তবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। মানুষকে কখন এমনভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখা যায় না। সবগুলি ভাব সবগুলি বৃত্তি মানুষের মধ্যে এক সঙ্গে কার্য্য করে। যোগের চারিটি অঙ্গ পরস্পর সাপেক্ষ, মানুষের আধারের স্তর গুলির পরিবর্ত্তন সাধনও পরস্পর সাপেক্ষ। কোন একটি স্তর হইতে কোন একটি অঙ্গের মধ্য দিয়াই সাধনা আরম্ভ হইতে পারে কিন্তু কোন একটির পূর্ণতা আর সকল গুলির পূর্ণতার উপরই নির্ভর করে।

আত্ম-তত্ত্ব

অধ্যাত্মযোগের দ্বারা জীবনটা যে স্বপ্ন নয় ইহা শীঘ্রই উপলব্ধি হইবে। এজীবনের মধ্যে যে সত্য আছে, সেই সত্যের প্রেরণায় আমাদের জীবন, ইহা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে হইবে এবং সত্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগদ্ধিতায় কার্য্য করিতে হইবে।

যখন জীবনটা সত্য হইয়া উঠিবে, যখন দেখিবে জীবনের সকল যন্ত্রগুলিই পুরুষের আয়ত্তাধীন, তখন পুরুষের ইচ্ছামতই প্রকৃতির হস্তে এ সমস্ত সমর্পণ প্রশস্ত, কেন না পুরুষ নির্ব্বিকার, আনন্দময়, প্রকৃতিই সকলের নিয়ন্ত্রী।

পুরুষের কোন অহঙ্কার নাই, আজ পুরুষ স্ব সৃজিত মায়া দ্বারা বিমূঢ়, তাই তিনি শরীরে, মনে, প্রকৃতিতে আবদ্ধ এইরূপ মনে করিয়া নানা দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছেন, পরন্তু তিনি শুদ্ধ, মুক্ত, আনন্দময়।

জীবনের মধ্যে তিনটীর পার্থক্য দর্শন কর (১) পুরুষ (২) প্রকৃতি (৩) যন্ত্র। পুরুষ স্বরাট্, হিরণ্যগর্ভ। প্রকৃতি পরা ও অপরা শক্তি। যন্ত্র, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত ক্রীড়নক।

পরা—বিদ্যা, অপরা—অবিদ্যা বা মায়া। পুরুষ এই প্রকৃতির সাহায্যে ক্রীড়নক লইয়া খেলিতেছেন, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা কর। পুরুষ এক, অখণ্ড হইলেও ইচ্ছা করিয়াই ত্রয়ী হইয়াছেন; সকলের মধ্যে একই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধ করিয়াও, বিভিন্ন বস্তুর আনন্দ উপভোগ কর, কেন না তুমি স্বয়ং পুরুষ, ভোক্তা। ভোগই তোমার ইচ্ছা। ভোগেই এই বৃহতের সৃষ্টি।

এই যে শরীরযন্ত্রের শীর্ষস্থানে ভাবময় ভগবান্ যন্ত্রারূঢ় হইয়া চিৎশক্তির সাহায্যে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন—সেই ভোক্তাই তুমি; এই যে পঞ্চ জ্ঞান ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া যে পুরুষ জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নানা লীলা প্রকটন করিতেছেন, সেই পুরুষই তুমি। এই যে কর্ম্মশক্তি, চেতনাশক্তি, ইহাও সেই পুরুষেরই ইচ্ছাসম্ভূত কালীশক্তি।

আর এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, চিত্ত, বুদ্ধি,

অহঙ্কার, এগুলি সেই পুরুষেরই নিত্যসৃষ্টি, নিত্যলীলার উপকরণ; সুতরাং জীবন স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, ইন্দ্রজাল নয়; জীবন সত্য, শিব, সুন্দর, জীবন—স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল; এই জীবনরূপ ত্রিলোকও সেই নিত্যের সৃষ্টি, সতের সৃষ্টি, সত্যের সৃষ্টি।

অতএব হে প্রাণাধিক বন্ধুগণ, হে এক, অদ্বৈত সুন্দর মানব, উদ্ভ্রান্ত চিত্তে কিসের অন্বেষণ কর? আজ এই গোপনরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর—দেখ,

"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"

চিন্তা-চুম্বক

শোভন কি? যাহা সত্য তাহাই শোভন। যাহা মিথ্যা তাহাই কুৎসিত। দাঁড়কাকের দাঁড়কাকত্বই শোভন। ময়ূরপুচ্ছ চিরকাল তাকে কুৎসিতই করে তুলবে।

সত্য কি? যাহা শোভন তাহাই সত্য। যাহা অসুন্দর, যাহা অশোভন তাহাই বিকার। মানুষের প্রেম, প্রীতিই সত্য কারণ তাহাই শোভন, তাহাই সুন্দর। তার ঘৃণা, দ্বেষ বিকার কারণ তাহা অশোভন।

মানুষ সুন্দর হয় যখন তার চোখে ভালবাসা ফুটে উঠে—সেটাই সত্য। মানুষ কুৎসিত হয় যখন সে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে—সেটা বিকার।

মুক্তি কি? সমস্তকে আলিঙ্গন করাই মুক্তি। সমস্ত হ'তে দূরে থাকা সেত সমস্তকে বর্জ্জন করা। বর্জ্জন মুক্তি নয়।

পাপ কি? অক্ষমতাই পাপ। ভগবানের পাপ পুণ্য নাই কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

শুদ্ধ কি? অগ্নি। অগ্নিই তেজ। আবার তেজই শক্তি। শক্তির স্পর্শ যেখানে সেখানেই শুদ্ধি।

* * *

শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ আছে। আমরা এক নূতন যোগ স্থাপন করব—কাম্যযোগ।

সেটা হচ্ছে ভোগের ভিতর দিয়ে ভগবান্ লাভ।

কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যদি ভগবান্ লাভ হয়, তবে ভোগের ভিতর দিয়ে কেন হবে না? চাই শুধু মনের কম্পাসটি সেই দিকে ঘুরিয়ে ধরা।

কর্ম্মত সবাই করে। সবারই কি ভগবান্ লাভ হয়? কারণ সবাইত ভগবান্ লাভ করবার জন্য কর্ম্ম করে না। তবেই বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্মের নিজস্ব ভগবান-পাওয়া-রূপ-ফল প্রসব করার কোন ক্ষমতা নাই।

আমরা ভোগ কর্‌ব ভগবানকে লাভ করবার জন্য, এমন কি ভগবানেরই ভোগের জন্য।

যাহার রতিতেই আপত্তি, ভগবানের সঙ্গে রতি তার কি রূপে সম্ভব?

যে প্রেম শুধু একটু চোখের দেখাতেই তৃপ্ত হয়ে যায় সে প্রেম কি প্রেম?

নবীন যুগের এই মূলমন্ত্র হউক যে ভিক্ষুক সেজে ভগবানের করুণা ভিক্ষা কর্‌ব না। সেজেগুজে প্রেমিক সেজে আমরা তার সঙ্গে প্রেম কর্‌ব।

* * *

নীতি শাস্ত্রের যা কিছু মূল্য সেটা কেবল মানুষের কাছে। শুধু নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট নিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না।

গাছের প্রত্যেক পাতাটি উদ্ভূত করার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, ফুলের প্রত্যেক পাপড়িটি খুলে দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে—মানুষের প্রত্যেক শক্তির স্ফুরণের মধ্যে সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দ লুকান রয়েছে।

ভগবান্ ত অসীম। তবে আপনার চারিপাশে সীমা কেটে মানুষ ভগবানকে উপলব্ধি কর্‌বে কেমন করে?

* * *

মানুষের অভাববোধেরই মধ্যে তার সকল ভাববোধের ভিত্তি। মানুষের জীবন থেকে তার অভাবসকল তুলে নাও—দেখ্‌বে মানুষ তখন কলের পুতুলের মত হ'য়ে পড়বে।

মানুষের দুঃখবোধের মধ্যে তার সকল আনন্দলাভের সকল ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। মানুষের জীবন থেকে তার সকল দুঃখ তুলে নাও দেখ্‌বে মানুষ তখন ধীরে ধীরে পশুত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকবে।

জীবনে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই প্রয়োজন। সুখ প্রেয় ব'লে প্রয়োজন, দুঃখ শ্রেয়ঃ ব'লে প্রয়োজন। সুখে তুষ্টি আছে বলে প্রেয়ের প্রয়োজন, দুঃখে মঙ্গল আছে ব'লে শ্রেয়ের প্রয়োজন।

মানুষ যা চায় তাই পায়। এর আর কোন ব্যতিক্রম নেই। তবে সে চাওয়া মনের চাওয়া নয়, বুদ্ধির চাওয়া নয়, প্রাণেরও চাওয়া নয়। এ সকলের অন্তরালে, এ সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে আমাদের মধ্যে যে পাকা "আমি" রয়েছে সেই পাকা "আমির" চাওয়া হওয়া চাই।

দেব লীলা।

আজ বাংলার সর্ব্বত্রই শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রাণশক্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। নানা অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া এই প্রাণশক্তি শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। অবশ্যই অহঙ্কার বা অশুদ্ধ আধারভেদে কার্য্যের গতি নানা আকার ধারণ করিলেও সকলের ভিতর যে একটা তাজা প্রাণের সাড়া রহিয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

স্বদেশী যুগের পর হইতে দেশের অনুষ্ঠানগুলি বিধাতার পরিমিতকারী বিধানে ক্রমশঃই নিয়মিত ও সুপরিচালিত হইয়া উঠিতেছে। কালে বাংলাদেশ যে জগতের চক্ষে মহামহিমান্বিত আদর্শ দেশ হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে আমাদের আর সন্দেহ নাই।

এই যে বাংলার ক্রমোন্নতি—ইহাতে মানুষের আদৌ হাত নাই; যেখানে মানুষের অহঙ্কার, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানেই বিধাতার উদ্যত বজ্র, ব্যর্থতার সম্মুখীন করিয়া সেই অহং বুদ্ধিকে ভগবদাশ্রিত, ভগবদ্‌পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, আজ স্বয়ং বিধাতাই বাঙ্গালীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সর্ব্বকর্ম বিধাতার উদ্দেশ্যেই সংঘটিত, বাঙ্গালীর জীবন তরণীর কর্ণধার—শ্রীভগবান্।

এই যে সেদিন মোহগ্রস্ত, সুপ্ত বাঙ্গালীর কর্ণে স্বদেশীমন্ত্র প্রবেশ করিল—এই যে সে মহামন্ত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া দেশ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—ইহার ভিতর মানুষের কর্তৃত্ব ছিল কি? কোনও ব্যক্তি বিশেষের কল্পনায় ইহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল কি? ইহা ভগবানের দান, তাঁহারই ইচ্ছাসম্ভূত।

এইরূপ বিচিত্র, বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া ভগবান্ বাঙ্গালীর চরিত্রকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেছেন। একটা অর্দ্ধোদয়যোগ উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীর কলুষিত জীবনে যে পুণ্যচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ভুলিতে পারিব কি? বাঙ্গালীযুবক সেদিন দেখিয়াছে, যে তাহার একটী মা নয়, একটী ভগ্নী নয়; সাত কোটী নর-নারী তার পরমাত্মীয়। দেশ সেদিন মূর্ত্তিমতী হইয়া বাঙ্গালীর জীবন ধন্য করিয়া দিয়াছে। তার পর বর্দ্ধমানের প্রবল বন্যা। সেদিনও ভগবান্ আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন যে দেশ আমাদের কত প্রিয়। বস্তুতঃ সে দিন আমরা দেশকে যে কত ভালবাসি তাহার পরিচয় পাইয়াছি। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, আপামর সাধারণ বর্দ্ধমানের রক্ষাকল্পে যে উন্মাদনা দেখাইয়াছে তাহা দেশ ভক্তির যথার্থ অভিব্যক্তি। এ ঘটনা কি মানুষের সৃষ্টি? এ যে দুঃখের মধ্যে সুখের সৃষ্টি, এ "যে করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে, সহসা দেখি যে নয়ন মেলিয়ে এনেছ তোমারই দুয়ারে"। আবার সেদিন এক নূতন ঘটনা, নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাংলা দেশ যখন খাঁটী সোণা হইবার জন্য জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে দগ্ধ হইতেছিল, কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার পুণ্যচরিত্র বিকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছিল, দেবচরিত্র লাভের ঘনঘটা অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যপথে ক্ষণেকের তরে পথ হারাইয়া, হতাশ নয়নে ভগবানের প্রেরণা প্রতীক্ষা করিতেছিল, দারুণ অস্পষ্টতার মধ্যে পড়িয়া পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে অসমর্থ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ক্ষুদ্র চন্দননগরকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ যে লীলা প্রকট করিলেন, তাহা আশাতীত, কল্পনাতীত, ধারণাতীত।

বাংলার ইতিহাসে, এ এক নূতন ঘটনা, নূতন আলো, নূতন যুগ। বাঙ্গালী, বীরের মত মরিবার অধিকার পাইয়া, ২০ জন যুবক যখন ইউরোপের মহাযুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বীরদর্পে চন্দননগর পরিত্যাগ করিল, তখন বাংলার যে উৎসাহ, যে উত্তেজনা, যে অভাবনীয় ভাবের দ্যোতনা দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিব না। রঙ্গমঞ্চেই জননী সন্তানকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করে দেখিয়াছি—আর আজ প্রত্যক্ষ জীবন্ত দৃশ্য দেখিলাম—এই জড়চক্ষে এই বাঙ্গালীর অর্দ্ধমৃত সংসারে দেখিলাম—জনক জননী পুত্রের গলায় বিজয়মাল্য পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল—পত্নী যুদ্ধগমনোন্মুখ পতিকে শেষ প্রণাম করিল—সহোদরা স্বহস্তে ফুলের মালা গাঁথিয়া সহোদরের কণ্ঠে পরাইয়া দিল—আর আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী হুলুধ্বনি করিল, জষ্টিস্ চন্দ্রাভর কর, জষ্টিস্ চৌধুরী, এস্, পি, সিংহ, মতিলাল ঘোষ, পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার মনীষীগণ এ নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন।

একি ভগবানের লীলা নয়—একি তাঁর আলো নয়—যে আলোয় আজ বাংলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল? তাই বলি, হে বাঙ্গালী, আজ এই আশার দিনে, অহমিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হইয়া প্রতীক্ষা কর—যিনি বলিয়া গিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সত্যং ঋতং বৃহৎ।

সত্যং ঋতং বৃহৎ এই তিনটি কথা ছিল আর্য্য ঋষিগণের সাধনার বীজমন্ত্র। সমস্ত বেদ এই তিনটি কথারই ব্যাখ্যামাত্র এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সত্য ঋত বৃহতের দ্বারাই দেবতাগণ গঠিত, সত্য ঋত বৃহতেরই তাঁহারা এক এক মূর্ত্তি। আপনার মধ্যে সত্যকে ঋতকে বৃহৎকে উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিপূর্ণ করিয়াই প্রাচীন সাধকগণ দেবতার জন্মদান করিয়াছেন, দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। অটুট যে প্রতিষ্ঠা, অব্যভিচারী যে সত্ত্বা, সেই সত্যের উপর দাঁড়াইতে হইবে। চলিতে হইবে, জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে এই সত্য হইতে উৎসারিত প্রেরণার দ্বারা—ঋতের দ্বারা কর্ম্মরাজী সম্পাদিত করিতে হইবে। আর এই সত্য-সত্ত্বা এবং এই সত্যপ্রেরণাকে ব্যাপিয়া, আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে অনন্ত, যে মহান্ বৃহৎ, তাহা হইবে তোমার নিবাসভবন, তোমার লীলা ক্ষেত্র।

প্রথমে খুঁজিতে হইবে সত্য, তাই জানা চাই সত্যকে, পাওয়া চাই সত্যের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়স্পর্শের দ্বারা যে জ্ঞান পাই তাহা সত্যের জ্ঞান নহে। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু বাহ্যরূপের পরিচয় পাই, কিন্তু বাহ্যরূপই বস্তুর সবখানি নয়। বিচারের দ্বারা যে জ্ঞান পাই তাহাও সত্যের জ্ঞান নহে। কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতীতির উপরই বিচার প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ, নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। বিচার যতই সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ হউক না, ইন্দ্রিয়বোধই উহার উপকরণ বলিয়া কখনও ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতাদোষ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে

পারে না। শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান তাহাও সত্যের জ্ঞান নহে। কারণ ইন্দ্রিয়ের দাস না হইলেও, সে আবার কল্পনার দাস হইয়া পড়ে। সত্যকে দেখিলেও দেখে কল্পনার চক্ষে, সত্যবস্তুটির সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। দার্শনিকের জ্ঞান জাগ্রত জীবন্ত নয়।

সত্য কি? যাহা সৎ, সতে যাহা নিহিত, যাহা অস্তি, যাহার কোন ব্যত্যয় নাই, যাহা ভাবাত্মক, অভাব বা সন্দেহের লেশমাত্র যাহাতে নাই, সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত বস্তুই সত্য। সত্য জানা অর্থে সত্যকে দেখা, বস্তুর যে সত্তা তাহার অপরোক্ষানুভূতি। তুমি যাহা ভাবিতেছ, যাহা করিতেছ তাহা কিসের উপর স্থাপিত, কোথায় তোমার প্রকৃত তুমি? সকল চঞ্চলতা, বৈচিত্র্যের অন্তরালে সেই স্থিরসত্ত্ব আত্মচৈতন্যমাত্র রহিয়াছে যাহা, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে দেখ। ইহা শরীরের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধিরও অতীত। ইহা কেবল দৈবদৃষ্টিগ্রাহ্য। জগৎলীলার বাহ্য নিয়ম, স্থূল প্রণালী, মানুষের চিন্তাস্রোতঃ, কর্ম্মাবলীর দ্বারাই জগৎকে, মানুষকে জানিও না। জগতের সকল লীলাতরঙ্গের পশ্চাতে কোন্ আত্মবিধৃত সত্তা রহিয়াছে, মানুষের সহস্রমুখী গতিশীলতাকে কোন্ মূল বস্তুটি ধরিয়া রহিয়াছে তাহাকে হৃদয়ঙ্গম কর। নিজের সত্তাকে চিনিয়া, নিজের সত্তাকে অপরের সত্তার মধ্যে মিশাইয়া দাও। আত্মার দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিতে হইবে। তাহাই দৈবদৃষ্টি, তাহা হইতেই সত্যের জ্ঞান।

সত্যকে জানাই শেষ নয়। সত্যকে পাইতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা যে সৎবস্তুকে চিনিতে পাইয়াছ, তাহাকে চিনিতে, বুঝিতে পারিলেই সব হইল না। তাহাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে, তাহার দ্বারাই পূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে। সেই সত্তা জ্ঞানগম্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য শুধু নয়; তাহা যে তুমিই, সর্ব্বদা এই বোধ এই অনুভূতি জাগরূক রাখিতে হইবে। দৃষ্টির দ্বারা যাহার পরিচয় পাইয়াছ, স্পর্শের দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। বস্তুতঃ জ্ঞেয়কে যতক্ষণ জ্ঞেয়রূপেই দেখ ততক্ষণ তোমার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। জ্ঞেয়ের মধ্যে একসত্ত্ব হইয়া যাওয়াই প্রকৃত জ্ঞান। ইহা তোমার নিজের সত্তাই হউক আর অপরের সত্তাই হউক কারণ সকল সত্তাই এক, অবিভাজ্য।

তোমাকে, তোমার প্রকৃতিকে সত্তার ঐক্যে, সতের উপাদানে, সত্যে গঠিত হইতে হইবে। ক্ষণিকের যাহা, বাহিরের যাহা, যাহার মূল এই সতের মধ্যে নিহিত নয়, শৈবালদলের ন্যায় যাহা কেবল উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায় তাহা সত্য নয়। সতে অপচয় নাই, অভাব নাই, দৈন্য নাই। ইহা নিত্য, শাশ্বত

পুরাতন—ইহাই স্থাণু। ইহা শান্তি শুদ্ধি, ইহা অনবদ্য—ইহাই অমৃতত্ব। এই অমৃত সত্তার দ্বারাই তোমার শারীরিক, মানসিক, সকল অঙ্গকেই সংপূর্ণ সত্য-পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। বাহ্য বা অন্তরের কোন রূপের মধ্যেই যখন তুমি আর একান্ত বদ্ধ নও, আত্মার স্বরূপে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই যখন নিথর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছ তখন তুমি সত্যের বিগ্রহ, তখন তুমি স্বরাট্। আর তখনই জীবনে আরম্ভ তোমার সত্যের খেলা, কর্ম্মে সত্যের প্রেরণা।

সৎ হইতে, সত্য প্রতিষ্ঠা হইতে যে শক্তি, যে সৃজনবেগ, যে কর্ম্ম-ঈষণা বিচ্ছুরিত হইয়া সেই সত্যের মধ্যে গতি, বহুলতা বিকশিত করিয়াছে তাহাই হইতেছে ঋত। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সত্যের দ্বারা আপনার মধ্যে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া সেই সত্যের প্রেরণায় তোমার জীবনকে, তোমার কর্ম্ম-রাজীকে পরিচালিত করিবে। সত্তাকে নির্ম্মিত করিতে হইবে সৎবস্তুর দ্বারা, জীবনকে চালাইতে হইবে ঋতপ্রেরণার দ্বারা, সত্যের ধর্ম্মের দ্বারা। এই ঋতের দ্বারা এই সত্যধর্ম্মের দ্বারাই দেবতাগণ স্ব স্ব ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়াছেন, সৃষ্টিকে ক্রমবিকাশের-পথে লইতেছেন, মানুষকে ঊর্দ্ধমুখে দেবজীবনের অভি-মুখে উন্নীত করিতেছেন।

জীবনে তোমার আদর্শ কি? তোমাকে কোন কর্ম্ম করিতে হইবে? বুদ্ধি উচিত অনুচিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, জগৎ বা সমাজ আপন মঙ্গল অমঙ্গল নির্দ্দেশ করিয়া তোমার সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়াছে তাহা অনুসরণ করিও না। তোমার বাসনার বেগ যে পথ দেখাইয়া দিতেছে সে পথেও চলিও না। সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিও তোমার অন্তরতম সত্যবস্তুকে, তাহা হইতে কোন্ প্রেরণা আসিতেছে। তোমার সত্য সত্তার যে ধর্ম্ম তাহাই বিশ্বসত্তার নিগূঢ় ধর্ম্ম। দেবতাগণ তোমার মধ্যে কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে চাহিতেছেন, তাহাই তোমার সত্যধর্ম্মের নিয়ন্তা। বুদ্ধির উচিত অনুচিত, মনের প্রিয় অপ্রিয় প্রাণের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি দৃক্‌পাত করিও না। অনুভব কর সত্যের ধর্ম্ম, ঋতের প্রেরণা।

শুধু তাহাই নয়। বুদ্ধিকে, মনকে, প্রাণকেও ফিরাইতে হইবে। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রেরণার সহিত উহাদের যেন কোন বিরোধ না থাকে, উভয়ের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যই সংস্থাপিত হয়। বুদ্ধি ঋতকেই শ্রেয়ঃ বলিবে, মন ঋতকেই প্রেয় বলিবে, প্রাণের চেষ্টা ঋতমুখীই হইবে। তোমার সকল প্রেরণাই ঋতের সহিত সমসূত্রে সংগ্রথিত রহিবে। এইরূপে সত্যের সহজ-উৎসারিত প্রেরণা

যখন তোমার জীবনকেও ভরিয়া তুলিয়াছে, যখন শুধু অন্তরে নয়, বাহিরেও তুমি-সত্যপূর্ণ তখন তুমি সত্যের সচল বিগ্রহ, ঋতপূর্ণ হইয়া তখন তুমি সম্রাট।

সত্যকে ঋতকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে বৃহৎ। অসীমের মধ্যে, মহানের মধ্যেই তোমার সত্তার সত্যতা, তোমার কর্ম্ম প্রেরণার ঋতত্ব। বৃহতের অনুভূতি লইয়াই তুমি সত্যপূর্ণ ঋতপূর্ণ। সত্যের, ঋতের মানদণ্ড এই বৃহৎ। যে সত্তা বৃহৎ নয় তাহা সত্য-সত্তা নয়, যে প্রেরণা বৃহৎ নয় তাহা ঋতময় নয়। সত্যের ও ঋতের সাধনা কালে বৃহৎ দিয়া আরম্ভ করিবে, সর্ব্বদা বৃহৎকে সম্মুখে রাখিবে। এই কষ্টিপাথরে কষিয়া লইবে সত্য কি, ঋত কি।

অসত্য কি? মিথ্যা কাহাকে বলিব? যাহা সসীম, যাহা খণ্ডীকৃত, যাহা অল্প। এই অল্পের বোধ হইতেই দ্বন্দ্ব, ভেদ, বিরোধের উদ্ভব। আর বিরোধ যাহাদের মধ্যে তাহারা ত পরস্পর পরস্পরের অসত্যতাই প্রমাণিত করিতেছে। সামঞ্জস্য যেখানে নাই সত্যও সেখানে নাই। অসম্পূর্ণতাই অসামঞ্জস্যের কারণ। বৃহতে সকল পূর্ণতা, সকল সামঞ্জস্য, তাই বৃহৎ লইয়াই সত্য। বৈদিক ঋষিগণের তাই লক্ষ্য ছিল এই "অসামি," যাহা পূর্ণ, অর্দ্ধমাত্র নয়। বৃহৎ শুধু পূর্ণ নয় ইহা আবার মহান্। হীনতর নিম্নতর অপরাস্থিতি হইতে তুলিয়া আমাদিগকে স্থাপন করে পরম প্রতিষ্ঠায়। সত্তার বিস্মৃতির সহিত মরলোক ছাড়িয়া, আমরা স্বর্গ-লোকের অধিবাসী, দেবগণের সখা হইয়া উঠি।

অনৃত কি? বদ্ধ যাহা, কুটিল গতি যাহার তাহাই অনৃত। ঋত হইতেছে গতি, ঋজু সরল গতি। খণ্ডের মধ্যে, অল্পের মধ্যে যতক্ষণ আমরা ততক্ষণই আমাদের প্রকাশের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, ততক্ষণই লক্ষ্য ও প্রয়াসের মধ্যে একটা ছেদ, ততক্ষণই আমাদের প্রেরণা মুক্তবেগে চলিতে পারে না, আপনার চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলী করিয়া ঘুরিতে থাকে, অনিশ্চয়তার অন্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বৃহতে যখন আমাদের আবাস, প্রেরণা তখন বাধাহীন, অনন্তের বিস্তারে ঋজু-রেখা কাটিয়াই সে ছুটিয়া চলে। বৃহতের মধ্যেই আমাদের প্রেরণা পূর্ণস্রোতা, "পৃথোদরী"।

এই যে খণ্ড, এই যে অল্প, বৃহতের যাহা অভাব, অসত্যের, অনৃতের লীলা-ভূমি তাহার মূল হইতেছে অহংকার। মানুষ জগৎসত্তা হইতে পৃথক করিয়া, আপনার চারিদিকে একটা কাল্পনিক প্রাচীর তুলিয়া দিয়া মনে করে আমি ইহা, আমি উহা নয়। এই শরীর, এই মন, এই নাম, এই রূপ ইহা একান্ত আমারই।

অন্য শরীর মন, অন্য নাম রূপ হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানের সম্বন্ধ থাকিলেও, বস্তুগত কোন সম্বন্ধ নাই। এই নামরূপেরও আবার সবখানি নই না, কতকগুলি মাত্র নির্দ্দিষ্ট গুণ কর্ম্মের সমষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বলি ইহাই আমি, ইহাই আমার সব, ইহা আমারই। এই পরিচিত গুণ কর্ম্মকে অতিক্রম করিবার আমার সাধ্যও নাই, আমার উচিতও নহে।

কিন্তু মানুষ যাহাকে যতটুকুকে আমি ও আমার বলিয়া জানে প্রকৃতপক্ষে সে তাহার অনেক বেশী। অজ্ঞানতঃ সে যাহা, সে যতখানি, তার কিয়দংশ মাত্র তাহার জ্ঞানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অচেতনা বা অতীন্দ্রিয় চেতনা, এই "মহান্ অর্ণব", রহিয়াছে তাহার বর্ত্তমান চেতনা, বর্ত্তমান সত্তার অন্তরালে—ইহারই একটা ঢেউ তাহার অহঙ্কারের মধ্য দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। এই অচেতন "অপ্রকেতং সলিলং"কে সচেতন করিতে হইবে, জাগিতে হইবে বৃহতের ঔদার্য্যে। অহংকারের গ্রন্থিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আমার সত্তার সহিত অন্যের সত্তা, আমার কর্ম্ম প্রেরণার সহিত অন্যের কর্ম্ম প্রেরণার কোন নৈসর্গিক বিরোধ, কোন অসামঞ্জস্য, এমন কি কোন একান্ত পার্থক্য পর্য্যন্তও নাই। একই মূল সত্তা, একই মূল কর্ম্মপ্রেরণা, তাহারই নানা রূপ নানা নাম। সত্তার পৃথকত্ব বলিয়া কিছু নাই, সমস্তখানি সত্তাই আমি, সকলের মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সকলই বর্ত্তমান। আর যে প্রকৃতিকে আজ আমার বলিয়া অতিমাত্র মনে করিতেছি, তাহাই আমার সবখানি নয়; নিখিল প্রকৃতিই আমার প্রকৃতি। শুধু তাহাই নয় প্রকৃতিরও যে আবার নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি রহিয়াছে, যে মহান্ প্রেরণা প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে ক্রমে বিকশিত হইতেছে, আপনাকে চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে তাহাই আমি, তাহাই আমার।

বেদে তিনটি ভুবনের কথা আছে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ। পৃথিবী হইতেছে অন্নময় জগতের চেতনা, অন্তরিক্ষ প্রাণময় জগতের চেতনা, স্বর্গ মনোময় জগতের চেতনা। কিন্তু এই 'ত্রিরোচনার'ও উপরে রহিয়াছে যে তুরীয় যে চতুর্থ লোক তাহা হইতেছে বিজ্ঞানময় মহর্লোক, তাহাই সত্যের ঋতের বৃহতের জগৎ। শরীর প্রাণ ও মন এই তিনটি যূপকাষ্ঠে জীব বদ্ধ—অহংকার এই বন্ধনত্রয়ের গ্রন্থি। শুনঃশেফের মত আমাদিগকে শরীরের গ্রন্থি কাটিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে হইবে, মনের গ্রন্থি কাটিয়া উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে আর প্রাণের গ্রন্থি কাটিয়া দুই পাশে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তবেই আমরা সত্যের ঋতের বৃহতের জগতে পৌঁছিতে পারিব।

ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়া যখন বিশ্বসত্তার মধ্যেই আমিত্বকে পাইব, সকল সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া চিত্তের অন্তরস্থিত মুক্ত প্রেরণায় চলিব, সেই অখণ্ড অনন্ত বৃহতের সৎবস্তুতে জ্ঞানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইব, বৃহতেরই ধর্ম্ম জীবনে পূর্ণ করিব, তখনই আমি সত্যপূর্ণ ঋতপূর্ণ, তখনই সকল পূর্ণতা, সার্থকতা। তখনই আমি স্বরাট্ ও সম্রাট্ তখনই আমি বিরাট্।

—0—

রণসাধ।

সুযোগ পাইলেই ইউরোপের মনীষীগণ শান্তির কথা, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন প্রবন্ধ প্রভৃতি বড় বড় তত্ত্বকথা প্রচার করিতেন কিন্তু কালচক্রে প্রেরিত হইয়া, নৃশংস রণবিদ্যাই ইউরোপের মহাজাতিগুলির প্রাণের কথা, আর সব ধাজে ফাঁকা আওয়াজ। আজ ইউরোপের মনুষ্যত্ব কোথায়? দয়া, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণগুলির অস্তিত্ব যেন পাশ্চাত্য খণ্ড হইতে মুছিয়া গিয়াছে—পোপের করুণ চীৎকার, অরণ্যে রোদনস্বরূপ বৃথা রাজন্যবৃন্দের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে। ইউরোপে আজ রণসাধই বুঝি যুগধর্ম্ম। ইউরোপীয় গুরুর উৎকৃষ্ট শিষ্য বাঙ্গালী জাতিও পরিপূর্ণ জীবনের উপাদানস্বরূপ রণকৌশল শিক্ষার জন্য উদ্গ্রীব—রাজার নিকট ইহার জন্য করুণ আবেদন করিয়াছে—বিধাতাও যুগধর্ম্মের মহিমায় বিংশতিজন (এবং আরো অধিক হইতে পারে) বাঙ্গালীকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা ফরাসীরাজের যুদ্ধবিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। বহুদিন পরে বাঙ্গালীরও রণসাধ জাগিয়া উঠিল—মনে হয় এই বিশ্বব্যাপী মহা সমরাহবে বাঙ্গালীও বাদ পড়িবে না।

কিন্তু এই মানুষের মধ্যে রক্তপিপাসা নিবারণ করিবার জন্য ইউরোপের মনীষীগণ যে ব্যস্ত নহেন এ কথা স্বীকার করা যায় না। বহুদিন হইতে ভয়াবহ যুদ্ধ যাহাতে না হইতে পারে তাহার অনেক আয়োজন হইয়াছে কিন্তু বিধাতা বিদ্রূপের সহিত সকল আয়োজন বিফল করিয়া সংগ্রামকেই উৎকৃষ্ট আসন পাতিয়া দিয়াছেন। অতএব রণবিদ্যাই মহাজাতিগণের নিকট অধিক আদরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইউরোপ রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একদিন মনে করিয়াছিল, যদি সমুদয় জাতিগণের মধ্যে বাণিজ্যনীতি প্রবল হইয়া উঠে; ধনে সম্পদে, সুখে সচ্ছন্দে বাস

করিবার জন্য যদি তাহারা বৈশ্যভাবে জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িবে, রক্তপিপাসা নিবৃত্ত হইবে, দেশে শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মানবগণের বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত কল্পনা যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহাই প্রমাণিত হইল। এই বাণিজ্য-বিস্তারকামনা বিকট যুদ্ধদেবতাকে প্রেমালিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অধিকতর নৃশংস ও প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধেরই সৃষ্টি করিল।

বুদ্ধিজীবী মানুষের দ্বিতীয় কল্পনা, যে দেশের যুদ্ধগুলি প্রায় অভিজাতশ্রেণী বা রাজন্যবৃন্দের সৌভাগ্য ও সম্পদ্‌বৃদ্ধির জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এই জন্য ইহাদের প্ররোচনায় যাহাদের যুদ্ধে কোনই শ্রেয়ঃ নাই, সেই প্রজা সাধারণ মেষের মত ধ্বংস হইয়া অপরকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করে; সুতরাং দেশের সর্ব্ব-সাধারণকে এই বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হউক। ফলে ইউরোপে প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল—প্রজাসাধারণের মতকে উপেক্ষা করিয়া দেশের অভিজাতশ্রেণী কোনও কার্য্যই করিতে পারিবে না। কিন্তু কাল যাহারা নৃশংস যুদ্ধের নিবৃত্তির জন্য প্রচেষ্টা করিল, আজ তাহারাই রক্তপতাকা হাতে করিয়া হত্যাকাণ্ডের পুরো-ভাগে দণ্ডায়মান, ইহাও বিধাতার অদ্ভুত শিক্ষা।

যুদ্ধ যাহাতে না হয় তাহার জন্য খুব বড় বড় চেষ্টা হইয়াছে, এই সেদিন সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি মিলিয়া মধ্যস্থসভা নির্ম্মাণ করিল, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল, শান্তিপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সকল কার্য্যের এক-জন প্রধান উদ্যোগীই সর্ব্বপ্রথমে কোষবদ্ধ তরবারি উন্মুক্ত করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিল। অতএব এরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া জগতে যে যুদ্ধের অবসান হইবে এরূপ আশা করা দারুণ ভ্রম। আন্তর্জাতিক সন্ধিকে যেন উপহাস করিবার জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায়, মঞ্চুরিয়ায়, বলকানে আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই বর্ত্তমান মনুর রাজ্যকালে যে এরূপ সর্ত্তবদ্ধ জাতিগুলির শান্তি ভোগ সম্ভব হইবে ইহা মনেও করা যায় না।

সেদিন রুষিয়ার একজন মহা পণ্ডিত বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিয়া যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছিলেন—এইবার যুদ্ধের অবসান হইবে, কেন না এত অর্থব্যয়, এত লোকক্ষয় করিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুদ্ধ করাটা অসম্ভব। বন্দুক কামানের পরিবর্ত্তে পৌরাণিক যুগের মত যখন সম্মোহনবাণ, বরুণবাণ, অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ, প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে, তখন যুদ্ধে জয়াশা নাই। যখন যুদ্ধে জয় পরাজয় স্থির হওয়া একান্তই অসম্ভব, তখন যুদ্ধ

করিয়া কি ফল হইবে কিন্তু আমরা বলি তথাপি যুদ্ধ ত বন্ধ হইল না—যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। তবু একদল লোক বলেন, মানুষ যখন বুঝিবে যুদ্ধে বৃথা শান্তিভঙ্গ, বৃথা অনর্থক লোক ও অর্থক্ষয়মাত্র তখন স্বভাবতঃই মানুষ ঘোর নৃশংস এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি এ কথা মনে থাকিবে কি? এই মহাযুদ্ধের নিদারুণ স্মৃতি শত বৎসরেরও অধিককাল মানুষের মনকে পীড়ণ করিবে কি না সন্দেহ। কারণ তখন প্রাণবিজ্ঞানের অপরিহার্য্য নিয়মবশে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলেও, মনোবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে তাহার প্রয়োজনীয়তা তখনও বর্ত্তমান থাকিবে। মানুষের হৃদয়বুদ্ধি যতকাল এইরূপ থাকিবে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতির অভিব্যক্তি স্বরূপ এই অস্ত্র ঝনৎকারও স্থায়ী হইবে। মানুষের মনে যখন প্রকৃত শান্তি বিরাজ করিবে, তখনই শুধু যুদ্ধের অবসান হইতে পারে।

কেন না, ভ্রাতৃবন্ধনের সূত্রে মনুষ্যগণ আবদ্ধ হইলেই যে যুদ্ধ বন্ধ হইবে এরূপও আশা করা যায় না। ভ্রাতৃবন্ধন অতি ক্ষীণ সূত্র মাত্র। ভাই ভাই কি বিরোধ হয় না? বড় বড় সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। একমাত্র আশা যুদ্ধাবসান কল্পে মানুষের এই যে সকল বিবিধ কুহক-কল্পনা, তাহাদের সকলের অন্তরালে যে মহৎ সত্যটী লুক্কায়িত তাহারই যদি প্রকাশ হয়। যদি কখনও মানুষের মধ্যে একটী অখণ্ড সত্তার অনুভূতি সত্য হইয়া উঠে, ভ্রাতৃত্ববোধ নহে কিন্তু একাত্মবোধ সকলের ভিতরে পরিস্ফুট হয়, তখন কে কাহাকে হত্যা করিবে, কাহার ধনে স্পৃহা করিবে? তখন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"। কিন্তু এরূপ অবস্থার প্রতীক্ষায় বসিয়া কোনও জাতিই মেষের মত অপরের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, কাযেই যুদ্ধের অবসান কল্পে বহুভাব প্রচার করিলেও ইউরোপের মহাজাতিগুলি যুদ্ধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্নবান্, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান ঘটনায় পাওয়া যাইতেছে।

অতএব ফরাসী অধিকৃত ভারতের প্রজাও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না, নিজের ও রাজার বলবৃদ্ধি কল্পে যুগধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহারা অগ্রসর হইল। ফরাসীরাজের বদান্যতায় বাঙ্গালী সেনাদলে যোগদান করিয়া দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, আমাদের আশা অচিরে বাঙ্গালী ও যুদ্ধ বিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিবে।

———:*:———

ভলাণ্টিয়ার প্রসঙ্গ।

চন্দননগরের "ভলাণ্টিয়ার" আন্দোলনের সকল সংবাদই সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন; প্রবন্ধকে সে সকল সংবাদ প্রদান করা অনাবশ্যক। তবে বাঙ্গালী সেনাদল যখন মাতাপিতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রীপুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল—সে করুণচিত্র যে দর্শন করিয়াছে, যুগপৎ তাহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর সংসারে এমন নূতন ঘটনা বহুশত বৎসর ঘটে নাই। হাসিমুখে মৃত্যুস্থলে যাত্রা করিবার জন্য সহোদরা সহোদরাকে, পিতা মাতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে, এমন গর্ব্বভরে যে বিদায় দিতে পারে তাহা ধারনার অতীত ছিল; এ দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। ভলেণ্টিয়ারগণ আমাদের আত্মার, আমাদের ঘরের ছেলে, যেন তাহারা বিজয়মাল্য বিভূষিত হইয়া সগর্ব্বে ঘরে পুনরাগমন করিয়া আমাদের আনন্দবিধান করে, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

শ্রীমান্ হারাধন সহযাত্রীবর্গের সহিত যখন তাঁহার অনুগত বালক-বন্ধুদের নিকট করুণ নয়নে বিদায় প্রার্থনা করিল, বালকগণের মধ্যে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক যে মর্ম্মস্পর্শী সম্ভাষণ পাঠ করিয়াছিল এবং পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীমান্ মনোরঞ্জনদাস তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীকে যে পত্র লিখিয়াছিল। তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ এতদপাঠে নবীন বঙ্গের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাইবেন।

শ্রীমান্ হারাধনের প্রতি বালকবৃন্দের অভিভাষণ।

হারাধন দাদা।

আজ আপনি আমাদের ছাড়িয়া দূরদূরান্তরে চলিয়াছেন। জানিনা এই বিদায়ের দিন আপনাকে কি দিতে পারিলে আমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি? ধন, যশ, মান, আপনারই মুখে শুনিয়াছি সকল বৃথা। আছে হৃদয়-টুকু একমাত্র সম্বল, তাই নিয়ে আপনার কাছে আজ এসেছি একটুকু আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে। আজ এই সন্ধিক্ষণে মনে পড়ে আপনার সঙ্গজনিত মধুর স্মৃতি-গুলি, পূত পবিত্র আনন্দগুলি। মনে পড়ে আপনার পিঠে চড়িয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলা, আপনাকে ধরিয়া সকলের টানাটানি, কত ছেলেমানুষি। আবার

তাহারই সঙ্গে মনে পড়ে আমাদের সৎ সনাতনের দিকে মতি ফিরাইবার জন্য, আমাদের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা, আপনার অদ্ভুত প্রেরণা, আপনার মধুর উপদেশ। তখন সে সমস্ত শুনিয়াছি বটে বুঝি নাই, আপনাকে ভাল বাসিতাম বলিয়া চুপ করিয়া শুনিতাম, আপনার তেজঃদর্শনে মোহিত হইয়া থাকিতাম কিন্তু আজ এই একটী দিনের ঘটনায়, একটী মুহূর্ত্তের দৃষ্টান্তে সে গুলি সব ফুটন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। আপনার সমস্ত হাব-ভাবগুলি আজ স্পষ্টভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি। জীবনটা তুচ্ছ নহে—জগতের, ভগবানের—এ কথা এতদিন আপনি বলিলেও উপলব্ধি হয় নাই। কি রকম করে কেমন হয় তাহা মাথায় আসে নাই। আজ আপনার আদর্শে, অদ্ভুত আত্মত্যাগে ভগবানের উপর আপনার অপরিসীম অনুরাগ ও নির্ভরতা দর্শনে সে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আজ বুঝিয়াছি জীবনের সার্থকতা কোথায়, আজ ধরিয়া লইয়াছি ভগবান কেমন তর। আজকের ঘটনায় এত দিনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে, সমস্ত আবিলতা ধুয়ে গিয়ে, এক নূতন আলোক দেখিতে পাইতেছি। তাই আজ আপনার পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিতে হইলেও আমরা দুঃখিত নহি, পরন্তু গৌরবান্বিত, স্পর্দ্ধান্বিত। আজ আর আপনি খেলার সাথি ক্ষুদ্র হারাধন দাদা নহেন, আজ আপনি বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, ভারতের পূজনীয়। তাই আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে, পবিত্র অর্দ্ধোদয়যোগে আপনার এবং আপনার সহতীর্থগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা লইতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাদের এই মহান আদর্শের ছবিখানি সম্মুখে রাখিয়া জীবনের কার্য্য করিতে পারি—আপনাদেরই মতন জগদ্ধিতায়, লোকহিতায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সকল ছেলেমানুষী দূর করিয়া মায়ের আহ্বানে সাড়া দিতে পারি—আপনাদের মতনই জলন্ত জাগ্রত রূপে, ভারতবর্ষ দেবতার দেশ, এই বাণীর সার্থকতা করিতে পারি।

শেষ কথা—আমার বন্ধুগণ! স্মরণ রাখিও আজকের কথা। স্মরণ রাখিও আজকের ত্যাগ, আজকের প্রেম, হৃদয়ে গাঁথিয়া লও আজকের এই ঘটনাটী। আস্থা রাখিও এই মাঠের ধূলিকনার উপর, তাহার স্পর্শে জীবনকে কৃতার্থ করিও।

সর্ব্বশেষে এস বন্ধুগণ, এস ভ্রাতৃগণ আমাদের এই ক্ষুদ্র দানের চিহ্ন বিজয়-মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিয়া আজ আমরা আমাদের পূজনীয় প্রিয়জনদিগকে জগদ্ধিতায় পাঠাইয়া দিই!

শ্রীমান্ মনোরঞ্জনের পত্র।

মা! আপনি আমার জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন কিন্তু দুঃখিত হইবার কারণ ত কিছুই দেখি না। আপনার পুত্র যদি উন্নতির জন্য কোন কাজ করে তাহা হইলে তাহাতে দুঃখ কিসের? আপনি আমার জন্য কিছু ভাবিবেন না, আমি বেশ সুস্থ ও সুখে আছি। আমি বলিতেছি যে আপনি ভগবানের উপর সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ করিয়া আশ্বস্ত হউন। আমাদের অমঙ্গল তিনি করিবেন না অথবা যাহাকে আপনারা অমঙ্গল মনে করিবেন তাহা অমঙ্গল নয় তাহা মঙ্গল। মানুষ মায়ার বশীভূত হইয়া মঙ্গল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু আজ মায়ার বশীভূত হইবার দিন নয়। যেখানে মঙ্গল কর্ম্ম সেইখানে যাইতেই উপদেশ দিন। মনে করুন সেই আমাদের আর্য্য নারীদের কথা ও তাঁহাদের আদর্শ বক্ষে ধারণ করুন, ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করিবেনই করিবেন, আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন উন্নতি করিতে পারি। আপনাদের উপকার ও আপনাদের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিবার নয় ও পরিশোধ করিবার যোগ্যও নহি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে 'আমি যেন উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারি'। আর অধিক কি লিখিব। মনে করিবেন না যে আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি, ইহা উপদেশ নহে ইহা আমার অনুরোধ। পরে আরও লিখিব এখন এই পর্য্যন্ত।

—:*:—

সমালোচনা।

গম্ভীরা— দ্বৈমাসিকপত্র, সত্বাধিকারী ও প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ চরণ সরকার, কালিগ্রাম, মালদহ। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা মাত্র। তৃতীয় খণ্ড, বৈশাখ ১৩২৩ সাল ১ম সংখ্যা। বর্ষ আবাহন, বিবিধ প্রসঙ্গ, বাণী প্রশস্তি, বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা, জন্ রাস্কিন্, বিবর্ত্তনবাদ, ও তাহার প্রামাণিকতা, যাত্রাসাহিত্যের অবনতি, প্রভৃতি অনেক গুলি কবিতা ও প্রবন্ধে এই সংখ্যা পরিপূর্ণ, সকল গুলিই সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা অতি উপাদেয় প্রবন্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটীর ভাষা যে শুধু চমৎকার এবং প্রাঞ্জল তাহা নহে পরন্তু লেখকের অধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয়ও ইহাতে যথেষ্ট আছে যথা "পুরুষ তপস্বী। সংযম শান্তি নিরাভরণতা সদা সন্তুষ্টি—এ সকল পুরুষেরই। পুরুষ চিন্তাশীল ধ্যানী আত্মস্থ। জগতের সহিত তাহার দ্রষ্টার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ" ইত্যাদি গভীর অন্তর্জ্ঞানেরই কথা। তারপর উপনিষদের সারমর্ম্ম বোধ করিয়া লেখক বলিতেছেন "সত্যের মুখে যে হিরণ্ময় পাত্রটী রহিয়াছে তাহারই কিরণজাল আমাদের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়, মূল প্রদেশের গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না—সত্যধর্ম্মটী সদাই আমাদের কাছে আবরিত রহিয়া যায়" আমরা গম্ভীরার বহুল প্রচার কামনা করি, আর এখানি মাসিকে পরিবর্ত্তিত হইলে আরও সুখী হইব।

ধর্ম্ম।

একজন উৎসাহী শিক্ষিত যুবককে "বলিলাম ধর্ম্মজীবন লাভ কর, তবে উন্নতি করিতে পারিবে"—সে বলিল "কোথায় ধর্ম্ম শিক্ষা করিব? কে শিক্ষা দিবে?" আমি একজন নামজাদা সন্ন্যাসীর নাম করিলাম, যুবক নয়ন যুগল বিস্ফারিত করিয়া কহিল "আপ করুন মহাশয়, গেরুয়ার আব্ ছায়ায় জীবন খোয়াইতে পারিব না—আমি চাই আত্মবিকাশ—ধর্ম্ম অর্থে অনেক হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতের একটা কোণে আশ্রয় লওয়া আমার কর্ম্ম নয়।"

আজ বাংলার শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্ম্ম অর্থে কি ইহাই দাঁড়াইয়াছে—ধর্ম্ম কি কতকগুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে অবস্থিত—সাধন পথে চলিবার কতকগুলি অনিবার্য্য আচরণই কি ধর্ম্ম—কতকগুলি শাস্ত্রানুষ্ঠান, কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়া-কলাপ কি ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি?

ধর্ম্ম ত কাহাকেও কিছু হইতে বঞ্চিত করেনা, সে যে উদার, বিরাট, অনন্ত ভুবনব্যাপী—সে যে মানুষের অক্ষমতাকে দূর করিয়া সকল ভোগে সামর্থ্যবান করিয়া তুলে—সে যে সকল প্রকার নীচতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিয়া মানুষকে সরল, উদার ও মহৎ করিয়া তুলে—সে যে ভিতর হইতে মানুষের সত্তাটাকে বাহিরে আনিয়া ভগবানের জয় ঘোষণা করে—সে যে অনাদৃত যন্ত্রে নূতন তার জড়াইয়া কড়ী ও কোমলে ঝঙ্কার দিয়া—অখিল ভুবনকে জাগাইয়া তুলে, উন্মাদ করিয়া তুলে—সে যে আধফোটা ফুলের সকল পাপড়িগুলি সযত্নে খুলিয়া দিয়া মধুরগন্ধে জগতের সব মাছিগুলিকে একত্রে ডাকিয়া আনে। ধর্ম্ম অর্থে বঞ্চনা, কে বলিল? ধর্ম্ম মনুষ্য জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করে।

এই ধর্ম্ম কি? ইহা যদি একটা ব্রত সাধনের মত কিছু হইত, অবশ্যই এই

অমূল্য ধর্ম্মলাভের জন্য কোন্ মানুষ উহার সাধন না করিত? শাস্ত্রের কোন একটা নিষেধবাক্য মান্য করিয়া চলা যদি ধর্ম্ম হইত, উহা অবশ্যই পালন করিয়া লোকে ধর্ম্মার্জ্জন করিত, একটা কৌপিন অথবা একটা আল্‌খেল্লা পরিধান কিংবা কণ্টকবিদ্ধ আসনে শয়নাদি রূপ কোন কঠোর বিধানের মধ্যে ধর্ম্ম যদি লুকাইয়া থাকিত, নিশ্চয় উহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ হইত; কেননা ভিতর হইতে এই ধর্ম্মের সন্ধানের জন্যই অন্তরপুরুষ অনবরত খোঁচা মারিতেছে—এই ধর্ম্মলাভ আমাদের করিতেই হইবে।

হে ভারতের ঋষি! আজ জলদমন্দ্রে আকাশে তোমার বাণী বাজিয়া উঠুক, সমগ্র পৃথিবী শুনুক্—ধর্ম্মলাভের জন্য যে আকুলতা তাহারই লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম একটা অনুভূতি, সেটা মানুষের ভিতর কি জানি কেমন করিয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—তার আলোয় জগৎ রহস্যের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া ফেলিবার সঙ্কেতটা দৃষ্টিগোচর হয়, জীবনটা বাস্তব হইয়া উঠে—বাহ্যজগতের উপর মানুষের আধিপত্য করিবার অধিকারটা প্রকাশ হইয়া পড়ে—সৃষ্টিধরের হাতের চক্রের মত সে অফুরন্ত ঘুরিয়াই আনন্দ পায়।

এই যে জাগ্রত জীবন্ত মানুষের জীবন—কোন্ দুষ্ট, কুহকের ফাঁদে ফেলিয়া ইহাকে মথিত ও অলস করিয়া দিতে চায়—ধর্ম্ম সাধনার লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার সীমা অতিক্রম করিয়া যে পুরুষ এই বাস্তবটাকে আঁকড়াইয়া পাইয়াছে, আমরা সেই সরল ও সহজকে আহ্বান করিতে চাই।

আমরা মানুষের হাতেগড়া বিকট ও আড়ম্বরবিশিষ্ট ধর্ম্মসাধনার যন্ত্রগুলিকে পরিহার করিতে চাই—আমরা ধর্ম্মলাভের জন্য মানুষের উদ্দাম চেষ্টার ভীষণ মূর্ত্তিটাকে দূরে রাখিয়া, কেবলমাত্র অনাগত সেই সুন্দর ও মঙ্গলের আগমন প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া বসিয়া থাকিতে চাই—চ্যুত পত্রের মর্ম্মর শব্দে তাহারই আগমন অনুমান করিয়া সেই দিকে বার বার ফিরিয়া চাহিব—আবার বারংবার হতাশ হইলেও একই সঙ্কল্প লইয়া তার না আসা পর্য্যন্ত এমনিই ভাবে বসিয়া থাকিব। বাড়াইয়া তুলিব আমার আকুলতাকে—সে এক করিয়া ফেলিবে আমার জীবনযন্ত্রটাকে—এই একতারা বাজাইয়া অনন্ত জীবন কাটাইয়া দিব—তাহারই উদ্দেশ্যে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিব—আমার সর্ব্বস্বরত্ন, নূপুর পায়ে পাটী পাটী করিয়া আসিতেছেন—আমার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া; সে যত বিলম্বেই হউক—শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে তাঁর অগ্রগতিই আমার জীবনের বিরাট আশা, সাধনার সম্পূর্ণ সার্থকতা।

শিক্ষা।

পূর্ণতা ও শুদ্ধতাই হিন্দুচরিত্রের বিশেষত্ব। তাই হিন্দুজীবনের প্রতি অংশ যোগের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। কোন খণ্ড বিশেষের পূর্ণ বিকাশে হিন্দুর জীবন অসম্পূর্ণ। হিন্দু শুধু মেধাবী হইলে চলিবে না, জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে সমান ভাবে তাহাকে মণ্ডিত হইতে হইবে। শুধু জ্ঞানবান্ হইলে চলিবে না, প্রেম, বুদ্ধি, ভক্তি, শক্তি সকল গুণ গুলিকেই আয়ত্ত করিতে হইবে। শারীরিক শক্তি লইয়া কি করিবে যদি সে শক্তি জ্ঞান স্পর্শে উজ্জ্বল না হয়, যদি বুদ্ধি উহাকে সুপরিচালিত না করে; যদি প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের সৎ বৃত্তি দ্বারা উহা সুশাসিত না হয়।

* * *

একাধারে মনুষ্যজীবনের সকল কোষগুলির গুণাবলীর সামঞ্জস্য বিধান অনুশীলন সাপেক্ষ নহে। মানুষ চেষ্টা করিয়া বড় জোর জ্ঞানবান্ হইতে পারে, সে শুষ্কজ্ঞান বর্ত্তমান জগতের কোন মঙ্গলেই আসিবে না; প্রেমিক হইতে পারে, শক্তিহীনের প্রেম বর্ত্তমান জগৎ পদতলে দলিত করিবে। এই পূর্ণ বিকাশের দিনে হিন্দুচরিত্রকে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া জগতের আদর্শ হইতে হইবে—ইহা বিধাতার ইচ্ছা, তাই আজ ইহা সম্ভব এবং সহজ, তাই হিন্দুর মরা প্রাণে জোয়ার আসিয়াছে, তাই বিনা চেষ্টায় বিনা তপস্যায় পূর্ণ যোগ অতিথির বেশে হিন্দুর দ্বারে দণ্ডায়মান; কে আছ বিশ্বাসী হিন্দু! এই পূর্ণ যোগের অভ্যর্থনা কর।

* * *

অনাগত বস্তু অনুভূত হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের মোটা মুটী একটা ধারণা করিয়া লইতে হয়, এই ধারণা অবশ্যই শিক্ষা সাপেক্ষ, এই জন্য হিন্দুর বিদ্যাশিক্ষা অর্থকরী নহে, দেবত্বের সোপান—হিন্দু বিদ্যাশিক্ষা করে, অর্থবান্ হইবার জন্য নহে, পশুত্ব পরিহার করিয়া দৈবত্ব লাভ করিবার জন্য। কালবশে হিন্দুর শিক্ষা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা হইয়াই দাঁড়াইয়াছে, কে কেমন ইংরাজী লিখিতে এবং বলিতে পারে ইহা দেখিয়াই শিক্ষার্থীকে আমরা বাহবা দিয়া থাকি। অবশ্য কালচক্রে রাজভাষা আমাদের উপেক্ষা করিতে চলিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর তত্ত্বকথাগুলিও শিক্ষ করিতে

হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শুষ্ক উপাধিধারী হইয়া গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—যাহা না শিখিলে আমরা ভারতের পরগাছা হইয়া যাইব তাহাও ঐকান্তিকচিত্তে আয়ত্ত করিতে হইবে।

* * *

ভারতের শিক্ষা গভীর ও নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব—যে তত্ত্ব হইতেই বহির্বিজ্ঞানের উৎপত্তি, যে তত্ত্ব মূল জগৎ রহস্যের আদি উপাদান। এই তত্ত্ব বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে হইবে, শুধু পুস্তকের বচন কণ্ঠস্থ করিলেই ইহার পরীক্ষায় উপাধিলাভ করা যায় না। ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা চাই। প্রথম ভূগোল ইতিহাসের মত মুখস্থ করিতে হইবে বটে কিন্তু পরে সাধনার দ্বারা ইহা জীবন দিয়া অনুভব করিতে হইবে—ভারতের শিক্ষার ইহাই বিশেষত্ব। অসীম অফুরন্ত জীবনের পরদায় পরদায় যতই ইহা প্রবেশ করিবে ততই নশ্বর জীবন মঙ্গলময় ও অবিনশ্বর হইয়া উঠিবে।

* * *

হিন্দুর শিক্ষা দূর হইতে বিকট ও কদাকার দেখায় কেননা ইহার আড়ম্বর নাই, ভিখারীর মত যথা তথা পরিভ্রমন করিয়া বেড়ায়, বড় বড় থামওলা প্রাসাদের মত ইহার একটীও স্থায়ী বাসস্থান নাই, লোকের চক্ষে পড়িবার মত সুবেশও নাই—ইহা ঝটিকা বাতাসের মত হিন্দুর ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়—যে সৌভাগ্যবান্ সেই ইহার স্পর্শে দিব্য জীবন লাভ করে।

* * *

আজ আমরা আমাদের সমস্ত বঙ্গবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলি—শুদ্ধ ও ভক্তিপূর্ণচিত্তে প্রতি ঘরে এই মহাদেবতার জন্য আসন পাতিয়া রাখুন, এই দেবতা বিধাতার ইচ্ছায় আবার সনাতনধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এতদিন চেষ্টা যত্ন করিয়া যাহা বার বার বিফল হইয়াছে, আজ তাহা সহজ ও অনায়াসলভ্য হইবে। যাঁহারা এই হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া এই দেবতার দর্শন পাইবেন না—হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা চিরদিন বৃক্ষমূলে, পর্ণকুটিরে, আচার্য্যের আশ্রমেই দেওয়া হইত, আজও তাহাই হইবে, এই ধর্ম্মশিক্ষার কোনও নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র থাকিবে না—মন্দিরে মন্দিরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

মানবজাতির একতার আদর্শ

(৩)

প্রকৃতি তাঁহার চির পদ্ধতিক্রমে, যে দুইটী উপাদানের সংযোগে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অগ্রে তন্মধ্যে উপর্য্যুপরি শক্তিপরীক্ষা উপস্থিত করেন। তাই ইচ্ছাক্রমেই তিনি কখনও একদিকের, কখনও অপর পক্ষের প্রবলতা বিধান করেন; আবার কখনও সম্পূর্ণ বা আংশিক সফলতার সহিত কোনরূপ সাময়িক সুব্যবস্থা এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে কোনও প্রকার পরিমিতকারী নিষ্পত্তির সাহায্যে উভয়ের বলাতিশয্যদোষ সংশোধন করেন। উপাদান দুইটী সেই সময়ে পরস্পরের পরম শত্রু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়—অথচ উভয়েই উভয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং উভয়কেই তাহাদের দ্বন্দ্বের একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য যত্নশীল হইতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক উপাদানেরই এক একটী স্বতন্ত্র অহমিকা আছে ও প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাকে শুধু আত্মরক্ষা নহে, পরন্তু স্বীয় শক্তি অনুযায়ী আত্মবিস্তারেও প্রণোদিত করে। এই জন্য উভয়েই যাহাতে স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইতে পারে, সম্ভব হইলে অপরের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, এমন কি যাহাতে নিজের অহঙ্কারের মধ্যে অপরের অহংটুকুকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়, এরূপ উপসংহারে পৌঁছিতে চায়, এইরূপ শক্তি সমূহের মধ্যে সংঘর্ষের দ্বারাই সমন্বয়মূখী উন্নতি সংসাধিত হয়। অনেক সময়ে মনে হয় বুঝি সামঞ্জস্য ও নিষ্পত্তির কোনও চেষ্টাই হইতেছে না, বরং পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতেই সমুদ্যত বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, পরিণামে কোনও বিশেষ একজনের ধ্বংস না হইয়া যে পর্য্যন্ত না উভয়েই উভয়কে আত্মসাৎ করিয়া পরম একাত্মস্বরূপ হইয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত একতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের এই চরম আদর্শেই সকল সংঘর্ষ উপনীত হইতে চেষ্টা করে, তবে অন্ধভাবে; কারণ সংঘর্ষের দ্বারা দুইটী বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে যে মীমাংসা হয়, তাহা একটা স্থায়ী সামঞ্জস্য নহে; দুইটী বিবাদরত অহমিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেটা একীকরণ নহে। তথাপি সংঘর্ষ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা

পরিচয়বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া দেয়, যাহার ফলে পরিশেষে প্রকৃত মিলনপ্রয়াস সম্ভবপর হইয়া উঠে।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কেও, মনুষ্যের দুইটী সমভাবে দৃঢ়মূল প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষরূপে, প্রকৃতির উক্ত চিরন্তন খেলাই আত্মপ্রকাশ করে। ব্যষ্টিবাদ ও সমষ্টিবাদ, রাষ্ট্রের সর্ব্বময় প্রভুত্ব, পূর্ণত্ব এবং বিকাশ ও ব্যক্তির স্বতন্ত্র মুক্তি, পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা—এতন্মধ্যে রাষ্ট্রমূলক ভাবটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যন্ত্রবিশেষের আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বমূলক ভাব উত্তরোত্তর বিকাশপরায়ণ ভগবানের ব্যষ্টিভাবের আদর্শ—ইহাদের মধ্যে যেন নিত্য বিরোধ বর্ত্তমান। সমষ্টির আকৃতিগত তারতম্যে এই বিরোধের মূলতঃ অথবা বাহ্যতঃ কোনও ইতরবিশেষ উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বে পরিবার, দল, জনপদই সমষ্টি ছিল; ক্রমে সম্প্রদায়, বর্ণ, শ্রেণী, কুল উক্ত স্থান গ্রহণ করিল, এক্ষণে জাতিই প্রধান সমষ্টি; কল্য অথবা তৎপরদিবস হয়ত সমগ্র মানবমণ্ডলীই উক্ত সমষ্টির পদ পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু তখনও মানুষ এবং মানবমণ্ডলী, মুমুক্ষু ব্যক্তি এবং আধিপত্যপ্রয়াসী সমাজের মধ্যে যে বিরোধ, যে মূল সমস্যা বর্ত্তমান, তাহার কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা হইতেছে না।

কেবল ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যগুলির উপর যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে মানুষ যে ব্যক্তির উপর আধিপত্যবিশিষ্ট সমাজ লইয়াই জীবনারম্ভ করিয়াছিল এবং পরে মানবসভ্যতার উন্নতি ও মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি ক্রমো-বিকাশ লাভ করিতেছে, এইরূপ অনুমানেই আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। জীবমাত্রের জীবনরক্ষাই যখন প্রথম প্রয়োজনীয় এবং মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া সমাজবদ্ধতাই যখন তাহার জীবনরক্ষার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, তখন এ কথা সহজেই অনুমেয় যে আদিতে মানুষ সমাজের শক্তি ও সুরক্ষার যন্ত্রমাত্র ছিল; আর আজ পর্য্যন্ত সকল সমাজতন্ত্রের মূলে এই ভাবটাই প্রভুত্ব করিতেছে—কেবল, এক্ষণে ব্যক্তি, সমাজের শক্তি ও সুরক্ষার সাধনমাত্র নহে, কিন্তু উন্নতি, কার্য্যকারিতা ও আত্মসংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিস্তারপ্রয়াসেরও উপায়স্বরূপ। এই যে প্রয়োজনীয়তা, ইহা মানুষের উপর বাহ্যাবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেরই ফল। আবার গভীরতর-মূল তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে, জড়জগতের ক্রিয়ায় একরূপতাই (uniformity) সমষ্টির প্রধান লক্ষণ স্বরূপ; অবাধ বৈচিত্র্য এবং ব্যষ্টিগত বিকাশ, প্রাণ ও মনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং যদি আমরা মানুষকে, জড়জগতে, জড় বস্তু

হইতে বিকশিত মনোময়সত্তামাত্ররূপে কল্পনা করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদিগকে ধরিয়া লইতেই হইবে, যে ব্যক্তি বৈচিত্র্যশূন্য সমাজানুগত্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্বচ্ছন্দ, বিচিত্র, স্বাধীন বিকাশকে লক্ষ্য করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে, কি পারিপার্শ্বিকপ্রভাব, কি মানবজীবনের অপরিহার্য্য মৌলিক নিয়ম, উভয়েই আমাদিগকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত করে, মানুষের ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক বিবর্ত্তনের এই একই ধারা নির্দ্দেশিত করে।

কিন্তু মানবজাতির যে পুরাগত সংস্কার তাহাও উপেক্ষা করা বা কল্পনামাত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া কখনও নিরাপদ নহে। সেই সংস্কারানুসারে সমাজবদ্ধ অবস্থার পূর্ব্বে অন্যবিধ অবস্থাই ছিল—স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ সর্ব্বপ্রকার সমাজবন্ধন-বিবর্জ্জিত অবস্থা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলিবে, যদি কখনও এরূপ অবস্থা সম্ভবপর হইয়া থাকে (সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহই বর্ত্তমান) তবে, তাহা শুধু যে সমাজবন্ধনবর্জ্জিত ছিল তাহা নয়, পরন্তু তাহা সমাজবিরোধীও বটে। মানুষ যখন বিজনচারী পশুবৎ ছিল, যখন দলবদ্ধ পশুর পরিণতিও প্রাপ্ত হয় নাই, এ নিশ্চয় সেই সময়েরই কথা। কিন্তু মানবজাতির বিশ্বাস যে যুগকে নির্দ্দেশ করে, সে যে সেই স্বর্ণযুগই—সে যুগে সমাজ বন্ধন না থাকিলেও মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে সমাজপ্রিয় ছিল, নিয়মানুষ্ঠানের দাসরূপে নহে, কিন্তু সহজ সংস্কার ও স্বাধীন জ্ঞানানুসারেই সে জীবনযাপন করিত, আত্মশাসনের সত্যধর্ম্ম সে তাহার নিজের জীবনের মধ্যেই প্রাপ্ত হইত, সহচরের বিরুদ্ধে হিংসাপরায়ণ হইবার প্রয়োজন ছিল না, সমাজের বজ্রবন্ধনে তাহাকে সংযত রাখিবারও আবশ্যক ছিল না। তথাপি হয়ত বলিব, এ একটা কবিত্ব বা ভাবানুরঞ্জিত কথামাত্র; প্রাচীন মানুষ, তাহার সমাজবিরোধী পূর্ব্বাবস্থার দৃঢ়মূল স্মৃতিটীর উপর একটা নূতন স্বপ্ন, বন্ধন-বিবর্জ্জিত স্বেচ্ছাসম্মিলিত সুখময় অবস্থার উদীয়মান আদর্শটীর সমারোপ করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহাওত হইতে পারে আমাদের বিকাশ ঋজু রেখায় না হইয়া চক্রগতিতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং এইরূপই চক্র পরিক্রমন-কালে কোন কোন যুগে সমাজবিপ্লববাদিগণের উচ্চ স্বপ্ন অন্ততঃ কতক পরিমানেও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন রাজা ও মন্ত্রীসভা, বিধি, নীতি, দণ্ড প্রভৃতি যত কিছু উপায়ে জোর করিয়া একীকরণের প্রয়াস হয়, ও এইরূপ মানুষের উপর মানুষের বলপূর্ব্বক শাসনের ফলস্বরূপ যত কিছু অত্যাচার, উৎপীড়ন, স্বার্থপরতা ও কলুষপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে সমুদয়ের কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। এমন কি ইহাও সম্ভব, আদিযুগে যেরূপ সহজে পরিবর্ত্তনীয় স্বতঃবিকশিত, সম্মিলন

জীবনগঠনের যে কয়েকটা প্রয়াস হইয়াছে সে গুলির কথা ছাড়িয়া দিতে হইল। আর সুগঠিত সমাজগুলির মধ্যে আবার দ্বিবিধ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটীতে, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপরে সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ববিশিষ্ট আসন প্রদান করা হয়, তাহার উদাহরণ যেমন প্রাচীন স্পার্টা, বর্ত্তমান জর্ম্মণী। দ্বিতীয় প্রকারের সমাজে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার উপাদান স্বরূপ ব্যক্তিমণ্ডলীকেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা, অধিকার, মর্য্যাদা অর্পণ করা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রাচীন এথেন্স, বর্ত্তমান ফ্রান্স। এই দুই প্রকার ব্যতীত তৃতীয় একটী সমাজের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমাজে রাষ্ট্র যত দূর সম্ভব ব্যক্তির হস্তে প্রভুত্বশক্তি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়, ব্যক্তির বিকাশ, স্বাধীনতা, মর্য্যাদা ও সফল মনুষ্যত্বের জন্যই যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এই কথা সাহস সহকারে স্বীকার করা হয়, এমন কি ব্যক্তির যথাসম্ভব স্বাধীনতা, মর্য্যাদা, ও মনুষ্যত্বের উপরই রাষ্ট্রের সম্পৎ, শক্তি ও ব্যাপ্তি বাস্তবিক নির্ভর করে কি না তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিপুল বিশ্বাসের সহিত পরীক্ষার আশ্রয়ও গ্রহণ করা হয়। এই রাষ্ট্রীয়াদর্শের বিখ্যাত উদাহরণ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডই ছিল। একমাত্র এই অন্তর্নিহিত ভাবের বীর্য্য প্রভাবেই ইংলণ্ড এমন স্বাধীন, উন্নত, শক্তিশালী ও অপরাজেয়। ইংলণ্ডকে দেবতাগণ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপ্তি, সাম্রাজ্য ও সৌভাগ্যসম্পদ্ দান করিয়াছিলেন কারণ সে এই মহৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে বা তজ্জন্য সমস্ত বিপদ সহ্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই, এমন কি, অনেক সময়ে স্বীয় দ্বীপনিবদ্ধ স্বার্থের বাহিরের ক্ষেত্রেও উক্ত ভাবের প্রয়োগ করিতে সে নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানবস্বভাবের যাহা চিরন্তন দোষ, সেই অহমিকা ও অর্দ্ধসত্যের উপর অতিমাত্র নির্ভরতাবশতঃ সে ঐ ভাবেরই পূর্ণ প্রয়োগ

আমরা গীতার "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি ছন্দ যত জোর করিয়াই আবৃত্তি করি, বাহ্যশরীরেরই সহিত যে আমরা অধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একথা জীবনের প্রতি ঘটনায় বুঝিতে পারি। তাই বলিয়া শরীরের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ যে ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ কথা বলি না—তবে বাহ্যাবয়বটা যে আমাদের অবিনশ্বর 'আমির' পরিচ্ছদ—একথাটা সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে আত্মার ইচ্ছানুযায়ী অবলীলাক্রমে পরিচ্ছদপরিবর্ত্তনে কোন দ্বন্দ্বই আসিবে না—আমাদের এরূপ একটা অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

ইহাই আনন্দের অবস্থা। বহুবার বলিয়াছি, আবার বলি যোগসাধনের যে সকল প্রলোভন আছে, যথা, একস্থানে দেহ রাখিয়া যথাতথা ভ্রমন, এক যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া তদুপরি যোগাসনে উপবেশন, সমাগত ব্যক্তিবর্গকে অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শন, প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য এ যোগ প্রশস্ত নহে। অথবা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যুগযুগান্তর কাল পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্যও এ যোগ কার্য্যকর নহে। এযোগে ভগবানের ইচ্ছার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর সাধক সমস্তই নির্ভর করেন। কি হইতে হইবে, কি হইতে হইবে না এরূপ কোনও কল্পনাই যোগীর অন্তরে স্থান পায় না। ভগবান্ যোগীকে যন্ত্রস্বরূপ পরিচালন করেন। যে আনন্দে আনন্দময় ক্রীড়া করেন, সেই আনন্দই জীবের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সে ভুলিয়া যায় সিদ্ধি অসিদ্ধি, জীবনমৃত্যু, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ—থাকে কেবল একটি অবিচ্ছেদ আনন্দ—সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গস্বরূপ জীব নৃত্য করিতে থাকে।

এক্ষণে এই অধ্যাত্মযোগ বুঝিতে হইলে, বাহ্যশরীর ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীরের বিষয় কিছু অবগত হইতে হইবে।

মানুষ বলিতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্বিত একটা রক্তমাংসের মূর্ত্তিমাত্র। এই মূর্ত্তি পরিচালিত হইতেছে ভিতরের প্রেরণায়—ইহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন, এই ভিতরের যন্ত্রটী মানুষের সূক্ষ্মশরীর। সেটী প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। এই স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম দেহ আছে—উহা সমস্ত জড়দেহটাকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা সূক্ষ্ম হইলেও জড় শরীরের সহিত ইহার সংযোগসূত্র আছে। মানবের শীর্ষদেশে ইচ্ছারূপিনী মহাশক্তি বিরাজ করেন—ইনিই এই দেহরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—যোগীজন যে সহস্রদলের কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই ইহার

সিংহাসন—ইনিই দেবতার আদেশে, ত্রিলোকে লীলা প্রকটন করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। এই প্রকৃতিশক্তি এবং সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রকৃতি যন্ত্রস্বরূপ সূক্ষ্মদেহকে স্পন্দিত করেন, সূক্ষ্মশরীরে তাহারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মস্তিষ্ক বলিয়া যে পদার্থ আছে—উহা তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমে জ্ঞান, (knowledge) দ্বিতীয় বিচার বুদ্ধি, (Reason) এবং তন্নিম্নে বোধশক্তি (understanding) বিরাজ করিতেছে। বলা বাহুল্য এগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—তবে প্রকৃতির হস্তে ইহারা যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, ঋষিগণ তদনুরূপ নামকরণ করিয়াছেন। অতঃপর হৃদ্‌পিণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মানসপদার্থ প্রতিষ্ঠিত—ইহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রশক্তি। তন্নিম্নে হৃদয় হইতে নাভিতলের মধ্যে চিত্ত, নাভিতল হইতে লিঙ্গমূল মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণ বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে মোটামুটি মানব-দেহকে এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া হউক—ইচ্ছাশক্তি (Will of God), জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি, মানস, চিত্ত ও প্রাণ—এই গুলি লইয়া সূক্ষ্মদেহ আর স্থূলদেহ এই স্নায়ুময় এবং অন্নময় মানবশরীর অর্থাৎ হাড়মাসের খাঁচা। এক্ষণে প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্যাদির বিষয় আলোচনা করা যাউক। মানুষ, তাহার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা ধরাপৃষ্ঠে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। অবশ্যই বলিতে হইবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করিবার পথপ্রদর্শক। এক্ষণে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্য কিরূপভাবে সূক্ষ্মশরীরে উপনীত হয়, তাহা দেখা যাউক। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি কিন্তু যন্ত্রটী দেখে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন দেখে, সে কে? মন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়গুলির বল্গা ধারণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কিছু ঊর্দ্ধে মনদেবতা বসিয়া আছেন। যখন বাহিরের সৌন্দর্য্য চক্ষের ভিতর দিয়া মনে পৌঁছিল, তখন মনে স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিল। এই স্পন্দনই মানস পদার্থের নিম্নে যে চিত্ত আছে, তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল—চিত্ত অমনি দৃষ্ট পদার্থটিকে আঁকিয়া বসিল। বুদ্ধির ধর্ম্ম বুঝা (to understand), চিত্তের রেখাপাত বুদ্ধি বুঝিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণকে উত্তেজিত করিল—দর্শন সুখ ভোগ করিবার জন্য; অনন্তর প্রাণ ভোগ করিল। মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, প্রাণও তেমনি স্নায়ুগুলিকে ইচ্ছা করিলেই চালাইয়া লয়, কার্য্য করাইয়া লয়। সূক্ষ্ম প্রাণের ভোগের অভিব্যক্তিই স্থূল শরীরে প্রকাশিত হয়।

বিষয় বড় জটিল। সেইজন্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। শ্যামের বাঁশী

বাজিল, ফুকারিয়া ফুকারিয়া বৃন্দাবনের কানন প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিল। সে সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রীরাধার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল তার প্রাণ"—কেন? ভোগের জন্য নহে কি? হে পাঠক বুঝুন—শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্যামরায়ের তত্ত্বকথা শ্রীরাধার মরমে পশিল। মরম কি না মানস স্পন্দিত হইল, (sensation) চিত্ত রসসৃষ্টি করিয়া (emotion) বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামরায়ের অতুলনীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিল। বুদ্ধি বুঝিল এক্ষণে কিসের প্রয়োজন, সে প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল। প্রাণ স্থূল দেহযন্ত্রকে উন্মাদ করিল---শ্রীরাধা লজ্জা ঘৃণা ভয় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল সে বাঁশীর রব ভোগ করিবার জন্য, সে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবতার সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য। এক্ষণে কেমন করিয়া মানুষ সংসাররঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছে আশা করি পাঠকবর্গের কতকটা ধারণা হইবে।

অতঃপর সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের যন্ত্রগুলির স্বভাব নিরূপণ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে মন যাহা দেখে, যাহা শুনে তাহা বুঝিয়া শরীরযন্ত্রকে পরিচালিত করে; মন, পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগ হইলে স্পন্দনের সৃষ্টি করে; চিত্ত, মনের স্পন্দনে দৃষ্ট পদার্থের উপর প্রেম, ঘৃণা, ভয়, লোভ উৎপাদন করে; প্রাণ, ভোগের জন্য শরীরযন্ত্রকে কার্য্য করায়। ইহাই স্বাভাবিক জীবের কার্য্য। এক্ষণে মন যদি স্বাধীনভাবে শুধু দেখিত, শুনিত; চিত্ত যদি মনের ছবি কেবল আঁকিয়া ও তদুপরি রসারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত; বুদ্ধি বুঝিয়া, জানিয়া নীরব হইত; প্রাণ নির্ব্বিকারচিত্তে ভোগ করিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিত—তাহা হইলে কোনই কথা থাকিত না। কিন্তু এরূপ হয় না—কাহারও কাহারও ভিতর প্রাণশক্তি এত প্রবল, যে সে, চিত্ত, মন ও বুদ্ধির উপর প্রভুত্ব করিতে ব্যগ্র হয়—ফলে কোথাও কোথাও চিত্ত, মন ও বুদ্ধি প্রাণের নির্দ্দেশানুসারেই পরিচালিত হয়, প্রাণের সংস্কারগত বাসনা চরিতার্থ করাই মন, চিত্ত ও বুদ্ধির একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠে—প্রাণের দাসখতে সহি করিয়া উহারা আপনাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে। আবার কোথাও চিত্ত, মন ও বুদ্ধির উপর কর্তৃত্ব চালাইয়া থাকে—সেথায় বুদ্ধি চক্ষুহীন হয়। চিত্তের ইচ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য অন্ধভাবে কার্য্য করিতে থাকে—চিত্তের প্রেম, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধের বশে বুদ্ধির বিচারশক্তি থাকে না—সে ঐ প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতির যন্ত্রপুত্তলী হয়, অকারণ চিন্তা বা লোভের উদয় হইলেও বুদ্ধি তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ

হয় কেন না সে চিত্তের বশীভূত হইয়া অবস্থান করে। আবার মন যদি বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন মন যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়—দেখা শুনা দ্রব্যের বিষয় বিচার করিবার তাহার আর অধিকার থাকে না। এইরূপ বিচারবুদ্ধিও যদি জ্ঞানের কার্য্যে অন্তরায় হয়, তাহা হইলে মানুষ যুক্তি, তর্ক, কল্পনার অতীত এক বিরাট সত্যে উপনীত হইতে পারে না। এমন কি ইচ্ছারূপিনী প্রকৃতি পর্য্যন্ত এই বুদ্ধির প্রখরতায় আপনাকে সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অনুদার বোধ করেন। সুতরাং কোনও মহৎ কার্য্যে মানুষ সফলতার আশা করিতে পারে না। তাহার ভিতর যে বিপ্লব চলিয়াছে—তাহার ফলে মানুষের জীবন দারুণ অবসাদগ্রস্ত হয়।

এক্ষণে যোগের কি আবশ্যক? জীবশরীরের প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রকৃতি-শক্তিকে অনুমন্তারূপে আদেশ করিতেছেন—উঠ, জাগ এবং এই ত্রিলোকে যে ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত করিয়া সমতা সম্পাদন কর, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। প্রকৃতি, পুরুষের আদেশ মাত্রেই জাগ্রত হইয়া ত্রিলোকের উপর আপনার অনন্ত শক্তি সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এই যে দেহ-যন্ত্র, ইহাও ধর্ম্মসঙ্করদোষে দূষিত---ভগবানের আদেশে ইহা আজ শক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে---আমাদের যন্ত্রগুলির ঔদ্ধত্য দূর করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে বশীভূত করিবেন। অতঃপর ইনি বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য নিয়োগ করিবেন---ইহার আদেশ করিবার অধিকার থাকিবে না। মন কেবল দেখিবে, শুনিবে, স্পর্শাদি অনুভব করিবে, আদেশ অথবা বিচার করিবে না। চিত্ত উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিবে, পরন্তু অনুভব, জ্ঞান বা আদেশাধিকার থাকিবে না। প্রাণ কেবল [illegible] অন্য কোনও যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রয়াস পাইবে না।

আত্মসমর্পণ যোগ। আত্মসমর্পণ করিলে, ভগবানই সাধক হইয়া এই সাধনলীলা প্রকটন করেন---ত্বরায় সনাতন ধর্ম্মরাজ্য ত্রিলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঙ্গালীর অভ্যুদয়।

বিধাতার আহ্বানে বাঙ্গালীও বিশ্বব্যাপী রণক্ষেত্রে আগুয়ান হইল। আজ চিরদিনের ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীর কলঙ্কলাঞ্ছিত ললাট সিন্দুররাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উপেক্ষিত, অনশনক্লিষ্ট, দরিদ্র, জরাগ্রস্ত বাঙ্গালী জগতের মহাযজ্ঞে হোতার আসন লাভ করিল। হে সুপ্ত মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী, ইহা কি পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেয়ে, মূক ব্যক্তির বাক্যলাভ করার চেয়ে অধিক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নহে?

আজ যুগযুগান্তরের বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া সেই উজ্জ্বল স্বর্ণযুগের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে জীবনমৃত্যু পদতলে দলিয়া আর্য্যবীরগণ কি মহোৎসাহে রণাঙ্গনে বিজয়োল্লাসে মহানৃত্য করিত; মনে পড়ে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে বীরতনু শতধা ছিন্ন হইলেও সম্মুখ সমর হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাকে আর্য্যবীরগণ মৃত্যু অপেক্ষা হেয়জ্ঞান করিত; মনে পড়ে প্রত্যেক আর্য্যসন্তান, 'হলে রণজয়, নাহয় লোকময়, পড়িলে সংগ্রামে দম্ভভরে চলেযায় স্বর্গপুরে' কল্পনা করিয়া প্রতিক্ষেত্রে বিজয়মুকুট মাথায় পরিয়া গৃহাগমন করিত! মনে পড়ে সে কি উল্লাস, সে কি উৎসাহের দিন ছিল!

আজ আবার সেই দিন আগতপ্রায়—কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার সেই আনন্দ ও উৎসাহের দিন আসিয়াছে। প্রজাসাধারণের মত রাজাকেও আজ এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে—বুঝিতে হইবে রাজা প্রজাকে সন্তানসদৃশ জ্ঞান করিলে প্রজাও রাজসম্মান রক্ষার জন্য উল্লাসে জীবনদান করিতে পারে। এমনি একটী স্নেহ ও প্রেমের বাঁধনে রাজাপ্রজার মধ্যে বিশ্বাস-মন্দাকিনী আগমন করুক, সেই শুদ্ধ পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভেদ ভাঙ্গিয়া যাউক, সমগ্র বিশ্ব সমতায়, একতায় পরিপূর্ণ হইয়া অক্ষয় শক্তিলাভ করুক—সেই মহাশক্তির সাহায্য পাইলেই আমরা ধরার অচিরে স্বর্গরাজ্যের আগমন সম্ভব করিয়া তুলিব।

বিশ্বপ্রকৃতি সেই চেষ্টাই করিতেছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় বার বার বিফল মনোরথের মধ্য দিয়াই বৈজ্ঞানিক তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—প্রকৃতির ভারতের কর্ম্মশালায় আজ যে পরীক্ষা হইতেছে, তাহাই ভবিষ্যতের আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবে। অনাগত ভবিষ্যৎকে কে কবে টীৎকার করিয়া আনয়ন করিয়াছে? সে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

আজ মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীকে লইয়া প্রকৃতির সেই পরীক্ষাই চলিতেছে—এই পরীক্ষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিলেই আমরা আদর্শের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইব—ইহা ধ্রুবসত্য।

১৫ই মে বাঙ্গালীর জীবনে, বাঙ্গালীর ইতিহাসে, একটী স্মরণীয় দিন হউক; কেন না এই দিনই বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের সহিত মিলনের মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছে—এই দিনেই শত্রুবধকল্পে বাঙ্গালী অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছে। এই অস্ত্রই বাঙ্গালীসেনাদলের জীবনস্বরূপ হউক—এই অস্ত্রই এক্ষণে তাহাদের বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মীয়। সেইজন্য ফরাসী সেনাপতি বাঙ্গালীর হস্তে অস্ত্রদান করিয়া বলিয়াছেন—"বন্ধুগণ, এই অস্ত্রই এক্ষণে তোমাদের প্রকৃত বন্ধু; স্বীয় শরীরের মত এই অস্ত্রের আদর যত্ন করিবে। কে জানে একমাস পরে কে কোথায় থাকিব, কিন্তু এই অস্ত্রই আমাদের শেষ দিনের সাথী—এই অস্ত্রই শত্রুর আক্রমন হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে—যদি অস্ত্রের অনাদর কর, তুর্কী বা জর্ম্মণীর আক্রমনে তোমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।" আরও বলিয়াছেন "যখন তোমরা সেনাদলে যোগদান করিয়াছ তখন আর তোমাদের কেহ নাই—বাপ, মা, স্ত্রীপুত্র, ঘর-বাড়ী—সবই তোমাদের এই সেনানিবাস। এই সৈনিক বন্ধুগণই তোমাদের সর্ব্বস্ব—ইহাদের সহিত একত্র অবস্থান করাই তোমাদের স্বর্গবাস।"

বঙ্গবাসী এ শিক্ষা মাথায় করিয়া রাখিবে—বাঙ্গালী চিরদিন সঙ্কল্পপরায়ণ জাতি—আজ এই সেনাদলের উপর দিয়া বিধাতার যে কঠোর পরীক্ষা চলিয়াছে, অন্যান্য পরীক্ষার মত এ পরীক্ষায়ও তাহারা কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইবে। তোরা সবাই বল—

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ভাষা,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান্!

———*···*···*———

মূল কথা।

নবীন সাধকের মহা বিপদ এই, যে সে প্রতিপদে পুরাতনের ফাঁদে পড়িয়া যায়। এই নূতন যোগাবলম্বী সাধককে মনে রাখিতে হইবে, যে ক্রমবিকাশময়ী আত্মশক্তিই তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিবে—বাহিরের প্রচলিত কোনরূপ ভাব বা সাধন-পন্থার অনুসরণ করিয়া সে চলিবে না।

মানুষের মনে যখনই ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে তখনই সে পুরাতন পন্থার অনুসরণ করে। ফলে চিত্রের পদ্মে ভ্রমর যেমন ভুলিয়া থাকে সাধকও সেইরূপ সাধনার জালে জড়াইয়া আবার আড়ম্বরবিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মহামূল্য সময় নষ্ট করে।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই যে চৈতন্য সাজিতে হইবে, শঙ্কর সাজিতে হইবে, বুদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ধর্ম্মলাভের জন্য নেড়া নেড়ীর মত যে বৈষ্ণবী কাড়িয়া, তন্ত্রসাধকের মত ভৈরবীগ্রহণ করিয়া শক্তিলাভ করিতে হইবে এমন কল্পনা যেন আত্মসমর্পণ-যোগীর মাথায় না আসে। আত্মসমর্পণযোগী বাহিরে কোন প্রত্যাশা করিবে না। তাহাকে বুঝিতে হইবে, তাহার ভিতর হইতেই শক্তি জাগ্রত হইবে। প্রতীকরূপা কোন রমণীর নিকট হইতে অথবা কোনও দেবতার আরাধনা করিয়া শক্তি লাভ করিব, এরূপ উঞ্ছবৃত্তি নবীন সাধক যেন অবলম্বন না করে।

সাধক আপনার শক্তিবলে আপনি দাঁড়াইয়া উঠিবে। ভিক্ষাবৃত্তি সে জানেনা, ভগবানের সকল ঐশ্বর্য্যই তাহার ভিতর সুপ্ত আছে, ইহা সে অবিরত মনে রাখিবে। এই অসীম শক্তিলাভ করিয়া জলদমন্দ্রে সে জগতের লোককে বলিবে "উঠ, জাগ, শক্তিলাভ কর।"

সাধক যেন আত্মবিস্মৃত না হয়, পুরাতন সাধন পদ্ধতি ছদ্মবেশে তাহাকে যেন ভুলাইয়া বিপথে লইয়া না যায়। যে মুহূর্ত্তে সে আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া 'আমায় দাও' বলিয়া বৃথা লোকের দ্বারে দ্বারে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কোথায় কে ভিক্ষা করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে?

"শক্ত্যাঃ ভগবতি চ শ্রদ্ধা"—ভগবান্ এবং তাঁহার শক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হও। এই শক্তি তোমারই। গুরু কেবল এই মন্ত্রই দিতে পারেন আর অধিক ক্ষমতা তাঁহার নাই। শক্তির সাধনা তোমাকেই করিতে হইবে, নতুবা তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

মনে রাখিবে, আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ, তাহা ভগবচ্ছক্তির প্রেরণায়; ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তাহাও এই ঐশীশক্তির আকর্ষণে—তবে ভিক্ষুক সাজিতে যাইবে কেন? কেবল এই মহাশক্তির অবাধ লীলার জন্য, আধারগুলি শুদ্ধ হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখ। সমতা না আসা পর্য্যন্ত কাহারও প্রতীক্ষা করিওনা। কে তোমার সঙ্গী হইবে, কে হইবে না, সে চিন্তা তোমার কেন? তুমি চলিবে মহানন্দে আত্মনির্ভরতা সঙ্গে লইয়া; তোমার অটল অচল ভাব লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বল তোমার সঙ্গী হইবে; তুমি অনাসক্তচিত্তে দৃঢ় তরুর মত অবস্থান করিবে। তরু কি কখন কোন্ লতাটী তাহাকে আশ্রয় করিবে তাহার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র ব্যাকুল হয়? যাহা করিতে আসিয়াছ তাহার শক্তি তোমার ভিতরেই সুপ্ত আছে। অজ্ঞানতা তোমায় অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে। আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া দেখ, তুমিই শক্তি, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি ইহার অধিক আর কি বলিব।

দ্বন্দ্ব জয়।

সুখদুঃখ, হাসিকান্না, জীবনমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের লীলা ভূমি এই পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীর লোক সুখ চায়, হাসি চায়, জীবন চায়; দুঃখ, কান্না, মৃত্যু কেহই প্রার্থনা করে না; সুতরাং দ্বন্দ্বের হাত হইতে জীব নিষ্কৃতি লাভে অসমর্থ হইতেছে। সুখের জন্য, প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির জন্য আমরা ভগবানকে ডাকি, দেবতার আরাধনা করি, পরন্তু দেবস্বভাব পাইবার জন্য আকাঙ্খা করি না।

* * *

আমরা ইহ জীবনের কোনও ইষ্টের জন্যই ভগবানকে পূজা করিব না। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিব তাঁহার স্বরূপ হইবার জন্য। কোন্ সন্তানটী জরা

ভোগ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে, "হে ভগবান্ আমার সন্তানের জীবন ভিক্ষা দাও", এরূপ নীচ প্রার্থনা কখনও করিব না ; অথবা দারিদ্রের কুলালচক্রে নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম বুঝিয়াও একদিনের তরেও ভগবানকে বলিব না, "আমায় ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া দাও"। কোনও কাম্য লাভের জন্য আমরা যেন তাঁহার শরণাগত না হই।

* * *

আমার প্রিয় অপ্রিয়, শত্রু মিত্র, ধনী দরিদ্র প্রভৃতি বিপরীত ভাবগুলি ভগবানেরই ক্রীড়নক—এই লইয়াই জগল্লীলা—অতএব এই সকলের একটী পরিহার করিয়া অপরটী লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারস্থ হইব কেন ? আমরা অকূল সমুদ্রে ডুবিয়া মরিবার কালে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয়রূপে পাইলে যেমন তাঁহার করুণানুভব করিব ; আবার সকলে আশ্রয় পাইল, আমার অবলম্বনটী প্রবল ঝটিকাবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল, আমি অতল জলধিজলে ডুবিয়া গেলাম —ইহার মধ্যেও আমার প্রতি তাঁহার সমান দয়াই অনুভব করিব।

* * *

মানুষ জগতে আসিয়াছে, দেবতার মত শক্তিশালী হইতে ; সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে দূরে ফেলিয়া সর্ব্বাবস্থাকে তুল্যবোধে আলিঙ্গন করাই জীবনের চরমাদর্শ। বিপরীত ভাবগুলি আমার জীবনের উপর দিয়া অবাধে খেলিয়া যাউক—আমি চঞ্চল হইব না ; বাহ্যপ্রকৃতির সকল প্রকার অত্যাচার ও আক্রমন প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করিব। ভিতরের যে অনন্ত শান্তি, যে অটুট আনন্দ, তাহা যেন চঞ্চল না হয়।

* * *

নিদারুণ পুত্রশোকেও যেমন আকুল হইব না—রাজরাজেশ্বর হইলেও তেমনি আত্মহারা হইব না। জীবনের খরস্রোতে যে সকল বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসিব সেগুলি ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেগুলি শত্রুভাবেই আসুক আর মিত্রভাবেই আসুক—কেহ আমাকে মুহূর্ত্তমাত্র রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি বহিব এই পৃথিবীর দ্বন্দ্বগুলির বুকের উপর দিয়া—প্রবল তেজে, প্রচণ্ডবেগে আমার গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিব—মত্ত ঐরাবতকে মথিত করিয়া পাহাড় ভেদিয়া জহ্নু মুনির জীবন বিনাশ করিয়া। আমায় ছুটিতে হইবে—আমার অবিরাম গতির প্রতিবন্ধক কাহাকেও হইতে দিব না।

* * *

এইরূপ চরিত্রই আবশ্যক হইয়াছে—এইরূপ অনন্ত শক্তির আধার প্রত্যেক নরনারীকে আমরা আমাদের এই নূতন সাধনা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি। ভগবান্‌কে লইয়া যাহারা নাকি সুরে কাঁদিবে মাত্র, আমরা এরূপ হীনবীর্য্য অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন অধম মানুষ চাহি না। যাহারা রোগের প্রতীকারপরায়ণ হইয়া তারকেশ্বরে হত্যা দেয়, সন্তানের জীবনরক্ষণকল্পে কালীঘাটে পূজা দেয়, অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় সত্যপীরের সিন্নি মানে—এমন হীন, সঙ্কীর্ণচেতা নরনারীর জগতে আবশ্যক নাই বলিলেও চলে।

* * *

মানুষের বিপদের সময়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য—কিন্তু তাহার শক্তির খর্ব্বতা, মৌলিকতার হানি যাহাতে হইতে পারে, এরূপ কার্য্য করা উচিত নয়। বিপদের সময়ে অটলভাবে যাহাতে সে তাহার সম্মুখীন হইতে পারে এমন উপদেশই তাহাকে দিবে। তাহার ভিতর সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া তুলিবে—যাহাতে বিপদের বোঝা সে মাথায় বহিতে সমর্থ হয়। বিস্মৃতির কুহকে ফেলিয়া, পূজা হোম মাদুলির মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া—আত্মশক্তির বিকাশে যাহা মানুষকে পরাঙ্মুখ করিয়া তুলে, সে শিক্ষা, সে প্রবৃত্তি দেশ হইতে দূর করাই শ্রেয়ঃ।

* * *

মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক, এ বিশ্ব রণক্ষেত্র—যোদ্ধৃবর্গের রণকোলাহল ও অস্ত্র ঝনঝনাশব্দকে রোধ করিলেই শান্তি আসিবে না—শরীরের যে জরা মৃত্যু প্রাণের যে কামনা বাসনা, মনের যে হিংসা দ্বেষ, বুদ্ধির যে বিচার কল্পনা প্রভৃতিকে জয় করিয়া একে একে সকল রাজ্যগুলিকে স্বাধিকারে না আনিলে শান্তি অসম্ভব। কোন্ মূর্খ যুদ্ধে বিমুখ হইয়া শান্তি লাভ করিতে চায়?

* * *

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিশালী পুরুষের ভিতরেই তিনি সহজে প্রকাশিত হয়েন। জগতের দ্বন্দ্বগুলিকে জয় করিয়া শক্তির পরিচয় দাও। বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেবতার আরাধনা অরণ্যে রোদন স্বরূপ হইবে। আত্মজয়ী পুরুষই ভগবদ্দর্শন পায়। বিপদ ও দুঃখের আগুনেই আত্মজয়ের গুপ্তমন্ত্র লুকান আছে—যে বীর, সেই এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমতা প্রাপ্ত হইবে।

বিশ্ব সৌন্দর্য্য।

মানুষ এবং মানুষের মধ্যে অন্য যে বিষয়ে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন একটা বিষয়ে তাহারা সকলেই এক। সকলেই সৌন্দর্য্যাভিলাষী। মানুষের ভাব, ভাষা, কাব্য, কলা, শিল্প, সমস্তের ভিতর দিয়াই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে সেই একই চেষ্টা—সুন্দরে যাইবার এবং সুন্দরকে পাইবার। মানুষ যে ফুল পরে, অলঙ্কার ব্যবহার করে তাহাও তাহার সেই অন্তর্চেষ্টারই একটি বহিঃপ্রকাশ। মানুষের চিত্রাঙ্কন, সেই সুন্দরকেই রেখা এবং বর্ণসন্নিপাতে ধরিয়া রাখার চেষ্টমাত্র। তাহার কাব্যরচনা সেই সুন্দরকেই শব্দগম্য এবং ছন্দগম্য করার উদ্যম মাত্র। এই যে সুন্দরকে পাইবার চেষ্টা, ধরিবার চেষ্টা, দেখিবার চেষ্টা ইহা মানুষের মধ্যে অহরহই বর্ত্তমান রহিয়াছে,—জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ। কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ সে সুন্দরের এমন কতকগুলি সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া বসিয়াছে যে সে সংজ্ঞাগুলি তাহার সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তাহার চিরসুন্দরের সন্নিকটে যাইবার পথে প্রতিপদে বাধা জন্মাইতেছে। মানুষের সেই চিরসুন্দরকে পাইবার পূর্ব্বে তাহাকে বুঝিতে হইবে তাহার এই সংজ্ঞা কি? এবং তৎপরে তাহার এই সংজ্ঞাকে কষ্টিপাথরে ঘসিয়া দেখিতে হইবে তাহা খাঁটী মাল না শুধুই মনগড়া একটা মানদণ্ডমাত্র।

বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া একেবারে বলিয়া ফেলা ভাল যে এই সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন ইহা মানদণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বিভিন্ন দেশের মানদণ্ডের মতই বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে এমন কি বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই সংজ্ঞার পার্থক্য দেখিতে পাই। এই সংজ্ঞা কি তাহা না হয় নাই জানিলাম। কিন্তু ইহার পার্থক্য ধরিতে পাই ফলের পার্থক্যে। আমি যে রমণীকে সুন্দরী বলিতেছি একজন চীনেম্যানের কাছে সে রূপহীনা। আবার চীনেম্যানের সুন্দরী ললনা আমার নিকট কদাকার। এই যে পার্থক্য ইহা সংজ্ঞারই পার্থক্য ঘোষণা করে। আর যে সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সে সংজ্ঞাকে মনগড়া, স্বভাবগড়া—অথবা যাহা গড়াই হউক—মানদণ্ডমাত্র ছাড়া আর কি বলিব? আর যে সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন, সে সংজ্ঞার সংজ্ঞাদান করিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র।

বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে মানুষের মধ্যে এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতির পৃথক পৃথক সংস্কার ইহার কারণ দুইটী। প্রথমটী—মানুষের উপর তাহার পারিপার্শ্বিকের (Environments) প্রভাব—এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই মানুষের যাবতীয় সংস্কারগঠনে সাহায্য করে—এবং দ্বিতীয়টী যে অধিকাংশ নর-নারীই শিশুর ন্যায় দেখে শুধু রূপসৌন্দর্য্য,—ভাবসৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য যতখানি অন্তরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন তাহা তাহাদের জীবনে ঘটিয়া উঠে না। যে জিনিষটী চোখে লাগে, চোখ ঝল্‌সাইয়া যায় সেটাই তাহাদের কাছে সুন্দর। যদি কোন শিশুকে একটা সামান্যমূল্যের টুকটুকে লালবর্ণের পোষাক এবং একটী দামী কৃষ্ণবর্ণের আল্‌পাকার পোষাক দেওয়া যায় তবে সে লাল বর্ণের পোষাকটাই পছন্দ করিয়া নিবে। কারণ কোন্‌টার ভিতরের মূল্য কতখানি তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা শিশুর জন্মে নাই। লাল যেটা চোখে লাগে সেটাই তাহার ভাল, সেটাই তাহার কাছে সুন্দর। আমাদেরও সাধারণতঃ এই ভাবেই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হইয়া থাকে।

আমরা যখন ময়ূর দেখি তখন তাহার চিত্রবিচিত্রময় পুচ্ছ দেখিয়া বলি ময়ূর সুন্দর। আবার কাক দেখিয়া বলি কাক কুৎসিত। এখানে আমরা ময়ূরের ময়ূরত্বও দেখি না, কাকের কাকত্বও দেখি না—দেখি শুধু ময়ূরপুচ্ছ ও কাকপক্ষ। এবং আমাদের সংস্কারবশতঃ বলি একটী সুন্দর ও অপরটী কুৎসিত। ময়ূরের ময়ূরত্বের একটা সৌন্দর্য্য আছে, আবার কাকের কাকত্বেরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। যখন আমরা আমাদের অন্তর দিয়া মানুষের ময়ূরত্ব ও কাকের কাকত্ব যেখানে অবস্থান করিতেছে সেই খানটা স্পর্শ করিব তখনই শুধু এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আমরা পাইব। তখন দেখিব যে দুইই সুন্দর; এবং বুঝিব যে ময়ূরের সৌন্দর্য্য যেমন কাকে নাই তেমনি আবার কাকের সৌন্দর্য্যও ময়ূরে নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ময়ূর এবং কাকের দেহের সহিত আমার চোখের সংযোগ ততক্ষণই অসুতের খেলা। যখন আমার অন্তরাত্মার সহিত ময়ূর ও কাকের অন্তরাত্মার সংযোগ ঘটিবে সেই মুহূর্ত্তে চিরসুন্দর ও নিত্যসুন্দর ধরা পড়িবে। কারণ সবই সেই এক চিরসুন্দরেরই প্রকাশ।

আমরা যখন রূপরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করি তখনই শুধু আমাদের দৃষ্টিতে ভাবসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই ভাব-সৌন্দর্য্য দেখিবার ক্ষমতা জন্মিলেই সেই চিরসুন্দরকে ধরিবার অধিকার জন্মে না। কারণ ভাবরাজ্যেও মানুষ আপনার চারিপাশে গণ্ডি টানিয়া বসে।

এই গণ্ডি টানে বলিয়া কবি যখন বলেন—"God of love and God of Wroth are one" তখন তাহার ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। তাহার প্রাক্তন কর্ম্ম, তাহার স্বভাব এবং সংস্কার তাহাকে এমন একটী মানসিক সত্তায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে যেখানে সে God of wroth কে বুঝিতে পারে না; বুঝিলেও সেই ঈশ্বরকে সে অনৃতময়, অমঙ্গলময় এবং অসুন্দর করিয়াই বুঝে। ইহার কারণ কি? আমরা ঈশ্বরকে বুঝি, প্রেমময় ঈশ্বরকে বুঝি—কিন্তু রুদ্ররূপী ঈশ্বরকে আমরা বুঝি না—অন্ততঃ সে ঈশ্বরকে আমরা সুন্দর দেখি না, মঙ্গলময় দেখি না। আমরা যদি ইহার ভিতরের কথাটা বুঝিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির যে গণ্ডি তাহার আসল কারণটা বাহির হইয়া পড়িবে।

মানুষের প্রধান একটী ধর্ম্ম—তাহার অহঙ্কার। প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সেই কেন্দ্রেরই পরিপুষ্টি, উৎকর্ষ, সেই কেন্দ্রেরই সুখস্বাচ্ছন্দ খুঁজিতেছে। সেই কেন্দ্রের সুখ সমৃদ্ধির পক্ষে যাহা কিছু অনুকূল তাহাকেই সে বরণ করিয়া নেয়—যাহা কিছু প্রতিকূল তাহাকেই সে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করে। ইহাতে দোষের কিছু নাই। এই ব্যক্তিগত কেন্দ্রজ্ঞান আছে বলিয়া মানুষের উন্নতি। এই সকল কেন্দ্র হইতে যে শক্তির খেলা হইতেছে সেই শক্তির সঙ্গে অন্য কোন শক্তির সংঘর্ষ হইলেই আমরা সেই অপর শক্তিকে অমঙ্গলময় বলিয়া ধার্য্য করি। সেই জন্যই God of love কে বুঝি—কারণ আমরা মনে করি এই প্রেমময় ঈশ্বর আমাদিগকে প্রণয়ীর মত হাত ধরিয়া পথ হইতে পথান্তরে লইয়া যাইতেছেন, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতেছেন। তাই তাহাকে ভালবাসিতে পারি। কিন্তু God of wroth যিনি যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত ধ্বংস সাধন করিয়া দিতে পারেন, আমাদের কৃত শিল্প কলা, আমাদের নির্ম্মিত নগরনগরী, আমাদের উদ্ভাবিত কল কৌশল যে কোন মুহূর্ত্তে মুছিয়া দিতে পারেন সে ঈশ্বরকে আমরা মঙ্গলময় বলিয়া বরণ করিতে পারি না, সে ঈশ্বরকে আমরা ভাল বাসিতে পারি না। ইহার কারণ মানুষের সেই কেন্দ্রগত সসীম জ্ঞান—তাহার সেই সনাতন অহঙ্কার। সে যাহা মনে করে ঠিক, সে যাহা মনে করে মঙ্গল, তাহাই যেন ঠিক এবং মঙ্গল।

মানুষের এই যে আত্মরক্ষার instinct, এই যে আত্মপুষ্টির চেষ্টা ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির কি সম্বন্ধ? এই আত্মরক্ষা, আত্মপুষ্টি ও আত্মতুষ্টির বাসনা কি করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা আমরা উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পাছ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পথ চলি-

য়াছে। বিরাট প্রান্তর। প্রান্তরে একটীও বৃক্ষ নাই। গলদ্‌ঘর্ম্ম পথিক প্রান্তর পার হইয়া দেখিল একটী বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ; পত্র পুষ্প শোভিত; সুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পথিক ক্লান্ত দেহে সেই ছায়াসুশীতল বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিল। আপনা আপনি তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল—আঃ কি সুন্দর! সুন্দর কি? ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষ—পত্র পুষ্প শোভিত—মনোরম শীতল ছায়া সঙ্কুল। আর ঐ যে অশ্বত্থ বৃক্ষের পাশে সারি সারি শিমুল গাছ দাঁড়াইয়া আছে—পুষ্প-পত্র-লেশ-হীন—উহারা কিরূপ? উহারা কুৎসিত। উহারা সুন্দর হইবে কি করিয়া? কঙ্কাল সদৃশ—পত্রহীন, পুষ্পহীন—ছায়া-লেশশূন্য। আমি ক্লান্ত পথিক—গলদ্‌ঘর্ম্ম, সূর্য্যতাপে চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছে, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যায় যায়—আমাকে উহাদের শীতল ছায়ায় স্থানদান করিয়া আমার ক্লান্তি দূর করিবার শক্তি কোথায়? এই হইল পথিকের ভিতরের কথা। তাই উহারা কুৎসিত। কিন্তু বাস্তবিক কি পত্র-পুষ্প-হীন বৃক্ষের কোন সৌন্দর্য্য নাই? আছে। সে সৌন্দর্য্য পত্র-পুষ্প-যুক্ত বৃক্ষের সৌন্দর্য্য নহে, সে সৌন্দর্য্য পত্র-পুষ্প-হীন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য দেখা সম্ভবপর কাহার পক্ষে? যে পুরুষ কিংবা নারী তাহার স্বকীয় কেন্দ্রগত সুখ সুবিধাকে এবং তাহার বাসনার চরিতার্থতাকে আপনার সৌন্দর্য্যানুভূতির যে যন্ত্র সে যন্ত্রের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে না দেয় এবং যাহার সৌন্দর্য্যানুভূতি পত্র-পুষ্প-যুক্ত বৃক্ষের সৌন্দর্য্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যদি কেহ বলেন হাস্যরসেই শুধু আনন্দ আছে রৌদ্ররসে নাই কিম্বা করুণ রসই শুধু উপভোগ্য বীর রস নহে তবে যেমন তিনি তাঁহার স্বকীয় সংস্কারগত এবং স্বভাবগত, একটী সত্যের উক্তি করিবেন মাত্র তেমনি ঐ পত্রযুক্ত ও পত্রহীন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও একই কথা। নয়টী রস। নয়টী রসেই আনন্দ আছে। এই নয়টী রসের মূলগত আনন্দ এক হইলেও সে আনন্দের অনুভূতি জন্মে পৃথক পৃথক মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়া, কারণ নয়টী রস পৃথক। যে নর কিংবা নারী, তাহার কেন্দ্রগত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিয়াছে তাহার মানসিক সত্ত্বাকে সসীম হইতে অসীম করা সম্ভবপর হয় এবং সেই শুধু ভগবানের রঙ্গমঞ্চে নয়টী পৃথক পৃথক রসের আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

মেঘে সৌন্দর্য্য আছে। ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন বলিয়া কবি মেঘদূত লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যখন সেই মেঘ আকাশ ছাইয়া যায়, ঘোর ঘন ঘটা

করিয়া স্তরের পর স্তর পুঞ্জে পুঞ্জে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিগন্ত ঘিরিয়া ফেলে, তখন উত্তম অট্টালিকানিবাসী নববিবাহিত যুবকের সে সৌন্দর্য্য অনুভূতি করা বোধ হয় সহজেই সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু যে দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীর শত ছিদ্রময়, আশু বৃষ্টি এবং ঝটিকার ভয়ে যে কাতর—তাহার ঐ সৌন্দর্য্যানুভূতি হওয়া দূরের কথা, ভগবানের নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপর তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সমুদ্রের সৌন্দর্য্য আছে। ঝটিকান্দোলিত তরঙ্গসঙ্কুল সিন্ধুবক্ষেরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেটা শান্ত সিন্ধুর সৌন্দর্য্য নহে—সে সৌন্দর্য্য রুদ্রমূর্ত্তির। কিন্তু যে কর্ণধার সেই তরঙ্গমালার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র তরণী লইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে সে, সে সৌন্দর্য্য দেখিবে কেমন করিয়া? এই সংসার পারাবারেও ঐ একই কথা।

ইহাই হইল প্রধান বাধা,—এই স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ মানসিক সত্তা, এই অজ্ঞানতাময় কেন্দ্রজ্ঞান। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত কেন্দ্র ভগবান্। যখন প্রকৃত জ্ঞানালোকে ঐ ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রজ্ঞানের বিলোপ হইয়া জীবনে সেই সত্যতম, বৃহত্তম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, তৃতীয় নেত্র খুলিবে শুধু তখনই। এবং তখনই শুধু বিশ্ব-সৌন্দর্য্য আপনার প্রকৃত স্বরূপ লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। তখন দেখিব সকলই সুন্দর। শিশুর শিশুত্ব সুন্দর, বৃদ্ধের বৃদ্ধত্ব সুন্দর—জলধি সুন্দর, মরুভূমি সুন্দর—শ্যাম দুর্ব্বাদল আচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রান্তর সুন্দর, তৃণ-গুল্ম-নিরস্ত ঊষর ক্ষেত্র সুন্দর—বসন্তের মৃদু সমীরণ সুন্দর, বৈশাখের ভীম প্রভঞ্জন সুন্দর—শরতের কৌমুদী সুন্দর, বর্ষার ঘোর ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন অমানিশা সুন্দর। তখনই শুধু বুঝিব—কৃষ্ণও সুন্দর, কালীও সুন্দর। তখনই দেখিব শুধু—চিরসত্য—চিরমঙ্গল—চিরসুন্দর।

যোগ।

(৪)

প্রাণ যখন চিত্তের, চিত্ত যখন মনের, মন যখন বুদ্ধির কার্য্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখনই বুঝিতে হইবে, গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসঙ্কর দোষ নাশ না করিলে জীবের স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত জীবনলাভ একান্ত পক্ষে দুরূহ।

অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন আমিই যখন ঈশ্বর, আমার ইচ্ছাতেই যখন সর্ব্ব কর্ম্ম সংসাধিত হয়, তখন এরূপ হয় কেন? ইহাই ত অজ্ঞানতা। পুরুষ

স্বসৃজিত মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়া আপনার ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; তিনি ক্ষুদ্র দেহরাজ্যকেই আপনার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গে আপনাকে আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছেন।

শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি যন্ত্রগুলি কি ভোগ করে, না এসকলের ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে? ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগী কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত। এই বিস্মৃতির আবরণ হইতে মুক্তির ইচ্ছা করিলেই জীবশরীরে যোগীর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সেই সকল লক্ষণের কথাই যোগ নামক প্রবন্ধে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন যোগশাস্ত্রে সূক্ষ্মদেহের যে সকল নাম আছে যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র এইগুলিকে আমরা সাধারণ ও সহজ নামেই গ্রহণ করিয়াছি; মূলাধার অন্নময় কোষের মূল, অর্থাৎ স্নায়ুময় এই দেহযন্ত্র; স্বাধিষ্ঠান, আমরা ইহাকে সূক্ষ্মপ্রাণ বলিয়াছি; মণিপুর রসস্থান চিত্ত, অনাহত মন, বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং আজ্ঞাচক্রই ইচ্ছাশক্তি। অতএব প্রাচীন শব্দগুলি ব্যবহার না করিয়া আমরা দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াই সকল কথা বলিব। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেহস্থিত যন্ত্র ও তাহাদের কার্য্যকলাপের কথা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং এই যন্ত্রগুলি শক্তির অনুগত হইয়া কার্য্য করিলেই যে যোগসিদ্ধি লাভ করা যায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছি।

ইচ্ছা (will) এই সকল যন্ত্রের বল্গা ধারণ করিয়া বুদ্ধিকে জ্ঞানের জন্য, মানসকে বাহ্যজগতের বিষয় গ্রহণের জন্য, চিত্তকে রসসৃষ্টির জন্য, প্রাণকে ভোগের জন্য এবং দেহকে কার্য্য করিবার জন্য, পুরুষের শাসনে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।

ইচ্ছা পুরুষের। কোনও যন্ত্রের আজ্ঞাধীন ইনি নহেন। পুরুষের সহকারিণী এই শক্তি শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু। ইনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে অপর শরীর-যন্ত্রগুলি লইয়া ক্রীড়া করেন; বাসনা, ব্যগ্রতা, ভাব-প্রবণতা প্রভৃতি কোনভাবেই ইনি আবদ্ধ নহেন। পুরুষ যাহা চাহেন, ইনি নিরাসক্তভাবে তাহাই সম্পাদন করেন।

এই শক্তির উপর অটল বিশ্বাস করা চাই। এই শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করার পর সংশয়ের জালে জড়াইয়া আবার যেন চেষ্টা ও বাসনাকে পুনঃ জাগরিত না করি, এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মৃত্যুপণ না করিলে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। শক্তির উপর অটল বিশ্বাস ঘটিলেই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, শক্তির

খেলা চলিতে থাকিবে। যত দিন না এই শক্তিকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, ততদিন শরীর, প্রাণ, মন যতই চঞ্চল হউক উহার দিকে লক্ষ্য করিব না। শক্তিলাভ হইলে অর্থাৎ শক্তি অনুভূত হইলে শক্তিই সকল অন্তরায় দূর করিয়া দিবে। সাধককে এই শক্তিউপাসনাই প্রথমে করিতে হইবে।

সাধক শক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে পর, শক্তি আধারের শুদ্ধিবিধানে যত্নশীলা হন। এই অবস্থায় আধার পুরাতন স্বভাব, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সহজে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়—ফলে জীবনের মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধিয়া যায়। ইহাই দ্বন্দ্বের (struggle) অবস্থা। এই অবস্থা ধৈর্য্যসহকারে কাটাইতে পারিলে, যোগের পথ অধিকতর সুগম হইয়া উঠে।

মানব-জীবন স্বভাবতঃ অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ। এই অসিদ্ধ অবস্থাই মায়াবশে জীবের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হয়। শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আধারের প্রত্যেক যন্ত্রই তাহাদের চিরদিনের স্বভাব ও সংস্কারকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাহারা বলে—আমরা মঙ্গল চাহি না, আনন্দ চাহি না, পূর্ণতা চাহি না, আমরা বেশ আছি। শক্তি কিন্তু শ্রীভগবানের পূর্ণবিকাশের জন্য অদম্য বেগে শরীর, প্রাণ, মন প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা, অপূর্ণতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

মানুষের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়া তোলাই প্রকৃতির সনাতন পদ্ধতি। তিনি মানুষকে ক্রমশঃ এই পথেই অগ্রসর করাইতেছেন; কিন্তু সে গতির বেগ এত দীর্ঘসূত্রী, যে শত বৎসর পরেও জীব, জীবনের ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যোগে এই গতিকে অত্যন্ত ক্ষিপ্র করিয়া তুলে, মুক্তির দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এজন্য যোগ জীবনই প্রশস্ত।

পূর্ব্বস্বভাবই যোগের পথে প্রধান অন্তরায় এবং ভগবানের ইচ্ছাই মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই ইচ্ছাকে সর্ব্বাগ্রে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই। বাসনা পরবশ আমরা স্বভাবতঃ যাহা করি, তাহার ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যোগারম্ভ কালে, আমরা কোনটী বাসনা, কোনটী প্রেরণা ইহা স্থির করিতে অসমর্থ হই। এইরূপ অবস্থায় উপায় কি ? উপায়, যাহাই করি না কেন মনে রাখিব "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"। ভাল মন্দ, শুভ অশুভ যে কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা সাধিত হউক, তাহার দায়িত্বভার আমরা কিছুতেই বহন করিব না এবং প্রিয় অপ্রিয় ফলভোগের প্রতিও সমানরূপে উদাসীন হইব কেন না ভোক্তা ভগবান্। এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা প্রথমেই আমাদের প্রাণকে বাসনাশূন্য করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত আত্মসমর্পণ মন্ত্রেরই একাগ্র

সাধনবলে চিত্ত ও বুদ্ধির সমতাবিধান করিতে হইবে। চিত্তের ক্ষিপ্ততা, মূঢ়তাকে পরিবর্জ্জন করিব এবং বুদ্ধির কল্পনাজগতে বিচরণ বন্ধ করিয়া দিব। এই কার্য্যে একটা আশার কথা এই, দেহ, প্রাণ, মন ছাড়া আমাদের মধ্যে আর একটা যন্ত্র আছে যেটার শক্তি অপরিসীম, সেটী হচ্ছে বিজ্ঞানময় কোষ। এই বিজ্ঞানময় কোষ দিয়ে আমরা উপরোক্ত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করি; কিন্তু শুধু হৃদয়ঙ্গম করিলেই চলিবেনা যাহা বুঝি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহা আয়ত্ত করা চাই। এক্ষণে ইহা কি সত্য যে আমরা ক্ষুদ্র, অসমর্থ, অনুদার? বিজ্ঞানময় কোষ (জ্ঞান) বলছে— না, এটা তোমার মায়া, এটা তোমার অহঙ্কার। এই মায়া, এই অহঙ্কার ত্যাগ করলেই দেখতে পাবে যে তুমি পূর্ণ, তুমি অনন্ত, তুমি উদার!

দেহের অহং, প্রাণের অহং, মনের অহং পরিহার করিলেই একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি এসে এগুলা ভরিয়ে তোলে। তখন ভগবান্‌কে এই শরীর দিয়ে ধরা যায়, তাই সেথায় ধারণাসামর্থ্য—প্রাণ দিয়ে ভোগ করা যায়, তাই সেথায় ভোগ সামর্থ্য, মন দিয়ে ভালবাসা যায়, বুঝে উঠা যায়—তাই সেথায় প্রেমসামর্থ্য ও জ্ঞানসামর্থ্য জেগে উঠে। যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলিকেও জানিয়া রাখা আবশ্যক। অশুদ্ধ প্রাণ, মন, বুদ্ধিদ্বারা আমরা আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি, সেই সমস্ত অর্জ্জিত অভ্যাসের একটা প্রভাব আছে। অহঙ্কার স্পর্শে সেগুলি মলিন এবং অপূর্ণ বটে, কিন্তু নূতনের জন্য সহসা তাহারা স্থান ত্যাগকরিয়া অন্তর্হিত হয় না।

এই যোগশক্তির সহিত প্রথমেই তাহারা প্রবল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়; ক্ষেত্রস্থিত পুরাতন সংস্কার, প্রাণ, মন, বুদ্ধির ভিতরে ভগবচ্ছক্তিকে কার্য্য করিতে দেয় না। এই খানে বলিয়া রাখি, এই ইচ্ছাই কালীশক্তি; ইনিই ভগবৎপ্রেরণায় পুরাতনকে পরাস্ত করিয়া ধীরে ধীরে সাধকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন বৃত্তি জাগ্রত করেন; ক্রমে সাধকের জীবন হইতে পুরাতন প্রস্থান করে।

প্রস্থান করিলেও, দূরে থাকিয়া অশুদ্ধ শক্তিগুলির সমবায়ে এই পুরাতন, নূতনের উপর সাধকের বিশ্বাস ও জ্ঞানকে দূর করিয়া দিবার জন্য ভীষণ সংগ্রাম করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই কালীশক্তি একবার অন্তঃকরণে স্থান পাইলে, ক্রমেই ইনি প্রবলা হইতে থাকেন, পুরাতন স্বভাবের এই দ্বিতীয় স্তরের আক্রমণগুলিকে অনায়াসেই পর্য্যুদস্ত করিয়া জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অচল করিয়া লয়েন।

স্বভাবের তৃতীয় চেষ্টা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের। কিন্তু এই কালী-শক্তির যদি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়, তাহা হইলে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয়না।

জীবদেহে এই দেবশক্তির প্রতিষ্ঠা একদিনে সম্ভবপর নহে। জীবনের শুদ্ধি বিধানকল্পে মাতৃশক্তির হস্তে সর্ব্বস্বসমর্পণ-সঙ্কল্প যোগের প্রথম মন্ত্র। কালী-শক্তির প্রবেশ কালে জীবের পুরাতন প্রকৃতির সহিত এই যে দ্বন্দ্ব উহা অতি ভীষণ। এই অবস্থাতেই ভুলভ্রান্তি অবিশ্বাস, বাসনা কামনা, লোভ মোহ, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, বিচার আচার প্রভৃতির কুহকে জীবকে যোগ ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু এই প্রথমযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যদি সাধকের মধ্যে ভগবদিচ্ছা একবার স্থান পায়, তাহা

হইলে আর যোগভ্রষ্ট হইবার শঙ্কা থাকে না।

জীবের স্বভাব, পদে পদে অন্তরায়স্বরূপ হইয়া যেমন যোগীকে হতাশ ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, যোগের ক্রমোন্নতি তেমনি সাধককে উৎসাহ দেয় এবং আশান্বিত করে। কাল যেমন নির্দ্দিষ্ট গতির মধ্যে প্রবাহিত হয়, যোগও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ক্রমোন্নতি লাভ করে।

সাধক যোগাবলম্বনের পরেই জীবনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের আভাস পায়। পূর্ব্বে বিমূঢ় অবস্থায় প্রিয় অপ্রিয় যে কোন কার্য্য করিত, তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তির অভাব হেতুই রাগদ্বেষ, কাম ক্রোধ উগ্র হইয়া জীবকে ক্লেশ দিত, কিন্তু যোগগ্রহণের পর যে দ্বন্দ্ব, তাহার আকার অন্যরূপ।

ইচ্ছাশক্তি জীবকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে চায়, ভূতাবিষ্টের মত উহা করিতে অসমর্থ হইতেছি এরূপ একটা ধারাবাহিক জ্ঞান ভিতরে জাগিয়া উঠে। কখন সমর্থ, কখন অসমর্থ, কখন ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম করিলাম, কখন বাসনার দাস হইলাম, কখন উত্থান কখন পতন—এমনই একটা বিপ্লবের মধ্যে, এমনি একটা আবর্ত্তনের মধ্যে, এমনই একটা দোটানার বাঁধনে যে আবদ্ধ হইয়াছি এরূপ মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দ্বন্দ্বভোগ করিতে অসমর্থ হইলেই যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সাধক দ্রষ্টাস্বরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত এই অবস্থা কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিবে ক্রমেই পুরাতন ভাল মন্দ, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে আধার যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠিতেছে—প্রাণ, মন, বুদ্ধির প্রভাব ছাড়া একটা অজ্ঞাত শক্তি জীবন অধিকার করিতেছে। যোগের এই গতি প্রাথমিক। দ্বন্দ্বের অবস্থায় ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধকের আশা হয়, উৎসাহ হয়।

কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইলে পথের মধ্যে সকল সামগ্রী যেমন দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, সেইরূপ জীবনের কুসংস্কার একে একে সাধকের লক্ষীভূত হয় এবং ইচ্ছা কর্ত্তৃক উহা বিদূরিত হয়। কিন্তু কালীশক্তির যতই জীবের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়, এই গতির বেগ ততই দ্রুততর হইতে থাকে তখন কোথা দিয়া কি হইয়া যায় তাহা দেখিবার অবসর থাকে না—যেমন মটর গাড়ী করিয়া পথ অতিবাহন করা। যোগের আরও এক প্রকার গতি আছে, উহা সকল যোগীর জীবনে ঘটিয়া উঠে না, অবতার বা বিভূতিদিগের জীবনেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এই, এক মুহূর্ত্তে কালীশক্তি সকল অশুদ্ধতাকে সংহৃত করিয়া লয়েন; সাধক নিমেষমধ্যে প্রত্যক্ষ করে তাহার আধার শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে সাধককে প্রথমেই এই কালীশক্তির উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে—এই মাতৃশক্তিই যে আমায় শুদ্ধ করিয়া দিবেন, এতদ্ব্যতীত আর অন্য প্রয়াস, অন্য চেষ্টা করিব না এ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে। পরে এই শক্তি কেমন করিয়া জীবনকে শুদ্ধ ও দেবনিবাসের কেন্দ্র করিয়া তুলিতেছেন ধীরচিত্তে উহা কেবল লক্ষ্য করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমি ভর্ত্তাস্বরূপ এই দেহযন্ত্রকে ধারণ করিয়া রাখিব, কালীশক্তি ইহার সর্ব্বদোষ দূর করিয়া ইহাকে অমৃতময় করিয়া তুলিবেন।

লইয়া—আর সে ঢেউয়ে জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সেই যুগে আমরা জ্ঞানে ও প্রেমে ভগবানকে ধরিয়াছি—গৌরবে এবং বৃহতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—বিরাট কর্ম্মে তাঁহার তুষ্টি সাধন করিয়াছি—মানব জীবনের পূর্ণ সার্থকতায় তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছি। মানবমণ্ডলী সে খেলা দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, সম্ভ্রমে নতশিরে বলিয়াছে—ভারতবর্ষ তুমি ধন্য, তুমি পূজ্য। সভ্যতার আদি গুরু আমরা।

দিনের পর রাত্রি আসে। তাই আমাদেরও বিরাট কর্ম্মশীলতার পর পর একটা করিয়া অবসাদের যুগ আসিয়াছে। এই অবসাদের যুগে আর আমাদিগকে আমরা বলিয়া জানি নাই। তখন ভগবানের দানের অমর্য্যাদা করিয়াছি। যখন অন্তরে আনন্দ হারাইয়া বাহিরেও শুধু নিরানন্দকেই পাইয়াছি—তখন ভগবানকে বলিয়াছি—নিষ্ঠুর ভগবান্, আমাকে তুমি সৃষ্টি করিলে কেন? তোমার জগতে আমার আনন্দ নাই, তোমার সৃষ্টিতে আমার আকাঙ্খা নাই, তোমার সার্থকতায় আমার তৃপ্তি নাই। আমি থাকিতে চাই না তোমার জগতে, আমাকে বিজন কান্তারে নির্জ্জন গিরিগুহায় লইয়া চল; যেখানে মানুষের মুখ দেখিতে হইবে না, আকাশের আলো সহ্য করিতে হইবে না—যেখানে পাখী গাহিবে না, ফুল হাসিবে না। আমাকে মুছিয়া ফেল তোমার ব্রহ্মাণ্ড হইতে—তোমার সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ রস আমি কিছুই চাহি না। ইহাই হইতেছে অবসাদের যুগ। ইহা মানুষের সত্যবস্তু নয়। এই কর্ম্মবিমুখতা, এই আনন্দহীনতা ইহা মানুষের অনুতময় স্বভাব। ইহার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞানতায়। ইহার দেবতা

অশুচি। ইহার ঋষি অবিশ্বাসী। ইহা মানবধর্ম্ম নয়।

কিন্তু দীর্ঘ শীতের রজনীরও অবসান হয়। তখন নবীন প্রাণের নূতন বার্ত্তা লইয়া নামিয়া আসে বসন্তের উষা। তাহার স্পর্শে বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে গৌরবে পুষ্প-বাটিকা আহ্লাদে ভরিয়া যায়। বাতাসের সোহাগে সোহাগে বিটপীর কঙ্কাল সদৃশ শাখা প্রশাখা পত্রে পত্রে ছাইয়া যায়। সাধ্য কি যে ফুল গাছেরা খুসী না হইয়া উঠে—ক্ষমতা কি যে বিটপীরা গৌরব বোধ না করে। এ যে ভগবানের স্পর্শ, ভগবানের দান।

তাই ঐ তমসাচ্ছন্ন অবসাদবিভাবরীর পরও এমন একটী উষা ফুটিয়া উঠে যে সেদিন বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে জীবন আহ্লাদে আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উঠে। মুখ আপনা আপনি হাসিতে ভরিয়া যায়—বক্ষের স্তরে স্তরে আনন্দের স্পন্দন নৃত্য করিয়া উঠে—দেখি মানুষে আকাশে, আকাশে বাতাসে, বাতাসে ধরিত্রীতে এক অবিচ্ছেদ্য রহস্যময় সম্বন্ধ—দেখি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বিপুল আনন্দডোরে গাঁথা, সেখানে বিফল কিছুই নয়, নিরর্থক কিছুই নয়—আবেগ উচ্ছাসে, গৌরবে সৌরভে জীবন ভরিয়া উঠে—আর গদগদ কণ্ঠে বলি—ভগবান্ আমি ধন্য, তুমি ধন্য—তোমার জগৎ সংসার ধন্য। এ কি আনন্দের খেলা তোমার! এ কি বিরাট খেলা তোমার!

এই যুগে জাতির চোখে ফুটিয়া উঠে ভগবানের বিশ্বরূপ। তখন জাতি বুঝিতে শিখে ক্ষুদ্র কিছু নয়, নিরর্থক কিছু নাই; দেখিতে শিখে ভগবানের সত্যমূর্ত্তি, চিন্ময় মূর্ত্তি, আনন্দময় মূর্ত্তি শুধু আপনাকে অনন্তরূপে প্রকাশ করিয়া আছেন। মানুষের জীবনে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় তার সত্যধর্ম্ম। আর নব নব জ্ঞান, নব নব কর্ম্মের দ্যোতনায়, নব নব শিল্প কলা, নব নব উৎসাহে মানুষ আপনাকে সার্থক করিয়া তুলে। মানুষ তখন ক্ষুদ্র নয়—ভগবান্‌কে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া সে তখন তাহার অধিকার বুঝিয়াছে। সে তখন দীন নয় হীন নয়—ভগবানের গৌরবে সে গৌরবান্বিত—তাঁহার ঐশ্বর্য্যে সে ঐশ্বর্য্যবান্, তাঁহার শক্তিতে সে অটল অচল, তাঁহার বিশ্বাসে সে অমর। তখন মানুষকে থামাইবে কে—ঠেকাইবে কে? সে তখন আকাশের সহিত আপনার পরিমাণ করিতে চাহে, অশান্ত জলধিকে সে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার শাসন বিস্তার করিতে চাহে। ভগবান্ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাই আকাশের মত তাহার স্বাধীনতা—ভগবানের মন্দির সে, তাহার অশুচি কোথায়? ভগবান্ তাহার জন্য দায়ী—তাহাকে শাস্তি দিবে কে?

আমরা জানি ভগবানের এ আহ্বান কখনও বৃথা হইবে না। ভগবানের আহ্বান কবে কোথায় বৃথা হইয়াছে? তাই আজি বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মে মর্ম্মে এক দারুণ সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে। পন্থা কি? মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? মানবের পূর্ণ সার্থকতা কিসে? কৃচ্ছ্রতাসাধনে ইন্দ্রিয়াদিকে পিষিয়া আপনাকে লয় করিয়া দেওয়ার জন্যই কি ভগবান্ মানুষকে এমন অমানুষী শক্তি, ধী-কর্ম্মশীলতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? অথবা মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারকে ভগবানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারি চৈতন্যে আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া দেবলীলার উদ্‌যাপন হওয়াই ভগবানের উদ্দেশ্য? এ সন্দেহ আজি জাগিয়াছে ভগবানের ইশারায়। তাই মধ্যযুগের মানবজীবনের যে সমস্যাপূরণ তাহা আর কেহ আজ মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।

ভগবানের সেই ইশারার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আজি তাই ডাকিতেছি—এস ভাই সব, ঐ অনন্ত সুনীল গগনের নিম্নে আমরা মিলিত হই। ভগবানকে সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরাই ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। এস আবার সেই নির্ব্বাসিত ভগবানকে অরণ্য-কান্তার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের গৃহে গৃহে তাঁহার আসন পাতিব। জননীর স্নেহে, পত্নীর আদরে, ভাই বন্ধুর প্রীতিতে, শিশুর হাসিতে আবার তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব—আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মে, অবসরে, চিন্তায়, আহারে বিহারে তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিব। আমাদের অন্তরে অন্তরে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মন বুদ্ধি চিত্তকে তাঁহারি চৈতন্যে চৈতন্যময় করিয়া তুলিব—বিরাট করিয়া তুলিব—তখন তাহাদের ভিতর দিয়া ভগবানের যে আলোক ফুটিবে—তাঁহার যে জ্ঞান প্রকাশ হইবে—তাঁহার যে আদেশ বিঘোষিত হইবে তাহাতে জগত আবার আর একবার সম্ভ্রমে, নতশিরে বলিবে—ভারতবর্ষ সভ্যতার আদি-গুরু—তুমি ধন্য, তুমি পূজ্য।

ঋতম্।

দেহ, প্রাণ, মন—অহঙ্কারের বন্ধনে আবদ্ধ—তাই তাহারা স্বতন্ত্র, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র। "আমি দেহ" বলিলে এই বিশাল-বিশ্বে কতটুকু হই, এই অনন্তকোটী মানব-সমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের লক্ষ অংশের এক অংশও নই। সেইরূপ প্রাণ, বাসনার বেড়া দিয়ে জগতের অসীম প্রাণশক্তি থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমার বাসনা—বিশ্বরচয়িতার যে বাসনা আমার মত সংখ্যাতীত জীবের প্রাণকে সৃষ্টি করে তুলেছে, সেই অন্তহীন বিশ্ববাসনার মধ্যে তাহার স্থান নাই বলিলেও চলে। সেইরূপ আমার মন, অফুরন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্যের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দর্শন, স্পর্শন, বিচার কতটুকু করিতে পারে—সে কি এই অসীমকে যুগপৎ ধারণা করিতে পারে? এইজন্য ইহারা ক্ষুদ্র, ইহারা অপর্য্যাপ্ত—অনন্ত ভগবানের আস্বাদ এই গণ্ডীবদ্ধ জীবন দিয়ে করে উঠা যায় না—তাই সাধনার আবশ্যক। যা দিয়ে আমি এই ভগবদাস্বাদ করিতে পারি, এই অশেষ দেবতাটীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারি, এইরূপ ভাবে প্রাণ, মন, দেহটীকে গড়ে তুলতে হবে। যতই কৃতকার্য্য হইব ততই দেখিব, আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। প্রাণ বাসনার আবরণে জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে। চিত্ত ক্ষিপ্ত, এইজন্য ভগবানের উপর সহজে তাহার নির্ভরতা আসে না—সে চেষ্টা, উদ্যম, ও প্রবল প্রয়াসের দ্বারা সকল কর্ম্ম সংসাধন করিতে চায়—এই অস্থির স্বভাব হেতুও জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তি, কল্পনা প্রভৃতির সহায়ে সত্যবস্তু অধিকার করিতে চায়; কিন্তু সত্য ইন্দ্রিয়াতীত, চিত্ত, বুদ্ধি, প্রাণের দ্বারাও অধিগম্য নহেন; সুতরাং জীব সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান-প্রকাশেই সত্যের পথ আবিষ্কৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় (passive) করিতে পারিলেই আমরা সত্যজ্ঞান লাভ করিব এবং তখনই ভগবৎ-ইচ্ছাকেই জীবনের কেন্দ্রশক্তি বলিয়া স্বীকার করিব। এই অবস্থা লাভ হইলেই সাধনা শুধু কতকগুলি বাক্যমাত্র না হইয়া, জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এই ভগবদিচ্ছাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিবার পথে স্বভাবের এই সত্যটী জীবনের সবখানি যখন ভরিয়ে তোলে, অর্থাৎ এই সত্য দিয়ে ভাঙ্গা মন, খণ্ড প্রাণ, ক্ষুদ্র দেহ যখন পূর্ণ ও নূতন ভাবে গড়ে উঠে তখন ক্ষুদ্র প্রাণের বাসনায়, তুচ্ছ শরীরের ইশারায়, মনের উন্মাদনায় আর নাচি না—নাচি সত্যের প্রেরণায়; কেননা তখন জীবনটাই আমার সত্যময়, সত্যের জন্যই তখন কর্ম্ম, ভোগ, প্রেম, জ্ঞান—নিজেকে তখন হারিয়ে ফেলি অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে, যেমন মিলিয়ে যায় এক ফোঁটা জল অনন্ত বারিধির গর্ভে। এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেই আমি "ঋতম্"কে বুঝি—অখণ্ড, পরিপূর্ণ ভগবদ্‌প্রেরণার দ্বারাই তখন আমার শরীর-যন্ত্র পরিচালিত হয়—আমি আমার খণ্ডজীবন হারিয়ে জীবনকে ঋতপূর্ণ করিয়া তুলি। বৃহৎকে সম্মুখে রাখিলেই এই সত্য ও ঋতকে বুঝিবার অধিক অবসর আসিবে। কোনও ক্ষুদ্র, খণ্ডভাবের উপাসনা করিও না—জীব অখণ্ড দেবতার লীলাভূমি—প্রাচীন ঋষিগণ এই দেবতার সত্তা দিয়ে জীবন ভরিয়ে তুলেছিলেন তাই তাঁরা "ঋতম্"কে বুঝেছিলেন; আর আমরা ক্ষুদ্র জীবনের আকাঙ্খা ও আরামের জন্য সকল কর্ম্ম করি, তাই আমরা ঋষির বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হই। জীবন যখন প্রকৃতই সত্য হয়ে উঠবে—যখন 'দেবায় জন্মনে' এই জ্ঞান শুধু মনে রাখা নয়, জীবনময় ছড়িয়ে পড়বে, তখনই দেখবে দেবতার জন্য তোমার জীবন, তোমার কর্ম্ম, তোমার সাধনা—তখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঋতকে অধিকার করিবে—জীবনটা ঋতপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

নির্ভরতা।

অতীতের যোগপথের পথিকগণ সাধনা বলিতেই যৌগিক ক্রিয়া বুঝিতেন। শরীর ধর্ম্মসাধনার অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে? তাহাকে ক্লিষ্ট, নিষ্পীড়িত কর। ইন্দ্রিয়গণ প্রমাথী, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যোগাবঘ্ন উৎপাদন করিতেছে? তাহাদের বদ্ধ কর, অবরুদ্ধ কর, আবশ্যক হইলে উচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করিয়াও ফেলিতে পার। মন বড় চঞ্চল, উদ্দাম, প্রমত্তনৃত্যপরায়ণ? দারুণ ত্রাটক, কঠোর প্রত্যাহার—সাধনা দ্বারা তাহাকে সংযত করিয়া তোল। এইরূপে প্রাণ, চিত্ত, বুদ্ধি সকলের

বিশেষ ক্রিয়াগুলিকে নিরস্ত, নিষ্পেষিত, সংরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াই যোগিগণ যোগমার্গে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেন।

* * *

কিন্তু মানুষের বহির্জগতেও যেমন, অন্তর্জগতেও তেমনি এ কথা কি সত্য নয়, যে, কোনও প্রাকৃতিক শক্তিকে নিগ্রহের দ্বারা দমিত, সংযত, শাসনাধীন করা যায় না? লৌকিক জীবনেও যেরূপ, সাধনজীবনেও সেইরূপ, ভালই হউক, মন্দই হউক প্রকৃতিপ্রেরিত যে কোনও প্রবৃত্তি ও ভাব, শুদ্ধই হউক অশুদ্ধই হউক যে কোনও উদীয়মান শক্তি এবং আশাকে, নিগৃহীত, শৃঙ্খলিত করিয়া বশীভূত করা একেবারেই অসম্ভব—পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং শিলা প্রতিহত তটিনীর মত তাহার রুদ্ধ বল, বেগ ও প্রখরতা দ্বিগুণিত হইবেমাত্র—আপাততঃ দমিত বোধ হইলেও ভিন্ন-স্থানে, ভিন্নকালে, উগ্রতর পরাক্রমের সহিত তাহারা নিশ্চয় আবার আত্মপ্রকাশ করিবে। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? বস্তুতঃ কাহাকেও নিগ্রহের দ্বারা শাসনাধীন করিতে যাওয়া মূর্খতা এবং শ্রম ও সময়ের অপব্যয় মাত্র।

* * *

কারণ অতীতের ঐ সমস্ত যোগপন্থারই মূল কেন্দ্র ছিল অহংকার। আমি ভগবানকে লাভ করিব, আমি সাধনা করিব, আমি বুদ্ধিকে, মনকে, চিত্ত প্রাণ দেহকে সংযত, শুদ্ধ করিয়া তুলিব—করিব সকলই আমি; এই মূল কেন্দ্রেই প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দুর্ব্বলতার বীজ লুক্কায়িত ছিল। বস্তুতঃ তাহারা ভ্রমদুষ্ট ভিত্তির উপরই সাধনসৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইতেন। ফলতঃ যোগ-পন্থাগুলিকে একে একে মানবালয় পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত অরণ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের ভিতরে মানবসমাজ ও মানবজীবনকে বিকশিত ও উন্নত করিবার যে পরমশক্তি, পরমব্রত নিহিত ছিল—সেই মহৎ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া তাহারা সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বিস্তারই সত্য ও জীবনের লক্ষণ—যেখানে সঙ্কোচ, দীর্ঘ আত্ম-গোপন, বুঝিতে হইবে সেখানে ক্রমশঃই মিথ্যা ও মৃত্যুর রাজ্য প্রসারিত হইতেছে।

* * *

প্রকৃত পক্ষে পুরুষ যদি সমস্ত করিবে—তবে অনন্তশক্তিময়ী প্রকৃতি কিসের জন্য? যথার্থ সত্য কি? পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, প্রকৃতিই ক্রিয়াশীলা চঞ্চলা, সর্ব্বকর্ম্মকারিণী। পুরুষ অনন্ত—শুধু অনুমতি দিবে, দ্রষ্টা—শুধু দর্শন

করিবে, ভোক্তা—শুধু ভোগ করিবে, ভর্ত্তা—আধারকে ধারণ করিয়া থাকিবেমাত্র আর প্রকৃতিই তাঁহার সম্মুখে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবে। সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বাবস্থায় প্রকৃতিরই সমস্ত করিবার ভার—জীবন, কর্ম্ম, সাধনা, লীলা সকলি। ইহাই উত্তম রহস্য—অতীতের সাধনপথগুলি এই সত্য সম্বন্ধে একটা দারুণ অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতার উপরই সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই ত যতকিছু গোল-যোগের সৃষ্টি।

* * *

আমি আত্মসমর্পণ করিব কেন? সাধক পুরুষ স্বরূপে তাঁহার ইচ্ছাময়ী কালীশক্তি, তাঁহার অনন্তশক্তিময়ী মাতৃশক্তিকে তাঁহার সমস্ত আধারযন্ত্রটীকে সমর্পণ করিয়া দিবে—তাহার বিশ্বাস, তাহার পরম নির্ভরতা আছে মায়ের উপর—মা'ই সকল অশুদ্ধতাকে বিদূরিত করিয়া দিবেন। আমি শুধু নির্ভর করিয়া থাকিব—কারণ নির্ভরতা, প্রার্থনা, অনুমতিরই রূপান্তরমাত্র; আমি শুধু নিশ্চিন্ত-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিব—মা কেমন করিয়া পুরাতন অশুদ্ধ জিনিষগুলিকে নির্ম্মূল করিয়া, তৎস্থলে ধীরে ধীরে নূতন ভাব, নূতন জীবন, নব নব ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; আমি শুধু পরমানন্দে ভোগ করিয়া যাইব, আমার মায়ের দেওয়া ঐশ্বর্য্য, মায়ের দেওয়া দানগুলিকে; এবং প্রাচীন সাধকমণ্ডলীর মত নির্ব্বাণ ও লয়কেই লক্ষ্যস্বরূপ না করিয়া জগন্মাতাকে ধারণ করিয়া থাকিব—অখণ্ড আনন্দ ভরেই ইহজীবনে, ইহ জগতে মায়ের আনন্দ হইতে আনন্দে পরিক্রমন সম্ভব করিয়া তুলিব। ইহাই আত্মসমর্পণ যোগ—নূতন অথচ সেই চির সনাতন—সত্য, সহজ, সরল এবং সুন্দর।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দীক্ষা।

প্রাচ্য অধ্যাত্ম, পাশ্চাত্য আধিভূত। পাশ্চাত্যের ঝোঁক ইহলোকের দিকে, প্রাচ্যের ঝোঁক পরলোকের দিকে। সকল নিয়মেরই ব্যভিচার আছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিয়ম অসত্য হইয়া পড়ে না। এই নিয়মটির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রাচ্যে চার্ব্বাকের অভাব হয় নাই, আবার পাশ্চাত্যে যে সেণ্ট ফ্রান্সিস

ছিলেন না এমনও নয়। তবুও সাধারণভাবে লইলে আমরা বলিতে পারি, পাশ্চাত্যের জীবনস্রোতঃ ইন্দ্রিয়মুখী, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়মুখী। প্রাচ্যজগতের মূল প্রতিষ্ঠা সনাতন সত্য যে আত্মা, পাশ্চাত্য পরিচিত শুধু বাহিরের সত্যের সহিত, যাহার খেলা স্থূলে, যাহা অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল। পক্ষান্তরে স্বভাবের এই বিভিন্নতার ফলে পাশ্চাত্য হইয়াছে কর্ম্মী, সচল, জাগ্রত, জীবনপূর্ণ, প্রাচ্য হইয়াছে ধ্যানপর, শান্তসমাধিমগ্ন, জীবনসম্পর্কশূন্য। বর্ত্তমান যুগে মানবজাতি চাহিতেছে এই দুইটির সমন্বয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক করিয়া একটা উদারতর বৃহত্তর আদর্শের মধ্যে সমস্ত জগতকে সমধর্ম্মী করিয়া তুলিতে। কারণ আজ আমাদের বোধগম্য হইতেছে, এই যে দুইটি পৃথক্‌ধর্ম্ম ইহারা একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ নয়। আত্মা ছাড়া শরীর অন্ধ, শরীর ছাড়া আত্মা অচল। আত্মার মধ্যে শরীরকে সচেতন করিয়া তুলিব, শরীরের মধ্যে আত্মাকে গতিশীল করিব—ইহাই নব সমন্বয়ের আদর্শ।

এই আদর্শটি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে তাই উভয়ের সাহিত্যের কথা লইলাম। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ সেক্সপিয়রকে, ও প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ বাল্মীকিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এখন সেক্সপিয়র ও বাল্মীকির মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সেক্সপীয়র পড়িয়া মনের উপর আমাদের কি ধারণা রহিয়া যায়? বাল্মীকি পড়িয়াই বা কোন্ ভাব আমাদের অন্তরে ভাসিয়া উঠে? সেক্সপীয়র অঙ্কিত করিয়াছেন মানবীয় চরিতচিত্র, বাল্মীকি অঙ্কিত করিয়াছেন লোকোত্তর চরিতচিত্র। সেক্সপীয়র মানুষকে শুধু মানুষরূপেই দেখিয়াছেন, বাল্মীকি মানুষকে একটা বৃহত্তর কিছুর প্রতিনিধি বা নিদর্শন-স্বরূপেই প্রকটিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়রে জীবনের সহিত, জগতের সহিত ভৌতিক সম্বন্ধই অনুভব করি, পৃথিবীরই রসাস্বাদন করি, শরীরের দ্বারাই শুধু যেন শরীরকে আলিঙ্গন করিতেছি। বাল্মীকির মধ্যে জগৎকে শরীর দিয়া আমরা ধরিয়া লই, জগৎকে অনুভব করি যেন উর্দ্ধতর স্তরের একটা নিগূঢ় কিছুর ভিতর দিয়া। প্রাকৃত মানুষ, প্রাকৃত জীবন ইহাই সেক্সপীয়র, অতিপ্রাকৃত মানুষ, অতিপ্রাকৃত জীবন ইহা বাল্মীকি। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, লীয়র দেখ আর বাল্মীকির দেখ রাম রাবণ সীতা। সেক্সপীয়রের মানুষ মানুষই আর কিছু নয়, বাল্মীকির মানুষ মানুষ হইয়াও মানুষ নয়। যে সকল প্রেরণাবলীর সঙ্ঘাতে হ্যামলেট চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যতই জটিল হউক না কেন,

বুঝিতে আমাদের পক্ষে তত কঠিন নয়, কারণ উহা আমাদের চির পরিচিত আপনার জিনিষ। কিন্তু রাম চরিত্র বিশেষ জটিল নয়, তথাপি সবখানি তাঁর কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি? উহার পশ্চাতে একটা বিরাটত্ব, একটা অনন্তত্ব প্রহেলিকারূপ ছাইয়া রহিয়াছে, তাহা ঠিক মানবীয় গণ্ডীর মধ্যে ফেলিতে পারি না। রাম ও রাবণ এই অনন্তেরই এক এক মূর্ত্তি। রাম ও রাবণের মানবীয় লীলা একান্ত মানবীয় স্তরের ধর্ম্মেরই উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহাদের মানবলীলা-তরঙ্গভঙ্গ খেলিতেছে এক অগাধ অসীম সত্তার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের উপরে। এই অনন্তেরই বোধ হইতেছে প্রাচ্য, সান্তের অনুভব হইতেছে পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্যের সাহিত্যগুরু হোমরকে লও। হোমরের মানুষ বিরাট বিপুল হইলেও মানুষ। একিলিস, হেক্টর মানুষস্বভাবেরই রাজসংস্করণমাত্র, তাহারা অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি নহে। সান্তের, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সান্তের, ইন্দ্রিয়ের বিশেষত্বকে গোচর করা পাশ্চাত্যের দীক্ষা; আর সান্তের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, সান্তকে ইন্দ্রিয়কে উপলক্ষ করিয়া মাত্র, অনন্তকে অতীন্দ্রিয়কে পরিস্ফুট করাই প্রাচ্যের দীক্ষা।

আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে যদি আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্র অথবা ভাস্কর্য্যের তুলনা করি। ফিদিয়সের ভিনস মূর্ত্তি লও, আর লও ভারতের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রভেদ কোথায়? ভিনস নামে দেবী প্রকৃতপক্ষে মানবী। সুঠাম দেহ, সুবলয়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা, ললাট গণ্ডদ্বয় অনবদ্য—এক কথায়, নিখুঁত সুন্দরী। কোমলতা, প্রেমপ্রবণতার মাধুরী শরীরের পর্ব্বে পর্ব্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী গ্রেনিকা নারীর এক মূর্ত্তি কল্পনায় যতদূর বিশিষ্ট করিয়া গড়িতে পারি তাহা হইতেছে ঐ গ্রীসের ভিনস দেবী। কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখ—উহা অনবদ্যাঙ্গ নহে। আকার মানুষের বটে, কিন্তু শরীরতত্ত্ববিৎ গণিতকার উহাতে অনেক ভুল অনেক অসামঞ্জস্য হয়ত দেখাইয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্যানীবুদ্ধ ধ্যানস্থিত কোন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি নয়। উহা হইতেছে মূর্ত্তধ্যান। প্রাচ্যশিল্পের ইহাই বিশিষ্টতা—মানুষকে আঁকিয়া, তাহার মধ্যদিয়া ভাব কিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে প্রাচ্য শিল্প তাহা দেখায় না। প্রাচ্য শিল্প চাহে সেই ভাবটিকেই শরীরী করিয়া দেখাইতে। বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছেন তখন তিনি যে অনুভূতি যে ভাবের আধার সেই অতীন্দ্রিয় ভাব ও অনুভূতিরই একটা অখণ্ড স্থূলমূর্ত্তি প্রস্তরে কাটিয়া তুলিয়াছেন বৌদ্ধশিল্পী। হস্ত পদ মুখ নির্দ্দোষ সুন্দর হইল কি না তাহা তিনি দেখেন না—তিনি দেখেন হস্ত পদ মুখ কতটুকু ব্যক্ত করিল বুদ্ধত্বকে। কপালে

চিন্তার রেখা অথবা শান্তি। বিমলতা, চক্ষে ক্রোধের অগ্নি অথবা প্রেমের বৈদগ্ধ, পুরুষের শালপ্রাংশু পেশ বহুল ভুজদ্বয়, নারীর সুকোমল মসৃন বাহুলতিকা—এইরূপে বাহ্যপ্রকাশেরই উপর জোর দিয়া চিত্তবৃত্তির খেলা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন পাশ্চাত্য শিল্পী। প্রাচ্য শিল্পী শরীর ও মনের পশ্চাতে বৃত্তির যে সনাতন ও সত্যভাব তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন—বাহ্যপ্রকাশ, শরীরের বিকারাদি যাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখি, তাহাকে অতিমাত্র ফলাইয়া দেখান নাই, যতটুকু যে প্রকারে দেখাইয়াছেন তাহা সেই সত্যভাবেরই মধ্যে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, নটরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তিতে জ্ঞান, করুণা, শক্তি এইরূপ নানা চিরন্তন ভাবমাত্রকে অনন্তেরই অভিজ্ঞা হইতে বাহির করিয়া প্রস্তরীভূত করিয়াছে প্রাচ্য ভাস্কর্য্য। রাফাএল তাঁহার "মাদোনা"র মুখে এক দৈব মাতৃভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কিন্তু তাহাও প্রাচ্য শিল্প নহে। "মাদোনা" আদর্শ মাতা, মাতৃত্ব নহে। 'মাদোনা' ভাবুকতার চরমসৃষ্টি কিন্তু বুদ্ধে স্তুপীকৃত হইয়াছে সমাধিদৃষ্ট জ্ঞানের ফল। অনন্তের মধ্যে, ঐক্যের মধ্যে বস্তুর যে স্বরূপ সত্য, প্রাচ্য তাহাই খুঁজিতেছে। পাশ্চাত্য রহিয়াছে বিশিষ্টের, বৈচিত্র্যের, পৃথকত্বের মধ্যে।

সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি বীথোবেন (Beethoven)। বীথোবেনের তানে পাশ্চাত্যের প্রাণ যেরূপ স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে এমন বোধ হয় আর কিছুতে হয় নাই। ধ্বনির তরঙ্গের মধ্য দিয়া বীথোবেন প্রকটিত করিয়াছেন মানব-অন্তরের বিচিত্র প্রেরণারাশী, তাহাদের ভৈরব সংঘর্ষ-নিনাদ। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে, শৌর্য্যে, দম্ভে প্রকৃতির সকল প্রকার উচ্ছলিত উদ্বেলিত প্রেরণা পুঞ্জ পুঞ্জ করিয়া তিনি এক বিরাট জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির যে দ্বন্দ্বময়ী, ভিন্নমুখী সহস্র গতি ভঙ্গী তাহাই বীথোবেনের জগৎ। মনে হয় যেন মদমত্ত হস্তী তরুলতা-সঙ্কুল পথহীন ছেদহীন গহন অরণ্যকে তাড়িত মথিত উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। হস্তীর বৃংহিত, পশুপক্ষীর চীৎকার, বৃক্ষশাখার মড়মড়ধ্বনি সকলে মিলিয়া যেন প্রলয় ডমরু বাজাইয়া তুলিয়াছে। বীথোবেনের প্রতিভা, জগতের এই সুরলয়হীন হট্টগোলকে মহীয়ান করিয়া, হৃদয়স্পর্শী করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গীত শুন—শুন ত্যাগরাজের একটি কীর্ত্তন—কি শান্ত, কি ধীর অথচ কি গভীর কি উদাত্ত। সুরের সে বিরাট বৈচিত্র্য নাই কিন্তু একটিমাত্র ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আমরা উঠিয়া চলিয়াছি মরলোক ছাড়িয়া কোন অনন্তশান্তের কোলে। বহুপ্রকার ধ্বনির সমাবেশেই ইউরোপের সঙ্গীত আপনার প্রকাশক্ষমতা দেখাইতে পারে—ইউরোপীয় সঙ্গীতের গর্ব্ব harmony ভারত কিন্তু

melody—একটিমাত্র সুরকে খেলাইয়াই, একটি রসকে ফুটাইয়া সেই রসেই মজিয়া থাকিতে চাহিয়াছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত প্রকৃতির বহুল চিত্রবিচিত্রতার ছবি, প্রাচ্যের সঙ্গীত অতিপ্রকৃতির, একের ছবি।

তারপর উভয়ের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবনের পরিণতি দেখ। ইউরোপের ধর্ম্ম কি? গ্রীসই বর্ত্তমান ইউরোপের জননী, গ্রীসের দীক্ষা রোমকের দীক্ষার মধ্য দিয়া আধুনিক ইউরোপকে গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রীস ধর্ম্ম বলিয়া কি বুঝিত? যাহা শ্লীল, যাহা শোভন—যাহা যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত গ্রীকের কাছে তাহাই ধর্ম্ম। অন্তরের কোন নিগূঢ় স্বপ্রতিষ্ঠিত স্বরাট্ সত্তার সন্ধান তাহারা পায় নাই। বহিঃপ্রকাশের দিকে, তালমান সামঞ্জস্যের দিকেই ছিল গ্রীসের দৃষ্টি। রোমের ধর্ম্ম ছিল বীর্য্য, জিগীষা। গ্রীসের শোভনতাপ্রিয়তা রোমকের ক্ষাত্র স্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে এক প্রকার aggressive morality সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই হইতেছে ইউরোপের ধর্ম্ম। উহা চায় সাধারণ কর্ত্তৃক সম্মত কতকগুলি নীতিসূত্র অনুসারে চলিতে, তদ্দ্বারাই জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে। পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া, পারিপার্শ্বিকের তাড়নায় ভাল মন্দের একটা মানদণ্ড খাড়া করিয়া ইউরোপ এক নীতিতন্ত্র রচনা করিয়াছে—ইউরোপে ধর্ম্মজীবন বলিতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রেরণা এই নীতিতন্ত্র হইতে, আর ইহাকেই সে আজ সমস্ত মানবজাতির উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের নিম্নতর-স্তরের প্রবৃত্তিগুলিকেই কোনরূপে সাজাইয়া গুছাইয়া, তাহাদের দ্বন্দ্ব কোনরূপে মিট্ মাট করিয়া সহজে ও সুখে জীবন যাপন করা—ইহার বেশী ইউরোপের ধর্ম্ম দিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে আমরা যে Association, Arbitration, Federation প্রভৃতির কথা চারিদিকে শুনিতেছি তাহা ইহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। জর্ম্মণীর Deutschtum এই শোভনতা, এই নীতিবাদের ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া এক গভীরতর প্রেরণার উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে খুঁজিতে যাইয়া অহংজ্ঞানকে, ভগবৎশক্তিকে খুঁজিতে যাইয়া আসুরিক প্রাণশক্তিকেই সার সত্য বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে। প্রাচ্যের ব্যবহারশাস্ত্র রহিয়াছে কিন্তু উহাকে ধর্ম্মজীবনের শেষ কথা বলিয়া কোন দিনই সে মানে নাই। এবং সেইজন্যই অপরাপ্রকৃতির খেলার মধ্যেই আপনাকে সর্ব্বথা আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে আরও উচ্চে। ইউরোপ আপনাকে খৃষ্টের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইউরোপে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের পরিণতি কোথায়, এক লুথরকে দেখিলেই তাহা সব বুঝিতে পারি। খৃষ্টীয়চর্চ্চ প্রথমে হয়

church militant—বর্ত্তমানে হইয়াছে church political. খৃষ্টীয় চর্চ্চের লক্ষ্য ছিল স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা, কিন্তু বস্তুতঃ স্থাপনা করিয়াছে পার্থিব রাজ্য। পক্ষান্তরে, প্রাচ্যের ধর্ম্মের গতি আবার অন্যদিকে। প্রাচ্যের আদর্শ ছিল বৈদিক ঋষিগণ—বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ যাঁহাদের কামনার বস্তু ছিল সেই "পরম ব্যোম"। তাঁহাদের বংশধরগণ এই পরমপরমকে এতই দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে যে আর যে কিছু আছে তাহারা জানে না। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরিণতি বুদ্ধ শঙ্কর। পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়াছে, শেষে জগতের মধ্যে ধর্ম্মকে একেবারে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। প্রাচ্য ধর্ম্মকে ঊর্দ্ধে লইয়া চলিয়াছে, শেষে ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকে হারাইতে বসিয়াছে। তাহার ধর্ম্মতত্ত্ব সাধু সন্ন্যাসীর একাধিপত্য, তাহার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, মঠাদি অরণ্যে পর্ব্বতে।

কর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্যের আদর্শ আলেকসন্দর, সীজর, নেপোলিয়ন। প্রাচ্যের আদর্শ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম। পাশ্চাত্যের কর্ম্মবীর—চঞ্চল, মত্ত, অসুর। প্রাচ্যের কর্ম্মবীর—শান্ত, স্থিতধী, দেবতা। নেপোলিয়ন ভগবানের বিরাট বিভূতি, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে, অধ্যাত্মকে যেমন আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, প্রাচ্যও তেমনি কর্ম্মকে, আধিভূতকে নিজস্ব করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইউরোপ যেমন খৃষ্টকে ভুলিয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনি কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে। তাই জীবন ক্ষেত্রে প্রাচ্যকে দেখি দ্বন্দ্বের ভূমি এই জীবন হইতে অপসৃত হইয়া জগতের অতীত যে মিলনভূমি সেই ভগবানে বা ব্রহ্মে মিলিয়া যাইতে। জগতের সংঘর্ষসঙ্কুল কর্ম্মাবলী ক্রমে ক্রমে সহজ করিয়া আনিতে—যতটুকু জীবন ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ভূত করিয়া লওয়া যায় ততটুকুমাত্র কর্ম্ম করিতে। পাশ্চাত্য লইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা। জীবনকে, জগৎকে যতখানি স্পষ্ট, জাগ্রত করা সম্ভব তাহাই করিতে হইবে। জগতের সহিত নূতন নূতন কর্ম্মের বন্ধন সৃজন করিতে হইবে। কোন কর্ম্মই বৃথা নয়, কোন কর্ম্মই ক্ষুদ্র নয়। বরং কর্ম্ম যতই ক্ষুদ্র হয় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধও তত গভীর তত ঘনিষ্ঠ হয়। হীকেল ক্রে-মৎস্যের জীবনব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়াই তাঁহার আয়ুঃক্ষয় করিতে প্রস্তুত। মেরুকেন্দ্রে একটী পতাকা প্রোথিত করিয়া আসাই কতজনের জীবনলক্ষ্য হইয়াছে। প্রাচ্য ইহাকে বালকের খেলা বলিয়া হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবে। যে সকল অপরা বিদ্যা প্রাচ্য একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যারই সহিত

একটা সম্বন্ধে সংযুক্ত না করিয়া সে তৃপ্তি পায় নাই। তমেবৈকংজানথ, অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ—প্রাচ্যের ইহাই মূলমন্ত্র।

সত্ত্বপ্রকৃতি প্রাচ্য চাহিয়াছে সৎ—যাহা স্থানু, অদ্বৈত, অনন্ত। বহুর মধ্যে যাহা এক, চঞ্চলের মধ্যে যাহা শান্ত, পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা শাশ্বত, ক্ষুদ্রের মধ্যে যাহা বৃহৎ, যাহা স্বরূপ বা অরূপ—প্রাচ্য তাহাকেই খুঁজিয়া লইয়াছে। রজঃপ্রকৃতি পাশ্চাত্য চঞ্চলতা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, বৈচিত্র্য, নিত্যনবসৃষ্টি, রূপকেই বুঝিয়াছে। প্রাচ্যের হইতেছে অতীন্দ্রিয়বোধ, অপরোক্ষানুভূতি দিব্যদৃষ্টি আর পাশ্চাত্যের বুদ্ধি, মেধা, মনীষা। স্ব-স্ব আদর্শের মধ্যে উভয়েই অতিমাত্র আবদ্ধ, তাই একদিকে তাহাদের লাভ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে। প্রাচ্য আত্মাকে চিনিয়াছে তাই সে মহান্, গভীর। কিন্তু শুধুই আত্মাকে চিনিয়াছে বলিয়া সে ঋদ্ধিমান নয়, বিরাট নয়,—সে বৈচিত্র্যহীন। প্রাচ্য স্বরাজ্য চাহিয়াছে কিন্তু স্বরাজ্যের পূর্ণতা যে সাম্রাজ্য—একথা বুঝিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শরীরকে বুঝে, তাই বিচিত্রতার ঐশ্বর্য্য সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু শরীরের মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া তাহার এই ঐশ্বর্য্য ক্ষণভঙ্গুর—বাহ্য চাকচিক্যের মধ্যেই উহা পর্য্যবসিত হইয়াছে। জীবনের রস সে সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আত্মার সজ্ঞান আনন্দের অভাবে তাহা একেবারে অমৃত হইয়া উঠিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যসিদ্ধি চায়, কিন্তু বলাৎকার করিয়া, গ্রাস করিয়া, স্থূলউপকরণাদিরই একমাত্র সাহায্য লইয়া—অন্তরের গভীরতম ঐক্য, পরিপূর্ণতারই যে উহা সহজ ফল এ কথা বুঝিবার তাহার ধৈর্য্য নাই। প্রাচ্য সত্যপ্রতিষ্ঠা পাইয়াছে কিন্তু তাহার উপর লীলাভবন নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। পাশ্চাত্য সর্ব্বদাই চাহিয়াছে সুরম্য হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিতে —কিন্তু বালুকার উপর। পাশ্চাত্য বহুকে, রূপকে লইয়া ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কিন্তু তরল, প্রাচ্য এককে, অরূপকে লইয়া গভীর কিন্তু নগ্ন।

নবযুগে আমরা প্রাচ্যের আত্মোপলব্ধি চাই, নিখিল বস্তুর যে সত্যপ্রতিষ্ঠা সেই এককে সেই অসীমকে সর্ব্বাগ্রে চিনিব ও সর্ব্বদা তাহার মধ্যেই বাস করিব কিন্তু বস্তু সমুদায় হইতে, জগৎ হইতে বিযুক্ত হইয়া নয়। শুধু অব্যক্ত নয়, প্রকাশেরও যে নিজস্ব একটি রস আছে, প্রত্যেক বস্তুরই যে বিশেষ উপায়ে, বিশেষ প্রকারে আনন্দদিবার ক্ষমতা আছে পাশ্চাত্য হইতে এইটুকু শিখিব। কিন্তু এই যে বিশেষত্ব ইহা অল্পের বিশেষত্ব নহে, ইহা বৃহতেরই বিশেষত্ব, এই জ্ঞানটুকু প্রাচ্য হইতে আহরণ করিয়া লইব। অনন্তের মধ্যে সব কিছুকেই এক

ছাঁচে ঢালিব না কিন্তু এই অনন্তের দ্বারাই অপরিমেয় বৈচিত্র্যের বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি, আপন আপন রস ফুটাইয়া তুলিব। পৃথিবীর, মাটির যে স্বাদ তাহা অনির্দ্দেশ্যের আনন্দে মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিব না, অনির্দ্দেশ্য যাহা তাহা উহার বিশিষ্টতাকেই স্পষ্টতম, পূর্ণতম, সত্যপ্রাণ করিয়া তুলিবে। জীবনের শতব্যাপারকে শতরূপে জাগ্রত করিয়া ধরিব কিন্তু পাশ্চাত্যের মত সেই one thing needful কে ভুলিয়া নয়। পরম পুরুষেরই চারিদিকে সকল বিভূতি, সকল শ্রী সাজাইয়া উঠাইব—দশভূজারই দশবাহু দশদিকে প্রসারিত থাকিবে।

যোগ।

(৫)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই জীবের সকল চেষ্টা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, যে কোন ঘটনাই জীবনের উপর দিয়া ঘটিয়া যাউক না কেন, দেহ প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বুদ্ধি কালীশক্তির উপর শ্রদ্ধাহীন যেন না হয়। অন্যান্য আধার শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব থাকিবেই, সংস্কার বশে যাহা ভালমন্দ ধারণা করিয়াছি, বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারই ব্যঞ্জনায় আধার যন্ত্রগুলি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবেই—কিন্তু এ যোগ বুদ্ধির দ্বারাই প্রথম আরম্ভ করা হইয়াছে—বুদ্ধি যেন কোন অবস্থায়, কোন ঘটনায়, কোন বিপদে কালীশক্তির উপর বিশ্বাস না হারায়—সর্ব্বাবস্থা যে আমার সমগ্র আধারের শুদ্ধি বিধানের জন্য আগত এ কথা অবিরত স্মরণ রাখা চাই। ঘটনার পর ঘটনাই জীবনের সাধনা—অগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদের সমস্ত জীবনটাই যোগ। এ অবস্থায় সর্ব্বসময়েই মনে রাখিবে—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তো স্মি তথা করোমি।"

সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, ঘৃণায় প্রশংসায় যখন বুদ্ধি স্থির হইবে যে এ সকলই মায়ের ইচ্ছা, তখন বুঝিতে হইবে শক্তি উপাসনা করিবার অধিকারী হইয়াছ। মনে রাখিও এইটুকু হইলেই সব হইল না—সিদ্ধি তখনও বহুদূরে

অবস্থিত। কেবল তুমি সাধক হইলে মাত্র—মা তোমার আধারে আগমন করিলেন—অতঃপর তোমার বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন, চিত্ত, প্রাণ দেহ প্রভৃতির মধ্যগত সকল আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে। এই অবস্থায় সাধককে বড়ই বিব্রত হইতে হয়। যেমন বহুশত বৎসরের ধূলিরাশিপূর্ণ কক্ষে সহসা সম্মার্জ্জনী পড়িলে চতুর্দ্দিক ধূলি সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—গৃহমার্জ্জনকারীর সে ধূলায় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ আধারস্থিত কুসংস্কার ও পূতিগন্ধযুক্ত দুষ্কৃতিরাশি যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া সাধককে মহা বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে; কিন্তু কালীশক্তির উপর অকপট শ্রদ্ধা, এই যোগাবলম্বীগণের সঙ্গ, এই শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস এই সকল সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধককে অদ্ভুত শক্তি প্রদান করে। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, যোগ, জীবনের ভোগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেবজন্ম প্রদান করে; এই ভোগ দেহ, প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধির জন্মার্জ্জিত সংস্কার; সাধারণ জীব এই সংস্কার স্বভাববশে ধীরে ধীরে বহুজন্ম ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া যায়, যোগী সহস্র বৎসরের ভোগ এক বৎসরে অথবা একদিনে শেষ করিতে পারে। যাহার জীবনে এই সংস্কার ভোগ অধিক দ্রুত হইবে, তাহাকে অধিক বেগ, অধিক আঘাত সহ্য করিতে হইবে এবং অনতিকালের মধ্যেই এই যোগী সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু কাহার জীবনের ভোগ অধিকতর সংক্ষিপ্ত হইবে বা না হইবে, উহা সাধকের দেখিবার আবশ্যক নাই। কালী তাহা আমাদের চেয়ে ভাল জানেন—তিনিই উহার বিধান করুন।

এইবার আমি একে একে কেমন করিয়া প্রত্যেক যন্ত্রটী শুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ হইলে ইহার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই বুদ্ধির কথা। বুদ্ধি তাহার সমগ্র শক্তি দিয়া কালীকে অবলম্বন করিবে, জীবনের উন্নতি অবনতি, ভাল মন্দ সকল ভার কালীর হস্তেই সমর্পণ করিবে; যেমন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"॥

আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বস্ব এই কালীশক্তিকে অর্পণ করিলাম—কালীই সর্ব্বপাপ হইতে আমায় মুক্ত করিবেন—আমার জন্য আর আমার ভাবনা নাই—এইরূপ ধারণা দৃঢ় করিতে হইবে।

এইরূপ করিলেই বুদ্ধি তর্ক, যুক্তি হইতে বিরত হইবে, কল্পনা জল্পনা পরিত্যাগ করিবে, আত্মচিন্তা, পূর্ব্বস্মৃতি পরিহার করিবে: বুদ্ধি হইবে স্থির, শান্ত,

নিথর—এই প্রশান্ত বুদ্ধির উপর জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা থাকিবে, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" এইরূপে জীবের মধ্যে কালীশক্তির প্রতিষ্ঠা হইলেই বুদ্ধির অহং-আবরণ ভেদ করিয়া উঠিবে জ্ঞানসূর্য্য—সে অপার্থিব পুণ্য-আলোকে উদ্ভাসিত হইবে জীবের সর্ব্ব আধার। এই জ্ঞান প্রকাশ না হইলে বুঝিবে কালীশক্তির উপর তোমার বিশ্বাস এখনও দৃঢ় হয় নাই—সর্ব্বকর্ম্মে মায়ের ইচ্ছা এ কথা এখনও সম্যক্ ধারণা করিতে পার নাই—অতএব গুরুমুখ করিয়া এখনও আত্মসমর্পণ শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে।

জ্ঞানের লক্ষণ কি? জ্ঞানের উপকরণাদিই বা কোন্‌গুলি? জ্ঞানোপকরণাদির কিরূপ ব্যবহার করিয়াই বা জ্ঞান লাভ হইবে? এইবার ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব।

বুদ্ধির মুখের হিরণ্ময় পাত্রখানি উন্মুক্ত হইলেই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জ্ঞান তোমার ভিতরেই, কেবল অপ্রকাশ আছে মাত্র, সাধন সাহায্যে ইহা প্রকাশ হইবেই। বহুবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইলেও লজ্জাহীনা রমণীর যেমন শোভা থাকে না, জ্ঞানপ্রকাশ না হইলে সর্ব্বসাধনভজন তেমনি নিরর্থক, শোভাহীন। সর্ব্বাগ্রে চাই কালী, চাই মাতৃশক্তি, চাই আদ্যাপ্রকৃতি—তার পরই চাই সত্যসূর্য্য—আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান। এ জ্ঞানমহিমা পাশ্চাত্যের মস্তিষ্কে এখনও অজ্ঞাত। এ কেবল হিন্দুরই ঐশ্বর্য্য, ভারতের কোহিনুর। পাশ্চাত্য জানে ক্রমাগত বহির্জগতের সম্পর্কে থাকিয়া জগতের জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, বুদ্ধিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়। আমরা বলি, না, জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, আত্মচৈতন্য দিয়াই আমরা জগৎকে বুঝি, জগতের আদিকারণ বিদিত হই, আপনার চৈতন্য দিয়াই বাহিরের চৈতন্য উপলব্ধি করি। আমরা জানি একই পরম ব্রহ্মে নিখিল ভুবন অধিষ্ঠিত—একই মহাকারণের উপর বর্ত্তমান সমুদয় সৃষ্টি-সংসার—সে সৃষ্টির অভিব্যক্তি আমি, তুমি, অনন্ত স্থাবর জঙ্গম, গ্রহতারা, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ—এই কারণজ্ঞানই অনন্ত, অসীম, অফুরন্ত। আত্মসমর্পণযোগের প্রথম সিদ্ধিই এই জ্ঞানলাভ।

এইখানে সৃষ্টিরহস্যের গোটা দুই কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। এই যে ধারণাতীত বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি, ইহা একদিন চিচ্ছক্তির কুক্ষিগত ছিল—এই আদ্যাশক্তি ইহার প্রসূতি। জ্ঞান অজ্ঞান, পাপপুণ্য, অনিল অনল, বৃক্ষ গুল্মাদি যাহা কিছু সবই ভাবাকারে এইখানে অবস্থান করিত—সে তিমিরবরণা কালী গভীর আঁধারে আপনাকে ঢাকিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; সেখানে না ছিল নাম, না ছিল রূপ,

না ছিল গুণ, কিন্তু ছিল এক মহাভাব যাহা অনাদি কাল ধরিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, এখনও ফুরায় নাই। এই মহাভাব লইয়া মহতের সৃষ্টি, ইহাই জগতের ছাঁচ অর্থাৎ কারণ, এই খানেই ভাব, নাম রূপ গুণ প্রাপ্ত হইল। কারণই হেতু-বোধক, আদর্শ নির্ম্মল সত্য জ্ঞানময় অবস্থা। তার পর ফুটিয়া উঠিল সূক্ষ্মজগৎ, কারণের নামরূপগুণকে সম্ভবপর পরিবর্ত্তন করিয়া, রূপান্তর করিয়া, বস্তুতন্ত্র করিবার পথে, ক্রমবিকাশের পথে স্থাপন করিল।

স্থূলেই সৃষ্টি প্রকৃত রূপান্তর, পরিণতি, পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। কারণে কোনও বিকাশ নাই, কোনও বিবর্ত্তন নাই, সেথায় সকলই পূর্ণ, অবি-কৃত, সনাতন। কারণই সত্য। সূক্ষ্মে সমস্তের বিকাশের জন্য আয়োজন চলে, কল্পনা জল্পনা চলে; তাই তাহা অনৃতপূর্ণ, স্বপ্নবৎ—সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইলেও কারণের পূর্ণসত্য এখানে দুষ্প্রাপ্য—অথচ কল্পনা সেখানে বস্তুতন্ত্র হইয়াও উঠে নাই, স্থূলে বিকশিত হয় নাই। স্থূলে সমুদয়ের বিকাশ—কিন্তু অনন্ত পূর্ণ সত্যের খণ্ড বিকাশ মাত্র—তাই সেখানে ক্রমাগত অতীত আংশিকবিকাশকে অনৃতে পরিণত করিয়া, ধ্বংস করিয়া, পূর্ণতর সত্য, পূর্ণতর সৃষ্টির প্রকাশচেষ্টা চলি-য়াছে।

এক্ষণে জ্ঞান অর্থে এই সৃষ্টিলীলাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা। সৃষ্টি এই ত্রিবিধ স্তর সমন্বিত বলিয়া, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই তিনটীকে আমাদের একই জ্ঞানের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দিয়া বুঝিতে হয়। স্থূল জগৎ আমরা বুঝি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন দিয়া; সূক্ষ্মজগৎ বুঝি বুদ্ধি, মেধা বিচার সহযোগে; কারণ জগৎ বুঝি প্রজ্ঞার দ্বারা, প্রতিবোধের দ্বারা। এইরূপে মনের সাহায্যে স্থূল, বুদ্ধির সাহায্যে সূক্ষ্ম এবং প্রজ্ঞা দিয়া কারণতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। মন দিয়া যে জ্ঞান, উহা লইয়াই জড়বিজ্ঞান; বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র; এবং জগৎকারণের উপলব্ধির নামই যোগ।

সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়পথে মন দিয়া জগৎ সম্বন্ধে বাহ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে; সেই বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করে, তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বের অবধারণ করে বুদ্ধি দিয়া; পরে জ্ঞানের রাজ্যে আরোহণ করিতে প্রয়াস পায়। যোগী কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই ভাব উপলব্ধি করে, অর্থাৎ বিষয়টীর মূলতত্ত্ব আপনার মধ্যে অনুভব করে, পরে সেই স্বানুভূতিলব্ধ ভাব সম্বন্ধে চিন্তা করে, অনন্তর সেই ভাবের অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে।

বৈজ্ঞানিক মন হইতে জ্ঞানারম্ভ করেন; যোগী ঊর্দ্ধলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করেন। অতএব হে সাধক, হে মুমুক্ষু, আজ জ্ঞানক্রিয়া সম্বন্ধে তোমাকে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে বস্তুর ভাবকে আত্মানুভূতিগত করিয়া বিদিত হও; পরে উহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য, বুঝিবার জন্য চিন্তা কর; অতঃপর স্থূলের প্রকাশ সম্বন্ধে বাহ্যোপলব্ধি করিয়া আপনার জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া লও। মনে রাখিও, সর্ব্বাগ্রে ভাব, পরে চিন্তা, পরিশেষে প্রত্যক্ষ।

বারান্তরে এতদ্‌বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিব।

ভলাণ্টিয়ার প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর চির দুর্নাম যে তাহারা "ভেতো", তাহারা কাপুরুষ, তাহারা স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। পাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া তার উড়িবার শক্তি নাই বলা এবং উক্তরূপ কলঙ্ক আরোপণ করা উভয়ই তুল্য কথা। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচাইবার পথ অবরুদ্ধ ছিল; সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র ফরাসীরাজ এই মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী সেনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যে তাহারা যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানিয়া রাখা উচিত। এইজন্য আমরা নিম্নে, ফরাসী উপনিবেশের পদাতি সেনাধ্যক্ষ মঁসিয়ে এ জিলে, ৭ই জুন শ্রীমতিলাল রায়কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার বাংলা অনুবাদ দিলাম।

"মহাশয়, যদিও দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনার নিকট আমি অপরিচিত, তত্রাপি অতি আনন্দের সহিত চন্দননগর সৈনিকদিগের সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি তাহারা সকলেই শারীরিক কুশলে আছে এবং পণ্ডিচেরিতে আসিয়া অবধি তাহারা যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্যাদি করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সৎ—তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও দোষই দেখি নাই। ইহারাই আমার সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল (champions), এই কথায় একটু মাত্রও অত্যুক্তি নাই।

এইমাত্র সংবাদ পাইলাম আমাদিগকে জিবুতির পরিবর্ত্তে ফ্রান্সদেশের মার্সাই (Marsailles) নগরে গমন করিতে হইবে। আমি আপনাকে ইহাই জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, যে সেখানে আমি ইহাদের অভিভাবকস্বরূপ থাকিব—আমার ইউরোপীয় সেনাদিগের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করি, ইহারা বাঙ্গালী হইলেও ইহাদের প্রতি আমি তদ্রূপ আচরণই করিব এবং ইহাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিব। ইহারা সকলেই ফ্রান্সে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য লালায়িত এবং ইহাতেই ইহারা সুখী। আপনি সেনাগণের পরিবারবর্গকে জানাইবেন যে পুত্রের মত আমি ইহাদের সতত দেখিব এবং রক্ষা করিব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন।

(সহি) এ জিলে।

লেফ্‌টানাণ্ট, পদাতি সেনাদল, পণ্ডিচেরী।

পুনশ্চ—এই মাসের শেষাশেষি আমাদের যাত্রা করিতে হইবে।”

* * *

দ্বিতীয় সেনাদলের যাত্রা।

গত শুক্রবার ১৬ই জুন দ্বিতীয় বাঙ্গালী সেনাদল পণ্ডিচেরী রওনা হইয়াছেন। ইহারা তথা হইতে প্রথম সেনাদলের সহিত মার্সাই যাত্রা করিবেন। ইহাদের বিদায়কালে, চন্দননগর আবার নবীন উৎসাহে জাগিয়া উঠিয়াছিল; পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনিতে, কুমারীগণের মাঙ্গলিকে, যুবকদলের জয়শব্দে চন্দননগর সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

* * *

বিদায়।

২০শে জুন পণ্ডিচেরী হইতে বাঙ্গালী সৈন্যদল মার্সাই যাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীর যোগদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট নিয়ত তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিব।

—:*:—

মর্ম্মবেদনা।

বাঙ্গালীর জীবন গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ। অতীতের স্মৃতিটুকু তার সুখের, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিবিড় আঁধারে সমাচ্ছন্ন। পৃথিবীর অপর সকল জাতির দারুণ দুর্দ্দিন আসিলেও—তারা ভবিষ্যতে দুর্দ্দিন কাটাইয়া সুদিনের আশা করিতে পারে—কেননা তাহাদের সে বল আছে, সে পথ আছে, সে সাহস আছে, সে আশা আছে কিন্তু হায় আমরা বলবুদ্ধিহীন, আশাভরসা সহায় সম্পত্তি শূন্য একটা অধমরা জাতি। আমাদের হাত নাই, পথ নাই, বলবীর্য্য সহায়সম্বল কিছুই নাই; পৃথিবীর এই মহা পরিবর্ত্তনের যুগে আমাদের স্থান যে কোথায় তাহা ভাবিতে বসিলে কূল কিনারা খুঁজিয়া পাই না। তবু ত ভাবিতে হয়, তবু ত মরিতে সাধ যায় না; এমন লাঞ্ছিত জীবন বহন করিয়া, এমন হাহাকার, পদে পদে বিভীষিকা, উৎকট অন্নচিন্তা মাথায় বহিয়া মরণের রঙ্গস্থলে, বাংলার ভীষণ শ্মশানে কি সুখে, কি আশায় বাঁচিয়া আছি বল ত? কোটী কোটী নরনারীর অর্দ্ধাশন অনশন স্মরণ কর, তার কি প্রতিকার করিতে পার তাহাও চিন্তা কর—তারপর বলত আমাদের বাঁচিয়া সুখ কি? নিদাঘের প্রচণ্ড আতপতাপে, পল্লীর খাল বিল, নদীনালা শুকাইয়া গেল, নিদারুণ পিপাসায় দেশবাসীর হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল—কি করিতে পারিলাম বলত? বল ত বাংলাব্যাপী এই যে যমন্তর, এই যে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, মহামারীতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—ইহার প্রতিবিধান করিবার কি সামর্থ আছে?

নাই, নাই, কিছুই করিবার নাই, সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের তুলনার মত দেশের ক্ষুদ্র চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে চেষ্টায় হৃদয় বুড়িয়া যায়, ঘৃতস্পর্শে আগুনের মত অভাব আরও বাড়িয়া উঠে—মর্ম্মবেদনায় কর্ম্মীকে উন্মাদ করিয়া তুলে। তবু মরি না কেন? তবু বাঁচিতে সাধ যায় কেন বল ত?

এই সেদিন প্রতাপশালী রুষ, জাপানের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় বসিয়া যখন অনল বর্ষন করিল, জাপান সে অনলে পতঙ্গের মত দলে দলে ভস্মীভূত হইয়া কি আশায় জয়লাভ করিল বল ত? কত বীর সে আহবে প্রাণ দিল, কত ঐশ্বর্য্য জলস্রোতের মত অপচয় করিল; কিন্তু জাপানের আশা ছিল এ বিপদে উত্তীর্ণ হইলে তাহার সুদিন আসিবে। আজ দেখ জাপান ধনসম্পদে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পথে আগুয়ান হইয়াছে—ভারতের পণ্য-বিপণীতে জাপানজাত দ্রব্য থরে থরে শোভা পাইতেছে—ভারে ভারে রত্নরাজি অর্ণবপোত ভরিয়া জাপানী হাসিমুখে দেশে লইয়া চলিয়াছে; কেবল দেখ, আর মর্ম্মবেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমাদের কি আশা আছে বলত?

আজ ইউরোপে যে ভীষণ সংগ্রাম—ইহার তলেও প্রতি জাতির একটা বিপুল আশা লুকান আছে, সকলেই নিশ্চয় জানে একবার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই অনতিকাল মধ্যেই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিবে—এমন শক্তিও সকল জাতির মধ্যে আছে—রণ ক্ষান্ত হইলেই সকলে যেমন ছিল আবার তেমনিই হইবে, কিন্তু আমাদের কি আশা আছে বল? আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, রত্নাকরের মত অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া অমর রাম নাম জপ করিতেছি? কোন্ কাব্য রচণার জন্য কঠোর প্রাণ বহন করিয়া কৃমিকীটের ন্যায় মৃত্তিকাগর্ভে দিনযাপন করিতেছি?

আজ দীন দরিদ্র, রাজা মহারাজা, সাহিত্যিক কবি, সমাজহিতৈষী রাজনীতিক সকলকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করি তোমাদের কি আশা আছে বল ত? ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটা বৎসর সুখে ভোগে অতিবাহন করা ব্যতীত আর কি উচ্চ আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার তোমাদের সামর্থ আছে বল ত? বিদ্যার্থী যুবকমণ্ডলী, রক্তমুখী হইয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম পূর্ব্বক যে বিদ্যার্জ্জন করিতেছ, উহার পরিণামে তোমাদের কি উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে উত্তর দাও ত?

উত্তর নাই, বাঙ্গালী যাহা করে কিছু না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তাই; নতুবা বাঙ্গালীর কি আশা আছে? যাহা আছে তাহা ত আশা নয়—সে ত মরীচিকা—সেদিকে ধাবিত হইলে নিশ্চয় ব্যর্থ হইতে হয়।

তবুও ত আমরা বাঁচিয়া আছি! তাই আজ প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলে বসিয়া ভাবিতেছি—কেন আমরা মরিলাম না? কেন হিমালয়ের একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা আমাদের চাপিয়া ধরিল না? কেন বঙ্গোপসাগরের একটা উত্তাল

তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া লইল না ? কেন শত শত বৎসর মহামারীর কঠোর নিষ্পেষণে আমাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল না।

ভাবিতে গেলে সমস্ত বুক বেদনায় ভরিয়া যায়—গভীর মর্ম্মব্যথায় হৃদয় আকুল হইয়া উঠে—তবুও সেই রুদ্ধ জীবনস্রোতে স্তব্ধ তপ্তশ্বাসের তলে তলেই সার্থকতার সন্ধান বর্ত্তমান এই কথাই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

সে আজ বহুদিনের কথা—তখন বাংলার বুকে বেলুড় মঠের দৃঢ়ভিত্তি জাঁকিয়া বসে নাই—সূচনা চলিয়াছে মাত্র—স্বামীজির তিরোধানের ছয়মাস মাত্র বাকী ছিল—স্বর্গীয় উপাধ্যায় এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বদনে যে বেদনার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা বলি শুন।

স্বামীজি কলিকাতাস্থিত হাদুয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামীজি কি ভাবিতেছেন—আসুন কলিকাতায় বেদান্তবিজ্ঞানের একটা রোল তোলা যাউক।" স্বামী বিবেকানন্দ অতি কোমল বেদনাবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"ভাই ভবানী—আমি আর বাঁচিব না, যাহাতে আমার মঠটী শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দবস্ত করিয়া যাইতে পারি তাহারই জন্য ব্যস্ত আছি, আমার অবসর নাই।"

উপাধ্যায় বলেন—আহা সে স্বর কি বেদনাময়! ব্যথা প্রপীড়িত কি সকরুণ একাগ্রতাপূর্ণ বাণী! এ কিসের ব্যথা, কাহার জন্য ব্যথা ?

ভাই, এই ব্যথাটুকুই আজ আমাদের সম্বল—এই ব্যথাই আমাদের আশা—আমাদের প্রতিজনের হৃদয়ে এই ব্যথাটুকু জাগাইয়া তুলিতে পার ? বৃথা চেষ্টা, আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক উত্তেজনা নয়, আজ এমনি করিয়া অন্তঃসার শূন্য হইলে চলিবে না—আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনটা বেদনাপূর্ণ হউক—নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, জাতির ভবিষ্যচিন্তায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়মন আকুল হইয়া উঠুক।

স্বামীজির হৃদয়বেদনায় আজ প্রতিজনের হৃদয় ভরাইয়া তুলিতে হইবে—স্বামীজির মত, সেই মর্ম্মবেদনায় মজিয়া থাকিতে হইলে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে—ক্ষুদ্র সংসারের চিন্তা পরিহার করিতে হইবে—কল্পনার জগৎ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যের দুঃখ হলাহল উমানাথশঙ্করের মত আকণ্ঠ পান করিতে হইবে।

তারপর দেখিব—এই বেদনার মধ্য হইতে পথের আবিষ্কার হয় কি না—সমুদ্র মন্থন করিয়া যেমন অমৃত উঠিয়াছিল, তেমনি বাঙ্গালীর এই হৃদয়-সাগর

সহিত করিয়া অমর জীবন লাভের উপায় পাওয়া যায় কি না ?

যতদিন না তাহা হয়, যতদিন না ধরায় এই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ততদিন বেদনার সাড়া বুকের মধ্যে জাগ্রত রাখিতে হইবে। কিন্তু এই মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে হইলে কোনই আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, স্বামীজির গৈরিক বসন, স্বামীজির মঠস্থাপন, স্বামীজির মত সমুদ্রপারে বেদান্ত প্রচার প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনুকরণ করিও না—স্বামীজির শক্তির সাধনা কর, তাঁহার মূল প্রকৃতি, তাঁহার ভাবের উপলব্ধি কর। অগ্রে উপায় নয়, অগ্রে ভাষা নয়, অগ্রে প্রচার নয়, সর্ব্বাগ্রে আপনার মধ্যে মহাভাবের উদ্বোধন কর—তাহার দ্যোতনা আপনা আপনি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তুলিবে।

নূতনের প্রতি।

বাংলা দেশ আজ প্রকৃতই শ্মশান ক্ষেত্র। কোটী কোটী অন্নাভাবক্লিষ্ট নরনারীর তুলনায় দুই চারিজন ভাগ্যবান্ ধনবান্ ব্যক্তি গণনার মধ্যেই নহে। যাঁহারা ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া দেশের সর্ব্ববিধ আন্দোলনে শুধুই বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, যাঁহাদের নাম দেশের সংবাদপত্রে প্রতিনিয়তই দৃষ্টিগোচর হয়, যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া শাসিত ও শাসক উভয়েরই সুপরিচিত ও আদৃত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অভাবের মুখ দেখেন নাই ; সুতরাং যে বিস্তৃত জনসংঘের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা সংবাদপত্রে বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন অথবা সভামণ্ডপে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করেন—তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের উপদেশ, সেই জনসাধারণের কর্ণে অর্থহীন প্রলাপের মত শুনায় ; কাজেই দেশহিতৈষীগণের উদ্যম আশানুযায়ী ফলপ্রসূ হইতেছে না।

দেশের যে কি দুর্দ্দিন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এই দুর্দ্দিনের শোচনীয় পরিণামের কথা কলিকাতা মহানগরীর দুই চারিজন উচ্চশিক্ষিত জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, দেশের আপামর সাধারণকে এ কথা ভাবিতে হইবে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে অন্ন চিন্তার দারুণ বিভীষিকা মানুষকে এমনই

আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এমনই একটা তামসিকতার আবেষ্টনে প্রত্যহ করিয়া ফেলিতেছে, যে সে নিবিড় আবরণ ভেদ করিয়া সে কোনই আশার আলোক দেখিতে পায় না। ফলে দেশের জনসংঘ হতাশের গভীর আঁধারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেই যেন কৃতসঙ্কল্প, মরণের তুষার শীতল আলিঙ্গনে এগাইয়া পড়িতে পারিলেই যেন তাহাদের সকল রকম ভাবনা মিটিয়া যায়।

* * *

তাই আমরা দেখিতে পাই, সংসারের যাবতীয় লোকই উদাসীন ; দারিদ্র্য পাপক্ষয় করিবার জন্য, যাহা পাইলে জন্ম এমনই ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। অভাবের তাড়নায় উচ্চচিন্তা করিবার যন্ত্রগুলি হয় বিকৃত না হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কোনও মতে দেঁত হাসি হাসিয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্নসংস্থান করিতে পারিলেই ইহারা পরিতৃপ্ত। রেলগাড়িতে, পথে, গৃহস্থের সংসারে অন্বেষণ করিয়া দেখ, দেশের লোকগুলার অন্নচিন্তা ছাড়া অপর কোন চিন্তা আছে কি না ; ঘরে চাউল থাকিলেই ইহারা তাস পিটে, পাশা খেলে, থিয়েটার করে ; বড় জোর, কোন নূতন সত্যপূর্ণ, হিতকর কর্ম্ম কাহাকেও প্রবৃত্ত দেখিলে ইহারা উপহাস করে এবং গোপনে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

* * *

তজ্জন্য আমরা ইহাদের দোষ দিই না, এই অভ্যস্ততা দূর করিবার জন্যই ত ধর্ম্মপ্রাণ নূতনের অভ্যুত্থান। দেশ বিকৃত বলিয়াই ত ইহাকে শুদ্ধ ও পূর্ণ করিবার জন্য নূতন শক্তির আহ্বান করিতেছি। তাই আমরা চরিত্রবান, শিক্ষিত, সঙ্কল্প-পরায়ণ সর্ব্বত্যাগী যুবক সংঘকেই জাগাইয়া তুলিতে চাই। ইহার প্রতিকার আমাদেরই করিতে হইবে—আকাশের বজ্র মাথা পাতিয়া লইয়া, বিকার-গ্রস্ত দেশবাসীর উপহাস উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ক্ষুরধার পথেই আমাদের চলিতে হইবে। আমরা সর্ব্বাগ্রে দেশের ভাব, দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিব, দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ অনুরাগে হৃদয় ভরাইয়া তুলিব—তারপর চলিব ন্যায়পরায়ণতার দৃঢ়যষ্টি হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে নম্রতে কর্ত্তব্যের পথে। সে গতি অবাধ হইবে, সরল হইবে, নিঃসঙ্কোচ হইবে।

* * *

অতীতের নিন্দা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। বিগত দশ বৎসরে সমাজ, রাজনীতি, ব্যবসায়, সাহিত্য প্রভৃতি বিভাগে আমরা কেমন করিয়া কতটা অগ্রসর

হইয়াছি তাহা পূর্ণভাবে অবগত হইতে হইবে। এত সামাজিক আন্দোলন—ব্রাহ্মসমাজ, কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠা কতটুকু উন্নতিপথে দেশকে আগু বাড়িয়া দিল? কেন আশানুরূপ ফল ফলে না? সে উদ্যম, সে নিষ্ঠাপরায়ণ, সংযমী কর্ম্মীশ্রেণী কয়টী দেখিতে পাওয়া গেল? রাজনীতিক আন্দোলনকারী-দিগের মধ্যে তেমন তেজস্বী, তেমন নির্ভিক, তেমন স্বার্থত্যাগী কয়টী নেতা নয়নগোচর করিয়াছ? বাক্যচ্ছটায় গগন বিদীর্ণ করা ছাড়া ত্রিশ বৎসরের পর কংগ্রেস আর কোন্ সুফল প্রসব করিল? ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু তত্রাচ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল কিরূপ চলিতেছে? কমলা মিলের পরিণতি কি? দেশলাইয়ের কলগুলি কি হইল? তারপর, জাতীয় ধনভাণ্ডার আজ কোথায় গিয়া আত্ম-গোপন করিয়া রহিল? সেই ধনভাণ্ডারের ট্রষ্টিগণের সংবাদ কি, তাঁহারা কি কৈফিয়ৎ প্রদান করেন? নবীন দলকে এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়া, ভাবিয়া চলিতে হইবে। একমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই একটু জীবন বর্ত্তমান—তাহাও আজ শাসন-যন্ত্রের কঠোর বিধানে সশঙ্কিত।

* * *

এ সকল অবনতির কারণ চরিত্রের অভাব। অতএব নিজের চরিত্রকে গঠন করিয়া সমাজের চরিত্র পরিবর্ত্তনই নূতন দলের প্রথম কাজ। কিন্তু চারিদিকে দারুণ অন্নাভাব—এ অন্নাভাব একদিনে দূর হইবে না। এই অভাবের তাড়না সহ্য করিয়াই নূতনকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। সেইজন্য দেশহিতৈষী যুবকমণ্ডলীকে ভিতরে সন্ন্যাসী হইতে হইবে; তাহাদের স্ত্রী পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য, সম্মান গৌরব কিছুই থাকিবেনা—থাকিবে শুধু দীনা, হীনা, কণ্ঠাগতপ্রাণা দেশ-মাতৃকা—"সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা" মা আজ যাহা হইয়াছেন।

* * *

তারপর, বাংলার সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষেত্রে হে নবীন, তোমাদের আবির্ভূত হইতে হইবে। দেশ তোমাদের অনাবিল চরিত্রে যেন কখন আস্থাহীন হইবার অবসর না পায়, যেন পুরাতনের মত কখনও স্বার্থসেবার লেশমাত্র তোমাদিগকে কলঙ্কিত না করে—অনাঘ্রাত কুসুমের মত তোমরা বাংলার সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠ—ইহাই আমা-দের প্রার্থনা।

দেশের কথা।

এ সম্বন্ধে বোধ হয় আর কাহারও কোন মতভেদ নাই—যে দেশটার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কিন্তু যখন প্রশ্ন আসে কি করিয়া? তখনই উঠে যত তর্ক বিতর্ক—তখনি যত মতভেদ, দলভেদ—এক কথায় নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন সমাজের সংস্কার কর, কেহ বলেন রাজনীতিকে জীবনের একমাত্র সম্বল কর, কাহারও অভিমত ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইলে সব বৃথা হইবে। কেহ বলেন পল্লীসংস্কার, কেহ প্রচার করেন man education, কাহারও উপদেশ স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই যে চারিদিকে এত বহুশীলতার প্রকাশ এবং কর্ম্মশীলতার আভাস ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে এ জাতিটা আপনাকে কতকটা চৈতন্যবান করিয়াছে এবং কাজে কাজেই এ দেশটা উঠিবেই। আমরা কিন্তু অত দলভেদ এবং মতভেদের মধ্যে না গিয়া মানুষ যাহারা দেশের উন্নতি করিতে চাহিতেছে তাহাদের ভিতরকার রাজ্যটার একটু খোঁজখবর লইতে চেষ্টা করিব। মানুষের ভিতরের সহিত তাহার বাহিরের কি সম্বন্ধ? উন্নতির সূচীপত্র কি? এবং মানুষের ভিতরে কোন্ সত্যবস্তুর আবির্ভাব হইলে বাহিরে তাহার ঈপ্সিত উন্নতি করা ঘটিয়া উঠিবে? এই সকলই একটু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটা দেশের উন্নতি অর্থে অবশ্য আমরা সেই দেশবাসীরই উন্নতি বুঝি। এই উন্নতির সূচীপত্র কি? তাহারই আমরা মোটামুটি একটা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

মানুষের উন্নতির দুইটা দিক আছে। ঐহিক এবং পারত্রিক। অর্থাৎ ইহলোকের এবং পরলোকের। অর্থাৎ আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক। ঐহিক উন্নতির আবার দুইটি শাখা। প্রথম শাখায়—ধন, জন এবং সম্ভ্রম, দ্বিতীয় শাখায় শিল্প, কলা, বিজ্ঞান। অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। একটা জাতির ইহজীবনে যাহা কিছু আশা, আকাঙ্খা, ideal তাহা এইগুলিকে লইয়া। এক্ষণে আমরা যদি বাস্তবিক দেশটাকে ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী করিতে চাই, যদি ইহলোকে অন্নের নিকট হইতে সম্ভ্রম আদায় করিয়া চলিতে চাই এবং শিল্প, কলা, বিজ্ঞা-

নের দ্বারা জাতির এবং জীবনের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাই তবে আমরা মানুষের ইহলোকের জীবনটাকে যে দৃষ্টিতে দেখি সেই দৃষ্টিটাকে আমাদের বেশ একটু বদলাইতে হইবে অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে এক কথায় আমাদেরও angle of vision টা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই কথাটাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। মহৎ কেন কোন অসৎ কার্য্যও চালাকীর দ্বারা সাধন করা যায় না। এই চালাকীর অর্থ কি? এই চালাকী হইতেছে মানুষের প্রতিদিনের Superficial impulse—অর্থাৎ তাহার জীবনের একটা অত্যন্ত বাহিরের প্রেরণা। এইরূপ প্রেরণার জন্ম ও আশ্রয় শূন্যে শূন্যে। এই প্রেরণার এমন কোন মূল নাই যেখান হইতে সে অপরিমিত শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মের সম্পাদনে নিয়োগ করিতে পারে। মানুষ যখনই কোন কর্ম্ম করে তাহার অর্থই এই যে সে কিছু পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছে। জগতে চিরকালই একটা শক্তি অথবা শক্তির সমষ্টি রহিয়াছে যাহা যে কোন পরিবর্ত্তনের বিরোধী। এবং প্রত্যেক মানুষের প্রতি কর্ম্মের সময় এই দুই দিকের দুই শক্তিতে সংঘর্ষ হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত Superficial impulse যে টুকু শক্তি লইয়া কর্ম্ম করিতে চাহে তাহা জলবুদ্বুদের ন্যায়—সামান্যমাত্র বাধাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই কারণেই চালাকী দ্বারা কোন কার্য্য সম্ভবপর হয় না।

উপরিউক্ত সূত্র যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই তবে এ কথা মানিতেই হইবে যে দেশের উন্নতি করা আমাদের কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না যদি না তাহা এমন একটা প্রেরণার দ্বারা প্রারব্ধ হয় যে প্রেরণাটা আমাদের মধ্য হইতে সত্যশক্তি লাভ করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিতে পারে। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের জন্য এইরূপ প্রেরণার জন্মদান করিতে পারে না যদি তাহার সেই সকল কর্ম্মফলের জন্য সত্যআকাঙ্খা না থাকে। কারণ মিথ্যাদ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। আমরা সহজ কথায় বলি যাহা চাই না তাহা পাই না। আর যাহা চাই তাহা পাই। কিন্তু এই চাওয়া মনের চাওয়া নয়, প্রাণের চাওয়া নয়, বুদ্ধির চাওয়া নয়। ইহারা সবাই ঐ Superficial impulseএর জন্মদাতা। এই চাওয়া হওয়া চাই আমার। আমার—যে "আমি" নিত্য, মুক্ত, সত্য, শাশ্বত। এই "আমি"ই কেবল শক্তিশালী। এই "আমি"র পরাজয় কোথাও নাই। এই "আমি"ই শুধু সেই সত্য প্রেরণার জন্মদানে অধিকারী। এই "আমি" যখন ভৌমিসেণে ইহজগতে আপনার পতাকা প্রোথিত করিয়া বসে

তখন জড়পদার্থগুলি দাসরূপে তাহার চরণে পাদ্যঅর্ঘ বহিয়া আনে। ইহাই এই সৃষ্টির রহস্য।

কিন্তু আমরা যে এই "আমি"কে সন্ন্যাসী করিয়া তুলিয়াছি—বিরাট ত্যাগী করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের এই "আমি" যাহাতে ভোগী হইতে না পারে তাহার জন্য যে আমরা জন্মাবধি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি। আমাদের জাতিটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ত্যাগের এবং লয়ের আদর্শ। আবার অনেকের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে ব্যক্তিগতভাবে আমরা সন্ন্যাসীই থাকিব, বৈরাগ্যকেই আলিঙ্গন করিয়া রহিব, কিন্তু দেশটা জাতি হিসাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠুক। ইহা কখনও হইতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ সেই ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে সমাজ বা যে জাতি গঠিত সে জাতি বা সমাজ তদনুরূপই হইবে। ইহা বোধ হয় কষ্ট করিয়া আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। পাঁচ বাটী জল একত্র করিলে জল নামক পদার্থটীরই পরিমান পাঁচ-গুণ হয়। জলের রূপ এবং গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সে পঞ্চপাত্র জল আর কিছু দুগ্ধে পরিণত হয় না।

আমাদের জাতিটার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যাহা করিতে যাইতেছি যদি গোড়া হইতেই ধারণা থাকে যে তাহা মিথ্যা তবে তাহা চিরকাল আমার নিকট মিথ্যাই রহিয়া যাইবে। যে কার্য্য সম্পাদনে আমি কোনই সার্থকতা, কোনই চরিতার্থতা বোধ করিব না সে কার্য্য চিরকাল আমার দ্বারা অসম্পন্ন রহিবে। যে বস্তু বা বিষয় লাভ করিতে চাই তাহার মূল্য যদি আমার কাছে না থাকে তবে যে প্রেরণা লইয়া সে বস্তু বা বিষয় লাভ করিতে যাইব সে প্রেরণারও বড় বিশেষ মূল্য থাকিবে না। ত্যাগকে জীবনের আদর্শ করিলে নৃপতি হইতে কেহই পারে না। অন্তরে দীনতাকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে বাহিরের দৈন্য কিছুতেই দূর হইবে না। ইহাই হইল সৃষ্টির নিয়ম। সংসার অস অসীক, স্বপ্ন, ছায়াবাজি, ভগবানের ফাঁকি এটা যতদিন জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য প্রতিভাত হইবে ততদিন সে এ সংসারে তদনুযায়ী ফলই প্রাপ্ত হইবে। এই কারণেই আমাদের এই জাতিটা সংসারকে যে দৃষ্টিতে দেখে এবং জগৎ সম্বন্ধে যে আইডিয়া তাহার জীবনের কার্য্য কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেই আইডিয়া এবং সেই দৃষ্টির বেশ একটু পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। নহিলে আমরা দেশের যে উন্নতি করিতে চাহিতেছি তাহা সত্যপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুতেই দীর্ঘকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না।

বিচার তাঁহাদের সঙ্গে যাঁহারা আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী দেশের উন্নতি করিতে চাহিতেছেন। এবং তাঁহাদের প্রতিই আমাদের নিবেদন যে তাঁহারা যদি এই ইহলোকের সত্যমূর্ত্তি আপনাদের অন্তরে খুঁজিয়া না পান তবে তাঁহারা তাহার পূজা করিতেও অধিকারী হইবেন না—এবং পূজা করিলেও তাহাতে তাঁহারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন না—এবং প্রাণবিহীন বিগ্রহ ইহার পূজকদিগকে অমৃতদান করিতে চিরদিন অক্ষমই রহিবে। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের পূর্ব্বে আমাদের জীবনের সঙ্গে ইহলোকের সত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে নহিলে সকল প্রকার শ্রমই বৃথা হইবে। ইহলোকের উন্নতি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু আবার আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা ইহলোকের পূজা করিতে যাইয়া আমাদের দেশকে ইউরোপেরই একটা নূতন সংস্করণে পরিণত করিয়া না ফেলি। আমরা চাহি মানুষের জন্য ইউরোপের নরনারীর জীবন অপেক্ষা একটা বৃহত্তর, মহত্তর জীবন গঠন করিতে। ইউরোপ জাতি হিসাবে আজ যতই সমৃদ্ধিশালী, ক্ষমতাশালী হউক না কেন মানুষকে কিন্তু সে খর্ব্বই করিয়াছে। মানুষ চলিয়াছে। কিন্তু ইউরোপের মানুষের চলা থামিয়াছে সেইখানে যেখানে তাহার দৃশ্যমান জগৎ শেষ হইয়াছে। ইউরোপের মানুষ ইন্দ্রিয়প্রামান্য। ইন্দ্রিয়ই তাহার গণ্ডী। বিশ্বমানবের অন্তরে যে সৃষ্টির আদি হইতে ভৈরবনাদে ধ্বনিত হইতেছে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, মানুষ যে একটার পর একটা করিয়া সমস্ত অতিক্রম করিয়া দৃশ্যমান জগতের শেষ সীমায় আসিয়া আবার প্রশ্ন করিতেছে—এরপর কি? ইউরোপ সে প্রশ্ন করিতে সাহসী হয় নাই। এইখানেই ইউরোপের ক্ষুদ্রত্ব, তাহার বন্ধন ও গণ্ডী।

আমরা কিন্তু এই বন্ধনে মানুষকে বাঁধিয়া তাহাকে অধর্ম্মাচারী করিয়া তুলিব

না। কারণ গণ্ডী দিয়া মানুষকে বাঁধিলে মানুষ পরিণামে অধর্ম্মাচারী হইবেই। মানুষের চরিপাশে যে কোন গণ্ডীই টান না কেন, যে কোন বন্ধনেই তাহাকে বাঁধ না কেন সে গণ্ডী, সে বন্ধন তাহার পক্ষে অত্যন্ত অসত্য এবং অসত্যই অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা। প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষ যতই জাজ্বল্যমান হউক না কেন মানুষের আসল স্বরূপ সে প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা তাহা এবং আরও কিছু এবং তাহার এই "আরও কিছু" সে প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা তাহা হইতে লক্ষ্য গুণ কোটী গুণ বৃহৎ। তাহার চারিপাশে গণ্ডীটানায় অর্থই তাহার স্বরূপের এই "আরও কিছু"র গোড়া কাটিয়া দেওয়া। এই জন্যই বর্ত্তমান ভারতও ইউরোপের মতই মানুষকে খর্ব্ব করিয়াছে—অবশ্য অন্যরূপে। ইউরোপের গণ্ডী ইন্দ্রিয়, ভারতবর্ষের গণ্ডী অতিন্দ্রিয়। কিন্তু আমরা মানুষের চতুর্দ্দিকে কোন গণ্ডীই টানিব না বলিয়া দেশোন্নতির আলোচনায় অধিভূতের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা কি? এবং অধিভূতের সঙ্গে অধ্যাত্মের কি সম্বন্ধ? ইহারা পরস্পর বিরোধী— অথবা অন্যরূপ ইত্যাদির আলোচনা আমরা ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে করিবার চেষ্টা করিব।

———o———

যোগ।

(৬)

কোনও বিষয় বিশেষের পূর্ণ জ্ঞান লাভ কিরূপে হইবে? সর্ব্বাগ্রে সাধারণ পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা যাউক। সচরাচর জ্ঞান তিন প্রকার; ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক। উক্ত তিন প্রকার জ্ঞানই ভ্রমাত্মক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহা প্রমা নহে, কেন না শুক্তিতে রজত জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পভ্রম নূতন কথা নহে। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রতারিত হইয়া আমরা সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাহার পর যৌক্তিকজ্ঞান—কার্য্যক্ষেত্রে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে যে সকল অভিজ্ঞতার্জ্জন করিয়াছি, তাহারই কষ্টিপাথরে ইন্দ্রিয়সমন্বিত বিষয় বিশেষকে মাজিয়া

ঘসিয়া আলোচনা করিয়া গ্রহণ করাই এই জ্ঞানের কাজ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই ইহার ভিত্তিস্বরূপ এবং উহাই উহার প্রতিপাদ্য সুতরাং সদোষ সসীম ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া, যুক্তিতর্ক, বিষয় বিশেষের নির্ম্মলস্বরূপ সত্যকে প্রদান করিতে পারে না। ঔপদেশিক জ্ঞান শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির সাহায্যে বুদ্ধির বিকাশমাত্র। কিন্তু ইহাও ইন্দ্রিয়াদির দাস—প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ নির্ভুল-ভাবে শাস্ত্র গ্রহণ করিলে তবে ত বুদ্ধি নির্ভুল শাস্ত্রবিচার করিবে? বিশেষতঃ—শাস্ত্রাধ্যয়ন যোগে শাস্ত্রের ভাষাবোধ জন্মে বটে—কিন্তু ভাষাব্যূহ ভেদ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মোপলব্ধি করা প্রত্যক্ষানুভবী ব্যতীত কেবল পণ্ডিতের পক্ষে অসম্ভব। অতএব যোগজ যে জ্ঞান উহাই প্রমা, উহাই সত্য। এই জ্ঞান, ঐন্দ্রিয়িক, যৌক্তিক এবং ঔপদেশিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। উদাহরণদ্বারা সাধারণ-ভাবে বিষয় বিশেষের জ্ঞানার্জ্জন এবং যোগপদ্ধতি অনুসারে বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধরুন আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি। আপনার রূপ দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; এক্ষেত্রে দর্শনশক্তি দিয়াই আপনার রূপ আমার অন্তরে প্রবেশলাভ করিল। তারপর আপনার বাক্য কি মিষ্ট, কি মধুর—শ্রবণবিবরে অমৃতবর্ষণ করিল—আপনার অঙ্গসৌরভ আমায় উন্মাদ করিল—আপনার সুঠাম দেহখানি কি কোমল, কি মসৃণ! তাহার স্পর্শলালসায় আমার সর্ব্বস্ব হর্ষভরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না—দৃঢ় আলিঙ্গনে আপনাকে বদ্ধ করিলাম, আপনাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিলাম। আপনি, সুযোগ বুঝিয়া আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেন—হয়ত এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়াই আপনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে আমি ত ইহা বুঝিলাম না, আপনার গুণের পরিচয় না লইয়া এরূপ করিলাম কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়গুলিই ইহার কারণ। ইহাই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান—কিন্তু ইহা কি ভ্রমপূর্ণ, কি প্রতারণাময়!

অতএব ইন্দ্রিয়জয়ী হইলে এতটা নির্ব্বোধ হইতাম না। ভবিষ্যতে সাবধান হইলাম—মানুষ চিনিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিলাম—যে সকল লক্ষণ দেখিলে পূর্ব্বে ভালবাসারই পরিচয় বলিয়া প্রতীতি হইত—এক্ষণে সংশয়ের চক্ষে উহা গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তির অন্তর বাহির না বুঝিয়া আর কাহারও নিকট ধরা দিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। ঘটনা-চক্রে কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহার আকৃতি, মুখাবয়ব, তাহার উচ্চারিত প্রতিবর্ণ, তাহার হাবভাব, মনোযোগ দিয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগি-

লাম। তাহার ব্যবহার কিরূপ, তাহার সঙ্গী কাহারা, কোন্ বিষয়ে তাহার অধিক আসক্তি, সে কি কথা বলে, কি কার্য্য করে, কোন্ সকল পুস্তক পাঠে তাহার অধিক অভিরুচি—ইত্যাদি নানা প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এইটুকু বাহ্য অভিজ্ঞতা। অনন্তর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম—কাকচরিত্র, হনুমানচরিত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, পঠিত, শ্রুত যত রকম জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে জন্মিয়াছিল—সকল দিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। হয় বুঝিলাম, লোকটা এইরূপ এইরূপ করে, অনেক দেখিয়াছি এইরূপ ব্যবহারী লোকগুলা প্রায়ই দুষ্ট হয়, অতএব ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ; না হয় বুঝিলাম এইরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি সৎই হইয়া থাকে—অতএব ইহাকে বন্ধুভাবে ভালবাসিতে কোনই আপত্তি নাই। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই যে মানুষ ভুল করিয়া বসে, আমি এরূপ বলি না—এমন কি এতটা পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই অনেক স্থলে আমরা মনের মানুষ পাইয়া থাকি ইহাও সত্য কথা। কিন্তু এত বিচক্ষণতার পরও আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রায় দেখিতে পাই, যাহাকে অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিলাম, সেই অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মানুষ বিষয় বিশেষের জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকে; মানুষ সম্বন্ধেও যেমন, কোন দ্রব্যাদির বিষয়েও সেইরূপ। প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বস্তুটীকে মনের মধ্যে লইয়া আসা হয়, পরে যৌক্তিক ও ঔপদেশিক জ্ঞানের আলোকে উহাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তদ্বিষয়ে মিথ্যাই হউক, সত্যই হউক, একটা জ্ঞান লাভ করে। বস্তুতঃ, সে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় মাত্র—কারণ তাহার সিদ্ধান্তটী ঠিক হইল কি না, এমন কি তাহার এই সমগ্র চিন্তাপ্রণালিটীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশটুকু ছাড়া নির্ভুল ও সত্য কিছু রহিল কি না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বাহিরে যাহা কিছু, সমস্তকেই সাধারণ মানুষ সংশয়ের চক্ষে দেখে; ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যাহা সে প্রত্যক্ষ করে, অথবা সেই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যতটুকু মিল আছে, ততটুকু ছাড়া কোনও কিছুকে সে নিঃসংশায়িত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত।

কিন্তু যোগীর দ্রব্যাদির স্বরূপ নিরূপণ প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সংযোগাধীন নহে—কোনও হেতুদর্শনে তাহার জ্ঞান আগমন করে না, বুদ্ধির উক্ত প্রকার নিরন্তর অনুশীলনের ফলে, যখন প্রতিপদে বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা

[illegible] ফেলেন। অবশ্য এইরূপ শক্তি-লাভ অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

বিষয়টী আপাততঃ বড়ই জটিল এবং কঠিন বটে—কারণ, আমরা স্বভাবত ইন্দ্রিয় ও বিচার বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারাই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অভ্যস্ত, এতদ্ব্যতীত যে আমাদের মধ্যে অদ্ভুত প্রজ্ঞাশক্তি আছে ইহা ধারণার মধ্যেই আনিতে পারি না; কিন্তু বুদ্ধি যখন পূর্ণভাবে সেই অজানিত অনন্ত শক্তির উদ্দেশ্যে ধ্যানরত হইবে, শক্তির উপর অগাধ শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধি ও মন শুদ্ধ ও শান্ত হইবে—তখন প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারাই আমরা সকল কার্য্য করিব। বস্তু বা কোন ব্যক্তির বাহ্য অবয়ব বা তাহার কোন আচরণ লক্ষ্য না করিয়াই অন্তর্মুখী ভাবের দ্বারাই উহাদের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হইব।

পূর্ণ আত্মসমর্পণ সার্থক হইলে, আমার কথাগুলি সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। কারণ-জ্ঞান জন্মিলে কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ আধারে, কারণ মধ্যস্থিত অব্যক্ত ভাবের কতটা প্রকাশ সম্ভব উহা ভাবের দ্বারাই উপলব্ধি হইবে—মানুষের বাহির দেখিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করার তখন আর আবশ্যক হইবে না। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে বলিব।

যোগী ঘটনাই হউক, পদার্থই হউক, মনুষ্যই হউক, তাহার সঠিক স্বরূপ নিরাকরণ করিতে যখন উদ্যোগী হইবেন, প্রথমেই গতানুগতিক অভ্যস্ত পন্থাটী পরিহার পূর্ব্বক বিষয়টীর ভাবের সহিত আপনার ভাবকে মিলাইবার প্রচেষ্টা করিবেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে ভাবিয়া লইবেন। প্রথমে ইহা বৃথাই বোধ হইবে। নিরক্ষর ব্যক্তি একদিনেই পুস্তকপাঠে সমর্থ হয় না। অভ্যাসযোগে ক্রমশঃই ভাবের মধ্যে বস্তুটির অধ্যাত্ম

তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবে—এই অধ্যাত্মতত্ত্বই কারণ, যে কারণের উপর উহা অবস্থিত।

অনন্তর বুদ্ধির দ্বারা সেই ভাবমধ্যস্থিত অব্যক্ত জ্ঞানকে চিন্তার মধ্যে আনিতে হইবে। এই স্থানেই ভাব সম্ভবপর বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। অনুভূত অব্যক্ত জ্ঞান বাক্‌বদ্ধ হইয়া সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিবে। ইহারই নাম চিন্তা। অধিকাংশ লোকেই একান্ত অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে, অসম্পূর্ণ বাক্যে, আংশিক অর্থে তাহাকে অর্দ্ধস্ফুট করে মাত্র। যোগী কিন্তু এইরূপ করিবেন না।

তাঁহার চিন্তা সুপরিস্ফুট, সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত হওয়া চাই। চিন্তা না করিলেও যোগী স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি চিন্তা করিবেন, তখন সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ভাবেই চিন্তা করিবেন।

প্রয়োজন হইলে যোগী বিচারও করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মত নহে। তিনি দর্শন করেন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নহে, সর্ব্বান্তর্য্যামীর চক্ষু দিয়া, ঐ ঐশশক্তি সম্পন্ন প্রত্যক্ষ, ঐ দৈবদৃষ্টিই তাঁহাকে অর্থযুক্ত ভাব প্রদান করে; এই ভাবেরই দৈবপ্রেরণা, দেবতার প্রত্যাদেশস্বরূপ যোগীর মুখ ও লেখনীতে ভাষাকারে বহির্গত হয়; এই প্রত্যক্ষবোধই তাঁহাকে সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত করে এবং বিবেক—ভ্রান্তি ও অসত্য হইতে সতত তাঁহাকে রক্ষা করে। যদি তর্ক করিতে হয় সাধারণ তার্কিকের মত তর্কশাস্ত্র প্রদর্শিত পন্থানুসারে যুক্তির পর যুক্তির প্রয়োগ করিয়া অতি কষ্টে বিষয়টি প্রতিপাদন করিতে যান না। তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধিতে ভগবানই উপযুক্ত যুক্তি পরম্পরা প্রেরণ করেন—যোগী ভগবানের সেই প্রত্যাদেশই সরল এবং সুস্পষ্ট ভাবে লোক সমাজে প্রকাশ করেন। সেই জন্য যোগীর কথা ক্ষুরধার সদৃশ—জীবন্ত এবং জলন্ত।

যোগী কোন বিষয় বিনা দর্শনেও কেবল ভাবমাত্র অবলম্বন করিয়া উহা সম্বন্ধে যে জ্ঞানার্জ্জন করেন, ঐ বস্তুর বাহ্য বিকাশ দেখিয়া, উহা সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া লয়েন। এই মিলাইয়া লওয়ার জন্য কেহ যেন মনে না করেন, যে যোগী তাহার অমানুষী যোগশক্তির দ্বারা যে সঠিক জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, উহার প্রতি তাঁহার কোনও সংশয় আছে। যোগী, কেবল মানুষের বাহ্য বিকাশে, তাহার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতার কতটুকু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই দর্শন করেন। কেন না, যোগী জানেন, মানুষের অন্তর্স্থিত অসীম ভাবারশি সম্পূর্ণরূপে এককালে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যে সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহারই ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে—ইহা দেখিয়া আনন্দলাভ করেন মাত্র।

যোগের গতি অনুসারে যোগী অনাগত ভবিষ্যতের সকল তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন, কোন ব্যক্তি বিশেষের মূর্ত্তিমাত্র দর্শন না করিয়াও তাহার বিষয়ে সকল কথা বলিয়া দিতে পারেন; একস্থানে বসিয়া জগতের সর্ব্বত্রে কি ঘটিতেছে, কি ঘটিবে প্রভৃতি বিষয় অনায়াসে বিদিত হয়েন।

প্রধান কথা, মানুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের যে সম্বন্ধসূত্র আছে, বুদ্ধি ও মানসকে স্থির করিয়া সেই মহান সূত্রটি অবলম্বন করিতে হইবে; সমগ্র জগতের সুর সেই সূত্রে অনাহতভাবে ধ্বনিত হইতেছে—বাহিরের কোলাহল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলেই আমরা অনায়াসেই সেই মোহন বাঁশি শুনিয়া কৃতার্থ হইব। এক্ষণে কথা হইতেছে, এইরূপ সর্ব্বদর্শী হইবার জন্য আমাদের মনে যেন কোন বাসনা জাগিয়া না উঠে; আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহা বলা হইতেছে এ সমস্ত যোগসিদ্ধির একটা স্তর মাত্র। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, উক্ত প্রকার লক্ষণ অল্পবিস্তর আমাদের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিবে—এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বুঝিব আমাদের যোগ কার্য্যকরী হইতেছে কি না ?

অবশেষে বক্তব্য—যোগী মনে রাখিবেন বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা মন দিয়া জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞান—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত, ভাবরূপে জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ করেন, বুদ্ধি এবং মনরূপ দ্বার দিয়া উহা প্রকাশিত হয় মাত্র। অতঃপর আত্মসমর্পণযোগী কালী শক্তির হস্তে সকল যন্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই বুদ্ধির ধারণা-সামর্থ্য জন্মিবে, খণ্ডতা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বজ্ঞানের আধার হইয়া উঠিবে।

—O—

প্রেমের কথা।

আমরা লোককে, দেশকে, ভগবানকে ভালবাসি সুখের আশায়, ভোগের আশায় কিন্তু প্রেমের পরীক্ষা দুঃখে। এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের প্রেম, আমাদের পিরীতি মলামাটি শূন্য হইয়া খাঁটি হয়। যে প্রেমিক দুঃখের বজ্রকটোর মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হয়, তার ভালবাসায় মূল্য নাই; সে কামের হ্রদেই চিরদিন নিমগ্ন থাকে, স্বর্গের পারিজাতে তাহার অধিকার নাই।

ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া, ভগবানের সহিত প্রেম করিয়া মহামতি খৃষ্ট ক্রুশবদ্ধ হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন—আকাশের দিকে চাহিয়া প্রেমময় পরমপিতার প্রেম স্মরণ করিয়া মরণের দুঃখ ভুলিয়াছিলেন।

প্রেমের গতি ঊর্দ্ধমুখী, কাম নিরয়গামী। সংসারে প্রেমিক যাহারা তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল—অসাধারণ ব্যক্তি না হইলে প্রেমের অসাধারণ ব্রত কয়জন উদ্‌যাপন করিতে পারে?

ভারত উপাখ্যানে রাজা হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবৎস, নল প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দের দুঃখের কথা স্মরণ কর, সত্যের জন্য কি কঠোর শাস্তিই না ইহারা ভোগ করিয়াছেন। শিবি-রাজা স্বীয় শরীরের মাংস স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দান করিয়াছিলেন—ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভালবাসিতে গিয়াও কত ত্যাগ সহ্য করিতে হয়! তারপর বিশ্বপ্রেমোন্মত্ত বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতির অগ্নি পরীক্ষার কথা স্মরণ কর; রাজপুত্র পঞ্চবীর পাণ্ডুপুত্রগণের অরণ্যবাস, বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের নির্ব্বাসন প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি পড়িয়া স্বতঃই মনে হয় সত্যানুরাগের, প্রেমের ইহাই পুরস্কার।

তাই কৃষ্ণপ্রেম কহিতে গিয়া কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

চণ্ডীদাস বাণী—শুন বিনোদিনি,
সুখ দুঃখ দুটী ভাই;
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

যে সুখের লাগিয়া পিরীতি করে, তাহাকে অবশ্যই ব্রতচ্যুত হইতে হয়, তাই বলিতেছিলাম মনুষ্যজীবন লইয়া প্রেমের জন্য অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইতে, সার্থক লইতে চায় কয়জন বল দেখি ? যে দেশে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রেমের জন্য অসাধারণ লোকের অভ্যুত্থান হয়, সে দেশ ধন্য, তার মাটী স্বর্গাদপি গরীয়সী।

একা ভারতে কত ঘটনায়, সত্যানুরাগী মহাজনগণ হাসিমুখে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অমৃতত্বের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রেমিক নিত্যানন্দের সেই প্রেমময় বাণী—"মেরেছ কলসীর কণা

তাই বলে কি প্রেম দিব না" ?

এখনও বাঙ্গালীর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিয়া, উজ্জ্বল দেবজীবনের আদর্শ জাগ্রত, প্রস্ফুট করিয়া তুলিতেছে।

চিন্তা-চুম্বক।

মানুষ গিয়েছিল ফুলটী তুলতে। দেখ্‌লে যে সন্ধ্যেকালে ফুল ঝরে গেল। মানুষ বল্লে—এইত মায়া—এতে লাভ কি ? আমরা কিন্তু জানি যে ভগবান্ ফুলকে একদিনের আনন্দ দিয়েই গড়েছেন। আমরাও ফুলের কাছ থেকে ঐ একদিনের আনন্দের প্রত্যাশী হয়েই বসে থাকি। ভগবান্ তাঁর সৃষ্টিতে যেখানে যে ভাবে যেটুকু আনন্দ ফুটিয়ে রেখেছেন—আমাদেরও দাবী শুধু সেটুকু। তাই আমরা মায়াবাদী হ'তে পারিনি। ভগবানের শিষ্য আমরা।

আর যেখানে যেটুকু সেখানে সেটুকুর বেশী দাবী নেই বলেই আমাদের জীবনে কোন উপেক্ষা নেই, মরণে কোন আক্ষেপ নেই। মরণে কোন আক্ষেপ নেই বলেই জীবনে এত আনন্দ। তাই আমরা জীবনে দশ ইন্দ্রিয়কে দশদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছি। আর তারা ভগবানের লীলার রাজ্যে নবীন নবীন আনন্দ কুড়িয়ে তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক ক'রে তুলছে।

যার সঙ্গে প্রেম হয় তার বাড়ীর বেড়ালটাকেও স্পর্শ করে সুখ হয়। যখন ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত প্রেম জন্মিবে তখন তাঁর সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডে কোটী কোটী

পদার্থের স্পর্শে কোটী কোটী ভাবের দ্যোতনায় জীবনটা আনন্দে আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

ভগবান আপনাকে প্রকাশ ক'রে আছেন দু'ভাবে। রূপে এবং অরূপে। এই রূপ এবং অরূপ নিয়ে তাঁর স্বরূপ তৈরী। রূপের সাধনা ভোগে আর অরূপের সাধনা ত্যাগে। পূর্ণ যোগ এ দুটোকে নিয়ে।

ত্যাগের প্রকৃত সার্থকতা ভোগে আর ভোগের প্রকৃত সার্থকতা ত্যাগে। এর একটি ছাড়া আর একটী মূল্যহীন।

ত্যাগ কর্‌লেই যে অহঙ্কার খাটো হয়ে আসে আর ভোগ কর্‌লেই যে সেটা পর্ব্বত সদৃশ আকার ধারণ করবে এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। নিরাট ত্যাগীও তাঁর ত্যাগের মধ্যে তাঁর অহঙ্কারকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে বসে থাকতে পারেন যে ভগবানেরও তাঁর নিকট যেতে সাহস না হতে পারে।

ত্যাগীর ত্যাগের মধ্যে ভগবান লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনা যতটা আছে ভোগীর ভোগের মধ্যে তার চেয়ে বড় কম নেই। ভোগীর দোষ শুধু যে তার সেদিকে দৃষ্টি নেই। কারণ সে ঠিক করে বসে আছে যে ভোগ ও ভগবান্ দুটী বিরুদ্ধ বস্তু।

* * *

কর্ম্মশীলতাটা মানুষের এমনি সত্যিকার বস্তু যে সেটাকে যেদিকে যেমনভাবেই চাপ না কেন তা কোন না কোন দিক দিয়ে কোন না কোন আকারে প্রকাশ হবেই।

নূতনের মধ্যেই পুরাতনের সার্থকতা। আর পুরাতনের মধ্যেই নূতনের জন্ম। অথচ এই পুরাতন ও নূতন যেন কেউ কাকে চেনে না। আর তাই দুজনের মধ্যে চিরকালের রেষা রেষি। এইত লীলা, এইত উত্তমম্ রহস্যম্।

আমাদের প্রাণ বল্‌ছে এটা করি, মন বল্‌ছে ওটা করি, বুদ্ধি বল্‌ছে সেটা করি। দিনরাত এদের এই কলরবে আমাদের "পাকা আমি"টা যে কি বল্‌ছে সেটা বুঝেই উঠ্‌তে পার্‌ছি না। তাই আমাদের অধিকাংশের জীবনেই যেন একটার পর আর একটা এম্‌নি করে একটা Experiment চল্‌তে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে এই "পাকা আমি" জীবন্ত হয়ে উঠ্‌বে তখন দেখ্‌ব যে তার প্রেরণায় যাতে হাত দিয়েছি তাতেই সিদ্ধি পেয়েছি।

যখন যে যেখানে যেভাবে যেটুকু উপযুক্ত হচ্ছে ভগবান তাকে সেইখানে সেইভাবে সেটুকু দিচ্ছেন। মানুষ তাকে কিছুতেই তা থেকে বঞ্চিত করে রাখ্‌তে

পারে না।

সংসারে চালাক যাঁরা তাঁরা পরার্থপর। কারণ আমাদের বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধি নিহিত রয়েছে পরার্থপরতায়। সুতরাং আমাদের শ্রেষ্ঠতম স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগে।

* * *

মায়াবাদীরা বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। অর্থাৎ সংসারটা নেই, ভগবান্ আছেন। আমরা মাটীর মানুষ, আমরা সংসারটা আছে বলেই ভগবানের মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝি। সংসারটা যদি নাই থাকে তবে ভগবানও বা না থাকলে। তাতে ক্ষতি কি।

একদিন বৈকুণ্ঠে বৈঠক বসেছিল। ব্রহ্মা বল্লেন—আমি প্রজা সৃষ্টি করার ভার নিলেম। বিষ্ণু বল্লেন—আমি তাদের পালন করবার ভার নিলেম। শিব বল্লেন—আমি তাদের ধ্বংস করবার ভার নিলেম। ভগবান বল্লেন—আমি এদের আনন্দ দেবার ভার নিলেম।

সবাই যদি পরের উপকার সাধন কত্তে না ছুটে, প্রত্যেকে নিজ নিজ উপকার সাধন করে তবে জগতের কাজ এগিয়ে যায় অনেক বেশী। কারণ নিজের উপকার সাধন করা যত সহজ পরের উপকার সাধা তত সোজা নয়।

শক্তির অধিকার শুধু সংহারে—জয় করবার তার কোন ক্ষমতা নেই। জয়ের অধিকার শুধু এক প্রেমের। আবার শক্তিমান্ না হলে প্রেমে অধিকার জন্মে না। কারণ শক্তিহীনের প্রেম দাসত্বে পরিণত হবে। দাসত্ব প্রেম নয়।

মানুষ যেমন সুপাচ্য চব্য চষ্য লেহ্য পেয় দিয়ে রসনার ভোগ যোগাচ্ছে, তেমনি আবার সে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ব্যবহার ক'রে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন কচ্ছে।

* * *

মানুষ যত মহান্ হতে থাকে ভগবান এবং তার মধ্যে দূরত্বও তত কমে যেতে থাকে। নবীনযুগের সাধকেরা আদর্শ করবে শুধু এক ভগবানকে।

মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী। চলছে সে দুঃখ সুখের ভিতর দিয়ে। দুঃখের সময়টা তার পথ চলা আর সুখের সময়টা তার বিশ্রাম।

মানুষের সুখভোগের সামর্থ্য থেকে দুঃখভোগের সামর্থ্য অনেকগুণ বেশী।

———:*:———

ভোগঃ যোগায়তে ।

সচরাচর যোগ অর্থে আমরা বুঝি চিত্তবৃত্তি নিরোধ। অর্থাৎ অন্তঃকরণের খেলা যখন আমার সব স্তব্ধ হইবে, মনে যখন কোন চিন্তা নাই, হৃদয়ে যখন ভাবোচ্ছাস নাই, প্রাণে কর্ম্মৈষণা নাই, সব যখন শান্ত তখনই আমার যোগাবস্থা। এ জন্য যোগীর সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন নির্জ্জন স্থানে স্থিরসুখআসনে উপবেশন পূর্ব্বক নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকা। দেহে মনে সর্ব্বতোভাবে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থির হওয়াই যোগীর যোগ। কারণ অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ যখন বিশুদ্ধ তখনই কেবল সেই বিক্ষোভহীন নির্ম্মল শান্তি ভেদিয়া ফুটিয়া উঠে জীবের স্বরূপ, তাহার গভীর অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মসত্তা। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।

এই সিদ্ধান্তে একটি কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে দেহ প্রাণ চিত্ত বুদ্ধি অহংকার ইহারা ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষকে শুধু আবৃত করিয়া রহিয়াছে। আধেয় ও আধার, কর্ত্তা ও করণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা দ্বন্দ্বের, বিরোধের সম্বন্ধমাত্র। কিন্তু এ কথাটী কতদূর সত্য? ভাস্কর যখন প্রস্তর কাটিয়া মূর্ত্তি গঠনে নিযুক্ত, তখন তিনি কেবল অবাধ্য উপকরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন কি? কবি যখন শব্দ যোজনা করিয়া কাব্য রচনা করিতেছেন তিনি সর্ব্বদা জোরজবরদস্তি করিয়া বিদ্রোহীকে আপন করায়ত্ত করিতে চাহিতেছেন? ইহাই বরং গভীরতর সত্য যে শিল্পী স্থূল উপকরণরাজীকে তাঁহার ভাব প্রকাশের সহায় বলিয়াই বোধ করেন, উভয়ের মধ্যে একটা সহজ সামঞ্জস্যই তাঁহার সৃষ্টির মূল প্রেরণা। আপাত দৃষ্টিতে বস্তু যতই কঠিন, গাঢ়, অনমনীয় জড়মাত্র বলিয়া বোধ হউক না, শিল্পী তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সাহায্যেই অন্তরের সূক্ষ্ম তরলিত ভাবরাশি আকটিত করিয়া থাকেন। বস্তু ভাব প্রকাশের বাঁধ নয়, সেই ভাব প্রবাহেরই উদার বিস্তৃত নৈসর্গিক প্রণালী।

যোগীর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সাধারণতঃ মানুষের বৃত্তিসমুদয় তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা প্রকাশের পরিপন্থী। ইন্দ্রিয়ের গতি বহির্ম্মুখী, স্থূলের, বৈচিত্র্যের, বিক্ষোভতার দিকেই উহা ছুটিয়া চলে। এই ইন্দ্রিয়ের স্রোতে বাহিয়া জীবও তাই সহজেই আপনাহারা হইয়া সীমাবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত,

চঞ্চল, স্থূলপ্রত্যয়সার হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের খেলা আত্মবোধের প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই আবার সবখানি সত্য নয়। একদিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন সৃষ্টি প্রকৃতি ইন্দ্রিয়, স্রষ্টাকে পুরুষকে আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, জগৎ যেন ব্রহ্মকে অস্বীকারই করিতেছে। ইহা সাধকের প্রথম অবস্থার কথা। সাধক যখন ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী স্রোতে উজান কাটিয়া তাহার উৎস স্থানে পঁহুছিতে চাহিতেছেন, জড়ের বশীভূত মানুষ মুমুক্ষু হইয়া যখন 'নেতি' 'নেতি' করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু মুমুক্ষু যখন মুক্ত, যখন সেই পরমে সেই সমুচ্চে সে আরূঢ় তখন সে দেখে, যে সমস্ত সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহা একান্ত পরিত্যাগ করিবার নয়, তাহা সেই পরমেরই ছায়া, বিকাশ, সেই পরমই—তখন সে আবার 'ইতি' 'ইতি' করিয়া নামিতে পারে। তখন সে দেখে সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা, সৃষ্টিই স্রষ্টা, প্রকৃতির মধ্যেই পুরুষ, প্রকৃতিই পুরুষ, দেহের মধ্যে আত্মা, দেহই আত্মা। আধার তখন আধেয়ের পরিস্ফূর্ত্তি, তাহার জ্যোতির্ম্ময় কিরণরাজী, ঘনকৃষ্ণ অবগুণ্ঠন মাত্র নয়।

বস্তুতঃ এইটিই প্রকৃত সত্য। ইন্দ্রিয়সমষ্টি শূন্য হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার মুখে যবনিকা রূপে ছাইয়া বসে নাই। ইন্দ্রিয়াদি লইয়া যাহা আধার তাহা আত্মা হইতেই আসিয়াছে, উভয়ের মধ্যে ছেদ নাই, একটা সহজ গভীর জীবন্ত সংযোগই রহিয়াছে। অপক্ক অবস্থায় প্রাকৃতজনের বৃত্তিবিক্ষোভের মধ্যেও অতি প্রাকৃতের ফল্গুস্রোতঃ নিত্য বহমান। যাহা কিছু আছে তাহার কোনটিই একেবারে অনৃতময় নয়, প্রত্যেকের মধ্যে, আপাততঃ তাহাকে যতই অসত্য, অকল্যাণকর মনে হউক না, একটা গভীর সত্য, উদার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই কথা লক্ষ্য করিয়াই বেদ দেবশত্রু দস্যু পণিদিগের প্রকৃতি চিত্রিত করিয়াছেন। পণিগণ অজ্ঞানতার শক্তি—কিন্তু তাই বলিয়া উহারা একেবারে অজ্ঞানময় নহে। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপহরণ করিয়া আপন গুহা গহ্বরে লুকাইয়া রাখে মাত্র। দেবতার কার্য্য সেই গুহা ভেদ করিয়া সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ধার করা। পণির তমসাবৃত কঠিন আবরণের অন্তরেই জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে, শুধু সেই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতিঃকে নির্ম্মুক্ত করিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে—আর্য্যযোদ্ধার ইহা জীবনব্রত। সেইরূপ সকল অজ্ঞানতা সকল অসত্যতার মধ্যেই রহিয়াছে জ্ঞানের, সত্যের রেখা। ইন্দ্রিয়ের খেলা শুধু ভ্রম, শুধু মরীচিকা, নিঃশেষরূপে পরিত্যজ্য নহে। মায়া যাহাকে বলি তাহা নিতান্তই মায়া নহে। ঋষিদিগের ভাষায় মায়া দুই প্রকার—'দেবী মায়া' আর 'অদেবী মায়া'। অদেবী মায়া হই-

তেছে, তাহাই যাহার প্রভাবে জীবের অন্তরে অজ্ঞানতা, অশক্তি অথবা ভুলজ্ঞান, অশুদ্ধশক্তি প্রভৃতি আসিয়া অধিকার করে, যাহার ছায়া পড়িলে বস্তু কুরূপ হইয়া উঠে। বৃত্রের তাই নাসিকা নাই, হস্ত পদ নাই। বৃত্রের 'অদেবী মায়া' কে জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের দেবতা ইন্দ্র বিদূরিত করেন তাঁহার দৈবীমায়ার সাহায্যে। দৈবীমায়া হইতেছে জ্ঞানময় সত্যময়, যাহা লইয়া বস্তু সুন্দর সুরূপ। মায়া কাটিয়া উঠিতে হইবে, কিন্তু সেই মায়া যাহা অসরল, কুটিল সঙ্কুচিত, যাহা জ্ঞান আনন্দ শক্তির বিকৃত মূর্ত্তিমাত্র। রাখিতে হইবে সেই মায়া যাহা দেবতার দান, যাহা ভগবানের সুঠাম সুবলয়িত প্রকাশ। সৃষ্টির মায়ার অতীত হইবার প্রয়োজন নাই, শুধু কুসৃষ্টি যাহা কু-মায়া যাহা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার মধ্য হইতেই ঋতময় সৃষ্টি, সত্যরচিত মায়াকে ধীরে ধীরে বাহিরে পূর্ণ প্রকটিত করিয়া ধরিতে হইবে।

ইহাই যদি সত্য তবে কোনরূপ বিরোধ বা নিগ্রহকে আমাদের যোগসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সৃষ্টিকে ফুৎকার দিয়া যাহারা চলিয়া যাইতে চাহে নিগ্রহ তাহাদেরই পন্থা। কিন্তু আমরা সৃষ্টিকে ভগবানেরই আত্ম বিকীরণ বলিয়া জানি তাই সৃষ্টিকে ধরিয়াই আমরা চলিব। বৃত্তির নিরোধ নয় তাহার সকল রকম পরিস্ফুরণের মধ্য দিয়াই আমাদের যোগসাধন। কারণ যোগ অর্থে আমরা বুঝি না মানুষ হইতে, মানুষের বর্ত্তমান স্বভাব বা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা রহস্যময় কিছু কোথাও হইতে আনিয়া মানুষের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, অলক্ষিত, অতীন্দ্রিয় কিছুর দুর্ব্বিসহ গুরুভারে মানুষের বর্ত্তমানকে পিষ্ট করিয়া, তাহাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। আছে যাহা—তাহার সবখানি লইয়াই প্রতিষ্ঠা ও আরম্ভ। কি হইতে হইবে তাহার ইঙ্গিত সব এইখানেই। বর্ত্তমানের, আছের খেলাকে বন্ধ করিয়া দিলে ভবিষ্যতের দিকে ভগবানের সেই সহজ ইঙ্গিতকেই আমরা হারাইব।

গীতার "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" আমাদের বক্তব্যটিকেই প্রমাণিত করিতেছে। কর্ম্ম রাখিতে হইবে, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কোন ফল নাই। প্রকৃতির সকল প্রেরণার মধ্যেই জাগ্রত থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতির বাত্যাসঙ্কুল জীবনসমুদ্রে সুদক্ষ নাবিকের মত চলিতে হইবে। বিকর্ম্মের মধ্যে সত্যকর্ম্ম চিনিয়া লইয়া সত্যকর্ম্মী হইতে হইবে, কুটিল প্রেরণারই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলিয়া ঋতময় প্রেরণা বাহির করিতে হইবে, অসত্যকে, অজ্ঞানকে, কুটিলকেই সত্যে জ্ঞানে, ঋজুতায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্ম্মে এই কৌশলই সকল যোগ।

দুগ্ধ ত সর্ব্বদাই জলের সহিত মিশ্রিত, হংস কিন্তু জলটুকু পরিত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ আহরণ করে।

সন্ন্যাসীর যোগে নিরোধ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে আবশ্যক ইহা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে কর্ম্মযোগীর পক্ষেও ইহার যে প্রয়োজন নাই এরূপ নহে। সাধন অবস্থায় নিরোধের প্রয়োজন, সিদ্ধ হইলেই একমাত্র উহার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মযোগীও তাই প্রথমে বৈরাগ্য দ্বারা, নিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতির অশুদ্ধ খেলা হইতে মুক্ত হইবেন, মুক্ত হইবার পর শুদ্ধ প্রেরণা লইয়া তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই সহজ পন্থা—অন্যটি বিপদসঙ্কুল। প্রবৃত্তির খেলার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তাহার মধ্যেই অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধ, প্রাকৃত হইতে দৈব খুঁজিয়া লওয়া ও অশুদ্ধকে প্রাকৃতকে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধে দৈবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন, এমন কি আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। পিপাসিতের পক্ষে কর্দ্দমাক্ত জল হইতে কর্দ্দম বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ জল পান করা কতদূর সম্ভব? প্রবৃত্তি-তাড়িত অসহায় প্রাকৃত জন কি এই পিপাসিতেরই তুল্য নয়?

উত্তরে প্রথমে আমরা বলিব এতটুকু যাহার সাহস নাই যোগে তাহার অধিকার হয় নাই। পাপের ভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া যে কার্পণ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগে দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সেই মহা দোষটি দূর করিতে বলিয়াছেন। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ততোধিক ভগবানের শক্তিতে, তাঁহার নেতৃত্বে শ্রদ্ধা—ইহা হইতে যোগের আরম্ভ। কর্ম্মযোগী সকল কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ভগবানের আশ্বাস বাক্য, "অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। সন্ন্যাসী যোগ করেন নিজের জন্য, শুধু আপনার শক্তিবলে, তাই প্রতিপদে তাঁহার আশঙ্কা—পাছে শক্তিতে না কুলায়, পাছে মুক্তির ব্যাঘাত হয়। আমাদের সে আশঙ্কা সে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবানে সর্ব্বস্ব আমরা দিয়াছি, তিনিই আমাদের মধ্যে সাধক, ফলাফল তাঁহারই। তাই আমাদের সাহসের সীমা নাই, শক্তির পরিধি নাই। প্রবৃত্তির তরঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া সন্তরণ করিতে কোনই ইতস্ততঃ নাই। বস্তুতঃ কঠিন বলিয়া কোন কার্য্য হইতে যে ফিরিয়া চলিয়া আইসে তাহার কোন সহজ কর্ম্মই জুটে না। জগৎকে "কঠিন ঠাঁই" বলিয়া যে সন্ন্যাসী হয় তাহার সন্ন্যাসেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ।

প্রবৃত্তির খেলা কেন রাখিতে চাই সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়া আরও বলিবার আছে। জগৎ ত্যাগ করিয়া, সকল প্রেরণা দমন করিয়া

নিষ্ফল শান্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। সে মুক্তি লাভ করিয়া কর্ম্মের জন্য জগতে আবার ফিরিয়া আসিতে পারি। কিন্তু সে কর্ম্ম যে মুক্তির কর্ম্ম, ভাগবত প্রেরণার কর্ম্ম তাহার নিশ্চয়তা আছে কি? অন্তরে আমি মুক্ত হইয়াছি, পুরুষকে নির্লিপ্ত করিয়া পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি কিন্তু আধারকে প্রকৃতিকে ত মুক্ত করি নাই। প্রকৃতির বাহিরে আমি মুক্ত কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতির ভিতরেও কি মুক্ত হইব? প্রকৃতির সহিত যতক্ষণ নিঃসঙ্গ ততক্ষণই আমি শুদ্ধ মুক্ত কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আসিলে প্রকৃতি তাহার পূর্ব্বসংস্কার বশে তাহার গতানুগতিক ধর্ম্মকেই অনুসরণ করিয়া চলিবে। আমাদের উদ্দেশ্য প্রাক্তনক্ষয় মাত্র নহে—প্রাক্তনের মধ্যে সনাতন সমুচ্চ ধর্ম্ম যে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল খেলা, ক্ষয় নহে বিকাশই আমরা চাই। আধারের মুক্তি আধারের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব, আধারের অতীত হইয়া নয়। প্রতি কর্ম্মে, প্রতি প্রেরণায়, প্রতি চালনায় সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই প্রকৃতিকে সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত, পরিস্ফুট, শুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। স্থানুর মধ্যে যে মুক্তি তাহারই জোরে সচলের মধ্যেও যে মুক্তি পাইব, সচলকেও মুক্ত করিব ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। পঙ্কিল জলকে নির্ম্মল জল করা যায়, কিন্তু শূন্যতাকে কি করিয়া জলে পরিণত করিব? প্রাকৃত প্রেরণাকে ভাগবত প্রেরণায় পরিণত করা সহজ, কিন্তু প্রেরণার অবসান কি করিয়া প্রেরণার জন্ম দিবে? দেহাতিরিক্ত মুক্তি দেহকে কি করিয়া মুক্ত করিবে?

তারপর আমাদের যোগের উদ্দেশ্য প্রেরণার বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য। এই বৈচিত্র্য, এই ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠে খেলার মধ্য দিয়াই, সঞ্চালনার মধ্য দিয়া, প্রকৃতিকে তাহার সহজ গতি প্রবাহে ছাড়িয়া দিয়া। নিরোধের দ্বারা বৃত্তিসকল স্বভাবতঃই ক্ষীণ পঙ্গু হইয়া পড়ে, তাহাদের শতধারা উৎস শুকাইয়া যায়, প্রতিভার নবনবোন্মেষ আর হয় না। বৃত্তির নিত্য নবোন্মেষ স্বতঃই ত চলিয়াছে অন্তর্যামী ভগবানের ইষণায়, তাঁহারই বিভূতি জাগ্রতে প্রতিষ্ঠিত করা উহার লক্ষ্য। কৈবল্যমুক্তিপ্রয়াসীর কাছে এ সকলের কোন মূল্য নাই কারণ তিনি চাহেন শুধু এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাঁহার পথে চলা আমাদের পক্ষে মহা ভুল।

অত্র যাহা, তাহা অমুত্রেরই প্রতিনিধি। এখানে যাহা আছে তাহা সেখানেও আছে, এখানে যাহা নাই তাহা সেখানেও নাই কোথাও নাই। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ। আমাদের যোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। এখানে যাহার প্রকাশ তাহাকে অস্বীকার বা নিগ্রহ করিয়া নয়, তাহাকে স্বীকার করিয়া,

তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, তাহার সাহায্যেই অন্যত্রকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে বৃত্তি, যে প্রেরণাই আমার থাকুক না তাহা শূন্যে ঝুলিয়া নাই, তাহার মূল সত্যলোকে, ভগবানের মধ্যে, তাহার প্রত্যেকটিরই ভাগবত অর্থ, সার্থকতা, পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। সৃষ্টি ভগবানের অভাবাত্মক রূপ নহে, উহার মধ্যেই তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, উহার মধ্য দিয়াই তিনি বিকাশে বিকাশে নিজের কাছে নিজে গোচরীভূত হইয়া চলিতেছেন। তাই তন্ত্রের বীরসাধকের মত আমরা জানি ভোগই যোগস্বরূপ, সংসারই মোক্ষস্বরূপ—

ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ —॥

যোগ।

(৭)

এইবার মনের কথা বলিব। যোগগ্রহণাভিলাষী সাধককে অন্তরস্থিত এই সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিকে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। মন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকিলেও ইহা অবধারিত যে মনই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রির। শাস্ত্রকারগণ মনকেও একটী ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন এই উভয় ইন্দ্রিয়াবলীর পশ্চাতে লাগিয়া না থাকিলে কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম কিছুই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয় না। সেইজন্য মনকে বিশুদ্ধ করিয়া না তুলিলে আমাদের দ্বারা ভগবদ্‌কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সুদূরপরাহত।

সাধকের ভিতর জ্ঞান প্রকাশ হইলেই, শক্তি মানসে অবতরণ করেন। শক্তিসাধকের ইহাই তৃতীয় অবস্থা। প্রথম কালীশক্তিকে আবাহন, এবং তাঁহার উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণের সঙ্কল্প। দ্বিতীয় কালীশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা

জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ। তৃতীয় বুদ্ধি ও মানসের অশুদ্ধতা দূর করিয়া, উহাদিগের স্থলে জ্ঞানকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলা।

পূর্ব্ব প্রকাশিত দুইটী পরিচ্ছেদে জ্ঞান প্রকাশের লক্ষণ, প্রণালী প্রভৃতির কথা যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে মানস সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা পূর্ব্বে সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম—যথা, (১) ইচ্ছাশক্তি, (২) জ্ঞান, (৩) বিচারবুদ্ধি, বোধশক্তি, (৪) মানস। (প্রবর্ত্তক, দ্বাদশ সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এস্থলে মানস এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধি হইতে মানস ভিন্ন হইলেও, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্ত্তমান। মানুষ যদি কেবল যুক্তি, তর্ক, স্মৃতি, কল্পনা, অনুমান প্রভৃতির অধীন হইত, তবে সহজেই এগুলি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া উচ্চ জ্ঞানকে আশ্রয় করিতে পারিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যে কল্পনামন্দিরে মনেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে; সেই-জন্য মনকে বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে বুদ্ধিরও সম্যক্ শুদ্ধি অসম্ভব। সাধনকালে মন এবং বুদ্ধিকে স্বতন্ত্রভাবে না ধরিয়া একই সূত্রে বদ্ধ এরূপ ধারণা করিতে হইবে।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই লইয়াই অন্তঃকরণ। পূর্ব্বে মস্তিষ্ককে তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিভাগে উচ্চবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের স্থান দিয়াছি। তন্নিম্ন স্তরদ্বয়—বিচারবুদ্ধি এবং বোধশক্তি—এই দুইটীই বুদ্ধি নামে অভিহিত। এই বুদ্ধি, হৃৎপদ্মস্থিত মন, তন্নিম্ন স্তরে চিত্ত এবং এই তিনটীকেই ব্যাপ্ত করিয়া যে অহঙ্কার—ইহারা একই সূক্ষ্মবস্তুর চতুর্বিধ বৃত্তি বা তরঙ্গ মাত্র। শাস্ত্রকারগণ কখনও কখনও এই সমষ্টিবস্তুকেই মন এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাঠক শব্দের গোলযোগে পতিত হইবেন না—আমরা এই প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যে মন অন্তঃকরণসমষ্টির দ্বিতীয় স্তর, তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

এক্ষণে মনের বিশেষ কার্য্যাদি প্রণিধান করিতে পারিলেই বিষয়টী অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এইগুলি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, মন তখনি ঐ গুলিকে ধারণা করিয়া লয়। সুতরাং কোন বাহ্যবস্তু সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করিবার এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুকে স্পর্শ করিবা-

মাত্র, তদ্বিষয়ক একটা অস্পষ্ট অভিজ্ঞা মনে উপনীত হয়—এরূপ অবস্থায় গৃহীত প্রতিবিম্ব মন হইতে নিরাকৃত হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন যখন গৃহীত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বোধ করে, অনুভব করে, ইহা এই, উহা এই, এইরূপ নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লয়—তখন বস্তুর যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান—উহা জন্ম জন্মান্তরেও সহজে দূর হইবার নহে।

অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না, কোন দ্রব্য নিকটবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়গণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; মন কিন্তু ত্রিকালবিহারী, সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল বিষয়েই বিচরণ করে। অন্তঃকরণ যদি স্তব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াশক্তি লোপ পাইতে পারে, কিন্তু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বিনষ্ট হইলে মনের ক্রিয়া ধ্বংস হয় না। মন, কল্পনার চক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া এক বিচিত্র সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বসিতে পারে। চক্ষু দর্শনশক্তি সম্পন্ন, শ্রুতি শ্রবণ করিবে, এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয় প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, কেহই একাধিক শক্তিসম্পন্ন নয়, মন কিন্তু এককালে সর্ব্ব-রস উপভোগ করে। সপ্তবর্ণ সংযোগে যেমন বিচিত্র বর্ণ অঙ্কিত হয়, একবর্ণে কোন আলেখ্যই নয়নরঞ্জন হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ শক্তি থাকায় উহারা বৈচিত্র্যবিহীন; মন কিন্তু কোন্ পুরাকালে বাল্মিকীর তপোবনে গৈরিক বসনাবৃত লবকুশ বীণাযন্ত্রে রাম গুণ গান করিয়াছিল—পবিত্র তপঃ-ক্ষেত্রের হরিতকী, আমলকী বৃক্ষের পত্রাবলী কেমন হরিত, নীল, পীতবর্ণে সুশোভিত ছিল, তপোবনের পদতল বিধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া স্রোতঃস্বিনী রজত ধারার মত প্রবাহিত হইত, সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের আনন্দ কল-রব, বনচর বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কুজন—এইসব এককালে শ্রবণ, দর্শন কার্য্য সমাহিত হইয়া উপভোগ করিতে পারে। মনের কল্পনাশক্তি অসাধারণ। চক্ষু, যখন যে দৃশ্য সম্মুখে সমাগত হয়, উহারই প্রতিচ্ছবি মনকে প্রদান করে, মন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য লইয়া এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব চিত্র রচনা করিয়া আপনাপনি আনন্দ সৃষ্টি করিয়া কতকাল যে বিভোর থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

একটী দেবদূত কল্পনা করিবামাত্র তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল প্রভৃতি যতগুলি সুরূপের লক্ষণ, সব একত্র সমাবেশ করিয়া এক মনুষ্যমূর্ত্তি রচনা করি, পরে উহার দুইদিকে দুইটী সুদর্শন বিহঙ্গমপক্ষ যোজনা করিয়া, যাহা দেখি নাই, তাহারই চিত্র আঁকিয়া বসি। এইরূপ সমুদ্র তরঙ্গের মত ইন্দ্রিয়গণের

কার্য্যাবলী বন্ধ করিলেও মনের কল্পনালহরী অবিরত চলিতে থাকে।

মন সর্বজ্ঞাস্তা ; আকাশের ঘনঘটা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারে বৃষ্টি হইবে কি না, ধূম দেখিয়া উহার নিম্নে অগ্নি আছে একথা শপথ করিয়া বলিয়া দিবে—যদিও অনেক সময়ে মেঘ কাটিয়া যায়, বৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগে ধূমের সৃষ্টি হয়, তাহার তলে মনের অনুমিত অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। সহস্র স্থলে বোকা হইয়া গেলেও যাহা সে এতদিন ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক অনুভব করিয়া আসিয়াছে, তাহারবলেই সে ত সব বলিয়া দিবে, তারপর তাহা সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক।

মনের যে কল্পনা তাহা ঐন্দ্রিয়িক। ইন্দ্রিয়গণের স্পর্শন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির শৃঙ্খলাই মনের চিন্তা। এমন কি আমারা যখন প্রেম, সাহস, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলির কথা মনে করি, অমনি আমাদের চৈতন্যের কথা মনে পড়ে, রাণা প্রতাপ, শঙ্কর, বুদ্ধ প্রভৃতির ধারণাই জাগিয়া উঠে। যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি তাহারই ধারণা মন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কল্পনা মনের অধিগম্য নহে।

অনেকেই বলেন, মনই চিন্তা করে ; কিন্তু ইহা সত্য নহে। মন ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক নীত বিষয় গ্রহণ করে, এবং ঐ বিষয়েরই আলোচনা করে। তবে বুদ্ধি হইতে চিন্তার তরঙ্গগুলি যখন চিত্তে অবতরণ করে, তখন মন ঐ গুলিকে ধরিয়া লইয়া তাহার ঐন্দ্রিয়িক কল্পনায় উহাদিগকে অনুরঞ্জিত চিত্রবিচিত্র করিয়া তুলে।

মানুষের বুদ্ধিই চিন্তাযন্ত্র। মন, ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে যাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হয় বুদ্ধি তাহাতে সফলকাম হইতে পারে। এইজন্য কোনও কোনও পাশ্চাত্য মতে, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে যুক্তির সাহায্যে শৃঙ্খলাবিধানই যে বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেটা প্রকৃতপক্ষে একটা গুরুতর ভ্রম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এইরূপ ঐন্দ্রিয়িক চিন্তা মনেরই কার্য্য। পশুর চিন্তা মনের অধীন—যে চিত্র, যে শব্দ সে অনুভব করিয়াছে, তাহারই বিষয় সে ভাবিতে, কল্পন করিতে পারে। মানুষের বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চতরস্তরের। বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ম্। যোগসাধনার দ্বারা মানুষ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে কোনও বস্তুর সম্বন্ধে যাহা সে কখনও দেখে নাই, জানে নাই, সে বিষয় বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য হইতেছে। চিন্তা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বাদীর ধারণাটি যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা ইহ দ্বারাই যথেষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে। তাহার উক্ত ধারণা প্রকৃতপক্ষে কেবল মনের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

মনের অশুদ্ধতা—সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তদ্বিষয়ে যে ভাব গ্রহণ করে উ

বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেয়। সাধারণ স্থলে মনই বুদ্ধিকে পরিচালিত করে, বুদ্ধির উপর হইতে সত্যধর্ম্ম লাভ করিলেও মনের এই অশুদ্ধ কর্তৃত্বনিবন্ধন উহা বিকৃত-ভাবে প্রকাশ পায়।

আবার মনের যে সকল কল্পনা, উহা যে কেবল বাহ্যজগতের দর্শন স্পর্শন জনিত এরূপ নহে; পরন্তু মন বুদ্ধির চিন্তা ও চিত্তের অতীত স্মৃতিগুলিকে লুফিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক উহাদের মীমাংসা করিয়া লইতে যায়। এইজন্য যাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য অল্প তাহারা সর্ব্বতোভাবে মনেরই অধীন হইয়া পড়ে। মনের যুক্তি—যে সে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে উহাই অবধারিত। বালক বা অপরিণত মস্তিষ্ক ব্যক্তি 'আমি ইহা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া আসিলাম', এইটুকু বলিয়াই কোনও বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তিতর্ক নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে এইরূপ মনে করে। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে সে সর্ব্বদাই অস্বীকার করিয়া থাকে।

সাধারণ মনের অবস্থাগুলিকে সংক্ষেপে ধারণা করা যাউক —প্রথমতঃ, সে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নীত বাহ্য-স্পর্শগুলি (Sensation) সম্বন্ধে অভিজ্ঞা গ্রহণ (percept) করে; তৎপরে উহাদের ধারণা করিতে গিয়া ইহা এই, উহা এই প্রভৃতি প্রকারের মন্তব্য সৃষ্টি করিয়া লয়—ভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে নামাঙ্কিত করিয়া লয়(Concept); দ্বিতীয়ত বুদ্ধিরযে চিন্তা এবং চিত্ত-ভাণ্ডারের যে পূর্ব্ব স্মৃতিরাশি, ঐগুলিকে লইয়া অনবরত ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে মিলাইয়া লয়—যাহা বাহ্যজগতের জ্ঞানের সঙ্গে মিলে না উহা অসত্য, এইরূপ হেতুবাদ করিয়া পরিত্যাগ করে।

এক্ষণে এই মন লইয়া যোগী কি করিবে? প্রথমেই মনকে প্রশান্ত করিতে হইবে, মনের অবিচ্ছেদ তরঙ্গভঙ্গী দমিত করিতে হইবে—মানস চঞ্চল থাকিলে জ্ঞানের ছিটা ফোঁটা পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। শান্তমনই যোগীর সাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক।

কিন্তু মন যাহা ধারণা করিয়াছে, মন যেটুকু চিন্তা করে, সে গুলিকে না হয় মুছিয়া দিলে; প্রত্যুত ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত বিষয়স্পর্শে মনের যে তাণ্ডব নৃত্য উহা নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া? আমরা ত ইন্দ্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সমাধির দ্বারা মনকে সর্ব্বতোভাবে শান্ত করা যায়, এইজন্যই বৈদান্তিকগণ সমাধির উপর অধিকতর অনুরাগী—এই উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনের নিরন্তর নৃত্য বন্ধ করা যায়।

কিন্তু যদি তুমি সমাধির দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিতে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে

সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে—সর্ব্বসঙ্গ বিরহিত হইয়া অরণ্যবাসী হইতে হইবে—জগৎ এবং জগদীশ্বর এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট পূর্ণচ্ছেদ নিক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই কি সত্য, স্বাভাবিক? স্বভাবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অস্বাভাবিক দুর্গমপথে যোগারোহণ করা যোগীর কর্ত্তব্য নহে, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে ভেদ না দেখিয়াই আমাদের সাধন প্রবর্ত্তন করা বিধেয়।

সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান যুগে তন্ত্রই মহৎ পথ। তান্ত্রিকেরা জানেন, সমাধি মন স্থির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায় নহে। তান্ত্রিক তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, যাহাতে তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, ভ্রমন, আহার, নিদ্রা, কিছুই নিরুদ্ধ করিতে হয় না, সকল কার্য্যই সুচারু-রূপে সম্পন্ন করেন। বিস্ময়ের কথা বটে, পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সকল কার্য্য যথারীতি করিতে থাকিব অথচ মন স্থির হইবে কেমন করিয়া? উত্তর এই, তান্ত্রিক যে কেবল তাঁহার মনকে দৃঢ়মূল ধারণা, ঐন্দ্রিয়িক কল্পনা প্রভৃতি কার্য্যতৎপরতা হইতে মুক্ত করেন তাহা নহে অধিকন্তু মনের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গ্রহণকারী কর্ম্মশীলতা, উহাও বুদ্ধির নিকট স্থানান্তরিত করেন।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাউক। যোগী দেখেন, শুনেন, আঘ্রাণ করেন, আস্বাদ করেন, স্পর্শ করেন মন দিয়া নয়, বুদ্ধিসংস্থিত ইন্দ্রিয়-শক্তি দিয়া, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবাধে জগতের সর্ব্ববিষয়ে সঞ্চরণ করিবে—মনের পরিবর্ত্তে জ্ঞানোদ্ভাসিত বুদ্ধি উহা গ্রহণ করিবে মাত্র। এইরূপ হইতে থাকিলে তুমি তোমার জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবে—পূর্ব্বা-পেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি তোমার নিকট সুন্দরতর, সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিবে; উহাদের অতি সূক্ষ্মাংশ পর্য্যন্ত তোমার লক্ষীভূত হইবে; বস্তুগুলি এক দিব্য সত্তা-সত্তা লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। বুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে সারথীরূপে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তুমি যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে, উহা কি সুন্দর, কি সুমধুর, এক কথায়, পূর্ব্বে এরূপভাবে দেখ নাই, শ্রবণ কর নাই। একটি পত্রের উজ্জ্বল বর্ণে, একটি ফুলের মধুর সৌরভে, একটি পাখীর কলকাকলীতে তুমি যে আনন্দ, যে রস আস্বাদ করিবে-উহা পৃথিবীর নহে, স্বর্গের। তখন তুমি বুঝিবে এ পৃথিবী হইতে কোথায় যাইব—এইখানেই যে লীলাময় ভগবান্ বিহার করিতেছেন—এইখানেই যে আমার আরাধ্য, আমার চিরবাঞ্ছিত দিব্য রত্ন আমারই সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছেন—তখন তুমি দেখিবে তোমার ইন্দ্রিয়গণ অবাধ মুক্ত, এই মুক্ত ইন্দ্রিয়পথে পার্থিব সকল বস্তুর প্রতিকৃতির মধ্যে বিশ্বাত্মার যে

গুণ, যে আনন্দ, যে বিকাশ বর্ত্তমান উহা দেখিয়া ধন্য হইবে। এই যে বুদ্ধিস্থিত ইন্দ্রিয়ের নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌম শক্তি, ইহা যোগপথের প্রাকাম্য নামক খণ্ডসিদ্ধিরই অন্তর্গত। যোগ যখন পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবে, তখন দেখিবে মন আর বিরক্তির কারণ নহে, ইহা একটী মুক্ত দ্বার বিশেষ, ইহারই ভিতর দিয়া বুদ্ধি চিত্তের নিকট সমাচার প্রেরণ করিতেছে, এই সমাচার লুঠিয়া লইবার অসুর আর মনের মধ্যে নাই—মন শান্ত, ধীরভাবে আপনার উপর দিয়া সেতুরূপে উহা বহন করিতেছে মাত্র।

এইরূপে মনকে স্থির করিবার বহুবিধ উপায় বিদ্যমান—কিন্তু সে সকলেরই এই দোষটি দেখা যায়—তদ্দ্বারা মনের যে অংশ বুদ্ধির কার্য্যানুসরণ করিয়া চিন্তা করে, উহাকে বন্ধ করিলেও উহার অববোধশক্তি থাকিয়া যায় অর্থাৎ মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রভূরূপে দেখিতে শুনিতে থাকে, এইজন্য মন প্রকৃষ্টরূপে স্থির হয় না, যোগ সাধনার সম্যক্ ক্ষতি করিতে থাকে।

আত্মসমর্পণযোগে, কালীশক্তির দ্বারাই এককালে জ্ঞানকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং মনকে স্থির করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে দুইটী সুবিধা ভোগ করা যায়। প্রথমতঃ গতানুগতিক প্রথার মত তোমার মনকে খালি করিতে হইবে না। যদিও এইরূপ করিতে পারিলে খুব ভাল কিন্তু ইহা অতীব কঠোর ও কষ্টসাধ্য তপস্যা। তুমি সহজেই ধীরে ধীরে তোমার বুদ্ধিটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে—জ্ঞানালোকে বুদ্ধির চিন্তাকারী শক্তিকে খর্ব্ব না করিয়া উহাকে উচ্চচিন্তামুখী করিয়া দিবে—তাহা হইলেই উহার ক্ষুদ্রতা এবং সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া উহা দেবস্বরূপ হইবে। এবং মনের কার্য্যরোধ না করিয়া উহাকে বুদ্ধিগত, বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিয়াই উহাকে শুদ্ধ করিবে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণকারী শক্তিকে ধ্বংস না করিয়া প্রাকাম্য শক্তিরই ক্রিয়াশীলতা তৎস্থলে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সুষুপ্তির মধ্যে না থাকিলে বিষয়স্পর্শ বন্ধ হয় না—চিন্তাধারা রুদ্ধ করিতে পার কিন্তু কেবল চিন্তাশূন্য হইলেই মন স্থির হয় না। জ্ঞানপ্রকাশ না করিলে মনের এই অনধিকার চর্চ্চা, এই যোগপ্রতিবন্ধকতার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে? জ্ঞানউদ্দীপিত হইলেই মন নিস্তরঙ্গ হইবে—কেন না জ্ঞানালোকেই সাধক দেখিবে, স্বাভাবিক বিষয়-প্রতীতিগুলি বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই প্রাকাম্য প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শক্তি।

একি বিপ্লব, একি পরিবর্ত্তন, একি বিপুল আলোড়ন! এ কোন্ অভাবনীয় যুগের মধ্য দিয়া জগৎ খানা আজ চলিয়াছে! প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে, চকিতা দামিনীর চপল নৃত্যের মধ্যে ঘোর রোলে অশনি-গর্জ্জন, দারুণ ঝটিকার পর ঝটিকা ঝাপট, কড় কড় করাল কড়কাপাতের কর্ণবিদারক ধ্বনি—এইরূপ এককালে সহস্র শব্দে মুখরিতা অমাবস্যার কাল-রজনীর মত এ কোন্ প্রলয়-যুগ আজ এই মর্ত্যজগতে অবতরন করিয়া—বিশ্ববাসী মানবকে ভীত, চকিত, বিহ্বল, ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

তবুও, এই আবার ভাবিবার দিনও বটে। এই প্রলয়যুগ, এই শ্মশানকালীর তাণ্ডবনর্ত্তনের যুগ, এই বিক্ষোভের, বিলোড়নের, পরিবর্ত্তনের কাল—ইহাই আবার ধ্যানের দিন, ভাবুকের ভাবনার দিন, কর্ম্মীর ক্ষণিক কর্ম্মবিরতি করিয়া আদর্শের সহিত নিগূঢ়তর পরিচয়ের দিন। সাধকের পক্ষে এমন যুগও তাই মহানন্দের—কারণ ভাবনার সুযোগ্য প্রসারতা ঘটে, গভীর ধ্যানের প্রকৃষ্ট অবসর মিলে এমনি সুযোগেই—ভাবসাধনার, গীতোক্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের যে উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ ইহাই!

তাই বুঝি আজ করুণাময় বিধাতা বাঙ্গালীকে ডাকিতেছেন—তাঁহার সাধের তাঁহার চির-আদরের, চির প্রিয় এই জাতিকে নানা ক্ষেত্রে, নানা কণ্ঠে, নানা প্রকারে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"আজ তিষ্ঠ, আজ উপবিষ্ট হও ধ্যানাসনে, আজ হৃদয়ের রাজসিক উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া, বুদ্ধির হিরণ্ময় কল্পনাজাল অপসারিত করিয়া এই যে অন্তরের গুহার মধ্যে আমি সত্য সত্যই আছি, এস আমার কাছে, আমার কোলে, আমারই সহিত গভীরতর সম্মিলনে। অন্ধকারে পথ দেখাইব সে ত আমিই—সমস্ত দুর্ব্বলতা সরাইয়া শক্তি দিব সে ত আমিই—জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে মণ্ডিত করিয়া আমিই যে তোমাকে ভবিষ্য দেবজীবনের প্রবর্ত্তক, দেবজাতিতে পরিণত করিতেই চাহিতেছি, উদ্যোগ করিতেছি! এস শান্ত, সংযত, সমাহিত হইয়া আজ বুঝ আমার দিব্য ইঙ্গিত, এস

হয়. আজ সেই মহাভাব, সেই মহাশক্তিও তেমনি আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন---আর জগন্ময় এই যে ঘোর পরিবর্ত্তন, উহা স্তব্ধ নিভৃত কোন্ জগদ্-কেন্দ্রে বিরাটের সেই আত্মশোধনেরই অভিজ্ঞনা মাত্র।

ছোট কথা।

সাধনার পথে অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। এই বিঘ্নগুলি মুক্ত হইয়া সাধক ধীরে ধীরে দেবত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইবেন। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য, আত্মসমর্পণযোগী ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই সাধনার অনুকূল পন্থা অবলম্বন করিবেন।

* * *

সংসারে দুঃখ অনেক। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের প্রবল তাড়না সহ্য করিতে করিতেই মানুষের জীবন কাটিয়া যায়। দুঃখকে অতিক্রম করিবার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়—এই ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিবর্দ্দ যেমন গুরুভার বহন করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমরা সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। এক প্রকার দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনে করিলাম এইবার নিশ্চিন্ত-মনে ভগবানের নাম করিব—আবার এক প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ফলে এ সংসারে দুঃখের অভাব হয় না। সাধক কালীশক্তির কৃপায়, দুঃখকে মাথায় করিয়া স্বচ্ছন্দে সাধনপথে অগ্রসর হয়—দুঃখের আক্রমনে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, জ্ঞানের যাদুমন্ত্রে উহাকে নির্বীর্য্য করিয়া ফেলে, দুঃখ তখন সাধকের পদতলে পড়িয়া থাকে।

* * *

অহংকারী জীবের বাসনা অতীব প্রবল। কোটীজন্ম বাসনার বেড়াজালে জড়াইয়া মরিবে, তত্রাচ মুক্তির চিন্তা কিছুতেই করিবে না। ভগবান্ কিন্তু বড় দয়াময়, তাই মানুষের ইচ্ছা সতত নিষ্ফল করেন। যোগী জ্ঞাননেত্রে ইহার মধ্যে শ্রীভগবানের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া পুলকিত হয়েন; সাধারণ জীব ইচ্ছার ব্যাঘাতে দারুণ মনঃকষ্ট লাভ করে। সাধক আপনার ইচ্ছা—শ্রীভগবানে—সমর্পণ-পূর্ব্বক এই অলীক মনঃক্ষোভ অনায়াসেই দূর করিতে পারিবেন।

* * *

চিত্ত অবিমল বলিয়া জীবের অহঙ্কার আছে। সে নিজের সুখে যতটা সুখী, নিজের দুঃখে যতটা দুঃখী অপরের সুখে দুঃখে সেরূপ বোধ করিতে পারে না। মেয়েরা বলে "নিজের ল্যাজে পা পড়লে কঁ্যাক করে উঠে, পরের ল্যাজে পা পড়লে তুলা হেন ঠেকে" ইহাই আত্মম্ভরী লোকের কথা। সাধক জ্ঞানচক্ষে দেখেন—"মা বিরাজে সর্ব্বঘটে" সেইজন্য সর্ব্বজীবের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন। সাধক ভোগ করেন নিজের জন্য নয়, সর্ব্বভূতের জন্য। প্রতিবাসী ধনবান্ হইলে সাধক নিজেই ধনবান্ হইয়াছেন এইরূপ মনে করেন—ঈর্ষানলে জ্বলিয়া মরেন না। আবার দেশবাসীর কষ্ট, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন দেখিয়া তিনি আপনার বুকেই আঘাত পড়িতেছে উপলব্ধি করেন—নিজে সুখে নিরাপদে আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত উদাসীন চিত্তে কালযাপন করিতে পারেন না।

* * *

বদ্ধজীব সহস্র পাপে লিপ্ত তত্রাচ অন্য কোনও নামজাদা পাপীকে দেখিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে। আবার কেহ কোনও সৎকার্য্য করিতেছে দেখিলেও তাহার কোষ্ঠীপত্র বাহির করিয়া তাহার বংশের দোষ পর্য্যন্ত দেখাইতে ত্রুটী করে না। সাধক পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না—পুণ্য কর্ম্ম করিবার যাহার প্রবৃত্তি আছে তাহার প্রতি অবিচলিত প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক বরং তাহার কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

* * *

মোট কথা—আত্মসমর্পণযোগী দুঃখের তাড়নায় উৎকণ্ঠিত হইবেন না—যেমন স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"Face the danger and the danger will be over. বিপদকে বরণ করিয়া লইবার সাহস হইলেই, বিপদের ভীষণতা দূর হইবে—বিপদ ভগবানের আশীর্ব্বাদ, মুক্তির সহায়করূপে পরিণত হইবে। সাধক স্বীয় প্রবল বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না দেখিয়া মনঃক্ষোভ করিবেন না। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে মনস্থৈর্য্যের বিলোপ যেন না হয়। অনেকেই সামান্য কার্য্যাদিতে যেরূপ দ্রুত অঙ্গসঞ্চালনাদি করেন, যে তাহাকে দেখিলেই মনে হয় ইহার চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে—সাধকের শ্বাস প্রশ্বাসও ধীরে মন্থরে প্রবাহিত হইবে—সমাহিত চিত্তের ইহাই লক্ষণ।

দেশের সুখে সুখী, দেশের দুঃখে দুঃখী হইলেই বুঝিবে চিত্ত নির্ম্মল হইতেছে—ভগবানের প্রিয় সন্তান হইতে তোমার আর বিলম্ব নাই। দেশ যখন অন্নকষ্টে, রোগ যন্ত্রনায়, বিপদের দারুণ বোঝা বহিয়া ক্লিষ্ট, বিপর্য্যস্ত তাহার জন্য নীরবে অশ্রুপাত করিও—তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও—তাহার সহায়তা করিতে প্রাণ পণ করিয়া ছুটিয়া যাইও। আবার দেশ যখন ধনে জনে গৌরবে হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, উৎসাহময়ী হইবেন—তখন হাস্যে, আনন্দ, উৎসাহে নিজের অন্তরকেও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিও। এ যুগে, ইহাই ধর্ম্মসাধনার সহজ পথ। এইরূপ চরিত্রই আত্মসমর্পণযোগের অধিকারী। আমরা ইহাদিগকেই আহ্বান করিতেছি। বঙ্গের ইহারাই সুসন্তান।

—o—

বঙ্গেস্ত্রী-শিক্ষা।

গত যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনীতে বিদুষী রমণীগণের আসন হইবে শুনিয়া, কলিকাতার নায়ক এবং বসুমতী পত্রিকায় উহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়; বাঁকিপুরে আগামী সাম্মিলনীতে স্বতন্ত্রভাবে অথবা একসঙ্গেই রমণীসভ্যের স্থানের জন্য আন্দোলন চলিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়—বঙ্গরমণীগণ সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিতেছেন, এতদ্ব্যতীত মাসিক পত্রিকাগুলিতে অনেক বঙ্গমহিলার

সুললিত প্রবন্ধ, সরস উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালীর সকল দিকেই উন্নতি স্রোতঃ দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও অনেক বঙ্গরমণী উপাধি লাভ করিতেছেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডেও একজন (Tripos) পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, কলিকাতার উচ্চ আদালতে ওকালতী করিবার জন্যও একজন বঙ্গমহিলা আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমাদের আশা নিতান্ত অমূলক নহে।

বঙ্গীয় রমণীগণের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র বেথুন কলেজ; এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয় আছে—স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীগণের উদ্যমে আরও অনেক শিক্ষাকেন্দ্রের সৃষ্টি হইতেছে, এইসকল স্থান হইতেই কিছু না কিছু বাঙ্গালীর মেয়েরা নিশ্চয় শিক্ষা লাভ করিবে। তদ্ভিন্ন, ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয় এবং এইরূপ আরও অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় হইতেও শিক্ষিত জনকজননীর আনুকূল্যে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা অচিরে শিক্ষিত রমণীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে—সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে বিস্তৃত বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে এবং জগতের অপরাপর দেশের তুলনায় বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার যে চেষ্টা এবং যে সাফল্য উহা অতি অকিঞ্চিৎকরই বলিতে হইবে। তথাপি বঙ্গললনাগণের মধ্যে লেখা পড়া শিখিবার যে প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভদ্র পরিবার মণ্ডলীর মধ্যে অশিক্ষিতা রমণী নাও থাকিতে পারে।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে যে সকল বঙ্গরমণী শিক্ষিতা বলিয়া পরিচয় দেন—উহাদের অনেক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কেন না, বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার ত একটী মূল নহে, স্বতন্ত্র মূল হইতে স্বতন্ত্র ভাবের রস সংগ্রহ করিয়া বহু প্রকারের শিক্ষা বঙ্গীয় রমণীসমাজে দেখা দিয়াছে। অবশ্যই বাঙ্গালী খৃষ্টান ব্রাহ্ম, হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়কেই আমরা বঙ্গরমণী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। উচ্চ শিক্ষা বলিতে আধুনিক ক্ষেত্রে যাহা বুঝায় তাহা প্রায় খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজেই গণ্ডীবদ্ধ। ক্যাম্বেলে পাশ করা ধাত্রীলক্ষ্মীগণও বাঙ্গালী—তবে উহাদের মধ্যে অনেকেই হয় ব্রাহ্ম না হয় খৃষ্টান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণীগণও উক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নতুবা কোনও ব্রাহ্ম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গৃহলক্ষ্মী। ফলে বিশাল হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরে এই সকল শিক্ষিতা রমণীগণের কোনই অধিকার নাই—তবে মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়া ইহাদের কল্পিত আদর্শগুলি অন্তঃপুরে কুললক্ষ্মীগণের দৃষ্টিতে পড়ে বটে, কিন্তু

মুহুরা—কুটুম্বের সঙ্গে কলহ বাধাইতে, বৈরাগ্যপরায়ণ পলাতক স্বামীকে বাঁধিয়া আনিতে, বিবাহ বাসরে রস জমাইতে এবং অনেক সামাজিক দুষ্কৃতি সংঘটন করিতে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত—এখানে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। আশা, বাংলার উচ্চশিক্ষিতা রমণীকুলের উপর; কিন্তু ইঁহারা স্বভাবতঃই বঙ্গরমণীসমাজের এতটা বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন—যে ভবিষ্যতে বঙ্গীয় লাট-মজলিসে সদস্য পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান ছাড়া ইঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও পারি না। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকে ইঁহাদেরই প্রকাশ্য সভায় যোগ-দান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন—আহা, উদ্দেশ্য সফল হউক! আর কিছু না হউক ভবিষ্যতে প্রাদেশিক সভাসমিতেতে এমন কি কংগ্রেস-সভার সভাপতির আসন পুরুষের অপেক্ষা ইঁহারা জমাইতে পারিবেন, কেননা আধুনিক পুরুষের অপেক্ষা ইহঁাদের হৃদয়ের বল আছে, সাহস আছে, সরলতা আছে—অনেক পুরু-ষের কার্য্য ইহঁাদের দ্বারা অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে—সাহিত্যসভা-হইতেই এ কার্য্য আরম্ভ করিলে মন্দ হইবে না।

এক্ষণে ভাবনার কথা, এই এতদিন ধরিয়া নানাভাবে, নানাজনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন চলিল, তাহার ফল কি হইল? কয়েকজন উপাধিধারিণীর সংখ্যা অবশ্যই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—প্রাচীনাদেব অপেক্ষা নবীনারা সমধিক সভ্য হইয়াছেন—মাসিক পত্রাদিতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে—কিন্তু এইজন্যই কি বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষার আব-শ্যক হইয়াছিল! কালে, সাহিত্যসভা ব্যতীত আরও বড় বড় প্রকাশ্য সভায় বঙ্গ-রমণীগণকে প্রবন্ধ পড়িতে বা বক্তৃতা দিতে শুনিব, এরূপও আশা করি—কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালী জাতির কি উন্নতি হইবে, ইহা কি ভাবনার কথা নহে? শুনিতে

পাই, তপস্বিনী মাতাজীর পাঠশালার ইতিমধ্যেই দুর্দ্দশার লক্ষণ দেখা দিয়াছে—বেলুড়মঠের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের আন্তরিক অনুরাগের ফলেই নিবেদিতার বিদ্যালয় বিদ্যমান রহিয়াছে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উৎসাহ না পাইলে দেশীয়ভাবের বিদ্যালয়গুলি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ-লোকের উদাসীনতা ইহার উপায় কি? যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের পক্ষপাতী তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা সমস্যার কথা।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যধরণের উচ্চশিক্ষা ধীরে ধীরে সম্ভ্রান্ত হিন্দু অন্তঃপুর মহিলার মধ্যেও প্রসারিত হইতেছে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—এই বি এ এম এ উপাধিধারিণী বঙ্গরমণীগণ যেরূপ শিক্ষালাভ করিতেছেন, উহা দেশের নহে,—সেইজন্য আমাদের জাতীয়জীবনের উন্নতিপথের ইহাঁরা পরিপন্থী হইবেনই —যদিও ইহাঁদের মধ্যে অনেকেরই জীবন প্রকৃত শুভ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত, কিন্তু হইলে কি হইবে, হিন্দুর যে সনাতন বিশেষত্ব, ইহা হইতে ইহাঁরা বঞ্চিত বলিয়াই শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়া ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব নহে। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্পে ভগ্নী নিবেদিতাকে খাঁটী হিন্দু হইতে হইয়াছিল—আর বর্ত্তমানক্ষেত্রে হিন্দুললনাগণ বিবি সাজিয়া দেশের আদর্শ গড়িতে অগ্রসর হইতেছেন—ইহাকে একটা কপট অভিনয় ছাড়া আর কি বলিব?

ভগ্নী নিবেদিতার জীবনচরিত এবং তাঁহার রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিলেই দেখা যায় যিনি যে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ক্ষেত্রের উপযোগিনী হইবার জন্য কি কঠোর প্রয়াস; কি একনিষ্ঠ তপশ্চার্য্যায় নিরত ছিলেন, হিন্দুরমণীগণের শত কুসংস্কারকেও ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। বিজাতীয়া হইয়াও নিবেদিতা অনুদয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন, সন্ধ্যাকালে স্বহস্তে তুলসী তলায় প্রদীপ দিতেন, লক্ষ্মীপূজায়, ষষ্ঠীপূজায় হিন্দুরমণীগণের সঙ্গে থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। যাঁহাদের মানুষ করিতে হইবে, প্রতিকার্য্যে তীব্র সমালোচনা না করিয়া এইরূপেই তাহাদের সহিত মিশিতে হয়—নিবেদিতা ভিন্নদেশীয়া হইয়াও বাঙ্গালী-কুললনাগণের এইরূপেই হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর দেশীয়া উচ্চশিক্ষিতাগণ দেশের হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে, ইহা দুর্দ্দৈব ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

শিক্ষার চরম পরিণাম জ্ঞানলাভ। শিক্ষালাভ করিলে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের উন্নতিও দেখা দেয়। যে শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনকে শক্তিদান করে না, উহা নিতান্তই অসার এবং অকিঞ্চিৎকর।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন "মনে রাখিও তোমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী" কিন্তু হায় আমাদের রমণীসমাজে যে শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, উহা হইতে এরূপ আদর্শের রমণী কি জন্মিবে? আমাদের মনে হয় বিলাতের সাফ্রগীটের (Suffragetes) সৃষ্টি হইতে পারে, সীতা সাবিত্রীর প্রত্যাশা করা দুরাশাই থাকিয়া যাইবে। উচ্চশিক্ষিতাই হউক, আর অল্পশিক্ষিতাই হউক, এতদুভয়ের কাহারও দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের যে বিশেষ কোন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের সমধিক বিস্তৃতি হেতু কয়েকজন বঙ্গরমণীর নাম জনসমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক একথা ধ্রুব সত্য যে হিন্দুরমণীগণকে সুশিক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কিরূপভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে ইহারা সমাজজীবনে নূতন শক্তি প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা চিন্তা করিবার কার্য্য। এই কার্য্যে জীবনের ষোল আনা উৎসর্গ করিয়া ছিলেন দুইজন—দুইজনই বাঙ্গালী নহেন, একজন সাধিকা ভগ্নী নিবেদিতা, অপরজন তপস্বিনী মাতাজী। ইঁহাদের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল আশা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

সমগ্রজগতে আজ যে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে ইহার আবর্ত্তে আমাদের বাংলা দেশও হাবুডুবু খাইতেছে, এক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া কেবল যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এমন নহে, পরন্তু আত্মবিকাশেরও আবশ্যক।

এই আত্মবিকাশ ব্যক্তিগত জীবন লইয়া নহে, সামাজিক জীবন ও দেশের জীবনকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, এ কার্য্যে পুরুষেরও যেমন সঙ্কল্প, যেমন উৎসাহ থাকা দরকার দেশের রমণী কুলেরও তদ্রূপ একান্ত প্রয়োজনীয়।

বাংলার সমাজের সর্ব্বত্র যে সঙ্কীর্ণতা, যে অনুদারতা, যে কুসংস্কার, জমাট অন্ধকারের মত অবস্থান করিতেছে তাহা নিরাকৃত করা কেবল কয়জন উৎসাহী জ্ঞানবান্ সর্ব্বত্যাগী সাধকের দ্বারা সম্ভব নহে, এই কার্য্যে বাংলার নারীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞান না থাকিলে শক্তি অনাচার টানিয়া আনে—অশুদ্ধ শক্তির দ্বারা মহান্ উদ্দেশ্য কোনও কালেই সাধিত হয় নাই, হইবে না; শিক্ষার দ্বারাই বাংলার মহাশক্তি নারীজাতিকে উদ্বোধীত করিয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের নারী সমাজকে মনে রাখিতে হইবে, ইহা ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের মাটী জলহাওয়া অন্যদেশ হইতে বিভিন্ন রকমের সুতরাং দেশীয়ভাবেই তাহাদের সুশিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

দেশের শিক্ষা পাইয়াই রাজরাণী শৈব্যা স্বামীর ধর্ম্মপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সীতা পিত্রালয় অথবা শ্বশুরালয়ের সুখসম্ভোগ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া পতির অনুগমন করিয়াছিলেন, দময়ন্তী, চিন্তা—সম্পৎ-শূন্য পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই, পতি পরায়ণা সাবিত্রী, বেহুলা মৃত পতিকেও জীবন দানে সমর্থা হইয়াছিলেন—কত বলিব, ভারতেতিহাসে আদর্শ রমণীর অভাব আছে কি? এগুলি যদিও কাল্পনিক চিত্র বলিয়া অবিশ্বাসী ধরিয়া লয়েন, তাহা হইলেও যে দেশের কবি এমন স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন, সে দেশ ধন্য—সে দেশের নারী আদর্শরমণী হইবার জন্য কেন না তপস্যা করিবেন? হে বাংলার অসংখ্য জনহিতৈষিবৃন্দ,—উক্ত আদর্শের অনুরূপ স্ত্রীচরিত্র গঠনে তোমরা কি উদাসীন থাকিবে? তোমাদের শিক্ষার দ্বারা যদি একটীও রমণী সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্গুষ্ঠের মতও না হইতে পারে, ব্যর্থ হইয়াছে তোমাদের চেষ্টা, ব্যর্থ হইয়াছে তোমাদের পরিশ্রম, ব্যর্থ হইয়াছে তোমাদের অকাতরে অর্থব্যয়।

রেল ষ্টীমারে বিলাসিনী সাজিয়া আমাদের নারীগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিলেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ পূর্ণ হয় না। পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জের মত চট্ পট্ করিয়া জবাবদাহী করিতে পারিলেই শিক্ষার সার্থকতা হইল না। পারিজাত প্রস্ফুটিত হইলে সহস্র যোজন সুবাসে ভরিয়া যাইত, একটী আদর্শ রমণী বাংলায় যদি জন্মিত, দেখিতে নারী-সমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইত। বাংলায় কয়েকটী নিঃস্বার্থ পুরুষের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতন স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, রমণী সমাজেও তদ্রূপ হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণের উপরেই আমরা আশা করিয়া থাকি; আজ পর্য্যন্ত ভগবান্ যেরূপভাবে আমাদের চালাইয়াছেন, তাহা কিছুতেই ব্যর্থ হয় নাই, এক্ষণে এই শিক্ষিতা রমণীগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি ভগ্নী নিবেদিতার মত বিলাসমন্দির পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দৌড়াইয়া আসেন, যিনি একখানা ছিন্নবস্ত্রমাত্র লজ্জানিবারণের উপায় আর শরীরের পোষণকারী এক মুষ্ঠি অন্নমাত্র সম্বল করিয়া বিদ্যুল্লতার মত তমসাচ্ছন্ন বঙ্গনারীসমাজে উদিত হইয়া জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়া দিবেন। অস্ত্রশস্ত্রে পশুবলই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞানের বল মহাবল—দেবজীবনের ইহাই প্রকৃত অস্ত্র—এই জ্ঞানের হোমানল জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য সাধিকা চাই—ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে সভাসমিতি করিয়া সুফল ফলিবে না—তাই বলি কোথায় আছ মা, বাণী পদ্মাসনা! হিন্দুর ঘরে ঘরে তোমার অধিষ্ঠান দেখিতে চাই—দীর্ঘজীবন ধরিয়া তোমারই উপাসনা করিতেছি—কোথায় কোন্ সৌধশিখরে আপনা ভুলিয়

আছ—সন্তানের ডাকে সাড়া দাও না। বাংলার বিষম সমস্যার সমাধান হইয়া যাউক।

—০—

পাগলের চিঠি।

ভায়া, অনেক দিন পরে আমার আবার প্রবন্ধের জন্য পত্র লিখেছ—তোমাদের কলমের দৌড় কিছু কম হয়েছে নাকি?

আমি মূর্খ, ভবঘুরে, তোমাদের উপাদেয় প্রবন্ধের কাছে, পাগলের চিঠি শোভা পাবে কি?

দেখ, তোমরা যে সাধনার কথা লেখ, উহা বড় চমৎকার হয় বটে, কিন্তু কখন কেউ কি পুস্তক পড়ে মানুষ হয়েছে? তোমাদের উদ্দেশ্য খানা কি? 'প্রবর্ত্তকের' সাহায্যে বাংলাদেশের লোকগুলাকে সাধক করে তুলবে নাকি?

যাই কর, আমার সোজা কথাগুলি তোমাদের জানাই, আমার বিশ্বাস, শুধু সাধনার কথাগুলি পড়ে কেউ মানুষ হবে না, উহা কেবল কালহরণ কর্‌বার উপাদান, যদি কেউ মানুষ হয়, সে সাধু সংসর্গে; 'প্রবর্ত্তক' একটা অচেতন সঙ্গী বটে, কিন্তু চেতন সঙ্গী লাভ না কর্‌লে প্রবর্ত্তকের মন্ত্রশক্তি জীবন্ত হবে না।

আজকাল যে বাজার, তাতে সঙ্গীলাভ কর্‌তে যাওয়া বিপদের কথা। অমুক আমার সঙ্গী কেন—তারও জবাব দাহী কর্‌তে হয়, এমন কি যার সঙ্গে নেংটা বেলা থেকে বন্ধুত্ব করে এসেছি, আজকাল তার সঙ্গ ছাড়্‌বার জন্য কাশীর কালভৈরব যেমন নবাগত ব্যক্তিকে কাশী ত্যাগের জন্য উদ্ব্যস্ত করে, কালের দূত তেমনি ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। এগুলি ভগবানেরই পরীক্ষা, কা'রও দোষ নয়, এ কথা অবশ্য মনে রেখো। কারণ, যে সাধনায় জীবনমরণপণ নেই সে সাধনা ফলপ্রসূ হয় না। মোট কথা, তুমি যদি শুদ্ধ ভগবানকে চাও তবে তিনি জোর করে অপর সব দিকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেবেন। ইহার যুক্তিতর্ক নেই, কেন নেই, ইহার কৈফিয়ৎ আপনার মনে।

আজ পর্য্যন্ত আমার জীবন নিয়ে তিনি যে সব খেলা খেলেছেন তার কোন কারণ খুঁজে পাই না। একমাত্র কারণ, কায়মনোবাক্যে একদিন নবীন প্রভাতে তাঁরে চেয়েছিলুম; তার পর থেকে আমার বলতে যা ছিল, যেখানে আমার আসক্তি, হৃদয়ের বাঁধন ছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল, তাই সবাই আমায় পাগল বলে। ভায়া, যে যে কত কষ্ট, তোমায় কি জানাবো, মনে হতো বটে, "তাইত আমি তা কোন অপরাধের অপরাধী নই, তবে এমন হয় কেন—আজ বুঝেছি "হৃদয় যাহার শত খানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে, তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে।"—এ যে জোর করে ভক্তিডোরে মনকে বাঁধা।

বল দেখি ভাই, অনন্ত-বন্ধনের গ্রন্থি, মানুষ কি খুলতে পারে, এ তাঁর বাঁধা, তিনিই খুলে দেন; মজা এই, বাঁধা থেকে থেকে, এমন একটা সংস্কার হয়ে যায়, যেন বন্ধন অবস্থাটাই সুখের বলে মনে হয়। কোন্ ঋষির শক্তি বলে জোর করে বলে ফেলেছিলুম, মা আমায় খুলে দে, আমায় মুক্ত করে দে"—তার পর থেকে দেখেছি খুলে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, একটা একটা বাঁধন খোলে, আর এক এক-খানা বুকের পাঁজরা যেন খসে যায়—কি বিপদ! দেখ ভায়া, ছেলেবেলা একটা পালিক পাখী পুষেছিলুম, সেটাকে বাচ্ছাবেলা থেকেই খাঁচায় বন্ধ করে রেখে-ছিলুম, দুপাঁচ বছর পরে মনে হলো—আহা বেচারির কি কষ্ট, পৃথিবীর সব পাখী-গুলি কেমন নীল আকাশের কোলে উড়ে বেড়াচ্ছে, রূপোর মত তক্‌তকে নদীর জল, গাছের সরস পাকাফল খেয়ে আনন্দে নাচ্চে, আর আমি একে সব থেকে বঞ্চিত করে দেড় হাত খাঁচায় আবদ্ধ করে রেখেছি। যাই মনে হওয়া, অমনি পাখীটাকে ধরে ছাদের উপর গিয়ে উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। আহা, পাখীটা মুক্ত বাতাস পেয়ে, এমন আনন্দে কপচাতে লাগলো—সে আর তোমায় কি বলবো, তার পর লাফাতে লাফাতে ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করতে লাগলো আর গায়ের পাখনাগুলি ঠুঁকরে ঠুঁকরে এমন ফুলিয়ে তুলসে, যে মনে হলো, পাখীটার নূতন জীবন এলো—কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে আবার খাঁচায় এসে ঢুকে পড়লো।

আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা, যখন কোন মহাপুরুষের সংসর্গে অথবা ঋষির মন্ত্র উচ্চারণে মনের মধ্যে মুক্তির বাণী জেগে উঠে, তখন আমরা বুক ফুলিয়ে বলি "মুক্তি চাই, শুদ্ধি চাই, ভগবান্ চাই," কিন্তু তারপর যেন ভয় হয়, আবার বন্ধনের মধ্যে এসে পড়ি; আমি কিন্তু পাখীটাকে প্রতিদিন ছেড়ে দিতুম, এমনি কয়েকদিন

কথা? আমরা বলি সংসারের জরা, মৃত্যু, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন যে ভোগ করিতে পারে, সে স্বাস্থ্য, জীবন, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ভোগ না করবে কেন? আমাদের ভোগ মানে পৃথিবীর বাছা বাছা ঐশ্বর্য্যগুলি নয়—ছাই পাঁশ সবই—অভিধানে যা আছে তার একটাও বাদ দেব না।

রাজা রামকৃষ্ণের একটা গান বলে বিদায় হই—ভবিষ্যতে আবার দেখা দেব।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা, পূজা কিছুই না মানে,
যা করেন কালী—এই সে জানে।
কালী নাম যে মনে করেছে স্থল,
সহজে তারই বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে সে পায়রে কূল—
সে কুল হারাবে কেমনে?
রামকৃষ্ণ কয় হেন জনে,
লোকনিন্দা সে শুনবে কেনে?
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনীদিনে,
কালীনামামৃত পীযুষ-পানে॥

জন্মাষ্টমী।

কংস কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা উমাপতির নিকট আপনার দুর্দ্দশা-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন—পাপভারে ধরিত্রী রসাতলে প্রবেশ করিবে শুনিয়া কৈলাসপতি পদ্মযোনিকে আদেশ করিলেন—দুরাচার কংসের নিধন করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা হউক। প্রজাপতি অনন্তদেবের উদ্দেশে ক্ষীরোদসমুদ্র তীরে যাত্রা করিলেন।

এখানে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন—অনন্তের কি রূপ। ইন্দ্রিয়াতীত অবাঙ্ মনসোগোচর পরাৎপর পুরুষ সমুদ্রের নীলজলে শায়িত—জগতের জ্যোতিঃ-রেখাটুকুই প্রকৃতি—তিনি এই বিরাট পুরুষের পদসেবা করিতেছেন; প্রজাপতি স্তব করিলেন—

"নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
জগতঃ পালয়িত্রেচ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তুতে।
নমঃ কমল কিঞ্জল্ক পীত নির্ম্মলবাসসে।
নমঃ সমস্ত দেবানামধিপায় মহাত্মনে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অনন্ত বারিধির যেখানে অনন্ত আকাশ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই দিকচক্রবালে জ্যোতিঃস্বরূপ পরম পুরুষ জাগিয়া উঠিলেন ক্রমে ব্রহ্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনও অনন্তের যে নীলকান্ত মণির মত রূপ, সেটুকু অঙ্গে বিরাজ করিতেছিল। সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে সকল কাহিনী শ্রবণান্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন দ্বাপর ও কলি যুগের সন্ধিক্ষণেই তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন।

ইহাই জন্মাষ্টমী উৎসবের নিগূঢ় রহস্য।

স্বাধিকারপ্রমত্ত দৈত্যপতি কংস ত্রিলোকবাসীর নিতান্ত অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন—তিনি ধর্ম্মপ্রাণ বহুজনের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন—সংখ্যাতীত রাজন্যবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—আমরণ তাঁহারা কারাগারেই বাস করিতেছিলেন—ন্যায়বিচারে কখনও যে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন এরূপ আশা তাঁহাদের ছিল না। এরূপ সময়ে দেবর্ষি নারদ কংসরাজকে কহিলেন মহারাজ, আপনার সহোদরার গর্ভে এক পুত্র জন্মিবে—যে আপনার বিনাশের কারণ

হইবে, অতএব সাবধান হউন। অনলে ঘৃতাহুতিস্বরূপ দৈত্যরাজের রোষবহ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—বালক দলের উপরেই তাঁহার ক্রোধবজ্র পতিত হইতে লাগিল—অবোধ শত শত বালক কংসশাসনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, তদীয় ভগ্নী সতীসাধ্বী দেবকী স্বামীর সহিত কারারুদ্ধ হইলেন, এক এক করিয়া তাঁহার সাতটী সন্তান নিপাতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। বড় দুর্য্যোগ রজনীতেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে পুণ্যপীঠ ভারতবর্ষে এই মহালীলার সূচনা সংঘটন হইয়াছিল। মর্ত্যবাসীর হাহাকারনিবারণ, অধর্ম্মের প্রতিকার, সাধু-জনের উদ্ধার কামনায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

প্রাবৃটের ঘনঘোর রজনীতে প্রকৃতি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। একে কৃষ্ণাষ্টমী নিশা, তায় আকাশ কৃষ্ণমেঘে সমাবৃত; একদিকে রুদ্র কড় কুলিশ-নাদ, অপরদিকে প্রবল ঝটিকায় বৃক্ষমন্দিরচূড়া মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, কংসকারাগারে। এ হেন সময় দেবকী এক সন্তান প্রসব করিলেন। উজ্জ্বল নীলকান্তি দেখিয়া স্বামী স্ত্রী ভাবিলেন—এ রূপ কি মানুষের? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছেন!

অতঃপর কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে নীত হইলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

এই পৌরানিক আখ্যায়িকাটি বিশ্বাস করিলে দেখা যায় ধরিত্রীর কাতর নিবেদনের ফলেই ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বসুমতী মৃন্ময়ী হইয়া প্রাণময়ী হইলেন কিরূপে?

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, কোটি কোটি জীবের আধাররূপিণী দেশ-মাতৃকা অচেতনা জড় পদার্থ নহেন, ইনি প্রাণময়ী—আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি এ মহা প্রাণের লক্ষণা দেখিতে অসমর্থ পরন্তু যোগদৃষ্টি লাভ করিলেই মূর্ত্তিমতী জগদ্ধাত্রীর বিরাট প্রাণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দেশের সমাজজীবন যখন ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, সুজনের প্রতি দুর্জ্জনের অত্যাচার, ব্যাভিচার, মিথ্যাচরণ, প্রভৃতি পাপভারে সমাজ যখন পরিত্রাহি চীৎকার করে, তখনই দেশের বিরাট প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। এরূপ করিতে হইলে আবার একটি পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়।

ধরিত্রী যেমন সর্ব্বপ্রথম মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, মহেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিবেদন করিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা মহাবিষ্ণুর মহানিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ধরার ভার অপনো-

দন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। সেইরূপ পৃথিবীর যাঁহারা সাধু, যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহাদের আকুল প্রার্থনা দেশমাতৃকার কর্ণগত করা চাই—সন্তানের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা কোন্ জননী সহ্য করিতে পারেন—মা, "পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া নবযুগের সূচনা করিয়া তুলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, দেশের সর্ব্ববিধ হাহাকার মায়ের কর্ণে বাজে না—চোর দণ্ডিত হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করে, লম্পট সমাজশাসকের নিকট নির্য্যাতিত হয়, কুটিল শঠ, ভণ্ড প্রভৃতি স্বার্থে আঘাত পাইলেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়—এ সকলে কিন্তু দেবতার আসন অটল থাকে। যদি কখনও পরোপকারী শুদ্ধচিত্ত সাধকের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হয়, যদি কখনও সত্যধর্ম্মী মহাপুরুষগণের উপর অকারণ উৎপাতের সৃষ্টি হয় আর তাহার প্রতিকার করিবার জন্য সমাজ অথবা নৃপতিবৃন্দ উদাসীন হন, তখনই ধরণীতে নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে, ইহা অবধারিত। এই জন্য শাসনযন্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধান এই যে, "দেখিও দোষী মুক্ত হয় ক্ষতি নাই, তত্রাচ নির্দ্দোষী যেন শাস্তি না পায়।"

লঙ্কেশ্বর রাবণের উপদ্রবে, মর্ম্মদাহী অনুভূতি লইয়া বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মনস্বিগণ এমনই কাতরভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; তখন শ্রীবিষ্ণু রামচন্দ্ররূপে ধরণীর ভার বিদূরিত করেন; সাম্রাজ্য-মদ-গর্ব্বিত ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ভৃগু, জাবালী, পুলস্ত, পুলহ, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ কাতর আহ্বান করিয়াছিলেন—ক্ষত্রিয়নিধনকারী জামদগ্ন্য রূপে ভগবান্ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়রুধির পাত করিয়া পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন; পরাশর, ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি সাধকগণ মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া কংসনিধনকল্পে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন—পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সাধুজনের উদ্ধার ও ধরণীর ভারহরণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে যুগে যুগে আমরা দেখিতে পাই, মানুষের সহস্র চেষ্টায় সমাজে শান্তি স্থাপন হয় না; পাপভারে সমাজ অবনত হইলে যখন সংযমী সাধক ধর্ম্মপরায়ণ ভক্তজন, সাধু মহাপুরুষগণ মর্ম্মদাহী বেদনা অনুভব করেন, তখনই পাপহারী দৈবশক্তি বিকশিত হইয়া যুগান্তর আনয়ন করেন।

প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—

"মহাশয়,

নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্রের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, ইহাদের ভিতর যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হই।

প্রবর্ত্তক ১৫৭ পৃষ্ঠা—"বুদ্ধির দোষ কল্পনার মায়া মরীচিকা রচনা.....এক কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া বসি.....বুদ্ধির মুখ হইতে সেই উগ্র হিরণ্ময় পাত্রটী অপসারিত করিতে হইবে.....বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানের আধার হইলে বুদ্ধির শুদ্ধি হইল.....।

"২২০ পৃষ্ঠা—"এইরূপ করিলেই বুদ্ধি.....পরিত্যাগ করিবে...বুদ্ধির মুখের হিরণ্ময় পাত্রখানি উন্মুক্ত হইলেই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে"।

"১৬৭ পৃষ্ঠা—"শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান তাহাও সত্যের জ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়ের দাস না হইলেও সে আবার কল্পনা জল্পনার দাস হইয়া পড়ে, সত্যকে কল্পনার চক্ষে দেখে.....।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে বুদ্ধির শুদ্ধি অর্থ যদি কল্পনা জল্পনা হইতে শুদ্ধ এবং মুক্ত হওয়া এই হয়, তাহ হইলে পুনরায় শুদ্ধবুদ্ধি কেমন করিয়া কল্পনার দাস হইতে পারে? বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেই যদি জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হয় এবং বুদ্ধি জ্ঞানের আধার হয়, সে অবস্থায় ছায়ারূপ কল্পনা কিরূপে সম্ভব?

যাহা হউক এই অংশটিতে বড় গোলমাল ঠেকিতেছে, তাই মহাশয়ের নিকট প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার আশায় জিজ্ঞাসু হইলাম।"

পাঠক ভাষাগত পার্থক্যের মধ্যে গোলযোগে পড়িয়াছেন। ১৫৭ এবং ২২০ পৃষ্ঠায় একই কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধির দোষগুলিকে বিদূরিত করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে—বুদ্ধির প্রধান দোষ কল্পনা জল্পনা প্রভৃতি—এগুলি হইতে মুক্ত হইলেই জীবের বুদ্ধিতে জ্ঞানালোক প্রতিভাত হয়। ১৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে শুদ্ধবুদ্ধির যে জ্ঞান উহা সত্যের জ্ঞান নহে, এখানে শুদ্ধ অর্থে কেবল (purely the intellect, not purified intellect.); যোগপ্রবন্ধ পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিবেন, জীবের সকল যন্ত্রগুলি অন্যান্য যন্ত্রের সংস্পর্শে ও প্রভাবে অল্পাধিক বিকৃত। বুদ্ধি যখন চিত্ত ও মনের ভাবাপন্ন নহে, এইরূপ শুদ্ধবুদ্ধি (purely the intellect) সত্যকে কল্পনার চক্ষেই দেখে। ইহাত স্পষ্ট কথা। চিত্ত, মন, প্রাণ প্রভৃতির প্রভাব হইতে বুদ্ধিকে মুক্ত করিতে পারিলেইত বুদ্ধির শুদ্ধি হইল না, বুদ্ধির যে দোষ, জল্পনা কল্পনা ইহা হইতেও তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। এক্ষণে আশাকরি পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

ঈশ্বর-প্রণিধান।

আজ সমগ্র বাঙ্গালীকে মুক্তির পথে ছুটিতে হইবে—তাহাদের আর অন্য পথ নাই। সুখ, সৌভাগ্য, স্বার্থ, যাহাদের লক্ষ্য তাহারাই অবিদ্যার কুহকে, ভোগ-লালসার মোহে ডুবিয়া মরিবে—বিধাতার দান দুঃখ, আমাদের গতিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে—আমাদের শুদ্ধি, মুক্তি, দেবত্ব সন্নিকট।

সংশয়ী, আমাদের সরল সাধনপথকে চিরদিনই বক্র ও কুটিল দেখিবে, পাপী স্বার্থপর হীনচিত্তজন আমাদের সকল কর্ম্মই দারুণ দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনে করিবে, ক্ষতি নাই, ইহাই আমাদের জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা। প্রশান্ত চিত্তে এই সকল উপেক্ষা করিয়া সত্যের পথে, ভগবানের পথে, দেবত্বের পথে আমাদের গতিকে দ্রুত করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে আমাদের জীবনস্রোতঃ নিত্য; আমরা চলিয়াছি ভগবানের আহ্বানে—অকারণ উৎপাতের প্রতীকারপরায়ণ হইয়া জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিব না—পাপীর দণ্ডবিধান ভগবানের হস্তে অর্পণ করিয়া সম্মুখের পথটুকু অতিবাহন করিব—করুণাময়ের বরাভয় হস্ত আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া অমরত্ব প্রদান করিবার জন্য ঊর্দ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে; হে সাধক! অগ্রসর হও।

ভগবানের পথ ঋজু, পুণ্যময়, আনন্দপ্রদ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির এ পথে অধিকার নাই; বিক্ষিপ্তচিত্ত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া এ পথে আসিবার প্রযত্ন করিলেও আনন্দের আস্বাদ পায় না কারণ শুদ্ধচিত্ত না হইলে এ পথে আরোহণ নিতান্তই দুরূহ। তাই বলি শুধু ধর্ম্মের লালসা করিলে কি হইবে, কর্ম্মনাশার তীরে অবিদ্যার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যস্রোতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অবগাহন কর—বিনা আয়াসে আনন্দধামে উপনীত হইবে।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনটী ক্রিয়াযোগ। এই কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, সাধনপথে চলিবার অধিকার লাভ হয়। শাস্ত্রোক্ত ব্রত-ব্রত নিয়মাদি পালনের নাম তপস্যা; প্রণবজপ বা জটিল শাস্ত্রমর্ম্ম-অনুধ্যানের নাম স্বাধ্যায়। দুইটীই কলির জীবের পক্ষে আয়াসসাধ্য—তাই একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ভেলায় আরোহণ করিয়া শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ঈশ্বর-প্রণিধানই আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইলে ধীরে ধীরে জীবের কর্ম্মাশয়স্থিত অফুরন্ত সংস্কাররাশি অগ্নিসংযোগে তুলারাশির মত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। যাহার সংস্কার নাই, তাহার সুখ কি, দুঃখ কি? অভাব কি, অভিযোগ কি? ধার্ম্মিক জন কখনই নিরানন্দ ভোগ করেন না। ধর্ম্মের মহিমা-প্রচার মানসেই ভগবান্ ইচ্ছা করিয়া ধার্ম্মিককে যন্ত্রণারাশির মধ্যে নিক্ষেপ করেন; পরিণামে সুবর্ণ, অগ্নিসংযোগে যেমন বিমল ও বিশুদ্ধ হয়, ভগবদ্ভক্তও তদ্রূপ অলৌকিক প্রতিভায় ও অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়।

ভণ্ডের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ভণ্ডের ঐশ্বর্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও উহা অনিত্য। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত কালচক্রে ভস্মাবৃত প্রভাহীন বহ্নির মত বোধ হইলেও একদিন সে উজ্জ্বল হইয়া সমগ্র জগতে আলোক বিতরণ করিবে। আজ আমরা তাই—যাঁহারা ভগবান্‌কেই চাহেন এরূপ বজ্রকঠিন সঙ্কল্পপরায়ণ জনগণকে আহ্বান করিতেছি—এস, ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালনিশায়, এক বিরাট ভগবদ্-মণ্ডলীর সৃষ্টি করি—যে মণ্ডলী এই মহাপ্রলয়ের দিনে বিধ্বস্ত জগদ্বাসীর জন্য শান্তি-নিকেতন রচনা করিবে।

———:০:———

স্মরণ-মঙ্গল।

আরম্ভই উপসংহারের ভিত্তি। আরম্ভ নিষ্কলুষ হউক, উপসংহার সিদ্ধি লইয়া উপনীত হইবে।

উনানে অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। ইন্ধনগুলি সারিবদ্ধ হইয়া আপনাকে পোড়াইয়া আত্মদান করিতেছে। সর্ব্বশেষে যে ইন্ধনগুচ্ছ উনানের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ

করিল, তাহাদিগের দ্বারা অন্ন প্রস্তুত-কার্য্য সমাপ্ত হইল। আবার তাহাদিগের কতকগুলি ফিরিয়াও আসিল। ভাগ্যবান্ কাহারা? যাহারা প্রথম হইতে আত্মদান করিয়াছে তাহারাই, না যাহারা প্রত্যাগত হইল? যাহারা ফলভোগের আশা না রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে আপনাদিগকে অন্নাদি রূপে পরিণত করিয়াছে, তাহারাই অধিকতর ভাগ্যবান, তাহাদিগের পরিশ্রমই অধিকতর মূল্যবান্। তাহারা ত্যাগী—ইহারা ভোগী।

* * *

সংসারে সুখী কে?—যে সুখের আশা বর্জ্জন করিয়াছে। দুঃখকে যদি জীবনের সঙ্গী করিয়া লওয়া যায়, সুখ তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া অদূরে অপেক্ষা করে। পূর্ণ অন্ধকার আসিলেই বুঝিতে হইবে—জ্যোৎস্নার উন্মুক্ত ভাণ্ডার তোমার জন্য অদূরে অপেক্ষা করিতেছে।

* * *

যাহা বাস্তব—তাহাই সত্য। যাহা স্বাভাবিক—তাহাই অবলম্বনীয়। জীবের গতি সম্মুখ দিকে। ঈশ্বর তাহাকে সম্মুখে চলিবার জন্যই সম্মুখদিকে দুইটি চক্ষু প্রদান করিয়াছেন। মানব! সম্মুখে চল—অগ্রসর হও। বারম্বার পশ্চাতে চাহিয়া ঈশ্বর-মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ কর কেন? উহা যে অবাস্তব, তোমার পক্ষে উহা যে অস্বাভাবিক।

* * *

ঊর্দ্ধে আলোক, ভূগর্ভে অন্ধকার। এই জন্যই স্বর্গ ঊর্দ্ধে—পাতাল নিম্নে। মধ্যে মর্ত্ত্য। পাতালের জীব উদ্ভিদ্, মর্ত্ত্যের জীব মানবাদি জন্তু, স্বর্গের জীব দেবতা। উদ্ভিদ্ পাতাল হইতে মর্ত্ত্য ছাপাইয়া আলোক-রাজ্যে পৌঁছিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছে। মর্ত্ত্যবাসী মানব! তোমার দৃষ্টি অধঃপতিত হইবে কেন? ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ কর, তুমিও ঊর্দ্ধগতি হও, দেব-প্রসঙ্গে দেবত্ব লাভ কর।

* * *

দূর হইতে পর্ব্বতকে মেঘের মত এবং মেঘকে পর্ব্বতের মত দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পর্ব্বতও মেঘ নহে, মেঘও পর্ব্বত নহে। মানব! দূর হইতে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা তোমার মূর্খতা। নিকটস্থ হও, যাথার্থ্য অনুভব কর।

* * *

যে তড়াগ দূষিত ব্যাধি-বীজে পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে স্নান করিলে, তাহার জল পান করিলে নানা রোগ হইবার সম্ভাবনা। এমনও দেখা যায়—যে ব্যক্তি

উহার কূলে বসিয়া থাকে, সেও ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়াছে। তুমি যাহাকে মন্দ ভাবিয়াছ, তাহার হাওয়া তোমার গায়ে লাগিতে দিও না। কি জানি কোন্ পথ দিয়া উহা তোমার ভিতরে প্রবেশ করিবে যে, তুমি তাহা আদৌ বুঝিতে পারিবে না এবং তাহাতেই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।

* * *

একটি চারাগাছ রোপিত হইয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ লতাগুল্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। গাছ বড় হইতে পারিতেছে না, অধিকন্তু বন্ধনে বন্ধনে ক্ষীণতর হইতেছে। এইরূপে উহা অকালেই মরিয়া গেল; সে গাছে আর ফল ফলিল না। মানব! তোমাকে বড় হইতে হইবে। যদি মুক্তি চাও বন্ধন মোচন কর। বন্ধন-মোচনই মুক্তি।

* * *

চন্দন পরের জন্য আপনার অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। এজন্য সে এত পবিত্র, এজন্য সে ভগবানের অঙ্গের ভূষণ। পরার্থে সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিলেই ভগবান্ কোলে তুলিয়া লয়েন।

* * *

বায়ুর সত্তা স্থূলতঃ বোধগম্য হয় না। হিল্লোলে তাহাকে সমধিক প্রকাশ করে। মানব! কর্ম্মের দ্বারা তোমাকে তোমার অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে হইবে। নতুবা তোমাতে ও জড়ে পার্থক্য কোথায়?

* * *

মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড যখন ঠিক মস্তকের উপরে শূন্যমার্গে অবস্থিত, তখন তোমার প্রতিবিম্ব তোমাতেই লীন হইয়া যায়। তখনই মার্ত্তণ্ডের শক্তির পূর্ণ বিকাশ। জ্ঞান-সূর্য্য পূর্ণশক্তিতে প্রকাশ কর,—তোমার বাহিরের যাহা কিছু সকলই তোমাতে মিশিয়া যাইবে।

* * *

ভাদ্রের ভরা নদীই সাগর-সঙ্গমে অধিকারিণী। যখন তাহার ব্যাকুলতা কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠে, তখনই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মানব! তুমি পূর্ণ ব্যাকুলতা লাভ কর, তোমার হৃদয় ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাউক, অভীষ্ট ত্বরায় তোমার করতলগত হইবে।

মানবজাতির সেবকতার আদর্শ

(৪)

এক্ষণে বুঝিয়া দেখিতে হইবে এই রাষ্ট্রপ্রধান আদর্শ, সুগঠিত সমাজ সমীপে ব্যক্তির এই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শটী স্বরূপতঃ কি। ব্যক্তি তাহার সমস্ত স্বার্থ সকলের হিতের জন্য অর্পণ করুক —ইহা একটা উদার উচ্চ ভাব বটে; কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক, সামরিক অথবা অর্থ-নৈতিক উদ্দেশ্যমূলক কোনও বৃহৎ সমষ্টিবদ্ধ অহমিকারই সমীপে ব্যক্তিকে আনুগত্যস্বীকার করিতে বলা হইতেছে। এই বৃহৎ সমষ্টি যে সকল উচ্চাশা ও লক্ষ্যের অনুসরণ করে তাহা নিরূপণের ভার প্রতিনিধি-স্থানীয় কতকগুলি প্রধান লোকের উপরই নির্ভর করে। উক্ত প্রধান ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত কোনও শাসকশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হউন অথবা, যেমন বর্ত্তমান রাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা চরিত্রগুণে, অধিকাংশ সময়ে বা অবস্থাগুণে জনসাধারণের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হউন, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না। আবার হয়ত ইহাঁরা নিরূপিত লক্ষ্য ও আদর্শ সমাজের স্কন্ধে আরোপ করিতে হইলে প্রকাশ্য বল প্রয়োগের উপর তত আস্থাবান্ না হইয়া মুগ্ধকরী তর্কযুক্তি সহায়েই কার্য্যসিদ্ধি করিবার সমধিক পক্ষপাতী হইতে পারেন। ইহাতেও পূর্ব্বের মত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু সমাজের যে কোন স্তর হইতে উঠিয়া যে ভাবেই তাহারা কার্য্য করুন না কেন, এই শাসকমণ্ডলী যে একটা জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষা, উচ্চতম আশা ও প্রেরণার আধারস্বরূপ—এ কথাটা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে না।

আধুনিক জগতের কোন দেশের রাজনৈতিকের সম্বন্ধেই এই কথা প্রয়োগ করা যায় না। রাজনৈতিকনেতা জাতির প্রাণ, জাতির আশার প্রতিনিধি নহেন, বরং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, প্রবঞ্চনা, মানসিক দুর্ব্বলতা, নৈতিক কপটাচারিতা, ভীরুতা—এই সব দোষগুলিরই তিনি উৎকৃষ্ট প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা ভার যখন তাঁহার উপর অর্পিত হয়, সে সকলের মীমাংসায় তাঁহার তদনুরূপ মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। উচ্চ কথা, মহদ্ভাব তাঁহার মুখে নিয়তই লাগিয়া

যন্ত্রবিশেষের সমীপে ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত কর্ম্মজীবনের কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে নিয়তই আহ্বান করা হয়। ফলতঃ এতদুপায়ে সমাজের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে, প্রভূত পরিমাণে যেন ভ্রম প্রমাদ ও অশুভেরই সুব্যবস্থা করা হইতেছে—অবশ্য প্রকৃত উন্নতিবিধায়ক কিছু না কিছু শুভের উৎপত্তি যে না হইতেছে এমন নহে কারণ প্রকৃতি, স্খলন ও পতনের মধ্য দিয়া চিরকাল অগ্রগমনই করিতেছেন এবং মানুষের অসম্পূর্ণ মানসিক, অবস্থা সহায়তা না করিলেও অনেক সময়ে তৎপ্রদত্ত প্রতিবন্ধকতাকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তিনি আপন উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু শাসনযন্ত্রটীকে এতদপেক্ষা সুন্দরতর এবং মানসিক এবং নৈতিক বিষয়ে উচ্চতর উৎকর্ষসম্পন্ন করিয়া গঠিত করিতে পারিলেও, প্রাচীন সভ্যতাগুলি তাহাদের শাসকশ্রেণীকে নানা উচ্চ আদর্শ ও নিয়মে আবদ্ধ করিয়া যাহা করিতে চাহিয়াছিল তাহা কোন না কোন উপায়ে করিয়া উঠা সম্ভব হইলেও, রাষ্ট্রপ্রধান আদর্শ যে সুখস্বর্গের আশা প্রদান করে, তাহার সফলতা তখনও সুদূরপরাহত থাকিবে। উক্ত আদর্শের দ্বারা সাধারণের মঙ্গলের জন্য সমাজের সমুদায় জ্ঞান ও শক্তির সমবায়কেই নির্দ্দেশ করা হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের গঠন, যতটুকু বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির সংগ্রহের সুযোগ দেয় সেইটুকু মাত্র সংগৃহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই সম্মিলিত শক্তি ও সম্মিলিত বুদ্ধি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিতে গিয়া প্রায় তন্মধ্যে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়ে; ফলে, উক্ত যন্ত্রের গঠনগত দোষ ও আনুষঙ্গিক ভ্রান্তি ও স্বার্থজনিত দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া পড়ায় পদে পদে বিষম বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অবশ্য বর্ত্তমানক্ষেত্রে বর্ত্তমান ব্যবস্থাই একমাত্র সম্ভবপর এবং প্রকৃতিদেবী তাহার যথাসাধ্য সমীচীন প্রয়োগই

করিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তিকে আরও কিছু শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া রাষ্ট্র যাহা করিতে অসমর্থ, তাহা প্রয়াস করিবার যদি একটুমাত্রও ক্ষেত্র প্রদান করা না হয়, উপযুক্ত বুদ্ধিবল ও সাহসের অভাবে রাষ্ট্র যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ, যদি তাহাই সম্পন্ন করিতে শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের অকপটতা, শক্তি ও ভাবুকতার সদ্ব্যবহার করিতে দেওয়া না হয়, সমষ্টি তাহার সংরক্ষণশীলতা এবং দুর্ব্বলতাদোষে যে সকল প্রচেষ্টাকে হয় অননুষ্ঠিত রাখিবার, নতুবা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া দমিত ও নিষ্পীড়িত করিবারই প্রয়াসী হয়, সেই সমুদয়কে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে ব্যক্তি যদি বিন্দুমাত্র সুযোগ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অবস্থা বস্তুতঃই ভীষণ ও শোচনীয় দাঁড়াইবে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিগত প্রয়াসই সমষ্টির উন্নতির মূল। যখন রাষ্ট্র এই ব্যক্তিগত উদ্যমের সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়, সেই সাহায্য অনুচিত কর্ত্তৃত্বের আকার ধারণ না করিলে, প্রকৃতই তাহাতে প্রভূত সুফল সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাহা পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়; তখন প্রখর উন্নতিবেগকে কথঞ্চিৎ পরিমিত করিয়া রাখাই হয় তাহার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, নতুবা একটা নবীন উদীয়মান শক্তির প্রকৃষ্ট বল, বীর্য্য এবং গঠনগত পূর্ণত্বের জন্য যে প্রতিকূলতা ও সংঘর্ষের সম্মুখবর্ত্তিতা একান্ত আবশ্যক তাহারই আয়োজন করা তাহার কর্ম্মস্বরূপ হয়। কিন্তু এক্ষণে, মানবজাতির সম্মুখে রাষ্ট্রশক্তি এরূপ অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, রাষ্ট্রের কার্য্য ও প্রতাপ এরূপ বিপুল, দুর্দ্দম, জটীল আকার গ্রহণ করিতেছে যে মনে হয় অচিরে স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্যমের হয় নিঃশেষ বিলোপ নতুবা একান্ত খর্ব্বশক্তি হইয়া বিষম ব্যর্থতাতেই তাহার পর্য্যবসান হইবে। যে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উদ্যম রাষ্ট্রযন্ত্রের অসম্পূর্ণতাজনিত অভাব সমূহ কথঞ্চিৎ পূরণ করিতেছিল তাহা বুঝি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

ফলে, অধুনা সুগঠিত রাষ্ট্র, না জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের সমষ্টি, না সমাজের সমুদায় শক্তির একটা সমবায় স্বরূপ। তাহার সুসংহত কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তিগণের কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তির (অনেক সময়ে এই শক্তিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যযুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানভূত হইলেও) কোনই স্থান নাই। বাস্তবিক এইরূপ রাষ্ট্রগত অহঙ্কারের অপেক্ষা সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি বহুলাংশে বিশুদ্ধতর। যাহা হউক, উক্ত প্রকারের সমষ্টি সমূহের অহঙ্কারগুলির মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান, তাহা আজ মানুষ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে; সে সম্বন্ধের শ্রীহীনতা আজ মানবজাতির দৃষ্টি ও বিবেকের নিকট অতি স্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাধারণতঃ, ব্যক্তির আর কিছু না থাকুক অন্ততঃ একটা

হৃদয়ও আছে; এই হৃদয়েরও যদি একান্তপক্ষে অভাব হয়, সে একটা নীতি-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া তাহার অভাব পূরণের চেষ্টা করে; ইহাতেও যদি অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা হইলে সমাজের সমালোচনার ভয়, তাহারও একান্ত অভাবে সমাজের অনুশাসনের ভীতিও তাহাকে সংযত করিয়া থাকে—এই অনুশাসন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়, আর কিছু না হয় অন্ততঃ এড়াইয়া চলিতেও হয়; আর অত্যন্ত চতুর, অতি দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি ব্যতীত সকলের পক্ষেই এইরূপ এড়াইয়া চলাটা নিতান্ত সুকর নহে। কিন্তু এই রাষ্ট্রযন্ত্রটী এমন একটি অপরিমেয় শক্তি-সম্পন্ন বস্তু, যাহার শক্তিকে সংযত রাখিতে অন্তরে বাহিরে সঙ্কোচ বা বিঘ্নস্বরূপ কোনও কিছুই নাই। ইহার হৃদয় বলিয়া কোনও জিনিষ নাই—অথবা যাহা আছে তাহা অতি স্থূল রকমের, অতি অপরিস্ফুট; রাষ্ট্র একটা সামরিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক অতি সঙ্কীর্ণ, অপরিণত বুদ্ধি ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বস্তুমাত্র। এই অবিকশিত বুদ্ধিরও সে ব্যবহার করে, কেবল কতকগুলি কল্পনা, স্তোকবাক্য ও নব-নব রাষ্ট্রতত্ত্বের সাহায্যে অপরিস্ফুট নীতিজ্ঞানটীকেও নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতে। মানুষ, তাহার সমাজের আভ্যন্তরিক জীবনে অন্ততঃ অর্দ্ধসভ্য জীবও বটে; কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনে সে এখনও পশুমাত্র। খুব আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, সুগঠিত জাতি, প্রতিবেশী জাতিগণের সহিত ব্যবহারে একটা বৃহৎ হিংস্র জন্তু তুল্যই ছিল; কেবল তাহার হিংসাবৃত্তিগুলি কখনও উদর পূর্ণ থাকায়, কখনও বা ঘটনা ও অবস্থার প্রতিকূলতা বশতঃই সুপ্ত ছিল মাত্র—পরন্তু এই হিংসাবৃত্তিই তাহার জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যস্বরূপ আবহমান কাল বর্ত্তমান ছিল। আত্মরক্ষা এবং অপরকে গ্রাস করিয়া আত্মবিস্তারই তাহার ধর্ম্ম ছিল। বর্ত্তমান যুগে তাহার স্বরূপতঃ কোনও উৎকর্ষ ঘটে নাই—কেবল অপরকে গলাধঃকরণ করিবার পথে বিঘ্নগুলিই অধিকতর কঠিন ও দুরতিক্রমনীয় হইয়াছে মাত্র। একটা পরম "পবিত্র অহমিকাই" এখনও জাতিবৃন্দের প্রম আদর্শস্বরূপ—তাই অত্যাচারী রাষ্ট্রকে সংযত রাখিতে সমর্থ এমন কোনও সত্য ও জ্ঞানোদ্ভাসিত মতামতসমষ্টি মানুষ আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কিম্বা কোনও প্রকৃত কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক নীতিরও সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই। আছে কেবল ভয়; এবং খুব সম্প্রতি আর্থিক অবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবারই ভয়—কিন্তু অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে যে এই ভয়ের প্রতিবন্ধকতা বস্তুত কাজের কথা নহে।

তাহার আভ্যন্তরিক জীবনও এক সময়ে তাহার বহির্জীবনেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত

ছিল—(প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অন্তবর্ত্তী মধ্যযুগের কথাই বলিতেছি। প্রাচীন সময়ে, অন্ততঃ কোন কোন দেশে রাষ্ট্রের অন্তর্জীবনে কিছু কিছু উচ্চ আদর্শ ও বিবেকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত যদিও অন্য রাষ্ট্রসমূহের সহিত ব্যবহারে তাহার কিছুই দেখা যাইত না।) তখন নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ধূর্ত্ততা ও অত্যাচার-পরায়ণ, স্বাধীন মত, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন কার্য্য এমন কি ধর্ম্মবিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের একান্ত অসহিষ্ণু এই রাষ্ট্র, বাহিরের দুর্ব্বল জাতিগুলির উপরেও যেমন, অন্তবর্ত্তী ব্যক্তি ও শ্রেণীর উপরও ঠিক তেমনি ভাবেই উৎপীড়ন করিত। কেবল, যে সমাজের উপর ইহার জীবন নির্ভর করিত তাহাকে মোটামুটি রকমে জীবিত, সম্পৎ ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখা একান্ত অপরিহার্য্য বলিয়াই, তাহার প্রতি ব্যবহারে কিছু কিছু কল্যাণপরায়ণতা পরিদৃষ্ট হইত। বর্ত্তমান যুগে, কোন কোন দিকে অবনতি হইলেও অবস্থা অনেকাংশে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র এক্ষণে সমাজ এমন কি তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক এবং শারীরিক সুখসাচ্ছন্দ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া আপনার অস্তিত্ব অর্থযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে। সমাজের বুদ্ধিগত বিকাশ এবং পরোক্ষভাবে নৈতিক বিকাশসাধনও যে তাহার কর্ত্তব্য, ইহা সে বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে। রাষ্ট্র, এই যে বুদ্ধি ও নীতিপরায়ণ সত্তায় পরিণত হইয়া উঠিতেছে—ইহা একটি আধুনিক সভ্যতার বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এবং এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে, মানবের আন্তর্জাতিক জীবনেও যে এই বুদ্ধি ও নীতিপরায়ণতার আশ্রয় অত্যাবশ্যক, এই কথা মানুষের বিবেকের উপর দৃঢ় অধিকার স্থাপন করিয়া বসিতেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীন কর্ম্মশীলতাকে আত্মসাৎ করিবার দাবী, উহা ক্রমাগতই তাহার নিজের নব নব আদর্শ ও সম্ভবপরতা সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—ইহা আর কিছু না হইলেও অসাময়িক; সুতরাং যদি এই দাবী সফলতা লাভ করে, তাহা হইলে মানবের উন্নতিপথে বিষম বিঘ্নরোপন করাই হইবে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর গ্রীসীয়রোমক জগতে যে স্থবিরত্ব আগমন করিয়াছিল, সেইরূপ সুখাবহ স্থবিরত্বেই উন্নতির পর্য্যবসান হইবে।

সুতরাং, রাষ্ট্রের সমীপে ব্যক্তির আত্মবলিদান এবং সুসংহত সমাজের নিকট তাহার স্বাধীন কর্ম্মশীলতাকে সমর্পণ করিবার এই যে আহ্বান, ইহা আমাদের উচ্চতম আদর্শগুলি যাহা চায়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে বর্ত্তমান ব্যক্তিগত অহমিকা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সামাজিক অহমিকায় পরিণত

হয় মাত্র—কিন্তু তাহার এই শেষোক্ত আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও কোন মতেই শ্রেষ্ঠতর নহে, বরং উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগত অহঙ্কারের অপেক্ষা বহু প্রকারে নিকৃষ্টই বটে। বিশ্বহিতের আদর্শ, আত্মবলিদানের আদর্শ, মানবমণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আদর্শ, ক্রমবিকাশশীল বিশ্বমানবতার আদর্শ—এ সকল যেমন তেমনই থাকিতেছে—কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করা এই আদর্শসমূহের অর্থও নহে, তৎসাধনের ইহা উপায়স্বরূপও নহে। মানুষকে শিখিতে হইবে, নিজেকে বিধ্বস্ত করিতে নয়, নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে নয়, পরন্তু মানব জাতির পরিপূর্ণতায় নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়াই তুলিতে—যেমন, তাহাকে তাহার অহঙ্কার ধ্বংস বা অঙ্গহীন করিতে হইবে না, কিন্তু অহং যাহার ছায়া, যাহার স্বরূপপ্রকাশের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টামাত্র, সমস্ত সঙ্কীর্ণ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই বৃহত্তর আমি'র মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া হারাইয়া ফেলাই লক্ষ্য। কিন্তু বিশাল রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির স্বাধীনতাবিলোপ, এ যে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিণাম। রাষ্ট্র আমাদের সমষ্টিগত উন্নতির একটা সুবিধাজনক উপায়—আর অতি স্থূল রকমেরই উপায়মাত্র; উপায় যেন কখনও উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া না উঠে।

সুগঠিত রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বই মানবোন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, রাষ্ট্রভাবের এই যে দ্বিতীয় দাবী, ইহাও একটা অতিরঞ্জিত কল্পনামাত্র। মানবের জীবনে তাহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিকাশের জন্য সমাজের সহায়তা আবশ্যক কিন্তু রাষ্ট্রশাসিত কর্ম্মশীলতা ব্যক্তিগত পরিণতি এবং সামাজিক সাধারণ ক্রমোন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—ইহাই কি সত্য? বস্তুতঃ, ইহা সত্য নহে। সত্য শুধু এইটুকু, যে উহা সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের একযোগে কার্য্য করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধার আয়োজন করিয়া দেয় এবং যে সমস্ত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক উক্ত কার্য্যে প্রভূত বিঘ্ন উৎপাদন করিত, তাহার অপসারণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের প্রকৃত উপকারিতার এইখানেই শেষ—ইহার অধিক আর কিছু সে করিতে পারে না। মানবের সম্মিলিত কর্ম্মশীলতা কতদূর উপকারী, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থতাই ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিত্ববাদের দোষ; আবার উক্ত সম্মিলিত কার্য্যের উপকারিতাটুকুর দোহাই দিয়া, রাষ্ট্রের কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তনপ্রয়াসেই টিউটনীক সমষ্টিবাদের দুর্ব্বলতা নিহিত। রাষ্ট্র যখন সমাজের সম্মিলিত কর্ম্মশীলতাকে আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হয়, তখন সে একটি বিপুলকায় যন্ত্র গড়িয়া বসে, আর পরিশেষে মানবের স্বাধীনতা, মৌলিকত্ব, বিকাশ-বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনই এই যন্ত্রের একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র অতি স্থূল, মোটামুটি রকমের কার্য্য করিতেই বাধ্য ; জীবদেহে যে স্বেচ্ছানুসারী, সামঞ্জস্যময়, বুদ্ধি অথবা সহজসংস্কারচালিত বিচিত্র কর্ম্মশীলতা পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ করিবার ইহার সামর্থ্য নাই। কারণ রাষ্ট্র জীব নহে, যন্ত্র বিশেষ মাত্র ; যন্ত্রেরই মত, বুদ্ধি, রুচি, সুকুমার বৃত্তি, উচ্চ প্রেরণা এই সমস্ত বিরহিত হইয়াই তাহা কার্য্য সম্পাদন করে। ইহা শুধু উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মানব ইহজগতে আসিয়াছে সৃজন করিতে। রাষ্ট্রশাসিত শিক্ষাপ্রণালীর কথা ধরা যাউক। সার্ব্বজনীন শিক্ষার আয়োজন করা শুধু যে উচিত তাহা নহে, ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে ; আর এই আয়োজনে রাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণেই সহায়তা করে। কিন্তু যখন সে শিক্ষার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে, শিক্ষা তখন গতানুগতিক চর্ব্বিতচর্ব্বন মাত্র হইয়া দাঁড়ায় ; সে প্রাণহীন প্রণালীতে ব্যক্তির মৌলিক প্রতিভা, পরিণতি, সত্য বিকাশ, অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। রাষ্ট্র একরূপতায় (uniformity) পক্ষপাতী হইয়া থাকে, কারণ উহাই তাহার পক্ষে সহজ ; তাহার প্রাণশূন্য প্রকৃতিতে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে ? কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীনতা মৃত্যুই, জীবন নহে। জাতীয় সাধনা, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষার অদ্যাপি প্রয়োজনীয়তা আছে, কেবল দেখিতে হইবে তাহা যেন একদিকে বিশ্বমানবভাবের, অন্যদিকে ব্যক্তির চিন্তায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া না উঠে ; এইরূপ জাতীয়ত্ব সমষ্টিচৈতন্যকে বিশিষ্টতাভূষিত করে, জাতির সমগ্র জগতের সভ্যতায় যাহা দেয় আছে, তাহার অর্পণ সুকর করিয়া তুলে। কিন্তু রাষ্ট্রশাসিত শিক্ষা, ধর্ম্ম অথবা সভ্যতা বস্তুতঃ অস্বাভাবিক দুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর আমাদের সামাজিক জীবনের অন্যান্য বিষয়েও এই একই নিয়ম বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন পরিমাণে কার্য্য করে মাত্র।

মানবের জীবনে, মানবের আত্মবিকাশে রাষ্ট্র যতদিন একটা আবশ্যকীয় উপাদান বিশেষ থাকিবে, ততদিন তাহার কার্য্য শুধু সম্মিলিত কর্ম্মসাধনের সুবিধার আয়োজন করা, বাধা বিঘ্ন দূরীভূত করা, প্রকৃত ক্ষতিকর অপব্যয় ও সংঘর্ষ নিবারণ করা (অবশ্য কিছু কিছু অপব্যয় ও সংঘর্ষ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ক্রিয়ার পক্ষেই আবশ্যক ও উপকারী) এবং যতদূর সম্ভব অন্যায় ও অবিচার অপসারিত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির আপন শক্তি ও স্বভাবনির্দ্দেশিত উপায়ে আত্মবিকাশ ও চরিতার্থতার পথ সুপরিষ্কৃত করা। আধুনিক সমাজ-বিপ্লববাদীগণের আদর্শ এই পর্য্যন্ত আসিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে বাস্তবিকই ন্যায় সঙ্গত ও সুন্দর হইত কিন্তু যে পরিমাণে ইহা মানুষের উন্নতির স্বাধীনতায় অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করে,

সেই পরিমাণেই উহা ক্ষতিকর। সম্মিলিত কার্য্যও যদি ব্যক্তিগত বিকাশের সহিত (যাহার উপরেই প্রকৃত সার্ব্বজনীন উন্নতি নির্ভর করে) সামঞ্জস্য না রাখিয়া সমষ্টিগত অহমিকার মধ্যে ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে উহাও অহিতকর হইয়া উঠে এবং মানবজীবনকমলের পূর্ণোদ্গমের জন্য যে স্বাধীন সুযোগ ও মৌলিকতার ক্ষেত্র আবশ্যক তাহা অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। যতকাল মানুষ না পূর্ণপরিণত হইতেছে, যতদিন তাহার উৎকর্ষ ও সমধিক পরিপূর্ণতার আবশ্যক আছে ততদিন সর্ব্বসাধারণের স্থির অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল হইতে পারে না; আবার যদি সমষ্টির অন্তর্গত ব্যষ্টিগুলি সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেও এই নিত্যবর্দ্ধমান মঙ্গল কখনও সম্ভব নহে। যে সব সমষ্টিভাব, ব্যক্তিকে অন্যায়মাত্রায় অনুগত করিবার চেষ্টা করে, সে সকলের মধ্যে উন্নতির আদর্শটী প্রকৃতপক্ষে উন্নতির নহে, একটা স্থিতিশীল অবস্থারই। সে স্থিতিশীলতা, হয় বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত, না হয় অদূর ভবিষ্যতে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিবার আশামাত্র করে। কিন্তু তাহার পর কোনও গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রয়াস, সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-শৃঙ্খলার শান্তি, গতানুগতিক জীবন ও স্বচ্ছন্দতার বিরুদ্ধে, অধীর ব্যক্তিত্বের দারুণ অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। চিরকাল ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া থাকে ও সকলকে অগ্রগমনে বাধ্য করে; সমষ্টিমাত্রের স্বভাব—প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার মধ্যেই নযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় সংস্থিত থাকা। উন্নতি, বিকাশ, বিশাল হইতে বিশালতর সত্তার অনুভূতি ব্যক্তির পক্ষেই পরম সুখপ্রদ ধর্ম্ম; কিন্তু স্থিতিশীলতা, নিশ্চল শান্তি—সমাজের ধর্ম্ম ইহাই। এবং যতকাল সমাজ জাগ্রত সমষ্টিচৈতন্যস্বরূপ না হইয়া এইরূপ স্থূল আর্থিক উদ্দেশ্যমূলক বস্তুমাত্র হইয়া থাকিবে, ততকাল তাহার এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইবে না।

সুতরাং, মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থার সাহায্যে একটা সুষ্ঠ কল্যাণকর বিশ্বমানবসম্মিলনের প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভবপর নহে; বিভিন্ন শক্তিশালী, সুগঠিত রাষ্ট্রগুলিকে একত্র ও পরস্পরকে সযত্নপ্রতিষ্ঠিত, সুনিয়মিত, ন্যায়নীতিবদ্ধ সম্পর্কসূত্রে সংগ্রথিত করিলেও তাহা হইবে না; অথবা আধুনিক জাতিমণ্ডলীর শৃঙ্খলাবিশৃঙ্খলায় বিমিশ্রিত সম্পর্কের পরিবর্ত্তে একমাত্র বিশ্বরাষ্ট্র—সে রোমকদিগের মত একটী বিশাল সাম্রাজ্যের আকারই গ্রহণ করুক, অথবা তাহা স্বায়ত্তশাসনকারী রাজ্য সমূহের সম্মিলিত ঐক্যই হউক,—তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেও সুসিদ্ধ হইবে না। এইরূপ একটা বাহ্য রাষ্ট্রীয় একতা, মানবজাতিকে তাহার সম্মিলিত জীবনের ধারণা, অভ্যাস, সম্ভবপরতায় অভ্যস্ত করিবার

জন্য অদূর ভবিষ্যতে নির্দ্ধারিত থাকিলেও থাকিতে পারে—কিন্তু গভীরতর, সত্যতর ও অন্তরতর কিছু সৃষ্টি করিয়া উঠিতে না পারিলে, শুধু ইহাতে কখনও প্রকৃত স্থায়ী ও কল্যাণকর উপায়ে মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। এরূপ না হইলে, সেই প্রাচীন জগতের আভজ্ঞতাই আর একটু বড় রকমে, বিভিন্ন অবস্থা ব্যবস্থার মধ্যে পুনরভিনীত হইবে মাত্র; প্রকৃতির এই অভিনব পরীক্ষারও ব্যর্থতার পর্য্যবসান হইবে, এবং তৎপরে আর একটা বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতাময় পুনর্গঠনকারী যুগেরই আগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। হইতে পারে এই অভিজ্ঞতাও মানবজাতির পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু আমরা যদি বাহ্য উপায়গুলিকে গৌণস্থান দিয়া প্রধানতঃ নীতি ও আধ্যাত্মিকতাবিধৌত নবীন মানবজীবন গঠন করিয়া আমাদের উন্নতির সত্য ধারাটী ধরিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে সেই শোচনীয় অভিজ্ঞতার পরিহারেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

যোগা।

(৮)

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মন ও বুদ্ধির শুদ্ধি অসম্ভব। মনের পরই চিত্ত সম্বন্ধে সাধকের ধারণা সুস্পষ্ট থাকা চাই।

স্বভাবতঃ চিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত। মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভোগের এবং বুদ্ধির চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতির সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের প্রথম ভাগে এক-প্রকার তরঙ্গ-স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকেই অনুভূতি, রস, আবেগ (emotions) বলা হয় আর চিত্তের দ্বিতীয় স্তরটী চিত্রগুপ্তের ভাণ্ডার-স্বরূপ। এইখানে জন্ম জন্ম সঞ্চিত সংস্কারবাশি সুপ্তস্মৃতিরূপে (Passive memory) সংরক্ষিত থাকে। ইহজন্মের প্রবৃত্তিরাশি জীবননাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয় না। ঐগুলি সংস্কাররূপে জীবের সঙ্গে সঙ্গেই যায়; মানুষ আবার জন্ম পরিগ্রহ করিলে মূলাধারস্থিত ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে ফলবান্ হইয়া জীবকে অশেষ-ক্লেশ দেয়। আমরা সবিস্তারে চিত্তের এই দুইটী ভাগের কথা বর্ণনা করিব।

চিত্তের প্রথম যে স্তর, উহাই আবেগের ক্ষেত্র। কালীশক্তির ইচ্ছাতেই এই আবেগের সৃষ্টি। আবেগ না জন্মিলে জীবের কোন কার্য্যেই উৎসাহ হয় না

বদ্ধজীব যে কোন কার্য্য করে, উহা প্রত্যক্ষভাবে কালীশক্তির প্রেরণায় নহে। বাসনা এবং আবেগ এই দুইটী জীবকে কার্য্যক্ষেত্রে উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই আবেগ কিরূপে জীবের চিত্তে সমুৎপন্ন হইয়া কিরূপে কার্য্য করে।

চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থই বিশ্বজননীর হাতের যন্ত্র—তাঁহার ইচ্ছাতেই নড়াচড়া, এই যে আমরা অনন্ত প্রকারের কর্ম্মসৃষ্টি করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রিয় অপ্রিয়, ভাল মন্দ নানা অভিনয় করিতেছি, ইহা কি আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না মায়ের লীলা? আমাদের ইচ্ছায় যদি আমরা একটী তৃণখণ্ডকেও দগ্ধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও না হয় এ বিশ্বশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির উপর আস্থাস্থাপন করিতে পারিতাম। উপনিষদের ঋষি উপাখ্যান অবলম্বনে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন——

"কেনেষিতং পততি, প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ....."

সেই কালীশক্তির ইচ্ছাই আবেগরূপে জীবের চিত্তে স্পন্দনের সৃষ্টি করে; তাঁহারই ইচ্ছায় যে আমরা সকল কার্য্য করিয়া থাকি—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যই যোগ সাধনার আবশ্যকতা।

চিত্তে যে আবেগের উদয় হয়, উহা তিন প্রকারের—ভাবের উদ্দীপনা, অনুভূতির উদ্দীপনা ও কর্ম্মের উদ্দীপনা।

প্রথম, মায়ের ইচ্ছা সহস্রদল হইতে বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া কখন কখন জীবের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া একরূপ স্পন্দনের সৃষ্টি করে—উহাকেই ভাবের উদ্দীপনা বলে। কখন সহজ প্রেরণারূপে, কখন প্রত্যাদেশরূপে জীবের চিত্তে এই যে ভাবের উদ্দীপনা উহা জীবকে কোথাও কবি, কোথাও ভক্ত, কোথাও প্রতিভাবান, কোথাও বা বিশ্বাসী করিয়া তুলে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাবোদ্দীপনা যথেষ্ট উপকারী বটে, কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহা অতি অনিষ্টপ্রদ। কেন না প্রকৃত পক্ষে কালীর ইচ্ছা হইলেও উহা বুদ্ধির অলক্ষিতভাবে চিত্তে আসিয়া উপনীত হয়, তখন চিত্তের বহু পূর্ব্বস্মৃতি, সংস্কার, ভাবের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং উহা যখন বুদ্ধিতে গিয়া পুনরায় আঘাত করে, তখন নানা ভাব ও কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া বিকৃত আকারেই পরিণত হয়; ফলে ঐ ভাবোদ্দীপনায় জীবের স্তিতর দিয়া মায়ের অসম্পূর্ণ লীলাই প্রকাশ পায়। কিন্তু যোগী চায়—শুদ্ধ লীলা, অবিকৃত আনন্দ, পরিপূর্ণ দেবজীবন।

তারপর অনুভূতির স্পন্দন। ইহাকেই প্রকৃত পক্ষে আবেগ (emotion) বলা হয়। দশ ইন্দ্রিয়কে দশ দিকে ছড়াইয়া, মন এবং বুদ্ধির যে কার্য্য তাহারই আঘাতে চিত্তে যে ভাব উৎপন্ন হয় উহাকেই অনুভূতির উদ্দীপনা বলে। এক্ষণে সাধক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন—মন এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কোন কার্য্যই কেন সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। ভাবের উদ্দীপনা যেরূপ চিত্তে আসিয়া বিকৃতদশা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ মন এবং বুদ্ধির চিন্তা চিত্তের অশুদ্ধ

আবেগে সেইরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ পায়। সেই জন্যই যোগী সর্ব্বাগ্রে তাহার সমগ্র আধারযন্ত্রটীকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবেন।

এই অনুভূতির উদ্দীপনা আবার দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য। যাহা সত্য, তাহাই নিত্য, যাহা বিকৃত উহাই অচিরস্থায়ী, অনিত্য। প্রেম সত্য, জ্ঞানানুমোদিত, মানুষের বিবর্ত্তনধারায় উহা অবিকৃত থাকে; ঘৃণা প্রেমেরই অজ্ঞানপ্রসূত বিকার মাত্র। সেইরূপ তেজস্বিতা সত্য, ভীরুতা—বিকার; পরদুঃখকাতরতা, করুণা—নিত্য; পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা—অনিত্য। যাহা নিত্য উহাই ধর্ম, আর অনিত্যই অধর্ম। অবশ্য এই যাহা বলা হইল, ইহা সনাতন আদর্শেরই কথা—লৌকিক অথবা সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় এখানে উল্লিখিত হয় নাই। আবার এই অনিত্য বিকারগুলিরও কিছু আবশ্যকতা আছে—কেন না বিকৃতের মধ্য দিয়াই মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর নিত্য ধর্ম্মের পথে চলিয়াছে। এই অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধর্ম্মের আশ্রয় যোগীকেই করিতে হইবে।

অতঃপর কর্ম্মের উদ্দীপনাগুলির কথা। সাধারণ জীব আবেগপরবশই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রেম, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি উত্তেজক বৃত্তিগুলিরই প্রেরণায় সে উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। অশুদ্ধ জীব—শুদ্ধ বৃত্তির যে আস্বাদ তাহা জানে না; জীবের কামনা বাসনা না থাকিলেও সে যে কার্য্য করিতে পারে, এ কথায় সে বিশ্বাস করেনা।

এইবার চিত্তের দ্বিতীয় স্তরের কথা। যাহা আমরা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, বোধ করি, অনুভব করি, সকলেরই ছবি এই স্তরে অঙ্কিত হয়। মরণকালে সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিকে লইয়া আমরা মহাপ্রস্থান করি। যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করি—পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবৃত্তিগুলি সংস্কাররূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা যে কখন কখন ন্যায় অন্যায় কার্য্য করি; উহা এ সংস্কারের ফলে। যোগী কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঐ সুপ্ত সংস্কারগুলি দর্শন করেন—যোগের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কার নিচয় নির্বীর্য্য হইয়া যায়।

এক্ষণে এই চিত্তকে লইয়া যোগী কি করিবে? ইহজন্মের প্রবৃত্তির উৎপীড়নেই সে ব্যতিব্যস্ত—আবার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার তাহাকে নানা মত, নানা ভাব, নানা ধারণার বশবর্ত্তী করিয়া যোগের সরল পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। যোগী যেরূপ করিয়া বুদ্ধি এবং মনকে শান্ত করিবার জন্য কালীর হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে, চিত্তকেও সেইরূপ দর্শনমাত্র অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে। কালী যেমন বুদ্ধিকে সৃষ্টি করিয়াছেন চিন্তা করিবার জন্য, কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার জন্য নয়, চিত্তকে সেইরূপ তাঁহার শুদ্ধ ইচ্ছার আবেগ-ধারণ করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন—তাহাকে কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেও হইবে না, চিন্তা ও ভাবসৃষ্টি করিতেও হইবে না। ভাবোচ্ছ্বাস মানুষের কার্য্যকে স্বভাবানুযায়ী রঙ্গীন তুলিকায় রাঙ্গাইয়া তুলিবে মাত্র; মানুষ ভরিয়া উঠিবে প্রেমে, সাহসে, গর্ব্বে, সত্য অভিলাষে, আত্মবিশ্বাসে—কিন্তু সেই-

গুলি জীবনের কার্য্যের নিয়ামক হইবে না। কোনও বিশেষ উত্তেজনায় পড়িয়া সে কোনও কার্য্যই করিবে না—সে কর্ম্ম করিবে পুরুষের ইচ্ছায়; বিজ্ঞানময়কোষ দিয়া সে কালীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবে মা কোন্ কার্য্যটী কেন এবং কিরূপভাবে করিতেছেন এবং চিত্ত দিয়া, হৃদয় দিয়া সেই কার্য্যকে উপযুক্ত ভাবানুপ্রাণিত করিবেন। দুষ্ট-বুদ্ধি, আসুরী বুদ্ধি কালীর ইচ্ছাকে স্বীয় যুক্তিতর্কে বিকৃত করিয়া ফেলে—আসুরী চিত্তও সেইরূপ সেই অশুদ্ধ আবেগে সেই ভগবদিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। মায়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মা আর এইরূপ হইতে দিবেন না।

যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তাঁহারা বুঝিবেন, নিঃসংশয়ে বুঝিবেন—যে মাতৃ-শক্তি আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন—আমাদের বাসনা কামনা, ভাবনা কল্পনা প্রভৃতি না থাকিলে তাঁহার কার্য্য পূর্ব্ববৎ বিকৃত ও দীর্ঘসূত্রীভাবে প্রকাশ না হইয়া, সুশৃঙ্খলে অবারিত দ্রুতগামিতার সহিতই বিকশিত হইতে থাকে। অন্যথা মানুষের অহংজ্ঞান এই ভগবদিচ্ছাকে বিকৃত করিয়া তুলে। আমাদের বিজ্ঞান-ময়কোষ হইতে ইচ্ছারূপিনী মাতৃশক্তি বুদ্ধি, মন, প্রভৃতির মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, যে যন্ত্রটীর যে কার্য্য কেবল সেই কার্য্য করিলেই যোগী কালীর আদেশ লাভ করেন—শুদ্ধ যোগীই এইরূপ আদেশ লাভের অধিকারী—পরন্তু যাঁহারা অশুদ্ধ তাঁহারা অহঙ্কারের দ্বারাই কর্ম্মসৃষ্টি করেন—পরন্তু মনে করেন ইহাই বুঝি মায়ের আদেশ।

এক্ষণে, যে সকল সংস্কারে চিত্ত সমাচ্ছন্ন থাকে—এগুলি হইতে চিত্তকে মুক্ত করিতে হইবে। চিত্তের আবেগ আসিলেই আমরা কার্য্য করিব না, পরন্তু সেই আবেগ, সেই রস ভোগ করিব; কার্য্য করিব, বিজ্ঞানে যখন পুরুষের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে এবং সেই ইচ্ছাই আমাদের যন্ত্রবৎ পরিচালন করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চিত্তের যে রসোচ্ছ্বাস, উহাকে ধ্বংস করিতে হইবে না—সে যে কালীর রসলীলা—উদ্দীপনা শুদ্ধ হইলে উহা উদ্বেলিত হইয়া মনকে ও বুদ্ধিকে আর বিচলিত করিবে না; পরন্তু অগাধ সমুদ্রে, তরঙ্গহিল্লোলের মত কালীর সর্ব্ববিধ ইচ্ছার আবেগতরঙ্গ উঠিবে, পড়িবে, নৃত্য করিবে মাত্র। যখন দেখিবে চিত্তের এই উচ্ছ্বাস কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চঞ্চল নয়, কোন তৃপ্তিবিধা-নের জন্য উদ্বেলিত নয়—কেবল ভগবদিচ্ছায়, প্রেমে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, পরদুঃখ-কাতরতায় নৃত্যশীল মাত্র—তখনই বুঝিবে তোমার হৃদয় শুদ্ধ হইয়াছে। যখন, পরোপকার বৃত্তি জাগরিত হইবে, উহা একপ্রকার আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবে; কিন্তু সেই বৃত্তি কর্ত্তৃক কিছুতেই চালিত হইবে না—যতক্ষণ না ঐ বৃত্তি ব্যতীত একটা প্রত্যাদেশ উপর হইতে লাভ না কর। অবশ্য প্রথম প্রথম এইসব অসম্ভব ও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে কিন্তু যন্ত্রগুলির অশুদ্ধতা বিদূরিত হইলেই দেখিবে, যন্ত্রাতিরিক্ত কোন্ গভীর প্রদেশ হইতে মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে।

ভারতের ব্রত।

শক্তির তাড়িত-প্রবাহ সমগ্র পৃথিবীতে প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। কালচক্রে বর্ত্তমান জগৎ রজোগুণান্বিত, অতএব অনুকূল ইন্ধনে সংগ্রামবাসনা সকল জাতির মধ্যেই সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। ভোগবাসনাতেই মানুষের মধ্যে তীব্র রজোগুণের প্রকাশ হয়, জীবের অন্তঃপুরুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়ায় অশুদ্ধ রজোগুণ মানুষকে এমন রক্তপিপাসু করিয়া তুলিয়াছে। জগতের সকল জাতিই আজ স্ব স্ব স্বার্থ সংসাধনে নিরত—জগতের রাজনৈতিক গগন গভীর তমসাচ্ছন্ন—দেখিতে দেখিতে ইউরোপের প্রায় সমুদয় বীর জাতিবৃন্দই সমরাহবে যোগদান করিল—আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র প্রধান শক্তি নীরব রহিল—জানি না সুদূর ভবিষ্যতে জগতের পরিণতি কোথায় দাঁড়াইবে।

বৈদেশিক বা ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিব—আমরা কেবল দেখাইতে চাই—জগতের যে কর্ম্মদ্যোতনা এবং আধার ভেদে তাহার যে বিকাশ, সেই প্রবাহে ভারতবর্ষ কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। আমরা ঐ তত্ত্ব আধ্যাত্মিকভাবেই আলোচনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা জানি—মানুষ ভগবানের হাতের যন্ত্র, সুতরাং সে যাহা করে তাহার মূল কারণ সেই ভগবৎ প্রেরণাই। মানুষের যে বাসনা, মানুষের যে আবেগ—উহাও ভগবানের প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নহে; তবে ঐ প্রেরণা যে চিত্ত এবং প্রাণ দিয়া ধারণা করি—ঐ চিত্ত এবং প্রাণ অশুদ্ধ থাকিলেই শক্তির ইচ্ছা বিকৃতাকারে দেখা যায়—আধার ভেদে ভগবানের একই ঈষণা বিভিন্নাকারে বিকশিত হয় মাত্র।

অহংআশ্রিত মানুষের কর্ম্মাশয়ে ভগবানের শক্তি সঞ্চারিত হইবামাত্র, মানুষ সেই সুযোগে তাহার বাসনানুযায়ী কার্য্য করে; যে সৌভাগ্যবান্ সে অকৃতকার্য্যতার মধ্যেও জ্ঞানের সন্ধান পায়—আর দুর্ভাগা সেই যে বার বার বিফল মনোরথ হইয়াও এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়।

আজ জগতে যে বিপুল কর্ম্মস্রোতঃ দেখা দিয়াছে—এই আবর্ত্তে পড়িয়াই জার্ম্মণী তাহার চিরবাঞ্ছিত ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল, কেন না

জার্ম্মাণজাতির আধার এইভাবেই গঠিত হইয়াছিল; এইরূপে এই সুযোগে প্রত্যেক জাতিই তাহাদের বাসনানুযায়ী চরিতার্থতার মোহে হাবুডুবু খাইতেছে—আয়র্লণ্ডও সামান্যমাত্র সুযোগ পাইয়াই ব্রিটীশসিংহের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া বসিল—গ্রীস এই কর্ম্মস্রোতঃকে উপেক্ষা করিয়া আজ সুরধুনী-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র গজের মত ওলট পালট খাইতেছে—জাপান ও আমেরিকা এই মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাদের ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারতা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে—এত কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে ভগবানের ইচ্ছাস্রোতঃকে বাধা দিতে কেহই পারিবে না—প্রবল বন্যায় যেমন সকল নদীনালা ডুবিয়া যায়—আজ জগতের সর্ব্বঘটে মায়ের লীলা আধারভেদে বিভিন্নরূপে বিকশিত হইবেই।

সনাতনধর্ম্মী হিন্দু—আজ তোমাদেরও নিষ্কৃতি নাই—তোমাদের ভাঙ্গাফুটা আধারগুলিও এই নবীন প্রবাহে পূর্ণ হইবে, তাই আজ নূতনবার্ত্তা শুনাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।

যখন বিশ্বের কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়াছেন, তখন আর উপায় নাই, সে শক্তির তীব্রবেগ আমাদের জীর্ণ আধার ভেদ করিবেই—অতএব হে সাধক, এই শুভযোগ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাহার আয়োজন আমাদের করিতেই হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ আজ সমগ্র ভারতের দিকে লক্ষ্য কর—দেখ সকলের প্রাণে এক নূতন আশা এক নূতন আকাঙ্খার উদয় হইয়াছে—সে নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া নানাজন নানা কার্য্যে জীবন মরণ পণ করিয়াছে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বলিয়াই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটীশের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস করিতেছে শুনিয়া যেমন আমরা চমৎকৃত হই নাই, আবার মিলিত রাজশক্তির সাহায্যার্থ কয়েকজন বাঙ্গালীযুবক যুদ্ধ যাত্রায় চলিয়াছে শুনিয়াও সেইরূপ আমরা বিস্মিত হই নাই—ভারতেও আধারভেদে বিভিন্ন বিকাশের সৃষ্টি হইবে—সে ত সম্ভব অসম্ভব দেখিবে না—তুমি বাসনামুক্ত হও আর না হও, এই যে বিশাল কর্ম্মোন্মাদনা, তোমার ভিতর প্রবেশ করিবেই।

কিন্তু কথা হইতেছে, ভগবানের এই সার্ব্বভৌমিক মহাশক্তির বিকাশ জীবের প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিকশিত হইবে—আজ ভারতবর্ষও যদি কোন বিশিষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকে তবে তাহাকেও তদনুযায়ী হইয়া উঠিতে হইবে, এবং সেই প্রবৃত্তি যদি শুদ্ধা না হয় তবে অতি অসম্পূর্ণ কার্য্যই প্রসব করিবে।

তাই আজ আমাদের শুদ্ধ হইতে হইবে—আমরা আবেগ এবং বাসনার উত্তেজনায় অটল থাকিব—কালীর ইচ্ছা যতই শুদ্ধ হউক না কেন, ইহা যদি বাসনা এবং

আবেগের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার একমাত্র পথ পায়, তবে চিরকালই আমাদিগকে অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। সেইজন্য মা আজ আমাদের চিত্ত এবং প্রাণকে যোগ সাধনায় পরিশুদ্ধ করিবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে উন্মুখ হইয়াছেন —যোগ সাধনায় বিশুদ্ধ হইয়া আমরা মায়েরই অঙ্গুলি সঙ্কেতে কার্য্য করিতে চাই।

আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে লীলা ছাড়িয়া যোগাবলম্বন করিতে আহ্বান করি—লীলাই প্রকাশ—যোগের দ্বারা ভগবানের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলনসূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলে খণ্ডলীলাই বারম্বার প্রকাশ হইয়া পড়িবে কিন্তু, ভারত যদি খণ্ডলীলার নিকেতন হইত, তাহা হইলে কলির প্রারম্ভে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুত্থান হইত না, ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যলাভে উন্মত্ত হইয়া আবেগভরে ক্ষুদ্রত্বের বিকাশ হেতু গীতার বাণী প্রচারিত হয় নাই—গীতার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অথবা দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। আজ যে বিপুল কর্ম্মপ্রবাহে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত সেই প্লাবন আমাদের উপর দিয়াও প্রবাহিত হইবে—আমরা এই দৈবী-শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া যে ক্ষুদ্রতায়, যে নীচতায়, যে দীনতায় শত শত বৎসর অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি—তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাই। আমরা এই সুযোগে আমাদের ক্ষুদ্র বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব না হই—ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে ভগবান্ যে নবীন পূর্ণজীবনের অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করিতেছেন—আমাদিগকে তাহারই সমীপে দেহ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে—তবেই আমরা ভবিষ্য-বিশ্বজীবনে আমাদের যে উদার, মহান্, পবিত্র দেয় অংশ আছে, তাহা বিতরণ করিবার যোগ্যতা উপার্জ্জন করিতে পারিব।

মহিমা।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে ভারতের কাহিনী বড়ই সমস্যাপূর্ণ। এই ভারতবর্ষ খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দী হইতে বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বহুবার আক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, তত্রাচ ইহার মৌলিক ক্ষতি যে কিছু হইয়াছে, এরূপ বলিয়া মনে হয় না। ভারতের আভরণরাশিই

লুণ্ঠিত হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু ভারতের প্রাণ, জাতীয়ত্ব—তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

* * *

ভারত বিপর্য্যস্ত। অন্নাভাবে দীন হীন কাঙ্গালের মত সে দিন যাপন করিতেছে বটে, কিন্তু বল দেখি কতদিনের প্রাচীন আমাদের এই দেশ—কত প্রতিকূল সংঘাতের প্লাবন তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে—কত উৎপীড়ন, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আত্মমহিমা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অপরদিকে দেখ, জগতের সর্ব্বত্র এই দীর্ঘ যুগে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কত দেশ, কত জাতি উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ভারত তাহার সনাতন ধর্ম্ম লইয়া মহামহীরুহের মত জগতে আপনার অস্তিত্ব সমানভাবেই সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

* * *

ভারতবিজয়ের আশায় গ্রীক আসিয়াছে, পারসীক আসিয়াছে, মোগল পাঠান পর্ত্তুগীস আসিয়াছে—আজ তাহারা কোথায়—তাহাদের কি আছে? ভারতবর্ষের এই জীর্ণ দেহের এতই লাবণ্য যে আজও কত নূতন নূতন জাতি তাহাতে প্রলুব্ধ—ভারত অমর, দীর্ঘযুগ ধরিয়া সে কত দেখিল—বুঝি জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে দেখিবে—কামধেনুর মত সে সমগ্র জগৎকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ।

* * *

বিপুলকায় বলিয়া ভারত শ্রেষ্ঠ নহে, অমর নহে—রোম সাম্রাজ্যও বিরাটাকার হইয়াছিল, পৃথিবীর অর্দ্ধস্থান ব্যাপিয়া কয়ও বিরাজ করিতেছে। ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই ভারত শ্রেষ্ঠ নহে, সে ঐশ্বর্য্য তাহার গিয়াছে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের ধনরত্ন বিদেশীর বানিজ্য নীতিতে বাহির হইয়া যাইতেছে—বীরকুল প্রসবিনী বলিয়াই ভারত শ্রেষ্ঠ নয়—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে তাহার সে গৌরবের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? তবে ভারতের শ্রেষ্ঠতা কিসে? ভারতের প্রতিষ্ঠা মহিমায়।

* * *

এই মহিমা কি? 'দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব'—ভয়ঙ্কর ভেদ, বিচিত্র বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানই মহিমার লক্ষণ—'মহিমা মাধুরিমা নহে, বিশালতাও নহে'—সমস্ত দ্বন্দ্বের মিলন ঘটাইয়া ভেদ বহুলতার মধ্যে অভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে চিরযুগ বর্ত্তমান,

সেই স্বমহিমায় মহিমান্বিত। ভারতবর্ষ নিত্যযুগ ধরিয়া এইরূপ বৈচিত্র্যের সমতা সম্পাদন করিয়াছে—সে গ্রাস করিয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম, গ্রীকের সকল দর্শন, মহম্মদের একেশ্বরবাদ, পাশ্চাত্যের ঈশা মুসা প্রভৃতি।

* * * *

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী হিন্দুচরিত্রে একবার আশার দেখিয়া ওয়ারফিল্ড বলেন, আমরা ভারতের প্রাণের সন্ধান পাইয়াছি—সেখানে কি বিমল শান্তি, কি নির্ম্মল প্রেম, কি একতার, মিলনের মধুর অচ্ছেদ্য বন্ধন!

* * * *

এই ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা ভারতের প্রাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—সাধক উপরের বৈষম্যদর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন, ভারতের অসংখ্য হিন্দুর বাহ্যজীবন দেখিয়া চমকিত হইলে চলিবে না; নানাবিধ বেশ ভূষার পার্থক্য, ভাষাগত বিষম বৈষম্য, আচার ব্যবহারের ভিন্নতা প্রভৃতি, প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিকাশ মাত্র; কিন্তু প্রতি হিন্দুর অন্তঃকরণে একই বেদের মন্ত্রশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে—একই ভাগীরথী কেবল উত্তর পশ্চিমবাসী ও বাঙ্গালীর উপাস্য নহে—সমগ্র ভারতবাসী গঙ্গাবারি স্পর্শে পবিত্র হইবার আকাঙ্খা রাখে—একই তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন পরিচ্ছদধারী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী আসিয়া একই দেবতার উপাসনা করে—ভেদ কোথায়? দাক্ষিণাত্যের শঙ্কর, রামানুজ, উত্তর পশ্চিমের শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বঙ্গের গৌর নিতাই, রামকৃষ্ণ সমগ্র ভারতের যখন উপাস্য দেবতা, তখন ভেদ কোথায় ভাই? ভারত একপ্রাণ, এক মন, এক জাতি, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত।

* * *

তবে এমন কেন? কি হইয়াছে ভারতের? অনুদার শিক্ষা ও ধর্ম্মমতে তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে—ভারতের মহিমাদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাই আপনাদের অসার ও অপদার্থ মনে করিয়া বালকের মত চঞ্চল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতেছ? স্থির হও—যোগদৃষ্টি লাভ কর—মায়ের লীলা দেখিয়া শান্তি লাভ করিবে।

———:*:———

করেন। ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া তৎকালীন ভারতের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয়—সে আজ ৩০ বৎসরের কথা কিন্তু এতদিন ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ঠিক ঐ সময়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসীভারতে "কন্সক্রপ্সন" আইন প্রবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করেন—কিন্তু আশ্চর্য্য, এই সুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র অন্ততঃ চন্দননগরের জননেতাগণ এক সভা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন, পরে ফরাসীভারতের গবর্ণর বাহাদুর চন্দননগর পরিদর্শনে আগমন করিলে সকলে সমবেত হইয়া তৎকালীন তন্তুবায়কুলতিলক ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কে প্রমুখ করিয়া করযোড়ে কাতর বচনে এই "কন্সক্রপ্সন" আইন, যাহাতে পাশ না হয়, তাহার জন্য আবেদন করেন—সেই অবধি এই প্রস্তাব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। চন্দননগরের বাঙ্গালী অধিবাসীগণের তৎকালীন কাতরতার কথা ভাবিলে আজ আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী বচনে যতই অগ্রসর হউক না কেন কার্য্যে তখনও ততটা তৎপর হইয়া উঠে নহে—কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের পর দেশের মধ্যে যে জাতীয়ভাবের উদ্বোধন ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালী যে আজ সর্ব্বকর্ম্মে পটু হইয়া উঠিয়াছে, একথা আর অস্বীকার করা চলে না।

বাঙ্গালীর অভাব ছিল—আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের; আজ ভগবানের কৃপায় সদ্বিবেচক নেতৃবৃন্দের সুশিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-জীবনের আলোচনায় দেশটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার বিকাশ এই দশ বৎসরের মধ্যে এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহা দেখিলে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়।

স্বদেশীযুগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা নৈসর্গিক ঘটনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী-চরিত্র কত স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, ইহার উপর রাজানুকূল্য থাকিলে সোণায় সোহাগা হইত। আমাদের মনে পড়ে, দেশের নরনারীগণের মানমর্য্যাদার রক্ষার জন্য অর্দ্ধোদরযোগে শিক্ষিত যুবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খলার দায়িত্ব সকল কার্য্য সম্পাদনের কথা ; দেশের শাসনকর্ত্তারাও একবাক্যে ইহাঁদের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন ; তারপর বর্দ্ধমানের বন্যাপীড়িত দেশবাসীর দুর্গতি দূর করিবার জন্য যুবকগণের আত্মত্যাগ বাঙ্গালীর চরিত্রোৎকর্ষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সকল মহান্ উদার নিঃস্বার্থ কর্ম্ম বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের পরিচয় মাত্র।

তারপর ১৯১৪ সালে ইউরোপে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। এই মহা নরমেধযজ্ঞেও বাঙ্গালী আপনাকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিতে পরাঙ্মুখ নয়। ১৯১৫ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রজাতন্ত্র ফরাসী রাজ্যের প্রতিনিধি পয়কার (President Poincare) আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে ফরাসীভারতের হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছাসৈনিকের পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে, এই আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হয়। পরে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফরাসীভারতের গবর্ণর মার্তিনো মহোদয় ফরাসী প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব সহ এই আজ্ঞা নগরে নগরে প্রচার করেন। সংবাদপত্র পাঠকগণ এ সকল সংবাদ অবগত আছেন। পরে, কেবল বাঙ্গলীর ক্ষুদ্র সহর চন্দননগরেই এই আজ্ঞা কিরূপ উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইয়াছিল তাহাও সকলে বিদিত আছেন।

এ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ব্রিটীশ-বঙ্গে বহুদিনের আশা সফল করিবার উদ্যমে নব ইন্ধন সংযোগ হইল—এই কার্য্যে অমৃতবাজার পত্রিকাকেই সবিশেষ উৎসাহান্বিত দেখিয়াছি। ডাক্তার এস কে মল্লিক, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর প্রভৃতি বাংলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। সম্প্রতি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান যুদ্ধকালে বাঙ্গালী-যুবকগণকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন—৩০ বৎসরের আকাঙ্খা আজ আংশিকভাবে সফল হইয়াছে দেখিয়া বাঙ্গালীর মহানন্দ উপস্থিত হইয়াছে। যে বাঙ্গালী চিরদিন বিদেশীর চক্ষে দুর্ব্বল ভীরু বলিয়া উপেক্ষিত হইত, আজ কোন্ সকল কারণে সে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহার আলোচনাক্ষেত্র এ নহে ; যাহা হউক বাঙ্গালীর নিতান্ত দুর্দ্দিনেও ইহা আশার কথা।

চিরদিন বাঙ্গালী দুর্ব্বল ছিল না, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয়। পাল, সেন প্রভৃতি বংশীয় রাজন্যবৃন্দ বাঙ্গালী সেনার সাহায্যেই বঙ্গদেশ রক্ষা করিতেন; মুসলমান আমলেও রাজা গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল; আকবরের সময়ও প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি দ্বাদশভৌমিকের প্রতাপে দিল্লীশ্বরকেও সশঙ্ক থাকিতে হইত; সে দিনও পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ে মীরমদন, মোহন লাল বীরদর্পে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; চন্দননগরের কিঙ্কর সেন ও যোগীন্দ্র নাথ সেনের কথা কাহারও অবিদিত নহে। ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালীও যে বীরভূষণে ভূষিত হইতে পারে তাহার পরিচয়—ব্রেজিলের বিপ্লবে বিজয়ভূষণে ভূষিত সুরেশচন্দ্র। ফলে, বাঙ্গালীর চরিত্র ক্ষেত্রাভাবে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার ভিতর বিপুল সম্ভবপরতা প্রসুপ্ত আছে। সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী প্রতিভায়, প্রেমে, বলবীর্য্যে পৃথিবীতে অজেয় হইতে পারে। এই কারণেই কি বিদেশীয় লেখকেরা আমাদের যোগ্যতা বুঝিয়াও আমাদের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কের লেখা মাখাইয়া জগতে প্রমাণ করিতে চাহেন, আমরা ভিরু, কপট, বিশ্বাসঘাতক! প্রকৃতপক্ষে, বাঙ্গালী ক্ষেত্র পাইলে, তাহার চরিত্রের বিকাশ ঘটাইতে পারে, কারণ আমরা বহুবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ যে একটা সঙ্কল্পপরায়ণ মহাজাতি—কেবল সুপ্ত, মোহগ্রস্তমাত্র। যাহা হউক, চন্দননগরের ষষ্ঠবিংশ ভদ্রসন্তানকে ফরাসী রণবিদ্যালয়ে রণকৌশল শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিতে দেখিয়া আমরা যেরূপ আশান্বিত হইয়াছি, ব্রিটীশ বঙ্গেও ২২৮ জন, বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগদান করিবে শুনিয়া আমরা তেমনি উৎফুল্ল হইয়াছি।

এক্ষণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের পুনরাধিকারের সুযোগ যেন হেলায় না হারাই —ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মাথায় করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে চলিয়াছেন।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান সমরান্তে ভারতের ভাগ্যাকাশে নূতন দীপ্তি প্রকাশ পাইবেই— ভারত ভাগ্যদোষে রাজশক্তির নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা প্রেমের প্রতিষ্ঠাই আমরা চাই— যে প্রেমের বলে, পরস্পরের জীবনে সখ্যভাবে আলিঙ্গন ও সহায়তা সম্ভব হইবে। তাই, আনন্দের মধ্যে এ কথাটাও স্মরণ রাখিতে হইবে—এই অল্প, এই আংশিক সাফল্যকেই যেন আমরা চরম বলিয়া গ্রহণ না করি—রাজশক্তির অনুগ্রহ নহে কিন্তু প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণ জীবনই আমাদের লক্ষ্য।

ধর্ম্ম-সাধনা।

স্বামীজি বলিয়াছেন "শাক্ত মানে মদভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহা-শক্তির বিকাশ দেখেন।"

আমাদের দেশেও এক প্রকার শাক্ত আছেন—তাঁহারা তান্ত্রিক বলিয়া পরি-চয় দেন। গৃহস্থসংসারে তথাকথিত যে দীক্ষাপ্রথা প্রচলিত আছে—উহা শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই দুই নামে অভিহিত। বৈষ্ণব যাঁহারা, তাঁহারা গোস্বামী মহা-শয়গণের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন—আর শাক্ত, তান্ত্রিক গুরু, ভৈরবী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির মন্ত্রশিষ্য।

এই দুই সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বে যথেষ্ট বিবাদ বিসম্বাদ পরিদৃষ্ট হইত, স্থানে স্থানে এখনও যে নাই এরূপ নহে—তবে ততটা প্রকট নহে, বাংলাদেশে তান্ত্রিক সাধনার প্রভাবই সমধিক। সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্ত, আর আজু গোঁসাই ছিলেন বৈষ্ণব—এতদুভয়ের মধ্যে মিলন ছিল না।

রামপ্রসাদ যদি গাহিতেন—

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥"

আজু গোঁসাই তদুত্তের সঙ্গীত রচনা করিতেন—

"ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥"

রামপ্রসাদ যদি গাহিলেন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারিফল কুড়ায়ে খাবি॥"

আজু গাহিলেন—

কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি॥"

সম্প্রতি "নারায়ণে" কবি কুমুদরঞ্জন "বৈষ্ণব" নামক এক কবিতার উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন—বলা বাহুল্য সাধনার দিক দিয়া এইরূপ ভাব বড়ই সঙ্কীর্ণ,

বড়ই অনুদার ; ইহা মানুষকে বড়ই অপদার্থ করিয়া তুলে। বৈষ্ণবগণের উপাস্য পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু তাঁহার সবখানি লইবার ইঁহাদের যোগ্যতা নাই এবং অধিকারী হইবার উৎসাহও দেখি না। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিলেন, গাণ্ডীবের টঙ্কারে রণস্থল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন—সেটুকু বাদ দিয়া ইঁহারা মাখনচোরা বংশীধারীর কদম্বের মূলে দুগলরূপের পিরীত করিয়া বেড়ান—এঁরা শক্তি চান না, ভক্তি চান—সাহস চান না, প্রেম চান ; চির ভিখারীর ত্যাগ আর ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়-সংযমের মত ইহাঁদের প্রেম ও ভক্তি যে কত অকিঞ্চিৎকর ইহা বলাই বাহুল্য। স্বামীজির কথাতেই বলি—"যে বীর সেই ত্যাগ করতে পারে ; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচ্ছে আর একহাতে দান করছে, তার দানে কি ফল ? জগৎপ্রেম, আমরা বলি কৃষ্ণপ্রেম, তার অনেক দূর।"

আমরা প্রকৃত বৈষ্ণবের নিন্দা করি না—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যাঁহারা কৃষ্ণানুরূপ চরিত্র লাভ না করেন, তাঁহারা ভণ্ড। প্রেমে রস আছে, বীরত্বে কি রস নাই ? পুরুষ হইয়া যদি রমণীসুলভ চঞ্চল নয়নে চাহনীটুকুর অনুকরণ ভক্তি-সাধনার অঙ্গ হয়, আর "পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" এই বজ্রনির্ঘোষ বাণী কি কৃষ্ণভক্তের ধেয় নহে ? একটা কথা আছে—জাত হারালে বৈষ্ণব হয়, আজ কাল অন্ন আসর বিপদপূর্ণ দেখিয়া অনেকেই এই খণ্ড প্রেমের বৈষ্ণব হইতেছেন। ইহা কি সুলক্ষণ ? তারপর তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা। বৈষ্ণবগণের মত ইহাদের সাধনা খোল করতাল সংযোগে নগর সংকীর্ত্তনের মত স্বপ্রকাশ নহে, ইহা অতি গোপন—"গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।" আজ আমার একটা কথা মনে পড়িতেছে—ভক্তবীর শ্রীরামানুজ গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রগ্রহণ অভিলাষে অষ্টাদশ বার প্রত্যাখাত হইয়া যখন ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—তখন গোষ্ঠীপূর্ণের করুণা হইল। তিনি সাদরে রামানুজকে আহ্বান করিয়া মন্ত্ররাজ দান করিলেন এবং কহিলেন—"এক বিষ্ণু ভিন্ন ইহার মাহাত্ম্য আর কেহ অবগত নহেন। আমি তোমায় মহান্ আধার বলিয়া জানি—সেই জন্যই ইহা তোমায় দান করিলাম। কলি কালে ইহার দ্বিতীয় অধিকারী নাই। ইহা শ্রবণে নিশ্চয় দেহান্তে মুক্তি লাভ করিবে—অতএব ইহা আর কাহাকেও দিবে না।"

সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়া রামানুজ আপনাকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি পথে যাইতে যাইতে যাহাকে

সম্মুখে দেখিলেন তাহাকেই আহ্বান করিয়া বলিলেন—"এস ঐ মন্দিরদ্বারে তোমাদের অমূল্য রত্ন দিব।" রামানুজের পবিত্র মুখশ্রী ও দৃঢ় অথচ সরলতাপূর্ণ বচনবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা, তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের মত মহাজনতা মন্দিরদ্বারে সমবেত হইল—তখন মহাপুরুষ এক উচ্চবেদীর উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন—"প্রাণাধিক বন্ধুগণ, সংসারের জ্বালা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যদি পরম ধামে যাইতে ইচ্ছা কর—তবে শোন, আমি এক অমরমন্ত্র লাভ করিয়াছি, আমার সহিত বার বার উহা উচ্চারণ কর।" কাতর জনসংঘ রামানুজের অমানুষিক সারল্যপূর্ণ বাক্যে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল—"বলুন, বলুন, আমাদের কৃতার্থ করুন।" তখন রামানুজ মায়ামলিন সন্তাপিত সংসারকীটদিগের মুক্তির ইচ্ছায় হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে ভক্তিভরে—"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। গভীর রোলে গগন পূর্ণ হইল—সমগ্র জনমণ্ডল সারাদিন ভগবানের অমৃতময় নাম কীর্ত্তনে গোপুর পবিত্র করিল। এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণগোচর হইল; রামানুজ গুরু সমীপে আগমন করিবামাত্র—তিনি সরোষে কহিলেন—"দূর হও নরাধম, তোমার নরকেও স্থান হইবে না।" রামানুজ ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন—"আজীবন নরকবাসও শ্রেয়ঃ যদি আপনার সিদ্ধমন্ত্রে নগণ্যবাসী মুক্তি পায়।" জগদ্ধিতায় সাধুগণের আগমন—এমন সৎসাহসপূর্ণ তান্ত্রিক কে আছ, যে পৌত্তলিকতুল্য সঙ্কীর্ণ গুপ্ত প্রথার মস্তকে পদাঘাত করিয়া জগতের উদার ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া যাহার যে ধর্ম্মবিশ্বাস তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিবে? কৈ তেমন সাধক কৈ? সাধনার সর্ব্বজীবে ভগবানের বিকাশ জানিয়া বন্ধন খোল, বন্ধন খোল বলিবার মত লোক কোথা? স্বামীজি তুমি আর একবার, নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এস—জগতের সর্ব্বত্র তোমার বজ্রকঠোর আদেশ আর একবার প্রচারিত হউক।

আপনার মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া, তোলাই তান্ত্রিকসাধকের মূল মন্ত্র। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সকল বিকাশকে ইঁহারা কতকগুলি বিকৃতাচারের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ও নিরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। সাধনার কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকিলে চলে না—উদ্দাম প্রকৃতির মহাশক্তিবলে মানুষ মন্দকার্য্য করে সেও শ্রেয়ঃ কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করিয়া কি লৌকিক, কি সামাজিক, কি পৌরাণিক কোনরূপ নিয়মের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকা শ্রেয়ঃ নহে। যন্ত্রচালিত বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পাটকলের বিকট এঞ্জিন বিনা চলে খুব ভাল, কিন্তু মানুষ এমন

নিয়মবদ্ধ হইয়া পড়িলে জড়ে আর চৈতন্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। শক্তি-সাধকগণ এ তত্ত্ব বুঝেন, তাই তাঁহারা সংযমের চেয়ে প্রবৃত্তির তৃপ্তিতে অধিক অনুরাগী, তাই সমাজবন্ধনের পক্ষপাতী নহেন, দারুণ স্বেচ্ছাচারী। বৈষ্ণব যেমন লোকদেখান তিলকসেবার পিছনে রক্তমাংসের আবেগ ও ঠেলায় বিভ্রান্ত—ইহারাও সেইরূপ উপরের বেশে সাধু, ভিতরে গোপনে গোপনে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ষোল আনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব তবু প্রতিক্ষেত্রেই আহা কি করিলাম, কি করিলাম বলিয়া কার্য্যান্তে আক্ষেপ করেন—শক্তিসাধকের আর কিছু না হউক, পাপে, ভোগে হাহা করা নাই—ইহারা পাষণ্ড—শুধু পাপ গোপন রাখিতে পারিলেই হইল। তবুও, বৈষ্ণবের চেয়ে তান্ত্রিকগণ অধিকতর সাহসী এবং স্পর্দ্ধাশীল।

অধিক কথা ভাঙ্গিয়া বলিবার আবশ্যক নাই—মোটকথা কি বৈষ্ণব কি তান্ত্রিক এক একটা খণ্ডত্বের মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছেন। সাধনসাহায্যে ভিতরের ইচ্ছাশক্তি যদি জাগ্রত হইয়াই না উঠিল, তবে এমন সাধনার আবশ্যকতা কি? আমরা ঈশ্বরের এই ইচ্ছাশক্তিকে আমাদের মধ্যে সফল করিতে চাই—তাই আমরা বৈষ্ণব, তান্ত্রিক কোনও অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিনা—জীবের সকল কার্য্যের মধ্যে এই শক্তির খেলা দেখিয়া আমরা চরিতার্থ হইতে চাই।

বাসনানুযায়ী ইচ্ছাশক্তিকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া বাংলার ধর্ম্মসাধনা মানুষকে জড় করিয়া তুলিতেছে; আমরা বাংলার তথাকথিত ধার্ম্মিকগণের অপেক্ষা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিচালিত মানুষকে অধিক ভাল বিবেচনা করি। গোপনে বাংলার কুল-লক্ষীগণের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের লীলাভিনয় করা অপেক্ষা যাঁহারা মটর চালাইয়া বারবনিতার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মুক্তির আশা সমধিক। বিধবাকুল মজাইয়া গোপনে সুরাপান করিয়া চক্রসাধনা অপেক্ষা প্রকাশ্যে টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিয়া সেরীস্যাম্পেন-সেবীর দল অল্প পাপাচারী।

সর্ব্বনাশ করিল আমাদের দেশটাকে ধর্ম্মের ভণ্ডামীতে। এই ধর্ম্মের দায়ে আমাদের সমাজ মৃৎপিণ্ডপ্রায়। সমাজের এই সব ধর্ম্মধ্বজীগণ যত অধিক কাপুরুষ এমন আর কেহ নহে। তাই স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াই আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার

কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহা মূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চির প্রস্রবণ হইত।"

যাহা হউক, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কুৎসা রটনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—তবে যে ধর্ম্মের দ্বারা বাংলার সমাজজীবনে প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায় তাহার নিরাকরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রেমই বল, ভক্তিই বল, শক্তিসাধনা না করিলে কিছুরই প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আবার এই শক্তিসাধনাও ত বহুকাল ধরিয়া বাংলায় প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে—কিন্তু কৈ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির সফল বিকাশ বড় কোথাও দেখিলাম না ত? সাধনা ত আত্মতৃপ্তি নহে—শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য, স্থানানুযায়ী, অবস্থানুযায়ী একটা জীবন না হয় আমরা স্বপ্রবৃত্তির দাস হইয়া অহঙ্কারের তৃপ্তি লইয়াই থাকিতে পারিলাম—কিন্তু জীবনের ঊর্দ্ধগতি ত অনন্ত পথের জন্য একান্তই আবশ্যক—তাই বলি, হে বাংলার উদীয়মান তরুণসংঘ, খণ্ড সাধনার কুহকে আবিষ্ট হইয়া পরিপূর্ণ জীবন লাভের পথে অগ্রসর হইতে উদাসীন থাকিও না। মনে রাখিও শ্রীকৃষ্ণই এ যুগের আদর্শ—তবে তাহার মধুর লীলাটুকুর অবতারণা করিয়া ভাবের ঘরে চুরি করিও না—কৃষ্ণনামে আত্মতৃপ্তিকেই শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিও না।

সাধনার কালে আমরা যেন মনে রাখি যে আমিই আমার ঈশ্বর, আমার ইচ্ছাতেই আমি বড় হইতে পারি, আবার হীন, তুচ্ছ, অপদার্থ হইতে পারি—আমি বুদ্ধি, মন, চিত্ত প্রাণ শরীরের অধিকারী; বুদ্ধি প্রভৃতি যন্ত্রনিচয় যেন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ না হয়। এই আমি অকর্ত্তা, কেন না, আমার শক্তি অনন্ত অসীম। মোহাচ্ছন্ন বলিয়া এতদিন এই শক্তির সম্যক বিকাশে আমিই অন্তরায় ছিলাম—তাই ইহার সম্যক বিকাশ সম্ভব হয় নাই। আজ আমারই আদেশে এই শক্তি আমার মধ্যে জাগ্রত হউক—এই আত্মশক্তিবলে আমার রাজ্যের কোন খানে অবিদ্যার বাস যেন সম্ভব না হয়। বুদ্ধি হইতে শরীর পর্য্যন্ত শক্তি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়া এ জীবন দেবত্বে পরিণত হউক। আঘাতে আঘাতে এই শক্তি আমার মধ্যে জাগ্রত হউক। "কাঠ নেড়ে দিলে জ্বলে উঠে, সাপের মাথায় আঘাত কর্‌লে সে ফণা ধরে।" বাহির হইতে আজ এই যে আঘাত পড়িতেছে, তাহার সংঘর্ষে আমাদের আত্মশক্তিই স্বাধীনভাবে বিকশিত হউক; হে মানব, ইহাই সত্যপথ, যুগধর্ম্ম; ইহাই প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনা।

প্রশ্নোত্তর।

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—

১। কালীশক্তি কল্পনা করি কেন, অর্থাৎ ঐশশক্তির উপর বিশ্বাসে কি দরকার? থাকিলেই বা, তাঁহার অনন্তশক্তি কোথায়? আমি নিজে দীন হীন কোথায়? এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিব কেন?

২। আত্মোপলব্ধির (Realisation of self) সঙ্গে এই আত্মসমর্পণ যোগের সম্বন্ধ কি? অর্থাৎ Are we to surrender ourselves to God or Kali (or whatever unknown Sakti it may be) in realising ourselves?

৩। আত্মসমর্পণ কতখানি করবো? অথবা এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে আমার চেষ্টার (personal efforts) কি সম্বন্ধ থাকিবে?

১। ভগবান্—যিনি বহু হইয়াছেন। (Being which becomes everything) যে মূল পদার্থ দিয়ে জগতের বিচিত্র সৃষ্টি রচিত হইয়াছে, অবশ্যই সেই অনাদি সূত্রটীর নাম থাকা উচিত—উহাই ভগবান্, ব্রহ্ম, God. এই ভগবদ্‌বস্তুই বহু হইয়াছেন। ইহাত কল্পনা নহে। বেদে, উপনিষদে, হিন্দুর সর্ব্ব-শাস্ত্রে এতত্ত্ব ঋষিগণ জলদমন্দ্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একটী মূল উপাদান না থাকিলে কোন বস্তুর বিকাশ সম্ভব নহে। ভগবানই মূল এবং সৃষ্টিই তাঁহার শাখা প্রশাখা। এক্ষণে যে শক্তি দ্বারা তিনি বহু প্রকাশ, তাহার নাম কালী রাখিতে আপত্তি কি? ভগবানের ইচ্ছাই কালীশক্তি। এই কালীশক্তি অনন্ত কিনা, তাহা কি বলিয়া দিতে হয়? এই ভগবদ্‌বিকাশের আদি অন্ত আছে কি? আমি দীন হীন, কেননা এই রহস্য জানি না—আমি যে কে তাহা ভুলিয়া আছি। আমিই যে আমার ঈশ্বর এবং আমার অনন্ত ইচ্ছাশক্তির বলে, যেসকল বন্ধনের দাস হইয়া মরমে মরিয়া আছি, তাহা এক মুহূর্ত্তে কাটাইয়া উঠিতে পারি—অথচ পারিনা বলিয়াইত আমি দীন হীন। অহঙ্কারই সাধনার অন্তরায়, অহংআবরণে আমি আমাকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া অনন্ত প্রকৃতির খেলায় বাধা দিতেছি; সেইজন্য এই কালী-শক্তির হস্তে সকল ভার দিয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইব—

সনাতন স্বরূপদর্শন করিবার জন্যই আত্মসমর্পণ একান্ত প্রয়োজন।

২। Self-Realisaton—অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির সম্ভব হইবে না যদি এই ইচ্ছাশক্তির হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমিই আমার ঈশ্বর; আমারই ইচ্ছাশক্তিরূপ কালীর হস্তে আমার যন্ত্রনিচয়কে সমর্পণ করিব (প্রবর্ত্তকের ধর্ম্মসাধনা শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগ দেখুন)।

৩। আত্মসমর্পণ যোগপদ্ধতি। আমরা ধারাবাহিক নানাবিধ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এ তত্ত্ব নানাভাবে প্রচার করিতেছি। আত্মসমর্পণ করিব ষোল আনা। নিজের (personal) চেষ্টা কি? এই person কে? আমি! আমি! আমার ইচ্ছাই আমার শক্তি—ইচ্ছা করিয়াই মোহগ্রস্ত হইয়াছি,—কর্ত্তা সাজিয়া ক্ষুদ্র চেষ্টা করিতেছি, বিফল হইতেছি—আবার ইচ্ছা করিয়াই দেবতা হইব, দেবতার মত অকর্ত্তা, নির্লিপ্ত, সাক্ষী ও ভোক্তাভাবে সকল জগৎ ভোগ করিব। এমন সঙ্কল্প করাই আমার সাধনা।

পরিশেষে বক্তব্য—পত্রপ্রেরক যে উদাহরণ দিয়াছেন উহা দ্বন্দ্ব (Struggle)—এরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া আত্মসমর্পণ যোগ গ্রহণ নিতান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধগুলি মনোযোগ-সহকারে পড়িয়া যাইবেন—এরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকল কথা বুঝান কষ্টকর। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

———:*:———

সমালোচনা।

গম্ভীরা—আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা।

প্রথমেই বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রাণস্বরূপ ও বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফীর ছবি সমন্বিত হইয়া আষাঢ়ের গম্ভীরা গৌরবান্বিত। উভয় সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে "জাতীয় জীবনের একতম ভিত্তি ও আমাদের চাকুরী" উল্লেখযোগ্য শ্রীকালীদাস রায়ের অনর্গল লেখনীপ্রসূত কবিতা মায়াবিণী গড় গড় করিয়া পড়িয়া গেলাম—এ সকল কবিতায় পাঠকের হৃদয়ে কোনও নূতন ভাব উদ্দীপিত করে না। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "ভাষা বিজ্ঞান" ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের "বিবর্ত্তনের কারণ

নির্দ্দেশ" ধারাবাহিক-প্রবন্ধ। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষের "জন রাস্কিন ও তাহার শিক্ষানীতি," শ্রীসতীশচন্দ্র সেনের "পাশ্চাত্য কর্ম্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" প্রভৃতি কুদ্র প্রবন্ধে গভীরার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তের "ইউরোপের দান" প্রবন্ধই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা ইহাতে বেশ একটী মৌলিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান হাতড়াইয়া দীর্ঘ প্রবন্ধরাজি বঙ্গ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই—কিন্তু লেখকের প্রতিভা জগতের পুরা-তন আলোকের উপর নূতন আলোকপাত করিলেই তাহা অত্যন্ত মনোমদ হইয়া থাকে। "ইউরোপের দান" এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালী আবেগ প্রবণ জাতি। যখন যে বিষয়ে ঝোঁক যায়, তখন তাহার হাড়হদ্দ করিয়া ছাড়ে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা বাঙ্গালীই প্রথম গ্রহণ করে, আবার উহা জড়-বাদ বলিয়া প্রত্যাখান করিবার প্রস্তাব প্রথম বাঙ্গালীর মুখেই উচ্চারিত হয়। লেখক বলেন, 'সেটা প্রথম যুগের অতিরিক্ত ভক্তির অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র।" নলিনী বাবু পাশ্চাত্য জীবনের মর্ম্ম-স্থল সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিকতা একদেশদর্শী হওয়ায়, "হয় উঠিয়া যাইতে হইবে পরমাত্মার অক্ষত, অব্রণ, শুদ্ধতার মধ্যে, নচেৎ শূকরের মত মূত্র-পুরীষের মধ্যেই থাকিতে হইবে। ইহার গত্যন্তর নাই, ফলে জীবন সম্পর্কশূন্য হইয়া সে ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের মত জড়বাদী না হইয়াও ভারতবর্ষ ইউরোপের অপেক্ষা অধিক জড় হইয়া উঠিয়াছে।" "ভারতের আধ্যাত্মিকতার অর্থ শুধু আত্মার স্বরূপে ডুবিয়া থাকা নয়, রূপের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে সেই আত্মা কিভাবে প্রকাশিত, কিভাবে কর্ম্মপর তাহা দেখা, তাহা বুঝা, অনুভব করাও আধ্যাত্মিকতা"—জগদীশচন্দ্র ভারতের আধ্যাত্মিকতার সহিত ইউরোপের বাস্তবিকতা একসূত্রে মিলাইয়া "স্থূল দৃষ্টির সাহায্যে ঋষিদৃষ্টিকে ব্যাখ্যা দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নূতনত্ব ও মহত্ত্ব"—এইরূপ সুন্দর সুললিত ভাষায় লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রের ভাবী সুফলের একটী আভাষ দিয়াছেন।

দুর্গোৎসব।

বাংলার শোচনীয় দরিদ্রতা নিবন্ধনই হউক, অথবা কালপ্রভাবেই হউক, মূর্ত্তিপূজার হ্রাস হইয়াছে। বৃদ্ধগণ এই শারদীয়া মহোৎসবের সময় প্রায় দুঃখ প্রকাশ করেন; তাঁহারা সেকালে প্রতি গৃহে কাত্যায়নীর পূজা দেখিয়াছেন আর আজ ঢাকের বাজনাও কর্ণগোচর হয় না—ইহা যে অধঃপতনের একটী বিশেষ লক্ষণ একথাও তাঁহারা দৃঢ়স্বরে কহিয়া থাকেন।

ঘটে পটে দেবতার আরাধনা ভারতের সনাতন প্রথা না হইলেও বহুযুগ ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার স্থানও যথেষ্ট আছে; এইজন্য এতদ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না; তবে বাংলার এত বড় একটা উৎসব নীরবে জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে ইহাও দেখা যায় না।

এই দুর্গোৎসব জিনিষটা কি? অসুরনাশিনী, সিংহবাহিনী দশভুজার মৃন্ময় মূর্ত্তির পূজা ত বহুদিন করিয়া আসিতেছি—মা প্রকট হইলেন কৈ? শারদীয়া মহাপূজায় সপ্তকোটি বাঙ্গালী জ্ঞানে অজ্ঞানে সপ্তকোটী কণ্ঠে মা মা বলিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মায়ের আসন টলিয়াছে কি? মা সেই অচেতন মৃন্ময় মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপ দিবসত্রয় আলো করিয়া দশমীর দিন বিসর্জ্জিত হইয়া থাকেন—ইহাই বাঙ্গালীর মামুলী দুর্গোৎসব।

সে কোন্ অনাদিকালে—যখন দেবগণ ব্রহ্মশক্তি সমন্বিত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত, অহঙ্কারে সনাতন পুরুষকে ভুলিতে বসিয়াছিলেন—ব্রহ্ম তখন তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি অপহরণ করিয়া সত্যজ্ঞান প্রদান করিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বহুশোভমানা স্ত্রী-রূপিণী হৈমবতী মার মধ্য দিয়াই অন্তঃপুরুষের পুনঃ পরিচয় পাইয়াছিলেন।

তারপর যুগে যুগে দেবগণ যখনই আত্মবিস্মৃত হন, তখনই শক্তিহারা হইয়া অশেষ ক্লেশের পর এই আত্মশক্তিরই উদ্বোধন করেন এবং এই আত্মশক্তির উন্মেষেই বিপদমুক্ত হইয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করেন।

এই সনাতন লীলাই যুগে যুগে প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। দুর্গাসুর, ত্রিপুরাসুর, মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণ যখনই দেবদর্প চূর্ণ করিয়াছে, তখনই দেবগণ শক্তি আরাধনা করিয়া মহাদুর্গার অবতারণা করিয়াছেন এবং এই শক্তি বারবার আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের দুর্গতি দূর করিয়াছেন।

এই জন্যই—

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফোরোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তারপর নরলোকে মহারাজ সুরথ এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া সর্ব্বার্থ সফলকাম হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও রাবণ নিধনকল্পে এই মহাশক্তিই আহ্বান করিয়াছিলেন। আর আজ আমরাও বাঙ্গালী সেই মহাদুর্গার দশ হাতে দশ আয়ুধ প্রদান করিয়া প্রতি বৎসর মহাকালীর পূজা করিয়া থাকি।

ইহাই মহাপূজার আদি কথা। ফলতঃ মহাশক্তির আরাধনা না করিলে জীবের ব্রহ্মদর্শন হয় না, পরমানন্দ লাভ ঘটে না, কিন্তু বেদান্তের দেশ এতকাল এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

আমরা যেমন জড়, যেমন বীর্য্যহীন, যেমন জীবন্মৃত, তেমনি খড়কুটার এক প্রতীক নির্ম্মাণ করিয়া তিনদিন হো হো করিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাই, বিসর্জ্জনের দিন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হইয়া পূজার সব রসটুকু উপভোগ করি। ছি! ছি! এমন করিয়াই কি মহাশক্তির অবমাননা করিতে হয়—এমন করিয়াই কি জগদ্ধাত্রী মহামায়াকে উপেক্ষা করিতে হয়! হে বাঙ্গালি! শক্তি উপাসনার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষ, কিন্তু একবার চাহিয়া দেখ দেখি—মহাশক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার নাই বলিয়া গ্রহচক্রে আজ তোমার কেমন দুর্দ্দশা! তুমি দুর্গোৎসব কর, মহাশক্তির পূজা কর, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণার আরাধনা কর—বাঙ্গালীর "বারমাসে তের পার্ব্বণ" মহাশক্তির উপাসনা মাত্র; কিন্তু তোমার দুর্দ্দশা এমন কেন? শত শত বাঙ্গালীযুবকের মধ্যে ২২৮ জন মাত্র বীরদেহ খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কেন? কেন যুবকবয়সে যৌবনোচিত শ্রী নাই, কেন বাহুযুগল শক্তিহীন, মস্তিষ্ক মেধাহীন? যে জাতি পুরুষানুক্রমে শক্তির

সন্তান—শক্তিই যাহাদের উপাস্য দেবতা, তাহাদের এমন দুরবস্থা দেখিলে, লোকে তোমাদের পূজা পার্ব্বণে বীতশ্রদ্ধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

মা বীণাপাণি ! সাধনার ধনকে যে উঞ্ছবৃত্ত নরাধম জীবিকার্জ্জনের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহার হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া নে—যে রাজনন্ত্র জামাকারে হাত্রয়গ্রাম দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিবে, সে ভাষা আজ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ; যজ্ঞের হবি সারমেয়ের অধিকারে, আর কেন মা ! খুলিয়া দে জ্ঞানের কপাট—সাতকোটী বাঙ্গালী হুহুঙ্কারে আকাশ কাঁপাইয়া বলিয়া উঠুক মা ! মা ! মা !

আজ আমরা মায়ের দেউলে উপনীত হইয়াছি—এবার আমরা যথার্থভাবে দুর্গোৎসব করিতে চাই। এবার পূজার অবসরে কোনও বাঙ্গালী বন্ধন মুক্ত কুক্কুরের মত অযথা বিদেশ ভ্রমন করিবে না ; কোন অসার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্মস্থ মহাপ্রকৃতিকে বিস্মৃত হইবে না—এবার ষষ্ঠ্যাদি কল্প যথারীতি সম্পাদন পূর্ব্বক তিনদিন মহাশক্তির ধ্যান করিতে হইবে—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের নিম্নে যে প্রশান্ত জলস্তর, সাধককেও সেইরূপ বাহির ছাড়িয়া অন্তর মধ্যে এই শান্ত ফল্গুপ্রবাহের অন্বেষণ করিতে হইবে। যে মহাস্রোতঃ বাহির ভেদ করিয়া জগতে স্বর্গরাজ্যের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে উন্মুখী, তাহাতেই সাধক যাহাতে গা ভাসাইয়া দিতে পারে তাহারই আয়োজন করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত দুর্গোৎসব। তারপর দশমীর দিন মাথা তুলিয়া দেখিও যে জগদ্রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মাংসপেশী সবল, প্রাণ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ধৃতি-শক্তিসম্পন্ন—তখন বাহির হইও—মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ সাধক, সাতকোটী ভাই-বোনের মুখে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিবার জন্য—আলিঙ্গনপাশে আপনাপন স্বরূপকে হৃদয়ে মিশাইবার জন্য। আর হাঁকিয়া বলিও—

শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥

যুগ সম্মিলন।

মধ্যাহ্নের খররবিরশ্মি ধরার ধূলি-পৃষ্ঠ প্রতপ্ত করিতেছিল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। প্রকৃতির সেই স্তব্ধ নীরবতা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া কেবল সূর্য্যকরোজ্জ্বললহরী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাগিরথী দেবী তাঁহার যুগযুগান্তরের করুণ গীতিকা তুলিয়া বহিতেছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্ব-উপকূলে, দক্ষিণেশ্বরের স্বনাম প্রসিদ্ধ মন্দির। সেই মন্দিরের উত্তর প্রান্তস্থ গৃহশ্রেণীর মধ্যে শেষ কক্ষখানিতে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়া। সেই প্রশান্ত মুখচ্ছবিতে যেন অমৃত উছলিয়া উঠিতেছে। নয়নদ্বয়ে কি এক দেবদুর্লভ অপূর্ব্ব মধুমাখা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। ললাটদেশ একটু আকুঞ্চিত—কিছু চিন্তাকুল—যেন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। গৃহদ্বার বন্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কাহার কর-স্পর্শে দ্বার খুলিয়া গেল। একটি সুন্দর সৌম্য গৌরবর্ণ যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবকের উন্নত ললাট হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতে ছিল। নয়নদ্বয় গভীর চিন্তাশীলতা এবং ওষ্ঠদ্বয় সিংহতুল্য বীর্য্য, উৎসাহ ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। ইনিই নরেন্দ্র নাথ—ভবিষ্যতের সিংহচরিত্র স্বদেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। উলঙ্গ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ফুকারিয়া উঠিলেন—কিরে এসেছিস্? সে স্বরে কত যুগযুগান্তরের অতি গভীর ব্যাকুল অপেক্ষার ভাব বিমিশ্রিত ছিল কে বলিবে? যুবক নরেন্দ্রনাথ ভূপ্রণত হইয়া রামকৃষ্ণের পদমূলে পড়িলেন। অতি সংক্ষিপ্ত দু একটী মাত্র কথা উভয়ের মধ্যে হইল। কিন্তু ভাগীরথীর উপকণ্ঠে সেই যে সেদিন এক মহামিলন ঘটিল—তাহা কত গভীর কত অপূর্ব্ব, তাহাতে কত বিপুল ভবিষ্য রহস্যের বীজমূর্ত্তি ছিল, পাঠক কোন দিন তাহার ইয়ত্তা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ কি?

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, জগতে অপূর্ব্ব অতি বিচিত্র পুণ্য-লীলার প্রকটন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের তিরোধানের বহুদিন

পরে এক সুন্দর প্রভাতে ভারতের নিশ্চল বক্ষে ভগবদ্কৃপায় নবজীবনীর স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সারা দেশে তামসিকতার ও নির্জ্জীবতার ঘোর কাটিয়া গিয়া একটা বিরাট উৎসাহের স্রোত বহিল। ভারতবাসী নবজাতীয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। যেখানে স্বার্থ সঙ্কীর্ণতার পঙ্কিলতা ছিল, সেখানে প্রীতি ও উদারতা আসিল, যেখানে মোহের ঘোর কালীমা আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আত্মচৈতন্য ফুটিয়া উঠিল। সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ের ভিতর এক অতি পবিত্র স্বর্গীয় দেশপ্রেমের বন্যা বহিল। ভারত ব্যাপিয়া জাতীয়তাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও অখণ্ড আধিপত্য স্থাপিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ বহুদিন পূর্ব্বে এই জাতীয়তার, এই স্বদেশাত্মবোধের পরিগৃহীত মূর্ত্তি প্রাতীক স্বরূপ হইয়া অগ্নিময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছিলেন। আজ তিনিই যেন শত শত অণুমূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া নবভারতরূপে পুনরাবির্ভূত হইলেন।

* * *

আজ বুঝি সেইদিন আসিয়াছে যেদিন সেই পুণ্য মিলনলীলা—ব্যষ্টিভাবে যাহার অভিনয় আমরা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থে দেখিয়াছি—তাহারই সমষ্টিভাবে পুনরভিনয় দেখিব। আজ বুঝি সেইদিন আসিয়াছে, যেদিন নরেন্দ্র নাথ আসিয়া রামকৃষ্ণের চরণোপান্তে বসিবেন, যেদিন সেই উৎসাহ-চঞ্চল ব্যাকুলাত্মা যুবকের মত জাতীয়তাধর্ম্ম চিরযুগের মহাগুরুতুল্য সনাতন ধর্ম্মের নিকট আত্মসমর্পন করিবে। আজ অঙ্গ অঙ্গীর হস্তে অহংকার বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম মহাদ্রুমঃ—অব্যয় অপরিবর্ত্তনশীল অক্ষয়বট—জাতীয়তাধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ তাহার শাখা প্রশাখা। শাখা মহীরুহ কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। সনাতন ধর্ম্ম মাতা, জাতীয়তা তাহার কন্যা। কন্যা মাতার অনুগামিনী হইবেন। সনাতন ধর্ম্ম মহাসাগর, জাতীয়তা তাহার একটী তরঙ্গ—তরঙ্গ সিন্ধুর অঙ্কাশ্রিত হইয়া থাকাই আবশ্যক। সনাতনধর্ম্ম অনন্ত অসীম ভগবানকে লইয়া—দেশ কাল ও নিমিত্তের উর্দ্ধে তাহার স্থিতি। জাতীয়তার বিষয় সান্ত সসীম দেশ—দেশকাল নিমিত্তের শাসনের তলে তাহার স্থান। অনন্ত ও অসীমের কুক্ষির মধ্যে সান্ত সসীমের স্থান—বস্তুতঃ পরিমিত অপরিমেয়ের একটা প্রকাশ মাত্র। জাতীয়তা দেশ কাল ভেদে সনাতনধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র। তাই

জাতীয়তাকে সনাতনধর্ম্মের সহিত তাহার বিস্মৃত যোগসূত্রের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। অহংকারকে ঈশ্বরার্পণ দ্বারা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হইতে হইবে। যদি সমন্বয় মানবের গন্তব্য, লক্ষ্য হয়, যদি শান্তি বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এই আত্মসমর্পণরূপ মহাসমন্বয়মন্ত্র বরণ করিয়া লইতেই লইবে। অংশ যখন পূর্ণের অঙ্কাশ্রয়িত্ব অস্বীকার করিয়া মিথ্যা অহংকারে স্বপ্রধান হইয়া উঠে তখনই ধর্ম্মশঙ্কর উপস্থিত হয়—তখনই বিরোধ, তখনই অশান্তি তখনই অসমন্বয়। সে অসমন্বয় দূর করিবার মানসে ভগবান্ যুগে যুগে প্রতিশ্রুতি মত অবতীর্ণ হইয়া বিস্মৃত সংযোগসূত্র স্মৃতির পথে আনিবার জন্য মহামন্ত্র প্রেরণ করেন। সে মন্ত্র আত্মসমর্পণ—ধীরে ধীরে সেই সমন্বয়পূর্ণ মহাযুগ আসিতে চলিয়াছে। ধীরে ধীরে তাই সর্ব্বক্ষেত্রে এই অমূল্য মন্ত্রের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। তাই জাতীয়তাধর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক ক্রমবিবর্ত্তনের সূত্র অবলম্বনে চলিয়াই, সাগরগামিনী নদীর ন্যায় সনাতন ধর্ম্মের সন্ধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ও তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ আত্মসমর্পণ যেদিন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে—যে দিন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় অহংবিন্দুগুলি একই সনাতন শ্রীকৃষ্ণের চরণমূলে অভেদসূত্রে এক হইবে—সেদিন সব দ্বন্দ্ব, বিরোধ ঘুচিয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তারপর যে লীলার বিকাশ হইবে তাহা অপূর্ব্ব। শ্রীকৃষ্ণের লোকপাবন চরণরেণু স্পর্শে বিধৌতপাপ হইয়া সকলে আপন আপন স্বভাব ও অধিকারে অবস্থানপূর্ব্বক শুদ্ধ নিরহঙ্কারভাবে ভগবল্লীলা পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে। সনাতনস্পর্শে স্নাত ও বিধৌত জাতীয়তাধর্ম্মের প্রকাশ তখন কি অমৃতময় হইবে যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চিত্র স্মরণ করিও।

—:*:—

দুর্গমঃ পথস্তৎ।

কল্পনা যে লোকের সাধক, যে আদর্শটি জগতে কার্য্যতঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি তাহা যে কত বৃহৎ, কত কষ্টসাপেক্ষ তাহা একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা চাই কি? আমরা চাই স্থূল শরীরে দেবত্বলাভ, মরজগতের মধ্যে মরজগতের সহায়ে অমৃতত্বের খেলা। আদর্শটি কি অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় না? মনুষ্যজাতি মধ্যে কয়জন আছে যাহারা এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিতে ভীত হইয়া পড়ে না, কয়জনই বা আছে যাহারা ইহাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে না? আর আমরা যে দুই চারিজন এই আদর্শকে জড়াইয়া ধরিয়াছি অথবা যাহাদিগকে এই আদর্শ জড়াইয়া ধরিয়াছে, আমরাই কি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি আমাদের লক্ষ্য কত দূরপ্রসারী, আমাদের আকাঙ্খা কতখানি প্রয়াস, কতখানি শক্তি, কতখানি সামর্থ্যের অপেক্ষা রাখে? আকাঙ্খা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস সাধকের প্রথম অবস্থায় উপকারী ও প্রয়োজনীয় কিন্তু কেবল ইহাদের সাহায্যেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পথের সমস্ত বিপদ, সমস্ত বিভীষিকা, যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত অথবা গহন গভীর গহ্বর প্রতিপদে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে তাহার একটা সম্পূর্ণ হিসাব না রাখা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। প্রত্যেক বাধাটির সহিত পরিচিত হইয়া, তাহার শক্তির পরিমাপ করিয়া এমনকি তাহার সার্থকতাটুকু বুঝিয়া তবে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা অন্ধদৃষ্টিভরে, শুধু কল্পনার মরীচিকায় উৎফুল্ল হইয়া চলিলে প্রথম বাধার সহিত সংঘর্ষেচূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কাই অধিক।

আমাদের বিরুদ্ধে নাই কি? দেশ কাল পাত্র সমস্তই আমাদের বিরুদ্ধে। সমস্ত পৃথিবী জয় করা আমাদের লক্ষ্য কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু অংশ লইয়া আমাদের এখন অধিষ্ঠান, কর্ম্মক্ষেত্রের কতটুকু আমাদের এভাব মানিয়া চলে? পৃথিবীর পরমাণু সদৃশ কোণটিও অধিকার করিয়া রহিয়াছি কি? তারপর কাল—সহস্র সহস্র বৎসরের গতিবেগ রহিয়াছে আমাদের বর্ত্তমানের পশ্চাতে, আমরা এই যুগধর্ম্মীর ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছি। কোন্ যুগে মর্ত্ত্য ছিল দেবলীলার ক্ষেত্র, আদৌ ছিল কি? কালের এই যে

ঊর্দ্ধ্ব নারগ্রা-প্রপাত, তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ধরিতে হইবে, শুধু তাহাই নয় উহাকে আবার ঊর্দ্ধ মুখা করিয়া চালাইয়া লইতে হইবে। এ কোন্ দুঃসাহস! আর আমাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছি আমরা নিজেরা, আমাদের নিজের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব। পরাঞ্চিখানি—মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বভাবতঃই বহির্মুখী, তাহার বৃত্তি ক্রমনিম্নপ্রসারী। ধূলির প্রতি তাহার কি তীব্র আকর্ষণ, জরামৃত্যু, অজ্ঞানঅশক্তি, খণ্ডতাঅপূর্ণতার দিকেই তাহার সহজ গতি। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে, তাহাকে আজ্ঞানুবায়ী করিতে হইবে—সে ক্ষমতা সে বীর্য্য কাহার সম্ভব?

কারণ, এইটি ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন—দেবজন্ম লাভ অর্থ, মানুষ বলিতে এখন যাহা বুঝি, তাহার প্রকৃতি, তাহার স্বভাব, তাহার ধর্ম্ম, তাহার গুণ, তাহার কর্ম্ম, যাহা আজ কাল নয়, যাহা দেখা যায় যেন অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, সে সমস্ত উল্টাইয়া দিতে হইবে, আর শুধু তোমার আমার মধ্যে নহে, কিন্তু বিশ্বমানবজাতির মধ্যেই। ইহার অর্থ কত পরিশ্রম, কত তপস্যা তাহার অবধি আছে কি? কত সময়ই বা তজ্জন্য প্রয়োজন। আজ আমি যাহা হইয়াছি তাহা গড়িয়া তুলিতে আমার কতযুগ লাগিয়াছে, তাহা কি ফুৎকারেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, না মন্ত্র পড়িয়া নিমিষের মধ্যে পুনর্ব্বার গড়িয়া তুলা যায়। মনকে, প্রাণকে, চিত্তকে, শরীরকে তিল তিল করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছি, ভাঙ্গিতেও হইবে তিল তিল করিয়া, আবার সৃজন করিতে হইবে তিল তিল করিয়া। মানুষ শিশুর ক্রীড়নক নহে যে এক আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যাইবে। মানুষ হইতেছে মহাকায় হিমালয়—ইহাতে কত অভ্রভেদী শৃঙ্গ, কত গহন অরণ্যানী, কত বিকট তুষারপ্রপাত, কত দুর্ব্বার নদীপ্রবাহ, ইহাতে কত জীব কত জন্তু, ইহাতে কত অজ্ঞাত বিভীষিকা। এই হিমালয় কাটিয়া তাজমহল প্রতিষ্ঠা করিবে কোন্ অক্লান্ত কর্ম্মী, কোন্ উন্মত্ত শিল্পী?

সাধারণ মানুষ এই আদর্শ দেখিয়া যে ভয় পাইবে বা উপহাস করিবে তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আর কেহ বা যে অন্য আদর্শ অন্য পন্থা খুঁজিবে তাহাও অস্বাভাবিক নহে। ইহবাদী তাই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিবার আকাঙ্খা রাখে না, কোনরূপে কলে কৌশলে প্রকৃতিকে প্রতারিত করিয়া অথবা তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কিছু আদায় করিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট। আর মায়াবাদী, তিনিও প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তিনি অজেয় বলিয়া জানেন, প্রকৃতিকে এড়াইয়া,

পাশ কাটিয়া, প্রকৃতির অতীত হইয়া তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন।

আমরা যাহারা চাহিতেছি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতিকে জয় করা ও প্রকৃতির মধ্যেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আমাদের এই সকল উদাহরণ বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ অতি ভীষণ ব্যাপার। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ দেখিয়াই আমরা শিহরিয়া উঠি। কিন্তু আধ্যাত্মিক যুদ্ধের তুলনায় এই স্থূল রক্তমাংসের যুদ্ধ কি? প্রকৃতিকে প্রতি সূচ্যগ্র পরিমাণ হইতে হটাইতে যে পরিশ্রম, যে অধ্যবসায় প্রয়োজন তাহার দ্বারা কত ভাদুনের যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। প্রকৃতিকে যতবার একটী স্থান হইতে কোন ক্রমে হটাইবে ততবার সে ফিরিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে—সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া সৈকতবক্ষ হইতে একবার সরিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই আবার আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃতির যে কুটিল সমরনীতি তাহারই বা বিচিত্রতা নিরূপণ করিবে কে? শত্রুভাবে মিত্রভাবে, নিরপেক্ষভাবে, গোপনে প্রকাশ্যে, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ হইতে পার্শ্ব হইতে কখন কিরূপে যে সে আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা কিছু আছে কি?

তবুও প্রকৃতি জয় করিব—এই আদর্শেরই আমরা সাধক। সকল দিক দেখিতে হইবে কিন্তু দেখিয়া প্রাণ নিরাশ হইবে না, হৃদয় দোলাচল হইবে না। সাহস যাহার যত, সিদ্ধি তাহার তত— For the boldest the highest wisdom. চাই শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম, অটুট অধ্যবসায়। ধীরচিত্ত প্রশান্তবুদ্ধি লইয়া বুঝিতে হইবে কোথায় কি জয় করিতে হইবে তাহার কোথায় কি কতখানি প্রতিবন্ধক, তাহারপর ক্রমাগত ছেদহীন অবকাশহীন শক্তিপ্রয়োগ। প্রথম প্রথম পরাজয় হইবেই কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই। পরাজয়ের বিফলতারও বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ শক্তি প্রয়োগেই শক্তির বৃদ্ধি—জয়াজয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও। দ্বিতীয়তঃ বিফলতা অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দেয় সাধকের অভাব, সাধক ধরিবেন কোন্ পন্থাটী। তৃতীয়তঃ বিফলতা বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া সাধকের দৃষ্টি সতর্ক, উদারপ্রসারী, সত্যগর্ভ হইয়া উঠে। ক্রমাগত যে জয়ের মধ্য দিয়া জয়ে পৌঁছিয়াছে তাহার দৃষ্টি চলিয়াছে ঋজুরেখায়, জগতের যত তির্য্যক গতি, যত কুটিল রহস্য যে সকল তত্ত্ব তাহার কাছে আবরিত। সমস্ত জগতের বৈচিত্র্য লইয়া বৈচিত্র্যের মধ্যে অধিষ্ঠানই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন যত বিচিত্রতার উপলব্ধি আমাদের হয়, তাহা জয়

হউক পরাজয় হউক, সুখ হউক দুঃখ হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক ততই আমাদের সাধনার পূর্ণতা।

পথ অতি দুর্গম, সমস্ত প্রকৃতি আমাদের বিরুদ্ধে, বীরহৃদয়ের পুরুষকার লইয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও ইহাই যে সব সত্য এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়াছি কিন্তু কে চালাইয়া লইয়াছে, কাহার প্রেরণায়? যে আকাশকুসুম আমাদের নয়নে প্রতিভাত, যে কল্পনা আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা আদৌ উৎপন্ন হইল কোথা হইতে? দেবজন্মের স্বপ্ন মানুষ বিশ্বাস করে নাই তবুও যুগে যুগে দেখিয়াছে কেন? আমরা মনে করি এ স্বপ্ন প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত ভবিষ্য দৃষ্টি। বাহ্যতঃ প্রকৃতি আমাদের শত্রু কিন্তু তাহারই গুপ্ত প্রেরণা অনুসারে আমরা চলিয়াছি, তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে কার্য্যতঃ প্রতিফলিত করিতে আমরা উদ্যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনা ইহাই—প্রকৃতির এই গুপ্ত ফল্গুপ্রবাহের সহিত মিলিত হওয়া, তাহাকে প্রকটিত করা তাহার বলে জয়ী হওয়া। প্রকৃতি দিয়াই প্রকৃতির জয়—নতুবা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত প্রয়াসেরই বা সাধ্য কি?

এইখানেই যোগসাধনার গুপ্ততন্ত্র। সাধকের নিজের শক্তি, নিজের অধ্যবসায় দ্বারা নিজের অতীত এক শক্তি, নিজের নিগূঢ় এক প্রেরণাকে জাগাইয়া তুলা। প্রকৃতির উপরে রহিয়াছেন যে পুরুষোত্তম তাঁহার যন্ত্রভূত হইবে সাধক, সাধকের শক্তির মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি খেলিতে থাকিবে। তবেই প্রকৃতি চিনিবে আপনার অন্তরতম প্রেরণা, আপনার প্রভুর আদেশ, তবেই সে আদেশ পালনে সে তৎপর হইবে। ইহাতে সাধকের বাহ্য চেষ্টার যে হ্রাস হইবে এমন নয়, পাহাড়-গহ্বর সমতল হইয়া আমাদের জন্য যে কণ্টক-বিহীন পুষ্প-বিকীর্ণ সুরম্য রাজমার্গ উন্মুক্ত করিয়া দিবে তাহাও নয়। সংগ্রাম করিতেই হইবে, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিবে, পদস্খলে রক্তবিন্দু ক্ষরিবে কিন্তু ক্লেশ রহিবে না। কারণ, তখন আমরা জানিব আমাদের শ্রম বিফল নহে—ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? তখন স্থির নিশ্চিত, গম্যস্থান আমাদের আয়ত্তাধীন, অমৃতের পুত্র আমরা, দিব্যধাম আমাদের সম্মুখভাগে।

আধ্যাত্মিকতার কথা।

আমরা 'দেশের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে (৩রা শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২৩) ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিব।

আমরা 'দেশের কথা'য় প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম যে আধিভূতের সঙ্গে অধ্যাত্মের কি সম্বন্ধ? আমরা তাহারই আলোচনা বর্ত্তমানে করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে কোন কথা তুলিবার পূর্ব্বে আমাদের যুক্তিতর্কের সুবিধার জন্য আমরা অধিভূত এবং অধ্যাত্ম এই দুইটি শব্দকে সমঅর্থবোধক আর দুইটী কথাতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইব—সে দুইটী কথা হইতেছে—জগৎ এবং ভগবান্। কারণ অধিভূত এবং অধ্যাত্ম শব্দ দুইটী, একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দার্শনিক। এ দুইটী কথা শুনিয়া অনেকেরই মনে কোন বস্তুতন্ত্ররূপ জাগিয়া উঠে না। এদুইটী শব্দের আলোচনায় আমরা অনেকেই যেন কেবল শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে থাকি এবং সকল প্রকার যুক্তিতর্ক এবং গবেষণার অবসানে অধিভূত নামক পদার্থটী যে অধ্যাত্ম হইতেও ভারী রকমের আধ্যাত্মিক সেই বিষয়েরই একটা অস্পষ্ট ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়ার মত হয়। সেইজন্য আমরা ঐ দুইটী শব্দকে পরিহার করিয়া জগৎ এবং ভগবান্ এই দুইটী শব্দকে গ্রহণ করিব। প্রকৃতপক্ষে অধিভূত এবং অধ্যাত্মকে বস্তুতন্ত্ররূপ প্রদান করিতে গেলে আমরা পাই ঐ দুইটী কথা—জগৎ এবং ভগবান্।

সুতরাং আমাদের আলোচনা আসিয়া দাঁড়াইল এই জগৎ এবং ভগবানে। মানুষের পক্ষে জগৎ বলিতে আমরা কি বুঝি? বুঝি দুইটী জিনিষ—তাহার কর্ম্ম এবং ভোগ। এ জগতে মানুষের যাহা কিছু তাহা ঐ দুইটীকে লইয়া। মানুষের জীবন হইতে ঐ দুটীকে তুলিয়া লইলে তাহার জগতও লোপ পায়। সুতরাং আমরা পাইলাম তিনটী জিনিষ। প্রথমতঃ মানুষ, দ্বিতীয়তঃ তাহার ভোগ ও কর্ম্ম, তৃতীয়তঃ তাহার ভগবান্। এক্ষণে আমাদের আলোচনা এই তিনটীকে লইয়া। এই তিনটীর পরস্পর সম্বন্ধ কি?

ইহাদের পরস্পর যে সম্বন্ধই হউক না কেন বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশের শুধু বাঙ্গলাদেশের কেন সমস্ত ভারতবর্ষেরই নরনারীর মনে মনে এই ধারণাটী বদ্ধমূল হইয়া আছে যে মানুষের কর্ম্ম ও ভোগ এবং তাহার ভগবান্ দুইটি অত্যন্ত বিরুদ্ধ জিনিষ। মানুষকে ইহার একটা লইয়া থাকিতে হইবে—হয় এই জগৎ এই সংসার, নয় ভগবান্। এই ধারণাটী আমাদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ইহা আমাদের মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন প্রশ্ন নাই, সন্দেহ নাই। ইহাই যেন মানুষ সম্বন্ধে ভগবান্ সম্বন্ধে চরম জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে আমরা যেন অহরহঃ আমাদের চোখের সম্মুখে একখানি আলেখ্য লইয়া আছি—সে ছবিতে আমরা দেখি যেন মানুষ রহিয়াছে মধ্যখানে আর তাহার একপাশে রহিয়াছে তাহার কর্ম্ম এবং ভোগের প্রেরণা বিকটাকার রক্তপিপাসু পিশাচের মত মুখব্যাদন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে—আর অন্যদিকে রহিয়াছে ভগবান্ তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া। যাহার সুকৃতি সে ভগবানের দিকে টলিয়া তাহাতে লয় হইতেছে এবং ইহাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য ও সত্যলক্ষ্য—আর যাহার দুষ্কৃতি সে ভোগ এবং কর্ম্মরূপী অসুরের মুখে পতিত হইতেছে—তাহার জীবন অনন্ত নিরয়ে—ইহাই হইল আমাদের বর্ত্তমানের পরিকল্পনা। কিন্তু জগৎ মানুষ ও ভগবানের এই যে চিত্রের পরিকল্পনা, পরস্পরের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ—ইহাই কি সত্য? আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা এবং ভোগপ্রবৃত্তি তাহার অত্যন্ত সত্যবস্তু। সত্যবস্তু এইজন্য বলিতেছি যে এই দুটী জিনিষ তাহার প্রকৃতিগত, জন্মসিদ্ধ। মানুষকে আমরা যতদিন হইতে জানি—অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সভ্য, ধনী, নির্ধন, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিহীন, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক বৃদ্ধ—যেই হউক না কেন—একের সহিত অন্যের অন্য বিষয়ে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন—প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের এই দুইটী গুণ পাইতেছি—যে সে কর্ম্মশীল এবং ভোগ-পরায়ণ। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে সংসারে কর্ম্মবিমুখ এবং ভোগে উদাসীন ব্যক্তি মিলে না, কিন্তু যদি একশতটী আম্র বৃক্ষের মধ্যে নিরানব্বইটী বৃক্ষে আম্রফল ফলিতে দেখি এবং একটী বৃক্ষে তিন্তিড়ি উৎপন্ন হইতে দেখি, তবে তিন্তিড়িটাই স্বভাব বিরুদ্ধ বলিয়া মানিব; এবং আম্রবৃক্ষের আম্রবৃক্ষত্ব তাহাতে অপ্রমাণিত

হইয়া যাইবে না। এমন কি বুদ্ধদেব যিনি সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন তাঁহার প্রথম বৈরাগ্য উদয় হইল জরাক্রান্ত এক বৃদ্ধকে দেখিয়া। হায়! এ দেহের এইত পরিণাম—এ যৌবনময়দেহ আর কত দিনের। যুবক সিদ্ধার্থের এই যে চিন্তা ইহার পশ্চাতে প্রকৃতপক্ষে এই একটী ভাব ফল্গুধারার ন্যায় অন্তরালবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে যে এ দেহ এ যৌবন যদি অনন্ত অব্যয় ও অক্ষয় হইত তবে এ সংসারের সুখভোগে কোন ক্ষতি ছিল না তাহা চেষ্টাসাধ্যই হইত। [illegible] জরামৃত্যু দেখিয়া যদি তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহার মানেই এই যে ঐ জরা এবং মৃত্যুতে তাহার খুব আসে যায়। এবং তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার ব্যর্থতা জরা এবং মৃত্যু ঘটাইবে। যাহা হউক এমন যে নির্ব্বাণ-কামী বুদ্ধদেব তিনিও কর্ম্মের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং' এর তত্ত্ব কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভগবানের প্রতি অভিমানের সুরও আমাদের কানে আসিয়া বাজে। এই 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং' এর নিরাহরণকারী চিন্তাও শঙ্করাচার্য্যকে কর্ম্মহীন করিতে পারে নাই। এবং প্রকৃতপক্ষে নিষ্কর্ম্মের উপদেষ্টা শঙ্করের মত কর্ম্মবীর এ ভারতে আর কমই আছে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে কর্ম্ম-শীলতা এবং ভোগপরায়ণতা মানুষের দুইটী অত্যন্ত সত্যবস্তু—ইহাই তাহার প্রকৃতি, তাহার স্বভাব। এ পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক মহাপুরুষ আবি-র্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহারা মানুষকে যুগে যুগে নবীনভাবে তাহাদের ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু যেখানেই মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা এবং ভোগ-প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করা হইয়াছে, যেখানেই তাহার জীবন হইতে কর্ম্ম এবং ভোগকে নির্ব্বাসিত করা হই-য়াছে সেখানেই আমরা তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছি। উত্তর-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম—বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের জন্ম। ইউরোপে রোমান-ক্যাথলিক পুরোহিতসম্প্রদায় মধ্যযুগে যে জীবন যাপন করিত তাহা ঈশা দেখিলে নিশ্চয়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয়ের ভিতরকার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে স্বতঃ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা এবং ভোগপরায়ণতা তাহার অত্যন্ত সত্যবস্তু এবং যেখানেই এ দুটীকে তাহার জীবনে একদিকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেখানেই এ দুটী অন্য দিক দিয়া অন্য-

রূপে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং এই কর্ম্মপ্রেরণা এবং ভোগপ্রবৃত্তি মানুষের অত্যন্ত সত্যবস্তু—ইহাই তাহার প্রকৃতি। ইহা যদি আমরা স্বীকার করি তবে আমাদের প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায় যে মানুষের এই সত্য প্রকৃতি এবং ভগবান্ পরস্পর বিরোধী কি না?

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং তিনি মানুষকেও যে সৃষ্টি করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি যদি মানুষকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে এই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য তাহাও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে মানুষের কর্ম্ম এবং ভোগের প্রেরণাময় প্রকৃতি সত্যবস্তু। সুতরাং তাহাও ভগবানের সৃষ্টি। তিনি যদি মানুষকে কোন বিশেষ প্রকৃতি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তবে সেই প্রকৃতির খেলায়, সেই প্রকৃতির সার্থকতায় এবং চরিতার্থতায় মানুষ যে ভগবানের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারে না তাহাই যুক্তিযুক্ত। বরং পক্ষান্তরে মানুষের সেই প্রকৃতির কৃতার্থতায় যে ভগবান্ই কৃতার্থ হইতেছেন, মানুষের সেই সত্যপ্রেরণার উদ্‌যাপনে যে ভগবানেরই সৃষ্টিলীলা কৃতার্থ এবং সার্থক হইতেছে ইহাই বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত।

তথাপি আমরা যে কর্ম্মে ডুবিয়া যাই, ভোগে ভাঙ্গিয়া যাই তাহা আমরা এই কর্ম্ম এবং ভোগকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছি বলিয়া, ভগবান হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া। কর্ম্ম এবং ভোগ যে মানুষের এবং মানুষ যে ভগবানের তাহা আমরা ভুলিয়াছি। মানুষ যে কর্ম্ম এবং ভোগের মালিক—তাহার দাস নহে তাহা আমরা শিখি নাই। মানুষকে আমরা এমন দীন করিয়া এমন খর্ব্ব করিয়া দেখিতে শিক্ষা করিয়াছি যে আমরা মানুষের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়াছি। আমরা চাই ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষের এই ঈশ্বরত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে। আমরা চাই এই মানুষনামক জীবটীকেই মহীয়ান্ গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে। তাহার হস্তপদ রক্তমাংস মন বুদ্ধি জ্ঞান সমস্তকে ভগবানের চৈতন্যে চৈতন্যবান্ করিয়া এই বিরাট লীলায় তাহার সঙ্গী হইতে। আমরা ইউরোপকে জড়বাদী বলিয়া অবজ্ঞা করি। কিন্তু এক হিসাবে আমরাও কম জড়বাদী নই। কারণ আমরা ধরিত্রীকে একান্ত ধরিত্রী করিয়াই দেখিতেছি। রক্তমাংসকে আমরা অতিমাত্র রক্তমাংস বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছি। কিন্তু

এই রক্তমাংসও যে ভগবানেরই চৈতন্যে চৈতন্যবান, তাহা আমরা জানি না। আমরা চাহি মানুষকে সেই চৈতন্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতে। আমরা চাহি মানুষের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত যন্ত্রকে এরূপ চৈতন্যে চৈতন্যবান করিতে যেন তাহার দেহের অণু পরমাণু টী পর্য্যন্ত আপনার সত্যধর্ম্ম বুঝিতে পারে। তাহাই যখন পারিব তখন মানুষ অমৃতময় হইয়া উঠিবে। মনুষ্যজীবন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট হইতে, অনৃত অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সেই দিন ঋষি যখন জলদমন্দ্রস্বরে অনন্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করিবেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা!—তখন মানবমণ্ডলী বিজয়গর্ব্বোন্নতশিরে উঠিয়া দাঁড়াইবে—বুঝিবে তাহাদিগকেই আহ্বান করা হইতেছে।

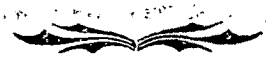

রুচি।

বিখ্যাত "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকায় "সাহিত্যে রুচি ও নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় লিখিয়াছেন "দেশমাতার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াও কবি (রবিন্দ্র নাথ) নিজের বিকৃত রুচি ঢাকিতে পারেন নাই। বলিতেছেন—

'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি ?'

জননীর রূপের কথা কি এমন করিয়া বলিতে আছে ?"

হরি! হরি! যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। রবিন্দ্রনাথের বিকৃত রুচির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয়ের হৃদয় যে নিতান্তই শুষ্ক ও অগভীর তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মা যে আমার সত্যই ভুবনমোহিনী। একথা যে তন্ত্রে লেখা আছে! এ কি রবীন্দ্রনাথের কথা! উপরন্তু মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধ রামপ্রসাদ কি বলিয়াছেন শোন—

"কে রে ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিমরকত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্যদলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী,,।

আবার—"অধর সুললিত, বিম্ববিনিন্দিত, কুন্দবিকশিত সুদশনে।"

আবার— "সমর করে কে ও রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী॥"

প্রভৃতি।

বলি মা বলিলেই ত সন্তানের হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে ভরিয়া যায়, তখনই ত মায়ের রূপ চক্ষে পড়ে, তখনই ত বুঝি মায়ের রূপের সীমা নাই, তখনই ত সেরূপ প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। জানি না অমরেন্দ্র বাবু—ঐ "ভুবন-মনোমোহিনীর" মধ্যে কি দুর্নীতির সন্ধান পাইলেন—অবশ্যই মহাকৌল মাতৃসাধক রামপ্রসাদের অপেক্ষা সমালোচক মহাশয় মাতৃমহিমা কমই বুঝেন।

সমালোচন খুব ভাল জিনিষ—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখি এক-দেশদর্শিতার ফলে সমালোচকগণ প্রতিভার আদর করিতেও কুণ্ঠিত হন। প্রতিভা যে জাতির প্রাণ একথা স্মরণ রাখিয়া বাণীর সাধনা করিলে দেশের মঙ্গল হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার—

আমরা মানিকতলা শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ের সপ্তমবার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদিগের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এবং ইহার অনুরূপে যে বাঙ্গালদেশের বহু স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় হইয়াছে ও হইতেছে, ইহাতে আশান্বিত হইলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের গড়ে ছাত্র সংখ্যা ৩৯ জন, এই বর্ষে মোট জমা ৩১৭।/১৫টাকা, খরচ ২৫০।০। যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক, এই দরিদ্র শ্রমজীবিকুলের শিক্ষাকল্পে আপনাদিগের সামর্থ্যও প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের উদ্যম ও উদ্দেশ্য সার্থক হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

কালী পূজা!

(পাগলের চিঠি)

মানুষের সমস্ত জীবন এমন একটা প্রহেলিকাপূর্ণ যে সামান্যমাত্র চৈতন্য বিকাশ ঘটিলে নিজেকে নিজের চক্ষেই একটা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। আমি কি বল দেখি? পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আমার ভিতর আছে সহস্রবার জানিয়াও বাহিরের তুচ্ছ সম্পদে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ি, পদে পদে ভ্রম ধরা পড়িতেছে—পদে পদে সামলাইতেছি; এমন সামলাইয়া চলিব কয় দিন? ছাড়িয়া দিলাম আমার সমস্তখানিকে অনন্তের অন্ধকার কোলে, লোকলজ্জা উৎপীড়ন, যাহাই অদৃষ্টে থাক্—সামলাইয়া চলার ধার আর ধারিব না।

বুঝিয়া দেখ তোমাদের যোগে কি বলে? ধ্রুব সত্য কি? এই যে নাম রূপ লইয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার হাড়মাসের খাঁচা বহিয়া বেড়াইতেছ—এটারও একটা সার্থকতা আছে; এই যে সার্থকতা, এটা কার, তোমার না ভগবানের? ভগবানের আবার সার্থকতা কি? তুমি বুঝিবে যে এটা ভগবানের ইচ্ছায় গড়ে উঠেছে, এবং তাঁর ইচ্ছাতেই চল্‌ছে, ফির্‌ছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই একদিন ভেঙ্গে পড়ে যাবে—এই বোঝাই তোমার সার্থকতা, এই জ্ঞানই অহং ছাড়াইয়া পরম পুরুষে পৌঁছান।

তোমরা ভাব, তোমরা কেন, আমিও ভাবি এটা আমার—অথচ এই সামান্য নশ্বর সম্পত্তিটুকু সাম্‌লাইবার ক্ষমতাটুকু আমার নেই, আজ সর্দ্দি কাল কাশি পরশু ম্যালেরিয়া নিউমোনিয়া কত কি? আমি দেখেছি, ভাব্‌তে ভাব্‌তে সব হাওয়া হয়ে যায়, পুঞ্জীভূত ভৌতিক কলুষ ধ্বংস হয়ে যায়, এই এত ভারী হাড়মাসগুলা তুলার মত লঘু হয়ে যায়, তখন কি আনন্দ! দুনিয়াটা ফিকে হয়ে চোখের সাম্‌নে পেঁজা তুলার মত বাতাসে ভাস্‌তে থাকে, আর আমি স্বয়ম্ভুর মত বসে বসে বায়স্কোপ দেখি—এইটাই আনন্দ—পৃথিবীর পরপারে বসে রগড় দেখা—ভগবান্ বলে অসাধারণ অপূর্ব্ব একজন আছেন তিনি দিবানিশি এইই কর্‌ছেন। তাই বলে চতুর্দ্দশ ভুবনে তিনি আছেনও বটে, এবং নেইও বটে।

সব থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়, আমার বল্‌তে কিছু না রাখা। সঙ্ক-

ল্পের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তুমি যেদিন থেকে এইটে ভাবতে সুরু কর্‌বে, দেখ্‌বে, ক্রমশঃ সত্য জিনিষটা বেরিয়ে পড়্‌ছে। তোমার কি আছে বল দেখি? এও কি বলে দিতে হবে, যে তোমার কিছু নেই!!! দয়াময় সে এই জন্যে—যে আমার কিছু নেই বল্‌তে সুরু কর্‌লেই সব ভোগ আমার চলে যায় না, সে মনের সঙ্গে মিল করে যায়, যখন যে ভোগটা কিছু নয় ভিতর থেকে বোধ হয়, তখনই সে ভোগটা ফিকে মেরে ম্যাজিক পর্দ্দায় মিলিয়ে যায়। মুখে বল্‌লেই ত তোমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না—অথচ বল্‌তে বল্‌তে ভেজাল আপনি কেটে যায়; তোমার কিছু নেই—জ্ঞানদাতা গুরুই সর্ব্বস্ব শিবং সুন্দরম্ মঙ্গলম্ আনন্দম্।

পৃথিবীর চারি দিকে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এটা কালীশক্তির একটা খেলা। কুরুক্ষেত্রে যদি পুরাতন ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে লুপ্ত না হত, ভারতবর্ষ এতটা সাধনার অবসর পেত না। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে আজ যে সমরানল জলে উঠেছে তাতে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধশক্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—ইহার ভিতরেও মানুষের হাত খুব কমই দেখ্‌তে পাবে, সব তাঁর ইচ্ছা, এই ইচ্ছার বশবর্ত্তিতায় মানুষের যা কিছু চেষ্টা ফুটে উঠেছে।

আজ আমার অনেক কথা মনে আস্‌ছে, অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ—কেবল হৈ হৈ করে আমরা বেড়াতে শিখেছি, দু দণ্ড চুপ করে আজকের দিনটাকে উপভোগ করবার অনুষ্ঠান ত আমরা কর্‌লুম না। তোমরা, তোমরা বল্‌লে যদি অহঙ্কারে আঘাত পড়ে আমরা বলেই বলি একটু ফিকে মেরে যাচ্ছি,—কতবার বল্‌বো, সপ্তাহে বড় ঘড়িকে দম দিয়ে দিলে সারা সপ্তাহ সে টক্ টক্ করে চলে, তোমরা ত ঘড়ি নও, যন্ত্র নও, যে দম নিয়ে এক ঝোঁকে কিছুদিন কাটিয়ে দেবে—তোমরা একটা একটা শক্তির ঢেলা—কালী পূজার রাত্রে বিশ্বশক্তির গুপ্ত মন্দিরে যে লীলা প্রকট হয়ে উঠেছে, তার ছোট খাট তরঙ্গও যে তোমাদের আঘাত করেনি এমন নহে—তবে অঘোরে রইলে, বুঝ্‌লে না। শক্তির তরঙ্গ জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, ঘুমুলে কি ছাই বুঝ্‌বে!

কর্ম্ম ত আছেই, সেটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত পৃথিবী জুড়ে বসে আছে, এক চুল এধার ওধার হলে তার ছড়ির আঘাতে আমাদের পিঠে গভীর দাগ পড়ে যায়, পেয়াদায় বাবা বলায়; তবে তুমি কাজের পিঠে যে শীলমোহরের ছাপটী লাগিয়ে দিচ্ছ আমি হয় ত সেটী দিচ্ছি না—এই নয়! মোটামুটি কাজ সকলেই কর্‌ছে তাতে কিছু এসে যায় না। ভাবের সাধনাই মধুময়,

অভিনব, মনোরম! এই মনোরম ভাবটীকে মজ্জাগত করে নিতে পার্‌লে, দেখ্‌বে সুযোগ আর তোমাদের ছাড়িয়ে যেতে পার্‌বে না—ঢাক ঢোলের বাজনায় তুমুল আওয়াজের মধ্যে মন প্রাণ এক হয়ে যাবে—সন্ধিপূজার মহামন্ত্র জীবনময় ছড়িয়ে পড়েছে, তুমি মন্ত্রময়, জ্ঞানময়, মধুময়—বিশ্বের সমাহৃত কোলা হল তোমার বাইরে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

আমাদের নিজের হাতে গড়া ফুলের বাগানে যে ফুলগুলি ফুটে রয়েছে তার সব মধুটুকু আহরণ করে এক মধুচক্র নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে—সেটা হতে হতে হচ্ছে না, যখন হচ্ছে না, তার উপর কথা নেই—কালী শক্তি না দিলে, জ্ঞান না দিলে হবে না জানি—কিন্তু আজ মায়ের মন্দির সবার কাছে উন্মুক্ত —ওগো তোমরা কোথায়, একটু গভীর ভাবের অভাবে আজ এ সাধনা থেকে বঞ্চিত হলে, আজিকার মহানিশি তোমাদের কাছে ব্যর্থ হবে।

নাম রূপ নিয়ে আমরা মজে আছি—এটা যে স্বাভাবিক। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্না, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন এ সব নামরূপধারী—এদের নিয়ে কত জন্ম কাটিয়ে এনেছি আজও কাটাচ্ছি। আহার, বিহার, ভোজন, শয়ন এতেও মজে আছি, থাক্‌বো ও থাকতেও পারি; অসংখ্য নামরূপে মাধুর্য্যে ডুবিয়া, মজিয়া, কোটী জন্ম কাটাইয়া দিলাম—একদিনের জন্য ঐ সব ছাড়িয়া যাকে দেখা যায় না, যাকে জানা যায় না, যাকে প্রমাণ যুক্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ যে আছে, যে সব, যে সকলের অতীত, তার ভাবনা করিতে সাধ যায় না।

বড় কঠোর, বড় নীরস, বড় বিকট। হাঁ, কালী লোল রসনা, বিকটদশনা, মহাভীষণা। তুমি নামরূপ চাও তাই এইরূপই তোমার সম্মুখে এনে দিয়েছি, ডুবে যাও—দেখ্‌বে মায়ের রূপ অতুলনীয়, পৃথিবীর কোথাও এর তুলনা নেই—হয়ত তিনি রূপাতীতা, এমনি গুণাতীতা অথচ মহামহিমান্বিতা, সর্ব্বশক্তিশালিনী সকল সম্পদশালিনী আদ্যাশক্তি। যা কিছু সবই তাঁর, তিনি ছাড়া কিছু নাই—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডুবে যাবে তোমার অভ্যাসগত সমস্ত নামরূপ এই অপূর্ব্ব অসীমত্বে —মিশিয়ে যাবে তোমার সকল প্রবৃত্তি এই অপার্থিব মহানন্দ সাগরে—যদি ভক্ত হও, যদি সন্তান হও, নূতন জীবন পাবে, পৃথিবীর রূপ তোমার কাছ বদলে যাবে—দেখ্‌বে কেবল চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি আর কিছু নেই—যখন জীবভাব, তখন ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, বদ্ধ, আর যখন তাহার কেবল শক্তি, কেবল শক্তি অফুরন্ত শক্তি, বিশ্ব তোলপাড় করা শক্তি, অদম্য অপরাজেয় শক্তি

আর আনন্দ, সবেতেই আনন্দ—মায়ের যেমন মুখভরা হাসি, অসুরদলনেও মা আমার স্মিতবদনা, প্রফুল্ল আননা—তুমিও তেমনি। উঃ, সে কি আনন্দ—লজ্জা নেই, ভয় নেই, মোহ নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই—তুমিই শিব, তুমিই কালী, আকার নিরাকার, অরূপ, অব্যয়, সান্ত অনন্ত—আবার তুমিই সুখদুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু, সে অপূর্ব্ব মহালীলা যা জগতে তা তোমাতে, তুমি মা মা তুমি—সব ভরে উঠ্‌বে তোমার আনন্দে, তোমার প্রীতিতে—তুমি বিভূতিময়, তোমার বিভূতিতেই জগদ প্রকাশ—তুমি জ্ঞানাতীত আবার জ্ঞান প্রকাশ, এ কেবল কালী সাধনায় হবে, তন্ত্রের সাধনায় হবে, কলিযুগের ইহাই যুগধর্ম্ম।

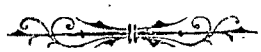

নীট্‌শ।

নীট্‌শের প্রচারিত ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নীট্‌শের প্রকৃতিটি আমাদের বুঝিতে হইবে। নীট্‌শের ধর্ম্ম নীট্‌শের শিক্ষা তাঁহার নিজের জীবনের রক্তরাগে রঞ্জিত, হৃদয় স্পন্দনে স্পন্দিত—উভয়কে আমরা একেবারে পৃথক করিয়া লইতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি "নীট্‌শের দর্শন" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীট্‌শ আদৌ দার্শনিক ছিলেন না। কাণ্ট বা হেগেলের যেমন সুচিন্তিত সুসংগ্রথিত এক একটী দর্শন শাস্ত্র রহিয়াছে নীট্‌শের তেমন শাস্ত্র বলিয়া কিছু নাই। তাঁহাদিগের মতন তিনি বিচার বিতর্ক করিয়া প্রমাণের পর প্রমাণ সাজাইয়া কোন সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে যান নাই। তর্ক বুদ্ধির দ্বারা যে সত্য পাওয়া যায় সে সত্যের উপর তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। নীট্‌শ ছিলেন মন্ত্রদাতা, দীক্ষাগুরু। অন্তরের দৃষ্টিকেই তিনি সত্য নির্ণয়ের পন্থা বলিয়া জানিয়া ছিলেন। সাক্ষাৎ দৃষ্টিদ্বারা, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার সত্যগুলিকে পাইয়াছিলেন—প্রাণে গভীর ভাবে সে সকল ক অনুভব করিয়াছিলেন। তাই হৃদয়ের ভাষা দিয়া, উচ্ছ্বসিত ভাবের মধ্য দিয়া সেগুলিকে রূপকে, শ্লেষবাক্যে, হেঁয়ালিতে অজস্র উন্মুক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাঁহার উচ্চারিত কথাগুলিরই উপর যদি আমরা জোর দেই তবে প্রকৃত নীট্‌শকে

আমরা পাইব না। তাঁহার বাক্যাবলীর মধ্যে হটাৎ দেখিলে বোধ হয় কত অসামঞ্জস্য, কত বালসুলভ চাপল্য কত অবান্তর উচ্ছ্বাস মিশ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সকলের মধ্য দিয়াই নীট্‌শের সত্যগুলি শরীরী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার মূল সূত্রটি যদি না ধরিতে পারি, তাঁহার প্রকৃতি কি ধাতুতে নির্ম্মিত না হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, শুধু কোথায় তিনি ভাবের সঙ্গে রফা করিতে পারেন নাই, কোথায় তিনি এক কথা বলিয়াছেন আবার কোথায় তিনি ঠিক বিপরীত কথা বলিয়াছেন, ইহা লইয়া ব্যস্ত হই তবে নীট্‌শের দর্শনকে পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু মনে হইবে না।

নীট্‌শের নাম শুনিলে আমাদের মনে স্বতঃই হিব্রুদিগের পিতৃপুরুষ সেই নবীগণের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। আমাদের বোধ হয় যেন জীহোবার কোন প্রাচীন নবী আবার আবির্ভূত হইয়াছেন, জগতে এক নূতন জাতি, এক মহামানবের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। হিব্রুর সেই যোদ্ধৃভাব, সে ভাবোচ্ছলতা, আত্মম্ভরিতা—নবীদিগের সে রুদ্র ঘনগম্ভীর বাণী, আপন ধর্ম্ম আপন দেবতার উপর সে তীব্র অনুরাগ, অপরের ধর্ম্ম অপরের দেবতার উপর ততোধিক তীব্র অভিশাপ বর্ষণ নীট্‌শের মধ্যে যেন আবার মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি শান্ত ধীর উদার মহৎ। ইহুদী নবীগণ ঋষিকল্প ছিলেন। ভারতীয় ঋষিদিগের ন্যায় সত্যকে অন্তরের চক্ষু দিয়াই দেখিতেন। তাঁহারাও ভগবানকে জানিয়াছিলেন, ভগবানকেই সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একমাত্র সেই ভগবানেরই শরণাগত হইতে মানুষকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুর ভগবান্ বিরাট প্রেমময় সর্ব্বসহ। জগত যদি না চায় তবুও তিনি জগতকে চাহিতেছেন, জগৎ না জানিয়া তাঁহারই পূর্ণ উপলব্ধির দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু ইহুদীর জীহোবা যেন উদ্যতবজ্র কালপুরুষ। ইহুদীর নবীগণ বিষাণস্বরে ফুকারিয়া বলিতেছেন "জীহোবার শরণ যে না লইবে তাহার ধ্বংস আসন্ন, ইহুদীর ভগবানকে যে না চিনিবে তাহার অনন্ত নরক যন্ত্রনা। ইহুদীর ভগবানই একমাত্র ভগবান্।" নীট্‌শের মধ্যেও আমরা সেই একই গর্জ্জন শুনিতেছি। "মানুষ! অতিমানুষের সহিত পরিচয় স্থাপন কর। অন্তরে বাহিরে তাঁহারি সম্বর্দ্ধনা কর। যে মানুষ মানুষই থাকিতে চায় জগৎ হইতে তাহাকে বিতাড়িত কর।" নীট্‌শ যে আদেশ পাইয়াছিলেন, যে মন্ত্রে জগতকে পুনর্দীক্ষিত

করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রচার করিয়াছিলেন ইহুদীর সেই প্রাণের আবেগ দিয়া, ইহুদীর মত রুদ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া।

অতীতের সংস্কারের মধ্যে জগৎ যখন আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ধর্ম্মের প্রাণ যখন অন্তর্হিত হয়, শুধু বাহ্য আড়ম্বর মিথ্যাচারেরই মধ্যে মানুষ যখন তাহার সুখ শান্তিটুকুকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তখন যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, তখন যিনি নূতন করিয়া জগতকে গঠিত করিতে চান, মৃতকে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিতে উদ্যুক্ত হন, তাঁহার মধ্যে যদি আমরা একটা অতিরিক্ত যোদ্ধৃভাব দেখি, তাঁহার মধ্যে আসুরিক প্রকৃতিই যদি অত্যধিক পরিমাণে প্রকটিত হয় তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাহাই স্বাভাবিক। পুরাতন সংস্কার, পুরাতন বিশ্বাস, গতানুগতিক অভ্যাসকে সর্ব্বাগ্রে নষ্ট করিতে হইবে। জরাগ্রস্ত ফিনিক্সের ভস্মাবশেষ হইতেই নবযৌবনোদ্ভিন্ন ফিনিক্সের আবির্ভাব। নীট্‌শও জগতকে এক নূতন ধর্ম্ম নূতন জীবন দিতে চাহিয়াছিলেন—জরাজীর্ণ মনুষ্যজাতিকে নবনৌবনে উন্মেষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। নূতনকে দেখিলেই মানুষের কেমন এক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পুরাতনের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া তবে নূতনকে দেখিতে চায়। নূতনের প্রতি মানুষের এই যে ভয় সঙ্কোচ তাহার মূলে আঘাত করিবার জন্যই পুরাতনের প্রতি নিট্‌শের এ অতিমাত্রা ক্রোধ, এ তীক্ষ্ণ শ্লেষ, এ কঠোর বিদ্রূপ। তাই নূতনকে যতদূর পারেন নূতন মূর্ত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত করিয়া তুলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—সে পুরাতন যত পুরাতনই হউক, যত মনোহারী যত প্রিয়ই হউক। পুরাতন আর মরণ একই কথা। জীবন যে চায় পুরাতনের সহিত নির্ম্মম হইয়া যুদ্ধ করিতে সে যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

বস্তুতঃ এই যোদ্ধৃধর্ম্মই নীট্‌শের সমস্ত শিক্ষার মূল কথা। মানুষ ভয়শীল, দুর্ব্বল, অশক্ত। মানুষকে নির্ভীক, সবল, শক্তিমান হইতে হইবে। "মানুষ, তুমি বীর হও"—এই কয়টি কথাতেই নীট্‌শের সকল দর্শনশাস্ত্র। নীট্‌শ তাই বলিতেছেন—পুরাতন শিক্ষা দিয়াছে, 'মানুষ, তুমি পুণ্যশীল হও' আমি শিক্ষা দিতেছি 'মানুষ, তুমি বীর্য্যশালী হও'। পুরাতন শিক্ষা দিয়াছে, 'মানুষ, তুমি সাধু হও' আমি শিক্ষা দিতেছি 'মানুষ, তুমি মহৎ হও'। পুরাতন শিক্ষা দিয়াছে 'মানুষ, তুমি মানুষ মাত্র। মানব সাধা-

ধর্ম্মের পথে মানুষ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাক' আমি শিক্ষা দিতেছি "মানুষ, তুমি মানুষ নও, তুমি সাধারণ নও। সাধারণকে অতিক্রম করিয়া সাধারণকে পদদলিত করিয়া তোমার অতি-সাধারণত্ব, অতি মানুষত্ব প্রতিপাদন কর।"

শক্তিমান হওয়া ইহাইত সমস্ত সৃষ্টির মূলকথা। শক্তি সকলের সংঘর্ষ লইয়াই সৃষ্টি। সৃষ্টির এই বিপুল দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যে অধিকতম বলশালী সেই বাঁচিয়া থাকে, আপন পরাক্রমদ্বারা বিরোধী শক্তিকে যে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে সেই শ্রেষ্ঠতম। যাহারা শক্তিমান প্রকৃতিদেবী তাহাদেরই কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের জন্যই জগতকে রাখিয়াছেন, যাহারা দুর্ব্বল শক্তিহীন, এ সঙ্কুলযুদ্ধে যাহারা পরাঙ্মুখ প্রকৃতি তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিতেছেন। বিবর্ত্তবাদের এই যে "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" ইহাই হইতেছে নীটশের প্রতিষ্ঠাভূমি। ইহাই প্রকৃতির মহাশিক্ষা। মানুষ প্রকৃতির বহির্ভূত কোন পদার্থ নয়। সকল সৃষ্টির যে ধর্ম্ম মানুষেরও সেই একই ধর্ম্ম। মানুষও যদি বাঁচিয়া থাকিতে চায়, জগতে যদি আপন পূর্ণতা চায় তবে তাহাকেও প্রকৃতির এই দীক্ষাতেই দীক্ষিত হইতে হইবে।

কিন্তু অন্ধ মানুষ চিরকাল ভাবিয়া আসিয়াছে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতির নিয়ম তাহার জন্য নয়। সেইজন্য প্রকৃতির ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া, উহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। প্রকৃতি কঠোর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র—সেখানে ভালমন্দ, পাপপুণ্য, মায়ামমতা কিছুরই স্থান নাই। ঠিক সেই জন্য এই সকল উপকরণাদি দিয়াই সে নিজের জন্য আর এক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। সৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া আপনার অন্তরের এক মায়াময় কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে। শিক্ষা দিয়াছে নীতিশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে চলাই মানুষের মনুষ্যত্ব। সমস্ত নীতিশাস্ত্র যে এক বিরাট মিথ্যাচার তাহার প্রমাণই এইখানে—জগৎ কোন দিন নীতিশাস্ত্র অনুসারে গঠিত হইয়া উঠে নাই। খ্রীষ্ট এক সাধুর জগৎ তৈয়ারি করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জগতের প্রতি চাহিয়া দেখ, খ্রীষ্টের সে চেষ্টার প্রত্যুত্তরে জগৎ কি করিতেছে। কল্পনা যত মধুময়ই হউক তাহার দ্বারা সত্য সৃষ্ট হইবে কি করিয়া? অন্তরের গভীরতম প্রজ্ঞা হইতে যে নীতিশাস্ত্র গঠিত হয় নাই তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে সার্ব্ব-

ঞ্জনিক বা সনাতন বলিয়া কোন্ নীতি উপদেশ নাই। যাহা সত্য তাহা সকল স্থানে সকল সময়ে সত্য। সত্যের কোন ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু মানুষ তাহার নীতিকে নিত্যই বদলাইতেছে। কাল যাহাকে অসৎ বলিয়া আসিয়াছে আজই তাহাকে সৎ বলিয়া প্রচার করিতেছে। এক জাতি বা এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা মঙ্গল বলিয়া আসিয়াছে অন্য জাতি বা অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাহাকেই আবার অমঙ্গলের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষ সদসৎ পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া আসিয়াছে সুবিধা অসুবিধার বোধ হইতে। যখন যেটিকে সুবিধাজনক মনে করিয়াছে, জগতের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদান করিবার পক্ষে আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে, তাহাকেই মূর্ত্তিমান মঙ্গল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে মানুষ আপন দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছে মাত্র। আপন ক্লীবত্বকে ঢাকিবার জন্যই মানুষ নীতিশাস্ত্রের আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু সত্যের প্রতি চাহিয়া দেখ, জগতকে দেখ—মানুষেরই অন্তরের দিকে দেখ। কোন্ বস্তুটি বাস্তবিক পক্ষে মানুষকে চালাইয়া লইয়াছে? সকল নীতি উপদেশ সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত কোন্ প্রেরণাটি মানুষের সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে? বাঁচিয়া থাকিব, আপনাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিব, জগতের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিব—ইহাই ত মানুষের প্রাণের কথা, ইহা অপেক্ষা আর কোন্ গভীরতর প্রেরণা তাহার মধ্যে রহিয়াছে? মানুষের সহজগতি যে দিকে সেই দিকেই তাহাকে ছুটাইয়া দাও, যে প্রেরণারাজি লইয়া তাহার প্রকৃতি তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইতে দাও। কাল্পনিক ধর্ম্মের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে অথর্ব্ব পঙ্গু করিয়া রাখিতেছ কেন? মানুষের এই অন্তরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নীতিশাস্ত্র পাপপুণ্য দিয়া যে একটা মিথ্যা ধর্ম্ম গড়াইতেছে তাহা ছাড়া অন্য কুনীতি অন্য অধর্ম্ম আবার কোথায়? "The struggle of morality against the fundamental instincts of humanity is the greatest immorality that has ever been on earth."

ভালমন্দ পাপপুণ্য দিয়া ধর্ম্মের বিচার হয় না। শক্তি, একমাত্র শক্তিই ধর্ম্মের পরিমাপক। কারণ জগতে যদি কিছু সত্যবস্তু থাকে তবে তাহা শক্তি। এই শক্তির বোধকে যাহা জাগাইয়া তুলে তাহাই মঙ্গল, অন্য কোন মঙ্গল নাই। যাহারা দুর্ব্বল ক্লীব তাহারাই যেন পাপ পুণ্যের ধর্ম্ম

লইয়া থাকে। বীর যে সে পাপ পুণ্যের অতীত। জয়ৈষণাই বীরের একমাত্র ইষণা। পুণ্যৈষণা অশক্তের দাসের ধর্ম্ম—বীরের জন্য এধর্ম্ম নয়। জগতকে বীরপূর্ণ করিতে হইবে। দুর্ব্বল যাহারা তাহাদিগকে বিদূরিত করিতে হইবে। শক্তিমান হওয়ার জন্য যদি কঠোর প্রকৃতিও হইতে হয় তাহাই শ্রেয়। ধ্বংস, খাদ্যের জন্য বধ যদিই তোমার শৌর্য্য তোমার শক্তি ফুটিয়া উঠে তবে নির্দ্দয় বলিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত হইও না। দয়া মায়া করুণা কাহাকে বল? দুর্ব্বলকে দেখিয়া তোমার দয়া হয়, রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণকে দেখিয়া তোমার হৃদয় গলিয়া যায়—তাহাদের সাহায্যে তুমি ব্যগ্র হও। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যাহারা মরণোন্মুখ, প্রকৃতি দেবীই যাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছেন তুমি তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে চাও কেন? জগৎ একেইত ক্লেদপূর্ণ, তোমার মায়া তোমার সহানুভূতি দ্বারা আবার নূতন ক্লেদ নূতন আবর্জ্জনার সৃষ্টি কর কেন? তোমার সহানুভূতি পাইয়াই ত অপরের মধ্যে দুঃখ দৈন্যের বোধ নিত্য জাগরিত থাকে নিত্য বৃদ্ধি পায়। যাহারা দুর্ব্বল যাহারা অজ্ঞান, জগৎকে বৃহৎ কিছুকে যাহারা চায় না তাহাদের সহিত আবার সহৃদয়তা কি? নির্ম্মম হইয়া তাহাদিগকে উৎপাটিত কর। ধরণীকে শস্যশালিনী করিতে চাও, শ্যামল শোভায় তাহাকে মনোহারিণী করিয়া তুলিতে চাও তবে তৃণ কণ্টকাদির প্রতি অযথা করুণাপর হইও না। মানুষের মধ্যে তাহার হৃদয়টিই একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। হৃদয়ের পশ্চাতে এক বৃহত্তর মহত্তর সত্তাই রহিয়াছে। তাহারই আদেশ অনুসারে চলিয়াছে শক্তিমান পুরুষ।

পৃথিবীর উপর নীটশ চাহিয়াছিলেন একটি বীরসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে। ভাববিলাসীর ভাবপ্রবণতা পুরুষসুলভ উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে বিকশিত পরিপক্ক হইতে দেয় না। প্রেমিক চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী দীনতাক্লিষ্ট—আপনার মহত্ত্ব সে কোনদিন অনুভব করিবার সুযোগ পায় না। নীটশের প্রিয় যে পুরুষ তাহার হৃদয় থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু সে হৃদয় সমধর্ম্মীর জন্য। মহৎ জীবনের ভাগী, মহৎ কর্ম্মের অংশী বীরসঙ্ঘের সন্তানদিগের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য থাকিতে পারে—তাহারা সব যে যোদ্ধা, একই যুদ্ধে ব্যাপৃত। কিন্তু করুণাকোমল হৃদয় লইয়া কোন্ যোদ্ধা আদর্শ যোদ্ধা হইতে পারে?

আভিজাত্যাভিমানী নীটশ চাহিয়াছিলেন বীরের আভিজাত্য। প্রশস্ত

ললাট উন্নত বক্ষ বিশাল বাহু—প্রাণে উৎসাহ, হৃদয়ে তেজ, নয়নে জ্ঞানের আভা এইরূপ মানুষের মত মানুষকেই চাই। অল্পে যাহারা সন্তুষ্ট, দারিদ্রকে যাহারা গৌরব বলিয়া মনে করে, জ্ঞানলাভ, শক্তিলাভ, জয়লাভ কোন প্রকার মহৎ আকাঙ্খাকে বরণ করিয়া লইতে যাহারা ইতস্ততঃ করে, সমস্ত জগৎকে মনুষ্যজাতিকে তাহাদেরই পরিচিত কোটরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় জীহোবার বজ্রহস্তে নীট্‌শ তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভোগ পূর্ণভোগ ইহাই নীট্‌শের লক্ষ্য। বসুমতী বীরভোগ্যা পৃথিবীর ধনরত্ন যে ভোগ করিবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বীর হইতে হইবে। যে অক্ষম তাহার ভোগ কি—তাহার জীবনই বা কি? রাজভোগ্য আহার্য্য উন্মুক্ত আকাশ গভীরতম জ্ঞান পরমা সুন্দরী রমণী ইহা লইয়াই জীবন ইহা লইয়াই ধর্ম্ম। জগৎ যদি না দিতে চায় আমাদিগকে কাড়িয়া লইতে হইবে। "If the world do not give us, we take them—the best food, the purest Sky, the strongest thought and the fairest woman."

যাহা সুন্দর যাহা বীর্য্যবন্ত যাহা গৌরবমণ্ডিত তাহাই প্রিয় এবং তাহাই শ্রেয়ঃ। স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যের আদর্শ পূজক ছিল গ্রীকজাতি। নীট্‌শের মধ্যেও তাঁহার ইহুদীয় চণ্ডীভাবের সহিত গ্রীসীয় সৌন্দর্য্যবোধ মিশ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। আর তাঁহার মধ্যে এই সৌন্দর্য্যানুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল বলিয়াই বোধ হয় দয়া মায়া করুণা প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্মে স্থান পায় নাই। খৃষ্টধর্ম্মকে তিনি যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহার মূল কারণ এই গ্রীক অভাব। গ্রীকের সাহিত্য শিল্প কলা তাঁহার প্রথমজীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল। সমস্ত জীবনে তিনি classic grace and dignity খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম মানুষকে শিখাইয়াছে সে দিনহীন পাপী তাপী—জরাজীর্ণ কুষ্ঠগ্রস্ত অন্ধ আতুর যাহারা, খৃষ্টধর্ম্ম বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগেরই সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছে। নীট্‌শ কুৎসীৎ কিছু সহ্য করিতে পারিতেন না। নীট্‌শ চাহিয়াছেন রূপ—বাহ্য রূপ, অন্তরের রূপ। দেহের সুস্থতা সৌন্দর্য্য সে ত অন্তরের সুস্থতা ও সৌন্দর্য্যেরই ছায়া মাত্র। খ্রীষ্টের মন্ত্র আত্মবলিদান। কিন্তু নীট্‌শ বলিতেছেন নিজেকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য, আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য, অন্তর্হিত সৌন্দর্য্যরাশীকে গোময় লিপ্ত করিবার জন্য মানুষ জগতে আসে নাই। আপনাকে নিত্য নব নব সৌন্দর্য্যে

প্রেক্ষ্টিত করিয়া তুলা, আপনাকে মহীয়ান্ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা ইহা লইয়াই মনুষ্যত্ব। আপনার মর্য্যাদাজ্ঞান যাহার নাই সে আবার মানুষ কি? আপনাকে যে দুর্ব্বল অক্ষম বলিয়া জানে, সর্ব্বদা সকলের নিম্ন স্থানেই যে নিজেকে দেখে, সেজন্য অন্তরূপে অন্তরকে সে কালিমাময় করিয়া রাখিয়াছে এরূপ লোক জগতে যে অন্ধ অথর্ব্ব রোগজীর্ণ জনসঙ্ঘের সৃষ্টি করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অন্তরে যে দীনহীন বাহিরেও সে দীনহীন। জগৎ যে আজ এত দরিদ্র এত কুৎসিত—তাহার কারণ এই করুণা, দীনতার ধর্ম্ম। নীট্‌শের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা রহিয়াছে গ্রীসীয় দেব দেবীর সে অপরূপ মধুর মূর্ত্তি—তাঁহার অন্তরে গাথা রহিয়াছে আপোলো, মিনার্ভা। মানুষকে আপোলোর মূর্ত্তি লইয়াই জগতে আবির্ভূত হইতে হইবে। মানুষ আপনার সকল সৃষ্টি কার্য্যে আপোলোকেই গঠন করিবে। ইহাই মানুষের আদর্শ।

আপনাকে আপনি যে চিনিয়াছে, আপনাকে যে বিরাট করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সকল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, সর্ব্বতোভাবে যে সুন্দর পুরুষ শ্রেষ্ঠ নীট্‌শ তাহারই নাম দিয়াছেন Superman, Uebermeusch. নীট্‌শের সমস্ত দর্শন সমস্ত শিক্ষা মূর্ত্তিমান হইয়াছে এই অতিমানুষে। এই যে আদর্শ মানুষ তাঁহার মধ্যে কোন দৈন্য কোন কৃপণতা কোন অশোভন কিছুই নাই। আপনার অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি জগতে অধিষ্ঠিত, আপনার গৌরবে তিনি গরীয়ান। তিনিই হিব্রুদিগের Jehova তিনিই আবার গ্রীকদিগের Apollo। জগৎ রহিয়াছে এই অতিমানুষের অপেক্ষায়। শক্তির অবতার, সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের আধার—ইহারই আদর্শে সমস্ত মনুষ্যজাতিকে গঠিত হইতে হইবে।

এইখানেই নীট্‌শের বিশেষত্ব। 'Man is a thing that shall be surpassed'—এই মন্ত্রটির মধ্যেই সমস্ত নীট্‌শ, এই মন্ত্রটির মধ্যেই মনুষ্যজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ। ইহাই নীট্‌শের শ্রেষ্ঠ দান। এই অতিমানুষকে নীট্‌শ যে ভাবে চিত্রিত করিতেছেন ঠিক সেইভাবেই বোধ হয় আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। দেবতাকে সৃষ্টি করিতে যাইয়া নীট্‌শ তাহাকে অতিমাত্র আসুরিক প্রকৃতি দিয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত অহঙ্কার পরিবর্জ্জন করিয়াই যে মানুষকে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হইবে এ তত্ত্ব নীট্‌শ বুঝিতে পারেন নাই। প্রকৃতির বাসনাবিক্ষুব্ধ, প্রাণশক্তির যে দ্বন্দ্বসঙ্কুল,

সঙ্ঘর্ষবিখণ্ডিত বাহ্যরূপ তাহাকেই তিনি অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন। প্রকৃতির গভীর ও সমুচ্চ প্রদেশে যে আর একপ্রকার প্রেরণা অলক্ষ্যে কার্য্য করিতেছে যাহার সার্থকতা শুধু দ্বন্দ্বে নয়, সংঘর্ষে নয় কিন্তু বহুর মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, ভিন্নমুখী গতির মধ্যে ঐক্যের মিলনের ঈশ্বরত্বই প্রতিপাদন করা নীট্‌শ তাহা উপলব্ধি করেন নাই। প্রেম মাত্রই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য নয়, প্রেমের মধ্যেও শক্তির স্থানুত্ব রহিয়াছে, বস্তুতঃ Superman জ্ঞান প্রেম শক্তি এই ত্রয়ীর পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য। সঙ্কীর্ণ সংস্কার বশে মানুষ যাহাকে ভাল মন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা মূল সত্য নয় কিন্তু তবুও মূল সত্যটি ভাল মন্দের অতীত হইয়াও সদ্‌ ও কল্যাণময়। অন্তরে বাহিরে দীনহীন, যে জনসঙ্ঘ তাহাদের প্রতি শুধু সহৃদয়তা দেখান, দরিদ্রনারায়ণদিগকে মুষ্টি ভিক্ষাদ্বারা সেবা করাই ধর্ম্ম সাধনের মহৎজীবনের কিছু প্রধান অঙ্গ নয়, এ কথা সত্য কিন্তু তাই বলিয়া উহাদিগকে ক্রূরহস্তে নিষ্পেষিত করিয়া পৃথিবী হইতে দূরিভূত করিতে হইবে অথবা চিরকাল পদদলিত করিয়া রাখিতে হইবে, এমনও নয়। শুধু সেবা দ্বারা নয় কিন্তু দরিদ্রনারায়ণদিগের অন্তরে নারায়ণের মহত্বই প্রকটিত করিয়া তুলিতে হইবে। নীট্‌শ যে সকল বিশেষ সূত্র দিয়াছেন তাহার এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধারণ সূত্রগুলি গভীর সত্যপূর্ণ, তাঁহার মূল বক্তব্যটি অবিকৃতই রহিবে। মানুষকে তাহার বর্ত্তমান স্বভাবের অতীত হইতে হইবে—আর একটি উচ্চতর, মহত্তর স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র সংস্কারের যে সকল দ্বৈত তাহার পরপারে যাইতে হইবে। পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণ শক্তি—আমরা যাহাকে চিন্ময়ীশক্তি বলি—তাহাই হইবে জীবনের কেন্দ্র; তাহার দ্বারাই নরজগতের প্রতিষ্ঠানকে অমৃতময় করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত জগৎকে জ্ঞানে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, ভোগে অমরাবতী করিয়া তুলিতে হইবে। এই নবদীক্ষার প্রথম নবী হইতেছেন নীট্‌শ। নীট্‌শের পাশ্চাত্যসুলভ অশুদ্ধ রাজসিক প্রকৃতি এই সব সত্যগুলিকে বিকৃত করিয়া প্রতিফলিত করিয়াছে। কিন্তু এই অশুদ্ধতার মধ্যে যে সত্যবস্তু নিহিত তাহা অমূল্য; ইহলোকবিমুখ, অল্পপ্রাণ, স্বল্পতুষ্ট, বৈরাগীর ছিন্ন কৌপীনসম্বল ভারতের পক্ষে ইহা মৃতসঞ্জীবনী।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম।

"সর্ব্বং হি এতৎ ব্রহ্ম"—এই যে যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। এই মহাবাক্যটিকে দুই অর্থে আমাদের দেশে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম, এই যে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি তৎসমস্তই ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা আমরা দেখিতেছি বস্তুতঃ সে সব কিছুই নাই, আছে শুধু ব্রহ্ম। আকাশ সমুদ্র পৃথিবী তরুলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী মানুষ এমন কি আমি যাহা কিছুই নাই যাহা স্বপ্ন মরিচিকা মায়া বল তাহা হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। রজ্জু দেখিয়া হঠাৎ যেমন সর্পভ্রম হয়। সর্প বাস্তবিক পক্ষে নাই, যাহাকে সর্প মনে করিতেছ তাহা রজ্জু। ঠিক সেই রকম যাহাকে জগৎ মনে করিতেছ যাহাকে "এই সকল" আখ্যা দিতেছ তাহা নাই। আছে এক ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি জানি না, জানা সম্ভব নয়। কারণ জানা অজানা এ সবও মায়া স্বপ্ন বিভ্রম। তবে ইঙ্গিতে যদি বুঝিতে পার মায়ার ভাষায় বলিতে পারি—ব্রহ্ম শুধু আছেন "অস্তি"। আরও একটু স্পষ্ট আভাস যদি চাও তবে বলিতে পারি ব্রহ্ম অনন্ত চৈতন্য অচঞ্চল আনন্দ। "অস্তি ভাতি প্রীতি" মানুষের ভাষায় ব্রহ্মের এইরূপ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্রহ্ম সকল ভাবের অগম্য—নেতি নেতি। জগৎ কিছু না, স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রকাশ কিছু না—এ সকল মিথ্যা প্রতীতি। এসকলের অতীত যে ব্রহ্ম তাহাই একমাত্র সদ্বস্তু। এই ব্রহ্মতে লীন হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তাহার জীবনের একমাত্র সার্থকতা। অতএব মিথ্যাকে দূর কর, জগৎকে ছাড়িয়া মুক্ত হও, কর্ম্মলেশহীন হইয়া শান্ত সমাধিতে ডুবিয়া যাও। ইহাই হইতেছে প্রথম ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে যাহা দেখিতেছ তাহাও ব্রহ্ম। "জগৎ ব্রহ্ম" অর্থ নয় যে ব্রহ্মই আছে জগৎ নাই। ইহার অর্থ জগৎও আছে ব্রহ্মও আছে। জগৎও যদি ব্রহ্ম নয় তবে জগৎ কি, আসিল কোথা হইতে, আদৌ তাহার উৎপত্তি কেন হইল? জগৎ ব্রহ্মেরই একটা দিক, তাহার আর এক মূর্ত্তি। অসীম সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অক্ষয় আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বরূপের এক কণা দিয়াই এই জগৎ নির্ম্মিত। ব্রহ্ম পূর্ণ জগৎ তাহারই অংশ। স্বরূপকে পূর্ণকে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত এই রূপের এই অংশেরও প্রয়োজন। স্বরূপের মধ্যেই রূপ প্রোত—সূত্রে মণিগণাইব। স্থূল জগৎ, সকল সৃষ্টপদার্থেরই অস্তিত্ব রহিয়াছে, গাছপালা মানুষ সকলই আছে, তুমিও আছ আমিও আছি। এ সব কল্পনা অমূলক স্বপ্ন মাত্র নয়। এই বহু এই নানা এই সসীমের মধ্যেই সেই অসীম অপরিবর্ত্তনীয় সত্যবস্তু গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহারা সেই একেরই খণ্ডবিকাশ—সমুদ্রবক্ষে

যেমন সমুদ্রের ঢেউ। সমুদ্রই প্রকৃত সত্তা। ব্রহ্মসমুদ্রের বক্ষে লীন হইয়া যাওয়াই মানুষ ঢেউএর লক্ষ্য বটে। তবে যত দিন ঢেউএর পৃথক্ খেলা রহিয়াছে ততদিন ঢেউএর জীবন একেবারে অনুভময় নহে। যতদিন তুমি জগতে আছ ততদিন মনে রাখিতে হইবে এই জগৎ সচ্চিদানন্দেরই বিগ্রহ। জীবনের মধ্য দিয়াই জীবনের অতীত হইতে হইবে। জগৎ শিক্ষাস্থল সাধনাক্ষেত্র। জগতের কার্য্যে যতটুকু তোমার প্রেরণা আইসে ততটুকু আপনাকে ব্যাপৃত করিও—কিন্তু দৃষ্টি রাখিও সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে। পূর্ণজ্ঞান হইলে, কর্ম্মক্ষয় হইলে জগৎ হইতে তুমি আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে—সুপক্ক ফলের মত। রূপ তখন আপনিই স্বরূপে মিলিয়া যাইবে। তোমার যে মূল সত্তা—সেই ব্রহ্ম—তাহাই পাইবে। জগৎ জাগতিক সীমা তোমার কিছু থাকিবে না।

এই দুইটি ব্যাখ্যা আমাদের সকলেরই পরিচিত। ইহা ছাড়া আর একটী তৃতীয় ব্যাখ্যাও হইতে পারে। সর্ব্বং হি এতৎ ব্রহ্ম—এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্ত ছাড় কোথাও ব্রহ্ম কিছু নাই। যে সকল কিছু দেখিতেছ যাহা আছে তাহাই আছে। প্রত্যেক বস্তুই রহিয়াছে, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্ম, নিখিল সর্ব্বই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে গেলে জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে, জগতের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে সম্পর্কহীন হইতে হইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। জগৎইত ব্রহ্ম এই সকলকে পরিবর্জ্জন করিয়া তুমি কোথায় যাইতে চাও? ব্রহ্মপদার্থে পৌঁছিবার পক্ষে জগৎ অন্তরায় নহে, আবার শুধু সহায় মাত্রও নহে। জগত শুধু কর্ম্মক্ষয়ের স্থান নহে, জগত ভোগভূমি—বাসনার ভোগ নহে, ব্রহ্মের উপলব্ধি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মের উপচয়ে যে আনন্দ সেই আনন্দেরই লীলাভূমি। জগত শুধু সাধন নয় জগতই সাধ্য, জগৎ শুধু উপায় মাত্র নয় জগতই উদ্দেশ্য। কারণ জগৎ ও ব্রহ্ম এক। জগতকে যখন চিনিয়াছ ব্রহ্মকেও তখন চিনিয়াছ, ব্রহ্মকে যখন পাইয়াছ জগতকেও তখন পইয়াছ। জগতে থাকিয়া, জগতের কার্য্যে পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া—জগতকে উপলব্ধি করিয়াই তোমার ব্রহ্মোপলব্ধি।

উপনিষদ কি বলিতেছে? সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম—এই সকলই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম কি, ইহার সরূপ কি? অয়মাত্মা ব্রহ্ম—এই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা আবার কি প্রকার? সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ—পাদচতুষ্টয় লইয়াই এই সে আত্মা। এই চারিটি পাদ কি কি? আত্মার প্রথমপাদ জগরিত স্থান—জগরিত স্থান হইতেছে বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে স্থূলসত্তার অনুভূতি হয় সেই অন্নময় প্রকৃতিই আত্মার প্রথমপাদ। দ্বিতীয়পাদ স্বপ্নস্থান—স্বপ্নস্থান হইতেছে

অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রবিবিক্তিভুক্। মনের অনুভূতি, চিত্তের ভোগ লইয়া গঠিত যে অন্তর্জগৎ প্রকৃতির সেই মনোময় ও প্রাণময় রূপই আত্মার দ্বিতীয়পাদ। তৃতীয়-পাদ সুষুপ্ত স্থান—সুষুপ্ত স্থান হইতেছে প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্। মনের অতীত ভূমিতে যে জ্ঞানের জগৎ দিব্যদৃষ্টি যেখানে বিভিন্ন জ্ঞানকে একই মহৎ জ্ঞানের মধ্যে একীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, যেখানে বস্তুর অন্তরতম রসধারার আস্বাদ আমরা পাই সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় লোকই আত্মার তৃতীয় পাদ। আর এই ত্রিলোকেরও অতীত সেই তুরীয় আত্মা যাহা 'অদৃশ্যম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্' যাঁহা 'একাত্মপ্রত্যয়সার' সেই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ হইতেছে চতুর্থ পাদ।

সাধারণ ভাষায় আমরা এই কথা কয়েকটীকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা কিছু আছে তাহাই আত্মা অথবা ব্রহ্ম। কি আছে? উপনিষদ বলিতেছেন চারিটী জিনিষ আছে, বিশ্বসত্তা চারিটি স্তরে সংগঠিত। সর্ব্বপ্রথম হইতেছে স্থূল বিকাশ—এই শরীর বা জড়প্রকৃতি। এই জড় দেহই সৃষ্টির, অস্তিত্বের, আত্মা বা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। "সর্ব্ব"রূপ যে বিরাট সৌধ তাহার ভিত্তি হইতেছে স্থূলদেহ আর তাহার শিখরদেশ হইতেছে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম। এই দুয়ের অন্তবর্ত্তী স্তরে অন্যান্য সত্তার বিকাশ। জড় প্রকৃতি তামসিক, তাহার আপনার কোন গতি নাই, স্থির, নিশ্চল। কিন্তু এই জড় প্রকৃতিই আপন-গর্ভে ধারণ করিয়া রহিয়াছে জীবনীশক্তিকে। জীবনীশক্তি আমার শরীরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া সর্ব্বদা খেলিতেছে, আমাকে সচল করিয়া তুলিয়াছে, প্রেরণারাজি দিয়া আমাকে ভরিয়া রাখিয়াছে। এই জীবনী শক্তি হইতেই আমাদের কর্ম্মজীবন—আমাদের ইচ্ছা বাসনা আকাঙ্খা ভোগ সমস্তই ইহার মধ্যে সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের মতন উঠিতেছে পড়িতেছে। আবার এই জীবনী শক্তির উপর ভর করিয়া খেলিতেছে আমাদের মনের বোধ, বুদ্ধির বিচারক্ষমতা। ঋগ্বেদীয় ভাষায় আমরা বলিতে পারি অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিশিখার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইরূপ প্রাণশক্তি হইতে মন ও বুদ্ধির প্রতীতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমাদের জীবনী-শক্তি, আমাদের বোধ, আমাদের ভোগ, আমাদের জ্ঞান—দার্শনিক ভাষায় প্রাণ মন চিত্ত ও বুদ্ধি এই চারিটি লইয়া সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিকাশ। ব্রহ্মের ইহাই দ্বিতীয় অংশ। এই সূক্ষ্মেরও পশ্চাতে যে স্তর তাহা হইতেছে দিব্য বিকাশ, পূর্ণ জ্ঞান। বুদ্ধি আমাদিগকে বস্তু হইতে বস্তুকে পৃথক করিয়া, গুণ হইতে গুণকে ভিন্ন করিয়া দেখায়—বুদ্ধি একদেশদর্শী, এক দৃষ্টি নিক্ষেপে সমস্তকে এক সঙ্গে করিয়া দেখে না। বুদ্ধির দৃষ্টি বৈচিত্র্যের দিকেই। মনের বোধও তদ্রূপ খণ্ডীকৃত। বাসনা একটিমাত্র বস্তুকেই আমাদের কাছে অতিমাত্র করিয়া তুলে, বস্তুর যে সহজ ও বাহ্যিক রূপ প্রকৃতি তাহাতেই আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ হইতেছে বিজ্ঞান, সাক্ষাৎ দৃষ্টি, অপরোক্ষানুভূতি। বিচার করিয়া যে জ্ঞান পাই না অথচ যে জ্ঞান সত্যবিচার বা বিবেকের মূলে, বস্তুকে আমা ছাড়া আমার বাহিরে জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে না দেখিয়া, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া, তাহাকে সৃষ্টির অন্তরস্থ সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়া যে সরল জ্ঞান পাই তাহাই হইতেছে মূল জ্ঞান। বস্তুর যে মূল সত্তা যে অন্তরতম প্রকৃতি তাহারই

নানা সম্ভাবনা সূক্ষ্ম জগতে প্রতিফলিত। সূক্ষ্ম জগতকে তাই উপনিষদ স্বপ্নস্থান বলিয়াছে আর সেই মূল প্রকৃতি যখন কোন সম্ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত্ত হইয়াছে তখনই স্থূলের বাস্তবের উদ্ভব। এই কারণ জগতই ঋত, এই ঋতের জ্ঞানই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মধ্যেই সকল জ্ঞান ঘনীকৃত—'প্রজ্ঞানঘন'। বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মা আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিয়াছে—বহুবিধ আনন্দের জন্য। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন আনন্দ হইতে এই নিখিল ভূত জন্মিয়াছে। সমস্ত বিকাশের অন্তরে আনন্দ, সমস্তের সামঞ্জস্যে, সকলের মিলনভূমিতে খেলিতেছে আনন্দ। বস্তুর অন্তরে যে ঋত-যে বৃহৎ, নিরপেক্ষ আনন্দই যাহার স্বভাব তাহাই হইতেছে আত্মার তৃতীয় মূর্ত্তি। কিন্তু এই সত্যলোকের যে বহু তাহা একেরই বহুবিধ রূপান্তর মাত্র—বহু হইলেও এই বহু এক বই দুই নয়। সৃষ্টির যে বিক্ষোভ যে চঞ্চলতা তাহার মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে অক্ষত শান্তি। সে পদার্থ কি প্রকার, তাহার লক্ষণ কি জানার উপায় নাই—প্রয়োজনও নাই। সেখানে সকল প্রশ্নের শেষ, তাহা পরম উপশম তাহাই হইতেছে চতুর্থ পাদ—শান্তম্ শিবম্।

স্থূল জগৎ, মানসিক জগৎ, বিজ্ঞান জগৎ আর সকল জগতের অতীত অদ্বৈত ব্রহ্ম এই চারিটি সত্তা লইয়াই সৃষ্টি এই চারিটি লইয়াই অস্তিত্ব এই চারিটি লইয়াই আত্মা বা ব্রহ্ম। এই যে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ বা সত্তার প্রকার ভেদ ইহারা যে পরস্পর হইতে পরস্পরে সম্পূর্ণ বিযুক্ত পৃথককৃত তাহা নয়। একের মধ্যে অন্যটি অনুস্যূত রহিয়া এই বিরাট অস্তিত্বকে সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যেমন দেখি স্থূলশরীরের মধ্য দিয়াই মানসিক জগৎ খেলিতেছে সেইরূপ মানসিক জগতেরও পশ্চাতে কারণ জগত কারণ স্বরূপ রহিয়াছে। কারণেরও অন্তরে সেই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মসত্তা সদাই প্রতিষ্ঠিত। স্থূল জগতের যে ধর্ম্ম তাহা মানসিক জগতের ধর্ম্মের ছায়া। আবার মানসিক জগতের ধর্ম্ম তাহা কারণ জগতেরই প্রতিচ্ছবি আর সকল ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ব্রহ্ম। কোন একটিমাত্র জগতকে কোন একটিমাত্র ধর্ম্ম অতিশয় করিয়াই দেখাই অধর্ম্ম। দেহকে অতিশয় করিয়া দেখার ফল চার্ব্বাক। মানসিক জগতকে অতিশয় করিয়া দেখার ফল শুষ্ক দার্শনিকতা, বাদবিচার—reason এর সাম্রাজ্য। বিজ্ঞান বা আনন্দকে অতিশয় করিয়া দেখার ফল কবির অশরীরী ভাবুকতা—mysticism. আর নিষ্কল ব্রহ্মকে অতিশয় করিয়া দেখার ফল শঙ্করাচার্য্য।

পৃথকভাবে প্রত্যেকটির যে আপন আপন মর্য্যাদা মহত্ত্ব প্রয়োজনীয়তা নাই তাহা নয়। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সব কয়েকটিকে লইয়া—প্রকৃত সিদ্ধি সব কয়েকটীর যুগপৎ উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান যুগে মানুষ প্রথম দুই পাদে প্রতিষ্ঠিত। মানুষ শরীরকে চিনিয়াছে, মানুষ মনকে চিনিয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠান লইয়াই তাহার জাগ্রত জীবন। মানুষ এখনও চিনে নাই বিজ্ঞান, মানুষ চিনে নাই শুদ্ধ ব্রহ্ম। প্রথমে জানিতে হইবে অখণ্ড ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রেরণায় গঠিত করিতে হইবে মন, বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অমৃতময় করিতে হইবে শরীর। অন্তরে পূর্ণত্বকে খেলাইয়া লইতে হইবে দিব্য দেহের মধ্য দিয়া। ইহাই পূর্ণাঙ্গ ব্রাহ্মীস্থিতি।

ব্যাধি কোথায়?

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "সর্ব্বমনর্থং ভাব নিত্যম্", সত্য সত্যই আর্থিক সাচ্ছল্য মানুষকে একেবারে অপদার্থ করিয়া তুলে। ধনবান্ কি কখন "জগদ্ধিতায়" আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বাহির হইতে পারিয়াছে? তবে যে তাহারা কিছু করে, সে কেবল মান যশের আশায়—পদমর্য্যাদার কুহকে।

বাঙ্গালায় কুবেরের বরপুত্রগণ যে অকাতরে অর্থব্যয় না করেন এমন কথা আমরা বলিনা। সে দিন দামোদরের প্রবল বন্যার সময় তাঁহাদের মুক্তহস্তে দানের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যে মহাপুরুষ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আজ পরলোকে—সেই স্বদেশহিতৈষী তারকনাথ পালিতের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বাঙ্গালীর বুকে গাঁথা থাকিবে। সেদিনও কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসম্মিলনীতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিলেন। এরূপ তিনি প্রতি বৎসরেই করেন।

বাঙ্গালার ধনীপুত্রগণ দানশীল একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু জানিনা এই দানের মধ্যে দাতার কি শুদ্ধতার অভাব রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার মেরুদণ্ড যে দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালার প্রাণশক্তি কর্পূরের মত উপিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার এই আসন্ন অবস্থার প্রতীকার থাকিতেও সেদিকে কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না।

আজ আমরা কমলার বরপুত্রগণকে একবার স্থির হইয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রসারণ করিতে অনুরোধ করি, আজ আমরা দেখাইতে চাই বাঙ্গালার ব্যাধি কোথায়? কোন্ রাক্ষসী তার বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে? তারপর যদি সামর্থ্য থাকে, সাধনা থাকে, ভগবদ্ কার্য্যে আস্থা থাকে, একযোগে প্রতীকারপরায়ণ হইয়া বাঙ্গালাদেশকে এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতেই হইবে।

আমরা বলি শুধু ধাত্রীবিদ্যায় অজস্র অর্থব্যয় করিলে বাঙ্গলার দুর্গতি দূর কোন কালেই হইবে না। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যই আমরা হাহাকার করি, বন্যাপীড়িতের জন্যই আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করি, আত্মসঙ্গতিও দান করি; কিন্তু হায়, ব্যাধি হয় কেন? দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী আসে কেন? তাহার চিন্তা আমরা একদিনও করিয়াছি কি?

অবশ্যই দেশ যখন অনাহারে মরিতেছে—মহামারীতে ছারখার হইতেছে—বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, তখন ইহার সাময়িক প্রতিবিধান কর্ত্তব্য বটে কিন্তু দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে হইবে বলিয়া, সকলেই সকল সময়েই ক্ষণিক প্রতিবিধানে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? যে কারণে দুর্ভিক্ষ আসে, যে কারণে ব্যাধির সৃষ্টি হয় তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিতে কটিবন্ধন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইব না—এমন বাতুলতা আমাদের দেশেই শোভা পায়!

গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন মানসে কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিলেও দেশের দুরবস্থা ঘুচিবে না; কেন ঘুচিবে না, এই প্রশ্নে আমরা একটা উত্তর দিতে চাই। এই যে বাঙ্গলাদেশে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া একটা নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে যোগদান করিয়াছে কাহারা? কৃষ্ণনগর ডাকাইতি সংশ্রবে যাহারা অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণিত হইল তাহারা যে সকলেই ইংরাজীশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী! আর কত দেখাইব—রাজনৈতিক অপরাধীদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আজ যে শত শত বাঙ্গালীযুবক রাজসংশয়ে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহাদের মধ্যে কয়টা চাষাভূষা-ব্যবসাদার আছে বল দেখি? তাই বলি, ইংরাজী শিখিয়া করিবে কি? তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের আয়োজন করিবার কিছু করিয়াছ কি? সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দু'পাতা ইংরাজী পড়াইলে ফল যে বিষময় হইবে—একথা কি এখনও বলিয়া দিতে হয়।

তারপর ধর্ম্মান্দোলনে যে অজস্র অর্থব্যয় কর—তাহাতে দেশের কি? তথাকথিত ধার্ম্মিকের ভীষণ স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি আছে? আপনার মুক্তি লইয়াই সে ব্যস্ত। তুমি যে ইহাদের লোটা কম্বলের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছ তাহার ফল ঐ পরকালে, এই ইঙ্গিত করিয়া অন্নহীন অস্থিচর্ম্মসার বাঙ্গালাদেশে ইহারা যে নধর কান্তিমান্ শরীর ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমন

করিয়া বেড়াইতেছে—কৈ দেশের তাহাতে কি উপকার হইতেছে?

এ ক্ষেত্রে অনেকেই বলিবেন ধর্ম্মের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক কি? আমরা তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলি ধর্ম্মের সহিত তোমার যেমন দেহের সম্পর্ক আমার ধর্ম্মের সহিত দেশের তেমন সম্পর্ক। "কি ছার—আর কেন মায়া কাঞ্চন কাচ ত রবে না" বলিয়া ত মনকে সিকে পড়াইয়া থাক না—প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞানে চরিতার্থতা আহারের আশায় ছুটাছুটি করিতে কি ভুলিয়া যাও!

ধর্ম্ম যেমন দেহ ছাড়া নহে—তেমনই জগৎ ছাড়াও নহে। সেই পুরাতন ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা দেশকে পূর্ণযোগ গ্রহণ করিতে বলি—চতুষ্পাদ ব্রহ্মের জাগ্রত অবস্থা এই দৃশ্যমান জগৎ—ইহার অনুশীলনে উপেক্ষা করিলে তুমি যে তিমিরে, সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্গালার শোচনীয় দুরবস্থার মূল কারণ যে দরিদ্রতা ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এই চরিত্র-শিক্ষা ধীরে ধীরে বাঙ্গালাদেশে অশান্তির ঝঞ্ঝা আনিয়া দিয়াছে। একণে অবস্থা মত ব্যবস্থা না করিলে অচিরেই দেশ ঘোর অশান্তিতে পরিণত হইবে—একথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। অতএব হে দেশের ধনিগণ! হে দেশের রাজন্যবৃন্দ! হে বঙ্গের ও সমগ্র ভারতের মাননীয় সদস্যগণ! সুরম্য হর্ম্ম্যে বসিয়া চাটুকারের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না; বিদ্যা ধনে মানে যশে মর্য্যাদায় তোমাদের বিভূষিত করিয়াছেন, তোমাদের অহংকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য নয়—পরন্তু যে দেশে জন্মিয়াছ সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির জন্য। দেশবাসীর অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দাও—তাহা হইলেই দেশের জীবন ফিরিয়া আসিবে।

বুদ্ধির কথা।

আমরা স্বভাবতঃ কার্য্য করিয়া থাকি কখনও ভাবের প্রেরণায়, কখনও চিত্তের আবেগে, আবার কখনও বা প্রাণের যে উন্মাদ বাসনা তাহারই আকুল আহ্বানে।

বুদ্ধি যে অসংখ্য প্রকার চিন্তাধারা গ্রহণ করিতেছে—তাহার কোন একটী যখন প্রবল বন্যার মত বুদ্ধিকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, বুদ্ধির

সীমাবদ্ধ দুকূল ভাসাইয়া ফেলিতে পারে—তখনই বুদ্ধি সেই বিশিষ্ট চিন্তা-ধারার অনুসরণ করিয়া মন প্রাণকে স্ববশে আনয়ন করে এবং জীবন দিয়া চিন্তানুরূপ কার্য্য সংসাধনে সচেষ্ট হয়।

ইন্দ্রিয়ানুকূল্যে বহির্জগতের জ্ঞান, যখন মনোমধ্যে নীত হয়, তখন হৃদয়-স্থিত যে রসসমুদ্র উহাও তরঙ্গায়িত হইতে থাকে; কোন বিশিষ্ট দর্শনে ও শ্রবণে যখন চিত্ত বিক্ষোভিত হইয়া উঠে তখনই উহার আবেগ বুদ্ধি ও প্রাণকে আকুল করিয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হয়।

প্রাণ বাসনার কেন্দ্র। ইহার গতি স্বভাবতঃই নিম্নমুখী—বিমূঢ় ব্যক্তির চিত্তবুদ্ধি অবিরত প্রাণের অদম্য কামনার বশবর্ত্তী। সাধারণ জীবের ইহাই অবস্থা।

* * *

সাধকের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত হইবে। সমুদ্র যেমন অসংখ্য স্রোতঃস্বিনীর সবেগ পতন অবহেলে গ্রহণ করে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ, জলধির বিশালতার মধ্যে কোথায় মিশাইয়া যায়, যোগীর উদার প্রশান্ত বুদ্ধি সেইরূপ অগণিত চিন্তাধারা অনায়াসে ধারণ করিবে, পরন্তু উচ্ছলিত হইবে না, চঞ্চল হইবে না, বুদ্ধি থাকিবে স্থির, শান্ত, অনুদ্ধত।

বুদ্ধি যদি হয় স্থির, তবে আবেগের আঘাতেও উহা অচঞ্চল থাকিবে, প্রাণের তীব্র বাসনার অব্যর্থ শর সন্ধানও ব্যর্থ হইবে, সুতরাং বুদ্ধিকে প্রশান্ত করিতে পারিলেই, স্বভাবতঃই অপরাপর যন্ত্রনিচয় শান্ত হইবে, শুদ্ধ হইবে, বুদ্ধির অনুগত হইবে।

এইজন্য বর্ত্তমান সাধনার প্রারম্ভ বুদ্ধির শুদ্ধি হইতে। বুদ্ধি যদি অনন্ত শক্তিশালী না হয়, তবে আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ হইবে। বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় (passive) করিতে হইবে শুনিয়াই বুদ্ধিজীবী মানব হাহাকার করিয়া উঠেন, কারণ বুদ্ধির বলেই ত এতকাল তাহারা নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করা অর্থে বুদ্ধির বুঝিবার শক্তি হ্রাস করা নহে, বরং এমন একটি সাধন প্রণালীর মধ্যে উহাকে নিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে উহা শত গুণ অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে।

* * *

পুরা তন সাধকগণ সংযমকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়া-

ছেন। এই সংযম অর্থে হয় বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলা, যাহাতে সে কোন একটী উন্নত চিন্তা গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারে, অথবা জগতের স্বাধীন চিন্তাস্রোতঃকে খর্ব্ব করিয়া শাস্ত্রমত উপদেশমত চিন্তা করিতেই তাহাকে অভ্যস্ত করিয়া তোলা।

আমরা এতদুভয়ের কোন পন্থাই অবলম্বন করিব না। আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উন্মুক্ত রাখিব এবং জগতের চক্ষে যাহা ভাল মন্দ, হিত অহিত, মঙ্গল অমঙ্গল সমস্ত স্বাধীন চিন্তাকেই গ্রহণ করিব, কিন্তু এই অভ্রান্ত চিন্তাধারার অনুগামী হইয়া জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিব না। আমরা বুঝিব বুদ্ধি আমাদের জীবনের নিয়ামক নহে, বুদ্ধির অতিরিক্ত অদ্বিতীয় পুরুষ, যাঁহার ইচ্ছায় শুধু আমাদের জীবন নয়, ত্রিজগতের গতি অবধারিত হইতেছে—সেই পরাৎপর পুরুষের ঈঙ্গিতে আমাদের চালিত হইতে হইবে।

* * *

সেই ইচ্ছাই কালীশক্তি, বুদ্ধির অহং বিদূরিত না হইলে এই কালীশক্তির ইচ্ছা বুদ্ধি অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই বুদ্ধির যে কর্ত্তৃত্ববোধ সাধনার প্রাক্কালে তাহার মূলেই কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

বুদ্ধি বিশ্লেষিত হয় বলিয়াই তাহার মধ্য দিয়া যে জ্ঞানসূর্য্য প্রতিভাত হয় তাহা জীবের দর্শনে আসে না। বুদ্ধি যখন সহস্র আবর্ত্তে অটল থাকিবে যখন সে প্রতি উত্তেজনায় কর্ম্মতৎপর হইয়া ছুটাছুটি করিবে না, তখনই বুঝিবে বুদ্ধি প্রশান্ত ও শুদ্ধ হইতেছে।

জীবনের সবে বুদ্ধি প্রভু নহে। অথচ তাহাকেই প্রভু করিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া আমরা পদে পদে বিপর্য্যস্ত হইতেছি ইহা ধ্রুবসত্য।

অতএব বুদ্ধি স্থির হইলেই কালীর ইচ্ছা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন—ইহাই আমাদের সাধনার মূল কথা।

আত্মোন্নতির কথা।

রোগীকে স্বাস্থ্যবান্ করিতে হইলে রোগীর রোগের মূল অনুসন্ধান প্রয়োজন, দুঃখের নিরাকরণ করিতে হইলে দুঃখের কারণসমূহ পরিজ্ঞাত হওয়া দরকার সেইরূপ দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশের অবনতির মূল কারণ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার নিতান্ত আবশ্যক; তাহা না হইলে আমরা ভুলপথে আমাদিগের শক্তিকে পরিচালিত করিয়া বৃথা কালক্ষয় ও শক্তির অপব্যয় করিতে পারি।

দেশের অবনতির কারণ সম্বন্ধে আজকাল অনেকের মুখেই একটা খামখেয়ালী খোস্‌মেজাজী কথা শুনিতে পাওয়া যায় সেটা হইতেছে এই যে—দেশের অবনতি হইয়াছে কারণ আমাদের ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে। এই কথাটা অনেক খানেই শোনা গেলেও ইহার ব্যাখ্যা কিন্তু কোথাও শ্রুতিগোচর হয় না। যাঁহারা এ কথাটা বলেন তাঁহারা যে ধর্ম্মের অবনতি অর্থে কি বলিতে চাহেন অথবা তাঁহাদেরই ইহার কোন স্পষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা তাহা পরিষ্কারভাবে এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের অবনতিটা মানিয়া লইলেও এ পর্য্যন্ত আমরা কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারি নাই; যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্মের অবনতিরূপ অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশের ও জাতির উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিতে পারি। সেদিন এক অশীতিপর প্রাচীন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুর" আমাদের ত ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে—কথাটার অর্থ কি বলিতে পারেন?" "বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—বাপু হে ধর্ম্মের অবনতি ত হইয়াছেই সে ত স্পষ্ট। আজকালকার লোকের কি আর ব্রাহ্মণের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি আছে?" ইহাই হইল প্রাচীন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের অবনতির ব্যাখ্যা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণও যে এখন নাই তাহা বৃদ্ধ ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার ধারণা ব্রাহ্মণগণ যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। কিন্তু সে ক্ষান্ত দান্ত জিতক্রোধ জিতমন ব্রাহ্মণ ত এখন নাই বলিলেই হয়। এখন আছে শুধু উপবীতধারী ব্রাহ্মণ। সুতরাং যাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তাশীল, যাঁহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তাঁহারা যে এই উপবীত-ব্যক্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট আপনাদের মস্তক নত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন তাহা

ও অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে শ্রদ্ধা ভক্তিতে ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের অধিকার, উপবীত-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে সে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র করাই বরং অধর্ম্ম। কারণ, সত্যের উৎযাপনই ধর্ম্ম এবং অসত্যের আশ্রয়ই অধর্ম্ম। সুতরাং বর্ত্তমানে এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব তাহা ত অধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণকে যে কারণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম সে কারণের অভাব হইয়াছে সুতরাং ভক্তি শ্রদ্ধারও অভাব হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সত্য, ইহাই ধর্ম্ম। সুতরাং এই ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভাবে যে দেশের অবনতি হইয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া অযৌক্তিক।

অন্য এক দিন এক গোস্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোঁসাইজী, আমাদের ত ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে। এ কথাটার ব্যাখ্যা কি বলিতে পারেন?" "তিনি উত্তর করিলেন—ধর্ম্মের অধঃপতনের আর বাকী কি? আজকাল যে 'মুর্গি মটনের' শ্রাদ্ধ।" সুতরাং গোস্বামীজীর ধর্ম্মের অবনতির যে ব্যাখ্যা সেটা রন্ধনশালার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এই 'মুর্গি মটন'টা ত শুধুই রসনার রুচিভেদের একটা কথা। ইহার সহিত একটা দেশের কিম্বা জাতির উন্নতি কি অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি নাই তাহা গোস্বামীজী ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই অথবা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। 'মুর্গি মটন' সামাজিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধ হইতে পারে—কিন্তু আচারের পরিবর্ত্তন হইলেই যে একটা দেশের অধঃপতন বা একটা জাতির মৃত্যু নিশ্চয় তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিবেন। সুতরাং গোস্বামীজীর এই 'মুর্গি মটনেই' যে দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে তাহাও মানিয়া লওয়া কঠিন।

কিন্তু তথাপি আমাদের যে অধঃপতন হইয়াছে তাহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা ত চিরকাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরাও ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? এ অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আমাদের আজ এ অবস্থা? ইহার একই উত্তর—সে উত্তর হইতেছে এই যে—আমরা মানুষনামক জীবটীকে অস্বীকার করিয়াছি—তাহাকে

অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমরা এই কথাটাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম হইতেছে—সত্যম্, ঋতম্। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে, এই সৃষ্টির স্থিতি সম্ভব হইয়াছে যাঁহাকে স্বীকার করিয়া বহু আপন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, বিড়ালের বিড়ালত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। আবার যাহার প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বৈশ্য, শূদ্র শূদ্র। মানুষ, বিড়াল, বৃক্ষ সকলেই এক—সকলেই সেই এক পরমাত্মার বিভূতি। আবার ইহারা সকলেই স্বতন্ত্র। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আসিল কোথা হইতে? ইহাদের পৃথক পৃথক গুণ হইতে। এই গুণের জন্ম হইল কি করিয়া? ইহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে।

সুতরাং এই সৃষ্টির যে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব—বহুর যে অনন্ত গুণের খেলা—তাহার ভিত্তি হইতেছে বহুর আপন আপন ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের উদ্‌যাপনেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মুক্তি, আনন্দ। কারণ এই যে ধর্ম্ম—তাহা কাহারও মনগড়া নয়। ইহা উদ্ভূত হইতেছে ব্রহ্ম হইতে, সৎরূপ লইয়া—আনন্দ হইতে, অমৃতবহ হইয়া—লীলার জন্য।

সুতরাং মানুষের যে ধর্ম্ম, মানুষের যে মনুষ্যত্ব তাহা রহিয়াছে তাহার দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে, চিত্তের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে—ইহাদের প্রেরণার মধ্যে। মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, গৌরব, সৌষ্ঠব রহিয়াছে তাহার এই বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়—সকলের আপন আপন ধর্ম্ম উৎযাপনের মধ্যে—কর্ম্মের মধ্যে, ভোগের মধ্যে—ইহাদের মুক্ত এবং সত্যচালনার মধ্যে রহিয়াছে তাহার আনন্দলোক—অমৃতত্ব। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম সেখানেই মানুষের ধ্বংস—মানুষের যাহা লইয়া মানুষ তাহার নাশ। যেখানেই ইহাদের অসত্য চালনা—সেখানেই মানুষের দুঃখ অমঙ্গল। কারণ ধর্ম্মই জীবকে ধারণা করিয়া আছে—এ সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করিয়া আছে। এই কথাটা আমরা একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বৃহৎ উদ্যানবাটিকা। অসংখ্য গোলাপ বৃক্ষ। পত্রে পত্রে শাখা প্রশাখা আচ্ছাদিত। রক্ত, শুভ্র, পীত নানা বর্ণের গোলাপ বৃক্ষরাজি উজ্জ্বল—চারিদিক সৌরভে আমোদিত। সৌন্দর্য্যে, সুবাসে, ভঙ্গিমায়, রঙ্গিমায়

উদ্যান-বাটিকা নন্দন কানন সদৃশ। জ্ঞানীগণ কি বলিবেন? বলিবেন—ব্রহ্ম গোলাপবৃক্ষরূপে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু গোলাপবৃক্ষ যদি বলিয়া বসে—"আমি বুঝিতেছি আমার মূল হইতে একটি শক্তি নিঃসৃত হইতেছে। আর সে শক্তি আমাকে সার্থক করিতেছে মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া। তাই আমার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতেছে, নব কিশলয় বিকশিত হইতেছে, পুষ্পরাজি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইতেছে, সৌরভের বিকাশ হইতেছে। কিন্তু এ খেলা আর আমার ভাল লাগে না। আমি যোগশক্তি প্রভাবে যে শক্তি মূলকে রস টানাইতেছে সে শক্তিকে দমন করিব।" তবে গোলাপ বৃক্ষের আর যে কোন উদ্দেশ্য সফল হউক বা না হউক—তাহার গোলাপ বৃক্ষত্বের অধঃপতন অনিবার্য্য। তাহার সে সৌন্দর্য্য, সৌরভ, গৌরবের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, এবং পুষ্পরাজ্যে তাহার মান, পদ ও সম্ভ্রমের হানি নিশ্চয়।

আমাদের এ জাতিটাও কয়েক শতাব্দী হইল গোলাপ বৃক্ষের ঐ কথাটা বলিয়া আসিবার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জীবনে উদ্দাম শক্তির অনুভব করিতেছি—মনে হইতেছে সে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা দেখিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগ সামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্য্যরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপাইয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশাল করিয়া না তুলিতে পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া না ফেলিতে পারে—এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি না আহরণ করিতে পার। কিন্তু কেন? এই যে আমার হস্ত পদ দেহ, মন প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত—ইহাদিগকে উপবাসী করিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা কেন? কোন্ উপকার সাধনের জন্য? কেহ বলিতেছেন ইহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে—কারণ ইহারা থাকিলে ভগবানে পৌঁছান যায় না—অন্ততঃ দুরূহ। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন—এই যে দৃশ্যমান জগৎ তাহা মায়ামাত্র, স্বপ্ন, অলীক। এবং তোমার কর্ম্ম ও ভোগ স্বপ্নঘোরে হাত পা ছোঁড়ার মতই হাস্যজনক।

আমরা এ সম্বন্ধে এ স্থলে কোন আলোচনা করিব না। (মায়া সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল)। কিন্তু ইহা মায়া হউক বা না হউক,—মানুষের মনুষ্যত্বকে বিজয়ে মণ্ডিত করিতে হইলে—গৌরবে দীপ্ত করিতে হইলে তাহার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে—কারণ ইহাদের লইয়াই মানুষ—মানুষ হইতে এই সকলকে খসাইয়া লইলে—যাহা থাকে তাহা ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আনন্দময়—মানুষেও যাহা বিড়ালেও তাহা, বৃক্ষেও তাহাই। সুতরাং মানুষ নাম ও রূপধারী সৃষ্ট জীবটীর সুখ সমৃদ্ধি গৌরব লব্ধ হইবে ইহাদেরই ভিতর দিয়া, ইহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের আচরণে। সুতরাং আমাদের জাতিটাকে উন্নত করিতে হইলে—ইহাকে সুখে, সমৃদ্ধিতে, সম্মানে, গৌরবে মণ্ডিত করিতে হইলে—প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—ঐ মনুষ্য ধর্ম্মকে—তাহার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানকে—তাহাদিগের উদ্বুদ্ধ শক্তিকে। মানুষের গৌরব রহিয়াছে এই সকলের মুক্ত খেলায়—তাহার অমৃত রহিয়াছে এই সকলের সত্য চালনায়। তাহার এই সকল যন্ত্রের মুক্ত খেলা সহজেই হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সত্যচালনা করিতে হইলে চাই এই সৃষ্টিলীলার রহস্যভেদ—আর এই সৃষ্টিলীলার রহস্যভেদ করিতে হইলে চাই আপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়। আর সে পরিচয় লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—যোগ।

—:*:—

যোগ।

[৯]

প্রাণের আধার এই শরীর। প্রাণ আছে বলিয়াই রক্তমাংসের এই দেহ বিদ্যমান। প্রাণশক্তির হ্রাস হইলেই বাহ্যাবয়বও জীর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রাণের শুদ্ধি হইলেই দেহ-শুদ্ধি আপনাআপনি হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য আত্মসমর্পণযোগী, এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইবে।

জীবের স্থূল দেহের সহিত সূক্ষ্ম দেহের সংযোগ বিধান করিয়াছে এই প্রাণশক্তি, সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্ম প্রাণের খেলা, স্থূল শরীরে প্রাণবায়ু বিবিধ বায়ুময় কোষে অবস্থিত থাকিয়া জীবের গতিবিধি পরিচালন করিতেছে। এই স্থূল প্রাণের কথা পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব, এক্ষণে সূক্ষ্ম প্রাণের কথাই বলি।

সূক্ষ্ম প্রাণ, মন ও চিত্তের নিম্নে, মাঝিতলে অবস্থিত। হঠযোগে যে চক্রের উল্লেখ আছে—ইহাই সেই স্বাধিষ্ঠান চক্র। অনেকেই সূক্ষ্ম শরীরের এই চক্রগুলিকে স্থূল শরীরে আবিষ্কার করিতে চান। সূক্ষ্ম শরীরের গ্রন্থি গুলি ঠিক ঠিক ভাবে স্থূল শরীরে পাওয়া যায় না, তবে কয়েকটা অনুরূপ কেন্দ্র ধরিয়া হঠযোগীরা সাধন আরম্ভ করেন এইমাত্র।

সূক্ষ্মপ্রাণ বুঝিতে হইলে গোড়ার কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। চতুষ্পাদ আত্মার যে তুরীয় অবস্থা—অর্থাৎ যে অবস্থা আনন্দময় সত্তারও বাহিরে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে—সেই পরম ব্রহ্মের বহির্বিকাশই এই পঞ্চভৌতিক জগৎ। এই অব্যক্ত অভাবনীয় তুরীয় ভাবই অধিরোহন করিয়াছেন প্রপঞ্চ জগদ্রূপে। এই অনির্ব্বচনীয় বিরাট ভাবই, আনন্দময় জ্ঞানময় সত্তাস্বরূপ, আত্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন জীবের অন্তঃকরণকে—ইহাই হইতেছে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর। এই অন্তঃকরণের আবরণই আমাদের জাগ্রত বা পার্থিব শরীর। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নাই এবং জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম নাই। সূক্ষ্মে ও স্থূলে সংযোগ হইয়াছে প্রাণময় সূত্র দিয়া—এই প্রাণ অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান্ জগৎ উপভোগ করিতেছেন।

এক্ষণে এই প্রাণের কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ত্যাগে যে বিপুল আনন্দ তাহা আমরা পাই না—কাজেই ত্যাগের মন্ত্রে শত শত বৎসর দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি, ফলে শুদ্ধ শক্তির অভাবে ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই হারাইয়া, আজ ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা। এই প্রাণকে শুদ্ধ করিয়া শিখিতে হইবে নূতন মন্ত্রের সাধনা "ভোগঃ যোগায়তে"। বুদ্ধির অশুদ্ধতা যেমন জল্পনা কল্পনা, কুট তর্ক, একদেশদর্শিতা—মনের দোষ যেমন বিষয়ের দাসত্ব, বহির্জগতের তাড়নায় বিক্ষিপ্ততা—চিত্তের দোষ যেমন তমঃপূর্ণ নৈসর্গিক সংস্কারপ্রবণতা, অতীত স্মৃতিকে পর্দা ধারণ করিয়া সঙ্কীর্ণ বৃত্তির অধীনতা—প্রাণের তেমনি প্রধান ও একমাত্র দোষ বাসনা। এই বাসনার কুহকে আচ্ছন্ন আছি বলিয়াই অতি অনিত্য ভোগ লালসায় উন্মত্ত হইয়া জগতের প্রকৃত ভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই।

মুকুর ধূলি সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে তাহাতে মূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। প্রাণও সেইরূপ বাসনাযুক্ত থাকায় ভোগে যে আনন্দ তাহা উপলব্ধি হয় না, সেইজন্য প্রথমেই প্রাণ হইতে এই বাসনাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে নিগ্রহনীতি অবলম্বন করিয়াই অনেকে এই কামনা ত্যাগের কল্পনা করেন কিন্তু আকাশে গৃহনির্ম্মাণরূপ অসাধ্য সাধনের মত ইহাদের প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। আজ যে সকল ব্যবধানের মধ্যে আপনাকে সংস্থিত রাখিয়া বাসনার হাত এড়াইবে, পরজন্মে সেই সমস্ত অনুকূল অবস্থা না ঘটিলে বাসনার প্রখর প্রবাহে তোমায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কে বলিতে পারে? এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি"।

আমরা বাসনা পরিত্যাগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় মনে করি—আত্ম-প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তনে। অন্তঃকরণকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাধকের জীবনে পুরাতনের কোন প্রভাবই যাহাতে কার্য্যকরী হইতে না পারে এমন ভাবে বুদ্ধি মন চিত্তকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল ভোগ্যবিষয় হইতে দূরে থাকিয়া কামনার পরপারে চলিয়া যাইব—ইহাকে আমরা অসার ও উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই বাসনা আমাদের কিরূপ বিভ্রান্ত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মৃত্যুর পরও জীবের মূলাধারে তাহার অতীত জন্মের সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়। নূতন জন্মগ্রহণের পরই একে একে জন্মার্জ্জিত বাসনাগুলি উঠিয়া জীবকে নাচাইতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণ—ভোগ ও কর্ম্ম-প্রেরণার ক্ষেত্র। এই ভোগ ও কর্ম্ম ভগবানের—কিন্তু ইহা উপর হইতে প্রাণে পৌঁছিবামাত্র আধারস্থিত বাসনার পূতিগন্ধে বিকৃত হইয়া উঠে। তখন উহা চেষ্টারূপে, চিত্ত ও মনকে বাসনানুযায়ী বিষয়গ্রহণের জন্য উন্মাদ করিয়া তুলে। বুদ্ধি বাসনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাম্য-পদার্থের প্রাপ্তির পথে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মোট কথা এই, বাসনার প্রভাব বুদ্ধি হইতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

বাসনার তিনটী রূপ। প্রথম আসক্তি, দ্বিতীয় কামনা এবং তৃতীয় রাগদ্বেষ। কোন বস্তু বিশেষের প্রতি তুমি যখন আসক্ত হও—তখন তোমার মনে হয় ঐ বিষয় লাভ না করিলে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা হইবে। সুতরাং ঐ বস্তু লাভ করিবার জন্য—তুমি, মন বুদ্ধি সমস্তই নিয়োগ

করিয়া দিবারাত্র চেষ্টা করিতে থাক। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে ক্ষণিক আনন্দে তুমি উন্মত্ত হও; আর বিফল হইলে রাগে অভিমানে তুমি মৃতপ্রায় হইয়া চিন্তা করিতে থাক কেমন করিয়া হইবে—যে রকমেই হউক উহা লাভ করা চাই। কোন প্রকারে প্রাণের এইরূপ আসক্তির উগ্রতা দূর হইয়া যাইলেও উক্ত প্রবৃত্তি লাভ করিবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা প্রাণের মধ্যে থাকিয়া যায়। যদি কখন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়, তৎক্ষণাৎ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে—ইহাই কামনার খেলা।

কামনা দূর হইয়া যাইলেও, রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। জন্ম-জন্মান্তরের বাহ্য জিনিষগুলিতে তোমার যেমন আনন্দ আবার যেগুলি তোমার ভাল লাগে না সেগুলিতেও সেইরূপ উৎকট বিরাগ। এই রাগদ্বেষ তিরোহিত হইলেই জীবের মধ্যে সমতা দেখা দেয়। ইহাই প্রাণের পূর্ণ শুদ্ধি।

এক্ষণে এই প্রাণকে কি করিয়া বাসনামুক্ত করা যায়? সাধক কালীশক্তিদ্বারা বুদ্ধিকে বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তুলিবে—বাসনা যেন বুদ্ধিকে কোন মতে বিভ্রান্ত করিয়া না তুলে। তাহার পর মনকে শান্ত ও চিত্ত যাহাতে অচঞ্চল থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে বাসনা কেবল প্রাণগত হইয়া পড়িবে—সেইখানেই সে উঠিবে পড়িবে পরন্তু মন ও বুদ্ধিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

এরূপ অবস্থায় অন্তঃকরণে পূর্ণ শান্তি সম্ভবে না কেননা বাসনা-রাক্ষসী প্রাণের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া ক্রমাগত মুক্তির জন্য চিত্তে মনে আঘাত করিতে থাকে কিন্তু একবার যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযোগে এই সকল যন্ত্রণাগুলি হইতে বাসনার প্রভাব দূর করিয়া তাহাকে প্রাণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেননা চিত্ত ও বুদ্ধির সহায়তা না পাইলে বাসনা কার্য্যকরী হয় না। যদি এই বাসনা কোন ক্রমে জীবের অন্তরে একটা আদর্শ বা জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা হইলে ইহার শক্তি দমন করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য ভালমন্দ যে কোন বাসনাই হউক না কেন—কখন বাসনার আবেগে অভিভূত হইও না।

অনেকেই বলেন ভাল বাসনাগুলি রাখিয়া মন্দগুলিকে বিসর্জ্জন দাও। এই সকল মূর্খদের উপদেশাবলীতে কখনই কর্ণপাত করিও না। তবে যদি এইরূপ সঙ্কল্প করিতে পার, যে মন্দ বাসনাগুলিকে ত্যাগ করিবার জন্য উপস্থিত

ভাল বাসনাগুলিকে রাখিতেছি, পরে মুমুক্ষুত্ব এবং ভগবানের সহিত মিলনের বাসনামাত্র রাখিয়া ভালগুলিও ত্যাগ করিব—পরিশেষে ভগবানের হস্তেই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিব—আমি হইব নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার। নতুবা ভালর ছদ্মবেশে মন্দ বাসনা তোমার প্রাণের মধ্যে বাস করিয়া এমন ভীষণ অবস্থায় তোমায় নিক্ষেপ করিবে যে সেখান হইতে উঠিবার সামর্থ্য আর থাকিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে তুমি পাপপুণ্য উভয়েরই অতীত হইবার সঙ্কল্প করিবে। স্বামিজী বলিয়াছেন—

ছিঁড়ে ফেল সকল বন্ধন, হউক সে
কনক রচিত কিম্বা লৌহময়; প্রেম
ঘৃণা, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, প্রকৃতির
যে কোন বন্ধন। অধীনতা কোন মতে
নহে শ্রেয়ঃ; অধীন যে জন, হেয় ঘৃণ্য
এ বিশ্ব মাঝারে। কারারুদ্ধ জন নহে
হীন মোহবদ্ধ চেয়ে; সুবর্ণ শৃঙ্খল
লৌহ সম, বাঁধিবার কালে হীনশক্তি
নাহি ধরে। বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল, গাও
বিদারি গগন, ওঁ তৎ সৎ ওঁ। *

বাসনা যখন প্রাণের সীমাবদ্ধ গতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া হাহাকার করিতে থাকিবে তখন তাহার করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিও না—সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবদ্ চিন্তায় মন ও বুদ্ধি সংযোগ করিবে। এইরূপে কিছু-কাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই দেখিবে আসক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে শক্তি নাই। আসক্তি শক্তিহীন হইলেই কামনা একেবারে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে—তখন তুমি অনায়াসেই আসক্তি ও কামনাকে চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারিবে। আসক্তি এবং কামনার নাশ হইলেও রাগদ্বেষ থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কামনা না থাকায় জীবনের উপর যাহা আসে তাহা সুখ দুঃখ যুক্ত হইলেও সাধক নির্ব্বিকার চিত্তে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে—সুখে এবং দুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনাতেই ভগবানের হস্ত—ইহা অনুভব করিতে করিতে সাধক সমতা ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে।

পৃথিবী যে ভগবানেরই ভোগ ভূমি, এই শুদ্ধ ভোগের সহিত পূর্ণ শান্তি বিরাজ-

* লেখকের অনুবাদ।

মান—পূর্ণ সমতা লাভ করিলেই সাধক ইহার আস্বাদ পাইবে। অনেকের ধারণা, কামনা না থাকিলে ভোগ সম্ভবে না—ইহা নিতান্তই মূর্খতা—কামনার কুহকে প্রাণ আচ্ছন্ন থাকিলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না, আর জ্ঞান বিকাশ না হইলে ভোগের আস্বাদ করিবে কে? সত্যসত্যই কামনামুক্ত না হইলে ভোগ আরম্ভই হয় না। কামনার তাড়নায় যে ভোগ, উহা অতি অকিঞ্চিৎকর, ক্লেশদায়ক, শঙ্কাবিজড়িত সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রাণের যে ভোগ উহা শান্ত, অফুরন্ত পরমানন্দদায়ক। সেই "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"র মত, তৃপ্তি ও বৈরাগ্য বিবর্জ্জিত অমরার মহামৃত। ইহা হর্ষ বা সুখ নহে—ইহা আনন্দ—এই অমৃত পানে সাধক জরামরণ শূন্য হইয়া ভগবদ্ প্রকৃতি লাভ করেন।

কাম যখন শুদ্ধ লিপ্সায় পরিণত হয় তখন সাধক জগতের যাবতীয় পদার্থই শবের মত নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা সবই ভগবানের দান বলিয়া সাধক সমস্তই আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করেন।

এই পূর্ণ যোগীর আত্মা যদি অনন্ত নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানেও ইহার অবিচল পূর্ণ শান্তির অন্ত হয় না—ভক্তের মত ইহা কেবল ভগবানের ইচ্ছা বলিয়াই সে পরিতৃপ্ত হয় না—সে পরম জ্ঞানীর মত, নরক কুণ্ডকেও আলিঙ্গন করিয়া বলিতে থাকে, "ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার ভগবান্, আনন্দময় ব্রহ্ম—আমার সর্ব্বেশ্বর শিবম্ শুভম্ সুন্দরম্।

হে নবীন সাধক! এই পূর্ণ যোগপথ তোমারই জন্য।

মনের মানুষ।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "মনের মানুষ কি পাওয়া যায়, মনের মানুষ করে নিতে হয়"। কিন্তু আমরা জানি খুঁজিলেই মনের মানুষ মিলিয়া যায়, যাহার ভাগ্যে মনের মানুষ মিলে না সে বড় দুর্ভাগ্য।

এই মনের মানুষের লোভে আমরা অনেক সময় বড় বিপন্ন হইয়া পড়ি; লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু একথা ধ্রুব সত্য। সংসারে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত যে, সে আমার মনের মানুষ কি না উহা পরীক্ষা

করি না ; তার মুখে মধু, হৃদে বিষ, তাহা দেখি না—বাহিরের হাব ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই, তারপর যখন দেখি সে ভীষণ স্বার্থপর, বড় ব্যবসায়ী তখন কেমন হয় বল দেখি ?

কিন্তু মনের-মানুষ চাই, তাহা না হইলে প্রাণ বাঁচে না। এই মনের মানুষ চেনবার একটা সঙ্কেত আছে পাঠকবর্গকে তাহা বলিয়া দিব, তাহা হইলে আর কাহাকেও প্রতারিত হইতে হইবে না।

সংসারে মনের-মানুষের হাট আছে, সে হাটে মনের মানুষের বেচাকেনা হইয়া থাকে। ভাব নগরে প্রেমের বাজারে এই হাট বসে। ঝাঁকা ঝাঁকা মনের মানুষ বিনামূল্যে বিকাইয়া যায়। অলস যাহারা তাহারা এতদূর আসিতে পারে না, ঘরে বসিয়া নকল জিনিষ খরিদ করিয়া নাস্তানাবুদ হয়।

নাড়া চাড়া করিয়াও এ খাঁটী জিনিষ পরখ করা যায় না। নয়ন দুটী দেখিয়া ইহাকে চিনিতে হয়। দেখিতে দেখিতে যদি বিভোর হইয়া যাও বুঝিবে এই তোমার মনের মানুষ, বিনামূল্যে ইহাকে খরিদ করিবে বটে কিন্তু সর্ব্বস্ব দিলেও প্রাণের মধ্যে দরদ লাগিবে না। ইহাকে দিয়াই যেন সুখ কিন্তু এ কিছু চায় না, যা লয় তাহার দ্বিগুণ ধরিয়া দেয়, জীবনের মধ্যে পূর্ণতা আনিয়া দেয়। বেশী কথা বলিব কি মনের মানুষ যদি পাও ত দেখিবে তার জন্যে বুকের মাঝে একটা খোঁচার ঘাও লাগিবে না। বাউল-দের একটা গান দিলাম—

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা,
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে হু এক জনা ;
সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে
(ভাবের মানুষ) কচ্ছে রসের বেচা কেনা ॥
মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা
ও সে কয়না গো কথা
ভাবের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।
মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা ॥

বল দেখি বর্ত্তমান যুগে অসাধারণ মত লইয়া উজান পথে কে চলিয়াছে ?

পূর্ব্বাভাষ।

সুফলা বঙ্গদেশ বিধাতার রোষনেত্রে ছারখারে যাইতে বসিয়াছে—ইহা আমাদের কর্ম্মফল। কোন্ কর্ম্মদোষে "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" সোণার বাঙ্গালার এমন শোচনীয় অবস্থা—কোন্ মহাপাপে অন্নপূর্ণা বঙ্গজননী আজ ভিখারিণী নিরাভরণা—কোন্ অভিশাপে ভক্ত কবি বীর-প্রসবিনী দেশ-মাতৃকা আজ রুগ্ন সন্তানগণের দুর্ব্বলা জননী? যাহার জন্যই হউক আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

আজ বাঙ্গালা দেশের নরনারী—বন্যায়, ম্যালেরিয়ায়, দুর্ভিক্ষে, বিসূচিকায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বাংলার আশাভরসা নব বলে বলীয়ান নিঃস্বার্থ যুবকবৃন্দ বিধির বিপাকে রাজরোষে দলে দলে কারাগারে অবরুদ্ধ হইতেছে—তস্কর, দস্যু, দুরাচারগণের উৎপীড়নে গ্রামবাসী সশঙ্কিত—কপট বাক্‌চাতুর্য্যে নেতার আসন অলঙ্কৃত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যোগী—সাধু অজ্ঞাতবাসে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছেন—কি উৎকট প্রায়শ্চিত্ত।

আজ এই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ভীষণানল নির্ব্বাপিত করিয়া, দেশের মধ্যে পুণ্যপ্রবাহ ছুটাইয়া দিতে হইবে—ফিরাইয়া আনিতে হইবে কবির ঋষির আনন্দময় স্বর্ণযুগকে। যে যুগে মানুষ পূর্ণ হইয়া উঠিবে জ্ঞানে প্রেমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে—দেশকে উন্নত করিয়া তুলিবে শিল্পে বানিজ্যে ধনে ঐশ্বর্য্যে—যে যুগে সে আপনার উন্নত ললাটে গৌরব টীকা ধারণ করিয়া মোহগ্রস্ত জগতকে হাঁকিয়া বলিবে—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

হে বাঙ্গালী, এই সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের উচ্চাসনে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগতকে শিক্ষা দিবার ভার তোমার উপরই বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে—এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা তাহারই পূর্ব্বাভাষ।

———:*:———

রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন আজ রবীন্দ্রনাথের গৌরবে গৌরবান্বিত—সাহিত্য-জগতে যখন তাঁহার নাম লইয়া বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে—দেশের একদল লোক যখন তাঁহাকে ঋষি আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত নন—তখন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা দু একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

* * *

রবীন্দ্রনাথ যখন 'কড়িও কোমল' প্রচার করিলেন ঠিক সেই সময় কাব্য-বিশারদ 'মিঠেকড়ায়' তাঁহাকে নাস্তানাবুদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এখনও মনে পড়ে কাব্যবিশারদের "ওঁরে কুঁড়ে কিঁরে" প্রভৃতি শ্লেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী অশুদ্ধ শব্দের উপর তীব্র কষাঘাত। তখন রবীন্দ্রনাথের রচনা লইয়া হিতবাদীতে প্রায় দীর্ঘ দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইত। সেইগুলি পড়িয়াই রবীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি একে একে পড়িতে আরম্ভ করি। এই সূত্র হইতেই রবীন্দ্রনাথের উপর আমরা অল্পাধিক পরিমাণে আকৃষ্ট।

* * *

তারপর স্বদেশী যুগের কথা। আহা, সেই সময়ের তাঁহার এক একটা সঙ্গীত আমাদের প্রাণে এমন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত তাহা আর কি বলিব—গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতাম, "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক" প্রভৃতি। আবার যখন গাহিতাম—

"দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত, জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত, হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।"

তখন উৎসাহে হৃদয় ভরিয়া যাইত। শত শত বৎসরের জড়তা ভীরুতা দূর করিবার জন্যই যেন কবি গাহিয়াছিলেন—

"যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না!
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।" প্রভৃতি।

কত বলিব, একটা জাতির মধ্যে চেতনার সাড়া আনিতে কবি রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না।

তিনি আরও বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইলেন সেইদিন, যেদিন তিনি কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়া চিনিয়াছিলেন—স্বদেশমূর্ত্তি শ্রীঅরবিন্দকে। তিনি দীপক রাগিণীতে গাহিলেন—

"* * * * জয়, তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অদানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল!
মোছরে দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল।"

সত্যের সন্ধান পাইয়া উদাত্তস্বরে কবি সেদিন প্রচার করিয়াছিলেন—

"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্বভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির!"

তখন রাখীবন্ধনের আদেশপত্রে অন্যান্য দেশনেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামও সংযুক্ত থাকিত, পথে পথে যুবকের দল গাহিয়া বেড়াইত কবিরই প্রাণ দিয়ে গড়া মধুর সঙ্গীত,

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই,
এক দেশ, এক ভগবান্,
এক জাতি, এক মন প্রাণ,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালী জাতির অগ্রদূত; রবীন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া, রবীন্দ্রনাথের ভাষা পড়িয়া নবীন দল পথ চলিবার একটা গতিনির্দ্দেশ চাহিত; রবীন্দ্রনাথের উপর দুর্ব্বল হতাশ জাতিটা কিছুর প্রত্যাশা করিত—সে প্রত্যাশা সত্যের, অমর ভাবের। কিন্তু তিনি কবি, নেতা নহেন, ঋষি নহেন একথা তখন কেহই বুঝিতে পারেন নাই—তাই যেদিন রবীন্দ্রনাথ মহাজনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বদেশীর যুগপাত করিয়া ঘরে ফিরিলেন, সেদিন দেশের মাথায় যেন বজ্রপতন হইল—সেই হইতেই রবীন্দ্রনাথের উপর অনেকেই বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র। যাহা হউক একটা পাল্টা মারিয়া রবীন্দ্রনাথ জগতের সম্মান পাইবার অনুসন্ধানে ফিরিলেন—ইউরোপের লোক রবিকবির কাব্যে তাহাদের অনাস্বাদিত প্রাচ্যজগতের নূতন রসের আভাষ পাইয়া তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ প্রদান করিলেন; বাঙ্গালী উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল বটে কিন্তু যে বেদনা তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই নিদারুণ, সেইজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি তেমন হৃদয়ের সহিত উপভোগ করিতে পারিল না।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া হয়ত ভাবিয়াছিলেন দেশবাসী তাঁহার পায়ে আসিয়া পড়িবে; কিন্তু বাংলায় আসিয়া তেমন কিছু তিনি দেখিলেন না। বাঙ্গালী জাতি গুণের আদর জানেনা এরূপ ভাবিয়া তিনি কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কেননা বোলপুরে যখন কতিপয় সাহিত্যরথী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, শুনিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সহিত বড় ভদ্র ব্যবহার করেন নাই।

* * *

তারপর সেদিন "ঘরে বাহিরে" উপন্যাসে দেশের বিকৃত দিকটা তিনি এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যাহা পড়িলে বাস্তবিকই যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী তাঁহাদের চক্ষে জল আসে, নিজেদের দুঃখে নয়, রবীন্দ্রনাথের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া।

শ্রীমতী সরলা দেবী গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীর একস্থানে লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমের আনন্দমঠের বহু পূর্ব্বেই রবিমামার এসকল কবিতা রচিত হয়। সুতরাং দেশমাতৃপূজার প্রধান পূজারী তিনিই। আজ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের অতি-ব্যবহার ও অপব্যবহারের উপর রাগ করিয়া 'ঘরে বাহিরে' গল্পে নিখিলেশের মুখে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার বিপক্ষে রবিমামা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের দোহাই দিয়া ছেলেরা যেসব কুকর্ম্ম করিয়াছে, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দেমাতরম্ গানটীকে দেশের অঙ্গ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইলে, রবিমামার জাতীয় বা দেশ-সঙ্গীত ও কবিতার অধিকাংশই ছাঁটিতে হয়।"

* * *

হায়, হর্ম্ম্যতলবাসী দেশভক্তগণের কি শোচনীয় মত পরিবর্ত্তন! অবশ্যই ইহা শত বার স্বীকার করি, স্বদেশীমন্ত্র বাংলায় একটা কঠোর যুগের আবর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু জামালপুরের প্রতিমা ভঙ্গ, বরিশালের কনফারেন্স দলন প্রভৃতি

কেলেঙ্কারী ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া ইহারাই ত গদ্যে পদ্যে দেশকে এরূপ ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদেরই মুখে আজি একি বিপরীত, বিভ্রান্তকারী কথা---হায়, ইহা দেশের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিব!

* * *

আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করি, অন্তরের সহিত তাঁহাকে পূজা করি---তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিয়া নয়, তিনি বড় সাহিত্যিক বলিয়া নয়, ধনী জমীদার বলিয়া নয়—এসব ত তাঁর অলঙ্কার---আমরা ভালবাসি তাঁর অন্তঃপ্রকৃতিকে। তিনি যেগুণে একদিন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার উপর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, যে অমৃতরস সিঞ্চনে একটা মরাজাতির হাড়ে বিদ্যুতের প্রেরণা বহাইয়াছিলেন; যে স্বর্গের কবিদৃষ্টির তরুণ রশ্মিপাতে বাংলার মায়াকুহেলিকা ভেদ করিয়া দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির মত সত্যের প্রেরণা বহিয়া আনিয়াছিলেন সেই সকল উপাদানই তাঁর স্বভাবজ নিজের সামগ্রী, উহা যাইবার নহে। প্রচণ্ড রবিকিরণ যেমন নিবিড় জলদজাল সদা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, সাময়িক মোহে রবীন্দ্রনাথ যেরূপ 'পাল্টাই মারুন' না কেন তাঁর স্বভাবশক্তি অসাধারণ, উহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ স্তম্ভিত।

* * *

বর্ত্তমান মহাপ্রলয়ের দিনে ভারতের মহিমা প্রচার কল্পে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তি বিচ্ছুরিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞানগর্ব্বিত কর্ণকুহরে প্রাচ্যের তত্ত্বগীতি গাহিবার জন্য যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, উহা সফল হউক ইহা সকল ভারতবাসীই অন্তরের সহিত কামনা করিতেছে। সম্প্রতি তিনি অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি দেশের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া যেরূপভাবে ভারতের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন তাহা সকল বাঙ্গালীরই জানিয়া রাখা উচিত। আমরা, সহযোগী বসুমতী এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কবি রবীন্দ্রনাথ এখন যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। ক্যানাডা ইংরাজ উপনিবেশ। তথাকার টরণ্টো ও মণ্টরীল সহরে বক্তৃতা জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তদুত্তরে তিনি যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। টরণ্টো সহরে প্রকাশিত 'ডেলিষ্টারে' মিষ্টার ভি জেমিসন লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) এই কথা সাধারণে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতে ইচ্ছা করেন যে

তাহাকে তাহুরর দ্বীপে নামিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বজাতি (ভারতবাসী) এরূপভাবে (ঘৃণিত-ভাবে) ব্যবহৃত হইবেন, ততদিন ক্যানাডায় অথবা অষ্ট্রেলিয়ায় (ইংরাজ উপনিবেশদ্বয়ে) কখনই পদার্পণ করিবেন না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত জাতি সকলের মানসিকভাবের পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন যে এই সকল ব্যাপারের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহাও তিনি আশা করেন না।'

আন্দোলন আবেদন অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রতীকার প্রক্রিয়া কত শ্রেষ্ঠতর তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে ? রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাঙ্গালী জাতি আজি গৌরবান্বিত।"

মানবজাতির একতার আদর্শ

(৫)

মানবজাতির মিলন সমস্যা এক্ষণে দুইটী স্বতন্ত্র সমস্যায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, প্রথম কথা, মানবের ক্রমোন্নতিফলে এ পর্য্যন্ত যে সমষ্টিসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলি পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিবর্জ্জিত করিয়া জগতের বর্ত্তমান নৈতিক ও সামরিক অবস্থাতেই কোনও রূপ স্থূল ব্যবহারিক সম্মিলন সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সম্ভব হইলেও তাহা কি ব্যক্তির ও পূর্ব্বসৃষ্ট সমষ্টিসমূহের স্বাধীন কর্ম্মশীলতা নিষ্পেষিত করিয়া তৎস্থলে প্রাণশূন্য রাষ্ট্রশাসন প্রবর্ত্তন করিবার ফলে মানবজীবন যন্ত্রবৎ শৃঙ্খলিত হইয়া যাইবার উপরেই নির্ভর করিতেছে না ? তদ্ব্যতীত তৃতীয় একটী প্রশ্নও উপস্থিত হইবে, এইরূপ যে আর্থিক, রাজনৈতিক, শাসনগত মিলন, তাহাই প্রকৃত মিলন কি না, যদি তাহা না হয়, তবে সেরূপ একতার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের অন্ততঃ পূর্ব্ব সূচনারও কি প্রয়োজন হয় নাই ?

মানবের বিবর্ত্তনের ইতিহাসের বর্ত্তমান স্তরে, জাতি (nation) ই সমষ্টিজীবনের প্রকৃত কেন্দ্রস্বরূপ। অবশ্য সাম্রাজ্য যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেগুলি এখনও কেবল রাজনৈতিক সত্তামাত্র লইয়া দণ্ডায়মান ; তাহাদের অভ্যন্তরে অখণ্ড জীবনের ফল্গুস্রোতঃ বহে না, পরন্তু কোন বহিঃশক্তির প্রভাবেই কিম্বা জগ-

তের অন্যান্য শক্তিসমূহের অনুমোদিত কোন রাজনৈতিক সুবিধার কথা বুঝিয়াই খণ্ডগুলি পরস্পর সংযোজিত থাকে। এইরূপ সাম্রাজ্যের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য একটী রাজনৈতিক সুবিধার উপরই নির্ভর করিত এবং কতক পরিমাণে এখনও করে; অন্যান্য শক্তিরা তাহা অনুমোদিত ছিল; খণ্ডগুলিরও কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাতে সম্মতি ছিল এবং জর্ম্মণগোত্রীয় হাপ্‌সবার্গ (Hapsburg) রাজবংশ, ও সহযোগী মেগীয়ার (Magyar) বংশের শক্তি-বলেই খণ্ডগুলি একত্র বিধৃত। সেই রাজনৈতিক সুবিধাটী যদি আর বর্ত্তমানে না থাকে এবং আজ্ কাল যেরূপ হইতেছে, কেন্দ্রাতিসারিণী শক্তি কর্ত্তৃক পরস্পর বিযুক্ত হইয়া প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য শক্তিগুলিও বিরূপ হইয়া উঠে, তবে সেই কৃত্রিম একতা অব্যাহত রাখিতে একমাত্র শক্তিই অবশিষ্ট থাকিবে। অবশ্য অষ্ট্রীয়ার অস্তিত্বের উপর নূতন একটী রাজনৈতিক সুবিধা এক্ষণে নির্ভর করিতেছে—তাহা জর্ম্মণভাবের আনুকূল্য সংসাধন; কিন্তু এ সুবিধা অবশিষ্ট ইউরোপের পক্ষে অসুবিধা মাত্র। পক্ষান্তরে উহারই ফলে আবার কয়েকটী প্রয়োজনীয় উপাদান অষ্ট্রীয়ান সমষ্টির বহির্ভূত সমষ্টির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ঐরূপ ঘটিবামাত্র যে কোন মুহূর্ত্তে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতে পারে; তখন হইতে তাহার অস্তিত্ব, কোনও আভ্যন্তরিক প্রয়োজনীয়তার উপর নহে, কিন্তু প্রথমতঃ অষ্ট্রীয়মেগীয়ারগণের শ্লাভ জাতিগুলিকে বিদলিত করিবার ক্ষমতার উপর, দ্বিতীয়তঃ ইউরোপে জর্ম্মণী ও জর্ম্মাণ প্রভাবের স্থায়িত্বের, অর্থাৎ এক কথায় কেবল শক্তির উপরই নির্ভর করিবে। সাম্রাজ্যগত মিলনের দোষগুলি এই অষ্ট্রীয়ার ক্ষেত্রে সবিশেষ; এমনকি অতিরিক্ত মাত্রাতেই উদাহৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতীয়তার বন্ধন যদি সঙ্গে সঙ্গে না থাকে, তাহা হইলে সাম্রাজ্য মাত্রেরই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে এইরূপ হইয়া থাকে ও তাহাদের সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য। অধিক কাল গত হয় নাই, অধিকাংশ চিন্তাশীল রাজনীতিকের ধারণা ছিল, যে মাতৃভূমির সহিত মূলগত, জাতিগত, ভাষাগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও খুব সম্ভব অচিরে উপনিবেশগুলি আপনাপনি হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে ও ফলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিবার কারণ, এক সাম্রাজ্যগত সমুদয় রাজনৈতিক সুবিধা উপনিবেশগুলি ভোগ করিলেও, তাহারা তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিত না, পক্ষান্তরে ভিতরে একটা জীবন্ত জাতীয়তার বন্ধনও ছিল না, কারণ অষ্ট্রেলিয়া ও কেনেডাবাসীগণ আপনাদিগকে বিস্তৃত বৃটীশ জাতীয়তার অঙ্গস্বরূপ কল্পনা না করিয়া স্বতন্ত্র

জাতিরূপেই বিবেচনা করিত। অবশ্য এই উভয় দিক দিয়াই অবস্থা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও ফলে বৃটীশ সাম্রাজ্যও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

তথাপি, প্রশ্ন এই, রাজনৈতিক ও বস্তুতন্ত্র একতার মধ্যে এইরূপ পার্থক্য-নির্দ্দেশ কি করিতেই হইবে? না করিলে উপায় নাই, কারণ, প্রকৃত গভীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় এবং ইহার উপর অত্যাবশ্যকীয় পরিণামই নির্ভর করে। মনে করা যাউক, অষ্ট্রিয়ার মত একটী জাতীয়তা-বিহীন সাম্রাজ্য যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা চিরতরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে; সে বাহ্য একতা পুনরুদ্ধার কল্পে ভিতর হইতে কোনও প্রয়াসই লক্ষিত হইবে না, কারণ সত্য সেখানে নাই, যাহা আছে তাহা কৃত্রিম রাজনৈতিক সংযোগ মাত্র। অপরপক্ষে, প্রকৃত জাতীয় একতা অবস্থাচক্রে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও চিরকালই তাহার পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠণ করিবার প্রয়াস থাকিয়া যাইবে। গ্রীক সাম্রাজ্য ত সকল সাম্রাজেরই শেষ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রীকজাতি বহু শতাব্দীর পর আবার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-দেহ অর্জ্জন করিয়াছে—তাহার কারণ তুর্কের শাসনছায়ায় অদৃশ্য হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া তখনও বর্ত্তমান ছিল। তুর্ক শাসনাধীন সমুদয় জাতিগুলির সম্বন্ধেই এই কথাটা প্রয়োজ্য, কারণ উক্ত শক্তিশালী শাসনচক্র অনেক দিকে রুদ্রনীতিপরায়ণ হইলেও কখনও অধীনস্থ জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যলোপ করিতে, কিংবা তৎস্থলে অটোমান জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হয় নাই। তাই এই জাতিগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যে যে পরিমাণে স্বকীয় জাতীয়ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে আপনার পুনর্গঠণ চেষ্টা করিতেছে; তাই সার্ভ জাতীয়ভাব, যে যে স্থানে সার্ভের বাস বা প্রভাববাহুল্য সেই সমুদয় স্থান পুনরুদ্ধারে যত্নশীল; গ্রীস, তাহার মূলদেশ, দ্বীপপুঞ্জ ও এসিয়াস্থ উপনিবেশ সমূহে আপনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে; কিন্তু সে সেই প্রাচীন গ্রীসকেই পুনঃসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে না, কারণ এমন কি থ্রেসেও বুলগার জাতীয়তারই প্রাধান্য সমধিক। এইরূপে আমরা ইতালীকেও এতগুলি শতাব্দীর পর পুনরায় অখণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইতে দেখিয়াছি—তাহারও কারণ, ইতালী-রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইলেও তাহার জাতীয়ত্ব কখনও বিনষ্ট হয় নাই। যথার্থ একতা কতদূর কার্য্যকরী নিম্নের উদাহরণ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বহু জাতি কখনও বাহিরে অখণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিলেও, অদৃষ্টচক্র, ঘটনাস্রোত ও তাহাদের আত্মপ্রকৃতি ঐক্যখণ্ডভাবের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও, এমন কি বিভিন্নমুখী শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সহজেই

বিদেশীয় পদানত হইয়া পড়িলেও অবশেষে কিন্তু একমুখী ভাবের বিকাশ ও সাধনা করিয়াছে এবং অনিবার্য্য গতিতে সুসংহত সম্মিলন সংগঠন করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির দাস ছিল, পরস্পর বিরুদ্ধ, অনন্য নিরপেক্ষ, স্বায়ত্তশাসনকারী 'পুর' রাষ্ট্র বা 'প্রদেশ' রাষ্ট্রসমূহের দৃঢ় পক্ষপাতী ছিল কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি চিরদিনই সেখানে বর্ত্তমান ছিল; তাহার বশে কখনও সে রাষ্ট্রমণ্ডলী বা রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টি করিয়াছে, কখনও এথিনীয় বা স্পার্টান প্রভুত্বাধীন হইয়া কেন্দ্রবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং অবশেষে, প্রথমে অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ীভাবে ম্যাসিডনীয় একাধিপত্য স্থাপনে ও তৎপরে এক বিচিত্র প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য রোমক জগতের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গ্রীকো-বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়। ঠিক এই ভাবেই, আমাদের জীবদ্দশাতেই প্রাচীন যুগ হইতে যে জর্ম্মণী বিষম অনৈক্যপূর্ণ ছিল, অবশেষে সে অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধের বিকাশ করিয়া হোহেনজোলার্ণ (Hohenzollern) সাম্রাজ্যরূপে আকারবদ্ধ হইয়া, কি ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ শক্তিসংঘ সৃষ্টি করিয়া তুলিল। আর যাঁহারা বাহিরের শুধু ঘটনাস্রোতঃ নহে, কিন্তু শক্তিসমূহের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা যদি বর্ত্তমান যুদ্ধের একটা পরিণামস্বরূপ, অবিলম্বেই হউক বা দূর ভবিষ্যতেই হউক, জর্ম্মণী সমষ্টির বাহিরে এখনও যে একটী উপাদান (অষ্ট্র-জর্ম্মণগণ) পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাও সম্মিলিত হইয়া গিয়া সমষ্টিটী পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিতে দেখেন, তাহা হইলে তাহাও তাঁহাদের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। অবশ্য উক্ত সমষ্টি হোহেনজোলার্ণ সাম্রাজ্য কিম্বা প্রাসিয়ান আধিপত্য না হইয়া স্বতন্ত্র আকারে সংগঠিত হওয়ারই সম্ভাবনা। উপর্য্যুক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে, শুধু তাই কেন, ইংলণ্ডের অথবা মধ্যযুগের ফ্রান্সের সম্মিলন, কিম্বা মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের গঠন, প্রভৃতি অন্যান্য দৃষ্টান্তেও দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত ঐক্যবোধ এবং বিশিষ্ট মানসিক ভাব-সমষ্টি, প্রথমে অজ্ঞাতসারে আপনার সত্তার প্রয়োজনীয়তা বোধে পরে হঠাৎ বা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক একতা সংগঠনে প্রবুদ্ধ হইয়া অবশেষে বাহিরেও অখণ্ড মূর্ত্তি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে এক একটী স্বতন্ত্র, সুস্পষ্ট, সমষ্টি চৈতন্যই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বোধে তাড়িত হইয়া বাহ্য অবস্থা ও ঘটনাচক্রকে নিয়মিত করিয়া সুগঠিত রাষ্ট্র-দেহ গঠনে প্রয়াস করিতেছিল।

কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র উদাহরণ ভারতের বিবর্ত্তনের মধ্যে মিলিবে। অন্য কোথাও এতগুলি এরূপ প্রবল, জটিল, দুর্জ্জয় অনৈক্যমুখী শক্তির

সমাবেশ হয় নাই ; এই বিবর্ত্তন ধারায় যে সময় লাগিয়াছে সেই সময়টাই বা কি বিপুল ? যে বিঘ্ন ও বিপত্তিরাজির ভিতর দিয়া সেই বিকাশকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহাই বা কি ভয়ঙ্কর। তত্রাপি এই সমুদয় অতিক্রম করিয়া, অনিবার্য্য-তেজে, মানুষ বাধা দান করিলে প্রকৃতির যে অন্ধ, নির্ম্মম, দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় জাগিয়া উঠে তাহারই প্রবল তাড়নায় কার্য্যটী অগ্রসর হইয়াছে এবং অবশেষে শত শত বৎসরব্যাপী ভীষণ প্রয়াসের পর বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতির নিজেরই মনোময় এই মানববন্ত্র যখন তাঁহার কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করিতে থাকে, তখন এমনি করিয়াই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থাচক্রকেই অন্তরাল হইতে নিয়মিত করিয়া অবশেষে অতি সফল যন্ত্ররূপে পরিণত করেন—এক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছেন। সেই প্রাচীনতম যুগের সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্ত্তার আদর্শ, অথবা সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োগ, এই সকল এই একমুখিতার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ। জাতীয় মহাকাব্যদুইটী পড়িলে মনে হয় তাহা বুঝি ইহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কল্পে রচিত হইয়াছিল ; কারণ একটীতে একছত্র-ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রতিষ্ঠা-কাহিনী বিবৃত, অপরটীতে দেশের পুণ্যপূত অতীতের এইরূপই একটী আদর্শ রাজ্যের কথা পরিচিত্রিত হইয়াছে। আর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস স্বদেশী বিদেশী সাম্রাজ্যপরম্পরার কাহিনীমাত্র—উহাদের প্রত্যেকটীই বিভিন্নমুখী শক্তির প্রভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু প্রত্যেকেই সম্মিলনমুখী প্রবৃত্তিকে সার্ব্বভৌমিকের নিকট হইতে নিকটতর পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। আরও একটী দ্রষ্টব্য ঘটনা এই, যে শাসনতন্ত্র যে পরিমাণে বৈদেশিক হইয়াছে, শাসিত জাতির সম্মিলন সাধনে উহা সেই পরিমাণেই কার্য্যকরী হইয়াছে। জাতির মূল প্রদেশে যে একত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং একটী অচ্ছেদ্য প্রাণসূত্র সুগঠিত জাতিরূপে পরিণত হইতে চাহিতেছে ইহা তাহারই একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাইতেছি জাতীয়ত্বের ভিত্তিস্বরূপ মানসিক ভাবটী সুস্পষ্ট রাষ্ট্রবিষয়রূপে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে দুই শতাব্দী বৎসরেরও অধিককাল লইয়াছে কিন্তু এখনও তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহা হইলেও, মূল ভাব সত্য সত্যই বর্ত্তমান বলিয়া, বিপুলতম অন্তরায় ও বিলম্ব সত্ত্বেও, জনসমষ্টির নিজের মধ্যেই মিলননিষ্ঠার একান্ত অভাব থাকিলেও, বাহির হইতে ভীষণ, বিধ্বংসকারী শত বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াও সেই গুপ্ত প্রেরণা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিয়া গিয়াছে। আর ইহাও সাধারণ সূত্রটীরই একটী চরম উদাহরণ মাত্র।

এইরূপে, এই জাতিগঠন প্রণালীতে, বৈদেশিক শাসনতন্ত্র কি পরিমাণে কি

কার্য্য করে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাস এ বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণে পূর্ণ। কিন্তু তন্মধ্যে বিজাতীয় আধিপত্য কোথাও অচিরস্থায়ী ও অসম্পূর্ণভাবে, কোথাও দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পূর্ণভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও নানা আকারে পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে গিয়াছে, অন্যত্র আবার তাহার প্রয়োজন অবসান হইবামাত্র দূরীভূত হইয়াছে; কোথাও বিজিত জাতি বিজেতৃগণকে আপনার সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অন্যক্ষেত্রে বৈদেশিক শাসন অল্পাধিক কালের জন্য গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ পদ্ধতিটী সর্ব্বত্র একই হইলেও, প্রকৃতি স্বীয় চিররীতি অনুসারে ভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী ভিন্নব্যবস্থা করিয়াছিলেন মাত্র। একমাত্র সুইডীশ জাতি ব্যতীত ইউরোপের আধুনিক জাতিগুলির মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহাকে আপনার জাতীয়ত্বের অনুভূতির জন্য আংশিকভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরাধীনতার ছায়ায় কাটাইয়া আসিতে হয় নাই। রুস ও ইংলণ্ডে বৈদেশিক বিজেতৃগণ অচিরে শাসকশ্রেণীরূপে পরিণত হইয়া অবশেষে জাতির সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; স্পেনে ক্রমান্বয়ে রোমক, গথ ও মুরগণের আধিপত্য, ইতালীতে অষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, বলকান প্রদেশগুলিতে তুর্কাধিকার, জর্ম্মাণীতে নেপোলিয়ানের ক্ষণস্থায়ী শাসন-পাশ — এই সকলই ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু এই সমুদয় ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে একটি দারুণ আঘাত, যাহার ভারে হয় জাতির ক্ষীণ আত্মানুভূতি প্রবুদ্ধ হইয়া ভিতর হইতে আপনাকে দৃঢ়গঠিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে, নতুবা যে সমস্ত উপাদান ঐক্যসাধনের প্রবল প্রতিকূলাচারণ করিতেছিল সেইগুলি সেই নিষ্পেষণে পড়িয়া আপন আপন শক্তি, জীবন, যাথার্থ্য হারাইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিটীর একটা আমূল অবস্থান্তর—তাহার নাম, তাহার সাধনা, তাহার সভ্যতা সমুদয়েরই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনও হইয়াছে। ফরাসী জাতীয়ত্ব, বিশেষ এই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন গলজাতি, তাহার দ্রুইডিক (Druidic) সভ্যতা ও পূর্ব্ব মহত্ত্ব সত্ত্বেও বা হয়ত উহারই জন্য, প্রাচীন গ্রীক বা ভারতীয় রাজতন্ত্র কিম্বা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র-নিচয়ের অপেক্ষাও রাষ্ট্রীয় একতা গঠনে অপারগ ছিল। কিন্তু নবীন ফ্রান্সের আজ এই যে অতুলনীয় একতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা গঠন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল তিনটী শক্তির—প্রথম রোমক শাসন ও লাটিন সাধনা, দ্বিতীয়তঃ টিউটনিক শাসক শ্রেণীর আধিপত্য এবং তৃতীয়তঃ সাময়িক ও আংশিকভাবে ইংরাজ অধিকারের আঘাত; তত্রাপি দেখিতে গেলে, তাহার নাম সভ্যতা আজ সকলই পরিবর্ত্তিত হইলেও, আজও

ফরাসী জাতি মূলে সেই প্রাচীন গলজাতিই রহিয়াছে, কেবল তাহার বাস্ক, গেলিক, আরমোরিক বিশেষত্বপুঞ্জ ফ্রেঞ্চ ও লাটিন সংমিশ্রণে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

এইরূপে এই অবিনশ্বর জাতীয়ত্ব-ভাবকেই প্রকৃতিদেবী পৃথিবীময় বিবিধাকারে পরিপুষ্ট ও স্থূল রাজনৈতিক ঐক্যরূপে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। রাজনৈতিক একতাই আসল বস্তু নহে; যেখানে উহা এখনও সুসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, জাতীয়ভাব সেখানেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে ও পরিশেষে নিশ্চয়ই আপনাকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিবে; রাজনৈতিক একতা ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে, কিন্তু তত্রাপি জাতি জীবিত থাকিবে ও দারুণ ক্লেশ, দুঃখ সহ্য করিয়াও মৃত্যুকে অস্বীকার করিবে। পূর্ব্বকালে সর্ব্ব সময়েই জাতি নহে, কিন্তু দল, শাখাজাতি, সম্প্রদায়, প্রাদেশিক সমষ্টি প্রভৃতিই প্রকৃত জীবনকেন্দ্র ছিল। এইজন্য, বৃহৎ জাতিরূপে পরিণত হইতে গিয়া ঐ সকল সমষ্টির যেগুলি আপনাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল অথচ সজীব জাতীয়ত্বেও উপনীত হইতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা সেই কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জাতিই মণ্ডলীকেন্দ্র; অন্য যাবতীয় ক্ষুদ্র সমষ্টিকে হয় ইহার মধ্যে আত্মবিলয় করিতে হইবে নতুবা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। তাই, পূর্ব্বাগত উদ্ভব ও সভ্যতার ঐক্যমূলক সমষ্টিসংস্কার সমূহও ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে না। স্পেনের ক্যাটালোনীয়ানগণ, ফ্রান্সের বৃটন, প্রভেঁসাল ও আলসাসীয়গণ, ইংলণ্ডের ওয়েলশ্‌গণ তাহাদের স্ব স্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিহ্ন এখনও বহন করিতে পারে, কিন্তু স্পেনিস, ফরাসী, ও বৃটিশ—এই বৃহত্তর সজীব জাতিসমষ্টির প্রবল আকর্ষণে ঐ সংস্কারগুলি ভাসিয়া যাইতেছে। এই কারণেই, এ যুগে ভিতর হইতে না মরিলে, এই জাতি-সমষ্টির মৃত্যু হইতে পারেই না। তিনটি প্রবল পরাক্রম সাম্রাজ্যের পদমূলে পড়িয়া ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত পোলাণ্ড মুছিয়া গেল বটে, কিন্তু পোলজাতি মরিল না। চল্লিশ বৎসরব্যাপী জর্ম্মণাধিপত্যের পরও বিজেতৃগণের সহিত উদ্ভব ও ভাষাগত সম্পর্ক থাকিলেও আল্‌সাস তাহার ফরাসী জাতীয়ত্ব বিস্মৃত হয় নাই। আধুনিক যুগেও স্বভাবের এই বিবর্ত্তননীতির প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইয়া বলপূর্ব্বক কোনও জাতিকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস মাত্রই বিফল হইবে ও অজ্ঞতারই পরিচয় দিবে, কারণ তাহারা স্বভাবের ক্রমবিকাশের এই ধারা স্বীকার করে না। সাম্রাজ্যগুলি এখনও বিনাশশীল রাজনৈতিক সমষ্টিমাত্র, জিঙ্গ জাতি অমর, অক্ষয়, এই [illegible]

অস্তরই থাকিবে, যতদিন না কোনও জীবন্ত সমষ্টি গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ সমষ্টিরই শ্রেষ্ঠতর আকর্ষণ শিরোধার্য্য করিয়া, জাতীয়ত্ব আত্মবিলয় করিতে পারে।

তাই, এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন উঠে, অভিব্যক্তিধারায় সাম্রাজ্যই ঠিক সেই অভীষ্ট সমষ্টি কি না। বর্ত্তমান যুগে জাতিই বস্তুতন্ত্র সমষ্টি, সাম্রাজ্য নহে কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধবিপর্য্যয়ের পরিপন্থী হইবে না তাহাও নয়। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,-এরূপ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতে হইলে; সাম্রাজ্যকে রাষ্ট্রীয় সত্তামাত্র না হইয়া সত্য মানসিকভাবের প্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু জাতির বিবর্ত্তন ধারায় বহুক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি উক্তরূপ মানসিক ভাবমূলক একতা গঠিত হইবার পূর্ব্বে রাজনৈতিক একতাই তাহার ভিত্তিস্বরূপ অগ্রে গঠিত হইয়াছে; স্কচ্, ইংরেজ, ওয়েল্সগণের সম্মিলনে বৃটিশজাতির গঠন ইহার অন্যতম উদাহরণ। ইহারই সদৃশ প্রণালী অবলম্বন করিয়া জার্ভার সমষ্টির স্থলে সাম্রাজ্য সমষ্টির প্রতিষ্ঠায় অবশ্য কোনও অনতিলঙ্ঘনীয় বিঘ্ন বিদ্যমান নাই। প্রকৃতি এই সাম্রাজ্যসমষ্টি গঠনে বহুকাল যাবৎ ব্যাপৃতা; দীর্ঘ যুগ ধরিয়া উহাকেই দৃঢ়, স্থায়ী আকার প্রদান করিতে চেষ্টিতা। তাই, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ এই সাম্রাজ্যাদর্শের জাগরণ ও জাতীয় সমষ্টির পরিবর্ত্তে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসসমূহ এখনও স্থূল, প্রচণ্ড, বিভ্রান্ত, নানা দোষে দূষিত হইলেও, ইহা প্রবৃত্তির চির লীলাভঙ্গীর অনুসরণেই দীর্ঘদিনব্যাপী ধীর আয়োজনকে সহসা দ্রুতবেগে পুষ্পিত ও সফল করিবার অভিপ্রায়ের পূর্ব্বসূচনামাত্র। সুতরাং মানবজাতির একতায় আদর্শের সম্বন্ধবিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই সম্ভাবনাটীর বিষয়েই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরিণামস্বরূপ দুইটী স্বতন্ত্র আদর্শ, দুইটী স্বতন্ত্র সম্ভাবনাই সমধিক ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে- হয় স্বাধীন ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের একটী সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নতুবা কয়েকটী বিপুলকায় সাম্রাজ্যসমষ্টির মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর বণ্টনের সম্ভাবনা। এই উভয়ের একটী কার্য্যকরী সমন্বয়ই অবশ্য অদূর ভবিষ্যতের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবপর ঘটনা। অতএব আমাদিগকে স্থিরচিত্তে আজ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে এই সম্ভবপর সমন্বয়ের একটী উপাদান যেমন জীবন্ত ও সত্য, অন্যতর উপাদানটীকেও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র সমষ্টিরূপে পরিবর্ত্তিত করা যায় কি না, এবং এই সমন্বয়ের সংস্থাপন যদি সফল হইয়া উঠে, তাহা স্থায়িত্বশূন্য একটা সাময়িক আয়োজন মাত্র না হইয়া দীর্ঘস্থায়ী অভিনব জগদ্ব্যবস্থারই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হইবে কি না।

বিজয়াদশমী।

সে নসীবাবু নাই, সে প্রসন্ন গোয়ালিনীও নাই, সে জুনিয়ার খোষনবিশেরও কাল হইয়াছে কিন্তু কমলাকান্ত আজও আছে—তার দিনগণা যে আজও শেষ হয় নাই। আর তাই প্রতি বিজয়াদশমীর দিন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে মনে পড়ে। কমলাকান্ত আফিং খাইয়া প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিল তাই সে যাহা দেখিয়াছিল তাহা আর কাহারও ভাগ্যে দেখা ঘটে নাই। অহিফেন প্রসাদাৎ কমলাকান্ত মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির অন্তরালে চিন্ময়ীদেবীকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল, নৈরাশ্যে পাগলপারা হইয়াছিল। তাই প্রতিমা বিসর্জ্জন তাহার প্রাণে যেমন করিয়া লাগিয়াছিল এ ভূভারতে আর কাহারও প্রাণে তেমন করিয়া লাগে নাই। তাই কমলাকান্ত ঐ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আকুল ক্রন্দনে ছয়কোটী সন্তানের হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিল—ব্যাকুল কণ্ঠে মাকে ডাকিয়াছিল—উঠ মা বঙ্গজননি—এই ছয় কোটী মস্তক তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, ছয় কোটী কণ্ঠে তোমার নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই দ্বাদশ কোটী ভুজে তোমাকে মাথায় করিয়া ঘরে আনিব, না পারি এই দ্বাদশ কোটী চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। কিন্তু হায়! মা উঠিলেন না।

কেন উঠিবেন? আমরা ত মাকে দেখিতে শিখি নাই, বুঝিতে শিখি নাই, আমরা যে মাকে একান্তভাবে মৃণ্ময়ী করিয়াই দেখিয়াছি। হায়! কমলাকান্ত, আমরা ত তোমার দৃষ্টি পাই নাই। চিন্ময়ী যে মৃণ্ময়ী হইয়াছেন তাহা ত আমরা বুঝি নাই। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই যে চিন্ময়ী দেবীর প্রকাশ, খেলা তাহা ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। আমরা যে অন্ধ। চক্ষুহীন—মায়ের জন্য কাঁদিবারও যে আমাদের শক্তি নাই। তাই মা উঠিলেন না।

হায় কবে ছুটিবে এই তমসাচ্ছন্ন জীবনের দুরন্ত তিমিরাবৃত অজ্ঞানতা—হলাহলের সুখময় জড়ত্বপূর্ণ তুনিবার নেশা! কবে শিখিব এই মৃত্তিকার অন্তরালে জাগ্রতদেবীকে দেখিতে? কবে শিখিব এ ধরিত্রীর পূজা করিতে? যে মৃত্তিকার স্তন্যরসপানে এ পৃথিবী সুন্দরী সাজিয়াছে,—ফলে ফুলে বৃক্ষ লতায়, সৌরভে গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়া, সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া আনন্দের হাট বসাইয়াছে—তাহার রহস্যভেদ করিয়া জীবনকে অমৃতময় করিতে কবে

শিখিব? মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রাণ সঞ্চরণ করিয়া, সে জলধারা ছুটিয়াছে—সংখ্যাহীন বিহঙ্গমের অনন্ত আকাশের আলোকে সহস্র কণ্ঠের যে কলধ্বনি ফুটিতেছে—সে জলধারার শীতলতা, সে কলধ্বনির মাধুরিমা কবে এ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে? "নেতি নেতি"র কপাট ভাঙ্গিয়া "ইতি ইতি"র বিজয়শঙ্খে কবে সমস্ত জীবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, দৃষ্টি রঙ্গিন হইয়া উঠিবে, বিশ্ব আনন্দময় হইয়া উঠিবে? মায়ের অনন্তরূপ কবে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে? কমলাকান্তের স্বপ্ন ফলিবে সেই দিন।

মা উঠিবেন—যেদিন তাঁর ছয় কোটী সন্তান মাকে দেখিতে শিখিবে, বুঝিতে শিখিবে। যেদিন বুঝিব আমরা এই ধরিত্রিকে—যেদিন বুঝিব এই মৃত্তিকা কত শত সহস্র বর্ষের তপস্যার ফল—যেদিন বুঝিব এই দেহ, এই রক্তমাংস মাতৃদান, মায়ের আজীবন সাধনার ফল—ইহা তুচ্ছ নহে, ত্যাজ্য নহে, অমঙ্গল নহে, কলঙ্কময় নহে—মা আসিবেন সেইদিন দিগন্তে দিগন্তে লোহিতোজ্জ্বল আলোকমালা বিকীর্ণ করিয়া নবরাগরঞ্জিনীরূপে—মা আসিবেন সেই দিন ছয় কোটী সন্তানের চোখে, নিরাশার অন্ধকার দূর করিয়া আনন্দময় জগৎ ফুটাইয়া নবস্বপ্নদর্শিনীরূপে। মা যে আমাদের মৃণ্ময়ী তাই ত তাঁহার অন্তরে স্নিগ্ধ শীতল স্নেহধারা অনন্তকাল হইতে প্রবাহিত। এই মৃত্তিকাকে বুঝিতে হইবে—এই মৃত্তিকার পূজা শিখিতে হইবে। কমলাকান্তের স্বপ্ন সফল হইবে সেই দিন।

"এস ভাই সকল ঐ কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া সন্তরণ করি।" কে আছ ভাই বীর সাধক যার ঐ কাল-সমুদ্রে মাতৃনামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস আছে—এস ঐ কাল-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ করিয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত বিধ্বস্ত করিয়া মায়ের মূর্ত্তিকে মাথায় করিয়া ঘরে আনিব। কে আছ যে নিবৃত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া নাই—কে আছ যে কোটী কোটী নরনারীর অশ্রুসিক্ত ধরিত্রীর এককোলে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার আয়াসের আসনখানি পাতিয়া দিবসরজনী গড্ডালিকা প্রবাহের মত কর্ত্তন করিয়া দিতেছ না—যাহার চক্ষুদ্বয় এই মৃত্তিকাময়ী ধরিত্রীর বৃক্ষশ্যামল পুষ্পকোমল অঙ্গের প্রতি চাহিয়া অবজ্ঞায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে না—আইস তাহারা ঐ কোটী কোটী নরনারীর সম্মুখে মৃত্তিকারূপিণী জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তিখানি ধরিয়া দিতে। যেদিন মৃণ্ময়ীর ভিতর দিয়া চিন্ময়ীর আলোক ফুটিবে সেদিন লক্ষ কোটি নরনারীর নয়নে নয়নে দীপ্তি ছুটিবে, আননে আননে তৃপ্তি ফুটিবে—বাহুতে শক্তি আসিবে, হৃদয়ে ভক্তি উছলিয়া উঠিবে। মানুষ সেদিন অপরাজেয়, অপ্রমেয়, অনিন্দ্য। মানুষের সীমা রহিবে

সেদিন আকাশ—গণ্ডী রহিবে তাহার কল্পনা। কমলাকান্তের স্বপ্ন ফলিবে সেই দিন।

যেদিন মানুষ বুঝিবে চিন্ময়ীদেবী মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিকে ধারণ করিয়া আছেন—চিন্ময়ী ও মৃণ্ময়ী একাত্ম হইয়া, জড়াজড়ি করিয়া আছেন—সেদিন সে দেখিবে এ দেহ এ রক্তমাংস ত তাহার বাধা নহে—এ যে তাহার গৌরব হইতে গৌরবান্তরে যাইবার রথ, এ যে তাহার অমৃত কুড়াইবার স্বর্ণকুম্ভ—দেখিবে তাহার দেহের ভিতর কর্ম্মপ্রবাহ, ভোগপ্রবাহ, ভাবপ্রবাহ—তিনধারা প্রবাহিত হইতেছে, আনন্দকণা চারিদিকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়া—আর সেই ত্রিধারায় অবগাহন করিয়া মানুষ প্রতি নিমেষে আপনাকে পাইতেছে পূর্ণ করিয়া—সার্থক করিয়া। আর কমলাকান্তের স্বপ্নও সফল হইবে সেই দিন।

আত্মকথা।

এই সংখ্যায় প্রবর্ত্তকের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হল—আজ তার হিসাব নিকাশের দিন।

পৃথিবীর মধ্যে থেকে পৃথিবীর সাহায্যেই আমরা মুক্ত হব, পৃথিবীকে জয় কর্‌ব, জরামরণশীল মরজগতেই অমরলোকের প্রতিষ্ঠা কর্‌ব; এমন যাদের উদ্দেশ্য তাদের সবটাই যে পাগলামী একথা আমরা বুঝ্‌তে পারি—আবার এও বুঝ্‌তে পারি, যে সত্যের ঈষণায় আজ আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছি, যে অন্তঃপ্রকৃতির গুপ্ত প্রেরণায় আমরা পৃথিবীর সমস্ত বাধার সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে শক্তির পুণ্যপুলকে নির্য্যাতন দারিদ্র্য এমনকি মরণকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় ফেল্‌তে সাহসী হয়েছি—সে ঈষণা সে প্রেরণা সে শক্তির প্রভাব বড় অল্প নয়, তুচ্ছ নয়, সঙ্কীর্ণ নয়—সে উদার, মুক্ত, অনন্ত—তার মহান্ বিরাট ছায়ায় দাঁড়িয়ে এ গর্ব্ব সার্থক হবে, সফল হবে, পূর্ণ হবে।

আমরা এক সংস্কার থেকে মুক্ত হতে গিয়ে অন্য সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না, আমরা এক দেশের সার্থকতা আন্‌তে গিয়ে অন্য দেশের হৃদয়-রক্ত শোষণ কর্‌তে চাই না, আমরা পৃথিবীর কোন জাতির সহায়তায় আমাদের দেবকার্য্য সংসাধন কর্‌তে চাই না—আমরা চাই—আমরা নিজেরা স্বর্গ হতে সুরধুনীকে মাথায় করে ধরাধামে প্রতিষ্ঠা কর্‌ব, তার কুলুকুলু পুণ্য নিনাদে ভারতের আকাশ প্রান্তর মুখরিত হবে, তার পবিত্র বারিবিন্দু স্পর্শে ভারতের মাটী অমৃতময় হবে, তাতে সোণা ফল্‌বে—ভারতবাসী মায়ের স্তন্যপীযূষপানে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে জগতে অপরাজেয় হয়ে উঠ্‌বে।

নবযুগে ভারতবর্ষ যে বাণী শ্রবণ করেছে, সে মানুষের নয়, কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়, সে মরজগতেরও নয়—সে অপার্থিব, সে বিধাতার, সে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যশঙ্খের গম্ভীর নিনাদ, সে মরজগতে স্বর্গরাজ্যসংস্থাপনের নিগূঢ় সঙ্কেত; তাই আমাদের গতি অপ্রতিহত—পাহাড় ভেদিয়া সাগর ছেঁচিয়া আমাদের পথ প্রস্তুত কর্‌তে হবে—এ যে ভগবানের আহ্বান।

মানুষের কার্য্য প্রথম বাধায় ভেঙে পড়ে, দেবকার্য্য বাধার বাধায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। আমরা আরো বাধা পেতে চাই—ভারতবর্ষ যে দেবতার আহ্বানে জেগে উঠেছে তাহাই সপ্রমাণ কর্‌তে চাই—ভেঙেচুরে ধুলায় মিশে যাক না আমাদের সমস্ত অস্তিত্বটা—যদি আমাদের মধ্যে ভগবদ্ উদ্দেশ্য থাকে সে গজিয়ে উঠ্‌বে সহস্রমুখী হয়ে, ছেয়ে ফেল্‌বে তার শাখা পল্লবে শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবীটাকে; আর আমাদের অহং দিয়ে যদি কিছু গড়ে তোল্‌বার কামনা করে থাকি তবে সেটা এই মুহূর্ত্তেই মিশে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক, নিষ্পেষিত হয়ে যাক, কালের কুলালচক্রে—এ অহঙ্কারের আবর্জ্জনা স্তূপ প্রকৃতির সম্মার্জ্জনী আঘাতে যত শীঘ্র দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল, ততই শ্রেয়ঃ।

আমরা আজ এই এক বৎসর ধরে, অতি ক্ষীণ স্বরে গেয়ে গেছি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে আমাদের হৃদয় সঙ্গীত—আমরা জানাতে চেষ্টা করেছি আমাদের লক্ষ্য কি? আমাদের কিসের আকাঙ্খা? আমরা ইঙ্গিতে বলেছি আমাদের পথে কত বাধা, কত বিভীষিকা, কত বিপদ; জানিনা আজ একজনও আমাদের অস্ফুট বাণী বুঝেছেন কি না—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন কি না—আমাদের মর্ম্মবেদনার অংশভাগী হয়েছেন কি না।

আমরা পরের কথা বলি না—পরের আচরণ অতি কঠোর হলেও সে যে আমাদের সাধনারই অনুকূল, সে যে কালীশক্তিরই বাহ্যাড়ম্বর—বাহিরের এই ঘনঘটা বজ্র উল্কাপাতের নিম্নে থাকিয়াই আমাদের অমৃতের সন্ধান কর্‌তে হবে।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেশের হৃদয় জয় কর্‌তে চাই, আমাদের আদর্শের পথে দেশই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। পুরাতনের গতিবেগকে অন্তর্হিত করে দেশকে নূতনের অধিকারে আন্‌তে চাই। ভগবানের খণ্ড আদর্শ ভেঙে তাঁর পূর্ণস্বরূপের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই। অসংখ্য আত্মবিলয়ের মধ্যে যে কপট আত্মপ্রতিষ্ঠার লোলুপ রসনা বিস্তার কর্‌ছে, তার ভুল ভেঙে দিতে চাই—ব্যক্তিগত জীবনের প্রাধান্যের তলে দাঁড়িয়ে যারা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি কর্‌তে উদ্যোগী তাদের সে পুরাতন প্রথা অপসারিত করে দিতে চাই। চাই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সত্যের উপাসক করে তুল্‌তে—চাই ভোগের ও যোগের সমন্বয় সাধন করে এই জগতেই স্বপ্নলব্ধ সে স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে।

মোহনিদ্রারত ভারতবাসীর কাণে সহসা শ্যামরায়ের মধুর মুরলীধ্বনি বেজে উঠে তাদের একটু বিভ্রান্ত করে তুলেছিল তাতেই অনেক অস্বাভাবিক অবস্থার

মধ্যে পড়ে দেশটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে—অচিরেই এর সমতা আসবে, সমগ্র দেশ সমগ্র আর্য্যসন্তান বিধাতার আহ্বানে শুদ্ধ হয়ে ভগবদ্ নির্দ্দেশেই চলবে—আত্মশক্তির উদ্বোধন করে, ঋতময় জীবনলাভ পূর্ব্বক- সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষকেই দেবলীলার ক্ষেত্র করে তুলবে।

আমরা সারা বর্ষ ধরে এই সঙ্গীতই গেয়ে এসেছি। আমরা এই মহান্ আদর্শেরই উপাসক—আমরা আত্মশক্তির দ্বারাই আমাদের অতীত এক শক্তির উপলব্ধি কর্‌ব—আর সেই মহান্ প্রকৃতির পশ্চাতেও যে পরাৎপর পুরুষ অবস্থান কর্‌ছেন তাঁরই যন্ত্রচালিত হব। আমাদের ভোগও তাঁর আবার ত্যাগও তাঁর—আমাদের আশা আকাঙ্খা উদ্দেশ্য সব তাঁরই নির্দ্দেশে; যখন মানুষের স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা এসে আমাদের এই যোগ ভঙ্গ করবার উদ্যোগ কর্‌বে তখন তাঁরই কথা গেয়ে আত্মজয় কর্‌ব—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।

বার্ত্তা।

বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় চলিতেছে, ইহার কর্ত্তা কে? ভগবান মানেন কি? সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চতুর্যুগের যে ভিন্ন ভিন্ন লীলা রহস্য, ইহার নিয়ামক সেই অদ্বৈত পরমপুরুষ ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এই যে অফুরন্ত খেলা যাহার শেষ নাই সীমা নাই—যাহা অনাদিকাল হইতে অবাধে চলিয়া আসিতেছে—যাহার বিচিত্র লীলাভঙ্গী আমাদের কল্পনা কুহকে পাপপুণ্য ভালমন্দ বলিয়া অভিহিত হয়—আমাদের অহং বুদ্ধির পরিনামে যে বিকাশগুলি প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞানে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়—সে সমস্তই কি ভগবানের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয় না? যাবতীয় কর্ম্মই কি সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছা-সম্ভূত নহে?

* * *

যোগযুক্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তী; আনন্দম্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইহা বুঝিলেই ভগবদ্ ইচ্ছার সহিত সাধকের পরিচয় হয় এবং তখনই সাধক এই সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত পুরুষের মত তাঁহার ইচ্ছায় চলিতেই থাকেন আবার

তাঁহার আদেশমাত্র লীলান্তর গ্রহণ করেন; ইহাই আনন্দ। সাধক অতীত বর্ত্তমান কোন অবস্থাতেই আসক্ত নহেন।

* * *

যাঁহারা পুরাতনকে ধরিয়া আছেন তাঁহারাও যেমন সেই ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছেন—আবার যাঁহারা বালার্ককিরণ প্রকাশে নূতন আশা নূতন ভাব লইয়া জগতে নূতন যুগের আবাহন সঙ্গীত গাহিতেছেন, তাঁহারাও সেই লীলাময় শ্রীভগবানেরই যন্ত্রচালিত পুত্তলিকামাত্র। এ জগতে যোগযুক্ত সবাই—তাঁহার নির্দ্দেশেই সমগ্র বিশ্বের জীবন নিয়ন্ত্রিত—তবে কোথাও কাহারও হৃদয়ে তিনি জাগ্রত প্রকট, কোনখানে তিনি সুপ্ত, মায়াবরণে লুকায়িত; কোন্ মূর্খ বলিবে সাধন বলে, তপস্যা বলে, উৎসাহ বলে—ভগবানের এ সুপ্তি, এ মায়াবরণ ঘুচাইয়া তাঁরে আপন হৃদয়ে জাগ্রতভাবে প্রতিষ্ঠা করিবে। তিনি যে প্রকাশ হয়েন, জ্ঞানচক্ষু দান করেন—ইহা তাঁহার করুণা—ইহা তাঁহার ইচ্ছা—ইহা তাঁহার লীলা. তিনি যোগ যাগ ধ্যান সাধন তপস্যা সকল চেষ্টার অতীত।

* * *

যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধ বালকের মত ক্রীড়াক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন তখনই কলিযুগ। সমগ্র বিশ্বে তখন অজ্ঞানতার পূর্ণলীলা প্রকটিত হইয়া উঠে। স্বার্থপরতায়, নীচতায়, দীনতায় সমগ্র পৃথিবী ভরিয়া উঠে। তখন আত্ম-কলহ, বন্ধুবিচ্ছেদ, দেবতার উপর দারুণ বিদ্বেষ চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হয়। মানবজাতির মধ্যে রক্তপিপাসা জাগ্রত হইয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার—অহঙ্কারী জনগণের ভীম হুহুঙ্কার, দস্যু তস্কর প্রভৃতির ভীষণ অত্যাচারে ধরিত্রী কম্পিত হইতে থাকে। রাজসিক ও তামসিক নীতির পূর্ণানন্দ কলিযুগেই তিনি সম্ভোগ করেন। এই ভীষণ অবস্থা হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য মানবের আর থাকে না—কেননা ইহাই তখন ভগবানের ইচ্ছা—তারপর আবার তিনি সত্যের, আনন্দের, জ্ঞানের যে সাত্ত্বিক ক্রীড়া তাহাই আরম্ভ করেন। ইহাকেই আমরা সত্যযুগ বলি—ইহারই আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি।

* * *

অতীত যুগের একটা গতিবেগ আছে—সে ভাল হউক, মন্দ হউক, বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে আসিয়া তাহার স্বভাব-শক্তির পরিচয় দিবেই। সত্যযুগের চতুষ্পাদ ধর্ম্ম একেবারেই তিরোহিত হয় নাই—ত্রেতা ও দ্বাপর এই দুই দীর্ঘ যুগের দীর্ঘ

জাতির মধ্যে সত্যযুগের মহান্ প্রভাব একেবারে নিঃশেষ হইতে পারে নাই। ভগবান কলিযুগে, আপনার সে মুক্ত ও জ্ঞানময় ভাব সংরক্ষণ করিবার জন্য কোন এক দেশের কতিপয় ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া লয়েন। আমরা চতুর্যুগের বিবরণ দেখিয়া অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারি সে-স্থান পুণ্যপীঠ ভারতবর্ষ —আর সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভারতের ঋষিবৃন্দ।

আজ সমগ্র জগতের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ভারতবর্ষই জ্ঞান-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া সত্যযুগের সে মহান্ সে উদার সে বিশ্বজনীন পথ দেখাইবে—ভারতের ঋষিগণ নবীন বেশে এই দীন ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছেন—তাঁহাদের ভগবদ্ দত্ত প্রভাব বলে ভারতের সংরক্ষণ-যুগের যে সঙ্কীর্ণ দেশগত অনুদার ধর্ম্মমত, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া এই নূতন বিরাট ভগবদ্ ভাবের প্রতিষ্ঠা করিবে—বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মের সকল মতগুলিকে সমীকরণ করিয়া এক অখণ্ড সত্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে—তাই ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইবার উদ্যোগ দেখা দিয়াছে।

ত্যাগের কথা।

আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে, অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হতে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে রাখ্‌তে সক্ষম হয় নি—তাদের আজ লড়াই কর্‌তে হবে এই ত্যাগমন্ত্রের সঙ্গে। অতীত কালের এই যে ত্যাগমন্ত্রের প্রচার—যাতে আমাদের কোন মতামত নেওয়া হয় নি—সেই ত্যাগমন্ত্রের দোষগুণ বিচার করে দেখ্‌বার আজ সময় এসেছে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্ত্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর কর্‌বার জন্যে ঢলে পড়্‌ছে তারা কর্‌বে না—উষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ কর্ত্তে যাচ্ছে তারা কর্‌বে। আমি আহ্বান কচ্ছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নিক্।

আমার বেঁচে থাকার বিপুল পুলকের মধ্যে যে চিন্ময়ী দেবী আসীনা রয়েছেন

সে দেবীর আসন থেকে ত কিছু বাদ দেবার আদেশ আমার প্রাণে পৌঁছুচ্ছে না—সে দেবী যে নিশিদিন আমাকে সমস্তকে আলিঙ্গন করতেই আদেশ কচ্ছেন—আকাশের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে নরনারীর সঙ্গে, যশমানের সঙ্গে, ধন প্রতিপত্তির সঙ্গে, সবার সঙ্গেই প্রেম কর্ত্তে ইসারা কচ্ছেন—কারণ এই সবের ভেতরেই ত ভগবানের বিরাট লীলা মহীয়ান্ হয়ে রয়েছে। আর এই ত হচ্ছে গীতার কর্ম্মযোগ।

শিশুর শরীরের মধ্যে তার হাত পা ছোঁড়ার একটা বিপুল আনন্দ রয়েছে—এতেই তার শারীরিক বিকাশের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয়। শিশুকে তার এই সনাতন স্বভাব থেকে বঞ্চিত করে রাখলে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত ভাল করে গঠিত হবেই না এমন কি শিশু নুলো হয়েও যেতে পারে। মানুষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক হিসাবে ত শিশুই। সেই মানব-শিশুর সনাতন স্বভাব ত আপনার সমস্ত দিয়ে আপনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—তার মন বুদ্ধি চিত্ত প্রাণ সমস্তকে আলগা করে এই বিরাট কর্ম্মের ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া। সেখানে সে আকাশ বাতাস থেকে, নরনারীর কাছ থেকে, স্বভাবের কাছ থেকে সর্ব্বদা যে আনন্দ কুড়ুবে তাতে তার জীবদেহের বিকাশ হয়ে হয়ে জীবনটা অনন্তের দিকেই ধাবিত হবে। তা না করে তার অন্তঃকরণের সনাতন কর্ম্মশীল স্বভাবের উপর একটা মিথ্যা ত্যাগের বোঝা চাপিয়ে দিলে—তার অন্তঃকরণের যন্ত্রসমূহের ত উচ্ছেদ সাধন হবে না—তারা শুধুই নুলো হয়ে পড়ে রে। বুদ্ধি অসীম চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে, নিয়ে থাকবে শুধুই অচঞ্চল অক্ষমতা, মনের বিরাট কল্পনার পরিবর্ত্তে থাকবে শুধুই সঙ্কীর্ণ আকাঙ্খার বহ্নিরাশি, প্রাণকে হারিয়ে আমরা শুধুই হয়ে থাকব এই রক্তমাংসময় দেহের কৃতদাস।

অন্ততঃ আজ আমি ত চোখের সাম্নে এইটেই দেখ্তে পাচ্ছি। যখন আমি আমার দেশবাসীর সঙ্গে প্রতীচ্য জনসঙ্ঘের তুলনা করে দেখি তখন দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমার দেশবাসী যাদের মধ্যে গত কয়েক শত বৎসর কেবল ত্যাগ মন্ত্রের প্রচার হয়েছে, যারা জন্মান্তর বাদ মানে তারা কেমন দৈন্যের সঙ্গে আপন আপন জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আর প্রতীচ্যের জনসমূহ যারা ভোগের অদম্য স্রোতে আপনাদেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, আকাঙ্খায় যাদের জীবন কাণায় কাণায় পূর্ণ, যাদের ধর্ম্ম তাদেকে একবার মর্‌লে আর ফিরে আসবার কোন ভরসাই দেয় না তারা কেমন অবলীলাক্রমে আপনাদের জীবনটা মরে দিতে জানে। আসল কথা হচ্ছে তাদের প্রাণটা সজীব রয়েছে, তাদের

জীবনে শক্তির অনুভূতি রয়েছে। আর আমাদের অন্তঃকরণ অনুভবহীন ত্যাগের বোঝার নিয়ে নুলো হয়ে তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে বসে আছে। তাই আমাদের কাছে জীবন সুখহীন, আনন্দশূন্য—মরণ বেদনাময়, ভীতিজনক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দুরন্ত প্লাবন যে আমাদের জাতিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি তার কারণ, এই হচ্ছে, যে এই জাতির নিম্নে একটা সনাতন ও বিরাট ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে চিরকাল রয়েছে। সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করে আমরা তারি উপরে যুগে যুগে নূতন নূতন ইমারত তৈরী করেছি। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিল্পী এসে সেই পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে সেখানে নূতন ইমারত খাড়া করেছে। আমরা এই নবীন যুগে ত্যাগের সেই পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে সেখানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করব কারণ চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই পুরাতন ত্যাগের ইমারতের কড়ি বরগায় ঘুণ ধরেছে, তার দেয়াল ফেটে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে, তার ভেতরে চামচিকে বাসা নিয়েছে। এই পুরাতন অস্বাস্থ্যকর ইমারতকে ভাঙ্গতে হবে—আর এই নবীনযুগে নবীন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেখানে এক নবীন ইমারত গড়্‌তে হবে। এই আমাদের কাজ। এর জন্যে নবীন যারা তাদের আজ আমি আহ্বান কচ্ছি।

মানুষ যখনই মেশামিশি করে তখন তারা পরস্পরকে কিছু দিয়ে যায়, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায়। ব্যক্তিগত ভাবে এই কথাটা যেমন সত্যি, জাতির পক্ষেও এটা তেমনি ঠিক্। পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে রাষ্ট্রনীতি বলে এক জিনিষের আমদানি হয়েছে। সেটা এদেশের পক্ষে খুবই নূতন। এই রাষ্ট্রনীতি ভাল কি মন্দ সেটা বিচার কর্ত্তে আমরা বসি নাই। তবে এটা পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শের স্বাভাবিক ফল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসঙ্ঘের মধ্যে পাশ্চাত্যের সেই nation গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে। এই nation গঠন কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। কারণ পাশ্চাত্য জাতির জীবনের এটী সার এবং সত্য জিনিষ। এ গড়ে উঠ্‌বেই। এখন আমাদেকে ভগবানে পৌঁছিবার রাস্তাটাকে, দেশের জনসঙ্ঘের মধ্যে এই যে nation গঠনের প্রক্রিয়াটী চল্‌ছে, তার ভিতর দিয়ে ফেল্‌তে হবে—এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সনাতনত্বের এবং সার্ব্বভৌমিকত্বের দাবী জগতের সাম্‌নে কর্‌তে হবে। তা না করে আজ যদি আমরা ত্যাগ ধর্ম্মের প্রচার করে সবাইকে সন্ন্যাসের পথ দেখিয়ে দি—তবে আজ এই জাতি প্রাণের মধ্যে যে স্পন্দনের অনুভূতি পাচ্ছে, তার অন্তরে যে জিনিষটী আজ সত্যরূপে

ছায়া ফেলেছে তার বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বে গিয়ে সে আজ হয়ত মোক্ষলাভও কর্ত্তে পার্‌বে না, অথবা অপর দিকে কেউ কেউ ত্যাগের মন্ত্রে কথঞ্চিত অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে জাতির মধ্যে nation গঠনের এই যে প্রণালী চল্‌ছে তার সঙ্গে আপনাকে মিলাতে পারবে না। জাতির অন্তরে nation গঠনের আজ যে প্রক্রিয়া চল্‌ছে সে স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করে জাতির অন্তর হতে ভগবানকেই হয়ত আমরা দূরে নিয়ে ফেল্‌ব অথবা কেউ কেউ তার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে তার জাতীয় জীবনকে খর্ব্ব কর্‌বে।

কারণ দু-এক জন নিয়ে আর এখন আমাদের কারবার করা চল্‌বে না। পৃথিবীর এম্‌নি সময় এসেছে যে আজ আমাদের কারবার কর্‌তে হবে সমস্ত জাতিটাকে নিয়ে,—সমস্ত জাতিটার কথা ভাব্‌তে হবে। মানুষের ভগবানে অনুরাগ যেমন সত্য ও স্বভাবজ (instinctive) তার ভোগাকাঙ্খা ও কর্ম্মশীলতাও তেম্‌নি সত্য ও স্বভাবজ। এতকাল আমরা এ দুটোকে বিরুদ্ধ করেই মেনে নিয়েছি। মানুষের যে অংশটায় ভোগাকাঙ্খা ও কর্ম্মশীলতা বাস করে সে অংশটাকে আমরা চিরকাল শাসিয়ে এসেছি যে তোমার ভগবানে অধিকার নাই। সেও তাই মেনে নিয়ে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়ে একদিকে ভগবান্ থেকে দূরে চলে গেছে অপর দিকে ত্যাগের ও সন্ন্যাসের চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে শুধুই সঙ্কীর্ণতাকে আলিঙ্গন করেছে, তার জীবনে বৃহতের পরিবর্ত্তে শুধুই ক্ষুদ্রতাকে টেনে এনেছে—অনন্তকে ধর্‌তে গিয়ে শুধুই সঙ্কোচকে বরণ করে নিয়েছে। আজ আমাদের এই ভোগাকাঙ্খা এবং কর্ম্মশীলতার ভিতর দিয়ে এমন কি তাদেকে সহায় করে ভগবানের পন্থা খুঁজে বের কর্‌তে হবে। দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ভোগে দোষ নাই, কর্ম্মে আনন্দ আছে। তাদের প্রাণে প্রাণে এই সত্যটাই ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে যে যখন ছোট হয়ে ভগবানকে লাভ করা যায় তখন বড় হয়েও যায়; দরিদ্র হয়ে যদি তার সত্ত্বা উপলব্ধি করা যায় তবে ঐশ্বর্য্যশালী হয়েও তা করা যায়। নবীন যুগের এই কাজ। আর এই হবে ভারতের Renaissance.

এই Renaissance হচ্ছে আমাদের দেশবাসীর ভবিষ্যত। এই Renaissance না হলে জাতির মধ্যে কতকগুলি লোক তার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আপনার নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক করে নিয়ে এ সংসার ছেড়ে চলে যাবে—আর অবশিষ্ট যারা তারা ভগবানকে হারিয়ে ত্যাগমন্ত্রের বুলি কপ্‌চিয়ে কপ্‌চিয়ে জীবন্মৃত ভাবে আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে

সংসারে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। এতে আমাদেরও কোন মঙ্গল হবে না আর জগতেরও কোন লাভ নাই।

কারণ আমি বিশ্বাস করি যে জগতের প্রতি এই ভারতবর্ষের একটা বিধি-নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য রয়েছে। এই Renaissance না হলে সে কর্ত্তব্য সাধন করা হবে না। ভোগের সঙ্গে ভগবানের সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারলে আমরা জগতকে দিতে পারব না। ত্যাগের সঙ্গে কর্ম্মকে যুক্ত করতে না পারলে আমরা তাদেকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের যে রহস্য তা বুঝাতে পারব না। তাই এই Renaissance এর প্রয়োজন। তাই আমি আজ আমার দেশবাসীকে নূতন করে সাড়া দিতে, প্রাণের মধ্যে নূতন করে সাড়া পেতে আহ্বান কচ্ছি। আজ আমার দেশবাসীর জীবনে কবির বাণী সত্যরূপে ফুটে উঠুক—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

যোগ।

(১০)

এইবার আমি স্থূলশরীরের কথা বলিয়া আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সংযোগে প্রাণশক্তি-এই রক্তমাংসের শরীর যদৃচ্ছা পরিচালন করিতেছে। এই অন্নময় শরীরের কেন্দ্রস্থান মূলাধার পদ্মে; ইহারই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নাভিতলের নিম্নে সূক্ষ্মপ্রাণ বিরাজ করিতেছে—স্থূল ও সূক্ষ্মের ইহাই মিলন কেন্দ্র। প্রাণ বায়ুর বন্ধনে সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের সহিত আবদ্ধ, এই সূক্ষ্মদেহ প্রাণবায়ু সংহৃত করিয়া প্রস্থান করিলে মানুষের মৃত্যু হয়—তখন অপান বায়ু মাত্র থাকিয়া জীবদেহের বিকৃতি উৎপাদন করে। একই বায়ু জীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য করে; প্রাণবায়ুর কার্য্য সূক্ষ্মদেহানুরূপ শরীর রক্ষা করা—তাই সূক্ষ্ম দেহের অবর্ত্তমানে শরীরের শৃঙ্খলা থাকে না—পরন্তু অনন্ত কোটী জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে, দেহ রূপান্তরিত হয়। আমি এ পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের শুদ্ধি বিধানের কথাই বলিয়া আসিয়াছি—মানুষের সূক্ষ্মদেহ কি, না তাহার অন্তঃকরণ—

এই অন্তঃকরণগুলিকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলাই এই যোগের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। শরীর কিছুই নহে, সূক্ষ্মদেহেরই ছাঁচ বিশেষ, মনই এই শরীরকে গঠন করিয়া তুলে, মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মন যদি মুক্ত ও শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই শরীরও শুদ্ধ এবং মুক্ত হইয়া উঠে, মানসিক অশুদ্ধতা নিবন্ধনই আমরা শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা, মৃত্যু প্রভৃতি ভীষণ দ্বন্দ্ব ভোগ করি। সাধন সাহায্যে আমাদের মন যখন অতীত সংস্কার হইতে মুক্ত হয়, মায়ার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলে—তখন জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মভোগ সবেগে শরীরের উপর পতিত হয়—সাধক তখন ইচ্ছা করিয়াই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল শরীর দিয়াই ভোগ করিতে থাকেন, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দৈবিক, ভৌতিক যতবিধ নির্য্যাতন থাকিতে পারে সমস্তই শরীরের উপর ভোগ হইতে থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধকের মন ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া আবার নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে মনের সর্ব্ববিধ অশুদ্ধতা শরীরের উপর ন্যস্ত হইলে, সাধক সেই অন্নময় কোষ হইতেও ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন, এরূপ অবস্থায় সাধক কায়া শুদ্ধি ও কায়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন—ষট্‌চক্রভেদ ও রাজযোগীদের প্রণালীই এ ক্ষেত্রে অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু আমরা যে আত্মসমর্পণ যোগের কথা বলিতেছি, ইহা উক্ত প্রকার সাধন প্রণালী অপেক্ষা সরল এবং সহজসাধ্য এবং নিশ্চয়ই সিদ্ধিপ্রদ। যদি তুমি মনকে শুদ্ধ করিতে পার, স্বভাবতঃই তোমার শরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; যাহার মন পৃথিবীর পাপ হইতে মুক্ত, যাহার—তাহার শরীরও দেবতার মত দ্বন্দ্বাতীত, অমৃতময়; যাহার মনের পূর্ণতা আসিয়াছে তাহার শরীরও অসাধারণ শক্তি-সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে—অন্তঃকরণের ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে, নিশ্চয় তোমার শরীর ঊর্দ্ধগতির পথে পরিচালিত হইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান কালে শরীরের উপর অযথা অত্যাচার করিও না—মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে শরীরের সকল দোষ বিদূরিত হয় না—শরীর যন্ত্রটীকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবে—সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যেন শরীরের সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই—যতটা পার, ইহা শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শক্তির হস্তে যন্ত্র-

স্বরূপ সেইরূপ স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে। অধিকাংশ সাধক এই অবস্থায় শরীরের ভিতর আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, তুমি তাহা কদাচ করিবে না—ভগবানের হাতে এ শরীর দিয়াই এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হইবে; যত উৎকট ব্যাধিই হউক না কেন, বিন্দুমাত্র ভীত হইও না—ইহা যে শরীরের অশুদ্ধতা এবং ঐ অশুদ্ধি বহিষ্কৃত হইয়া গেলে শুদ্ধি আসিবে, এরূপ মনে করিবে। মনে রাখিবে, তোমার বহু কুসংস্কারপূর্ণ জীর্ণ আধার যন্ত্রটীকে ভগবানের কার্য্যোপযোগী করিতে ইহার বহু পরিবর্ত্তন আবশ্যক—সমগ্র নাড়ীযন্ত্র, মস্তিষ্কফোষ পরিপার্শ্বে সে নিঃস্রবণকারী যন্ত্রগুলির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য নানাবিধ শারীরিক অসুবিধা কিছু কিছু ভোগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির জানিও। শারীরিক অসচ্ছন্দতার সময় যদি একান্তই অধীর হইয়া পড় এবং ইহার প্রতীকারের জন্য যদি নিতান্তই ঔষধাদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে যতটা পার খুব সামান্য নির্দ্দোষ ঔষধাদি সেবন করিবে; ব্যাধি দূর করিতে গিয়া উগ্রভাবে শরীরের উপর নূতন অত্যাচার করিও না—মনে রাখিও, "you cannot care more for yourself, than God cares for you"—ভগবান্ তোমার জন্য যেরূপ করুণ, তুমি কদাপি নিজের জন্য সেরূপ ব্যস্ত হইতে পার না। তোমার চেষ্টা তোমার বিপথেই পরিচালিত করিবে—ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি মঙ্গল এবং শুভের পথেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন—সাধকের এটুকু আস্থা না থাকিলে তাহার পক্ষে যোগসাধনা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

শরীরের দোষ ও গুণ বিশদ জানিতে হইলে হঠযোগ কথিত শরীরতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া চাই; তবে মোটামুটী শরীরের অশুদ্ধতা জরা, শীতোষ্ণে সুখ দুঃখ বোধ, মলমূত্র প্রভৃতির আবেগের অধীনতা। একটী পদ্মপত্রে যেমন অসংখ্য শিরা সুবিন্যস্ত, সেইরূপ আমাদের শরীর গণনাতীত সূক্ষ্ম স্থূল শিরা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নাড়ীই সর্ব্বপ্রধান এবং প্রাণ, অপান প্রভৃতি দশবিধ বায়ু এই নাড়ীসমূহে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া আমাদের বাহ্যাবয়বকে সঞ্চালিত করিতেছে। যেমন একই ব্রহ্ম নিখিল ভুবনে বহু বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভব করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুর অহংপরবশ পরস্পর হইতে ভিন্নবোধ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেইরূপ একই বায়ু শরীরের ভিন্ন

ভিন্ন কার্য্য সংসাধনে রত থাকিয়া তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে; হঠযোগদ্বারা সমগ্র বায়ুর কার্য্য একই প্রাণবায়ুর সাহায্যে সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণের ইচ্ছামত সমস্ত শরীর যন্ত্রটীকে পরিচালিত করা অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই অবস্থায় শরীরের শুদ্ধি ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে, সাধক ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার ব্যাধির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন—শীতোষ্ণে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্বভোগ করেন না—মলমূত্র ত্যাগের আর আবশ্যক হয় না, এমন কি কেবল বায়ু আহার করিয়াই অতি দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত থাকিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ইচ্ছামাত্র সাধক আপনার শরীরকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিতে পারেন, আবার সূচের মত সূক্ষ্মশরীরও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন, লৌহের মত গুরু এবং তুলার মত লঘু হইয়া আকাশে পরিভ্রমণও করিতে পারেন, ইহাই অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। কলিযুগে এরূপ অবস্থা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তবে ইহা একান্তই অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবারও কোন কারণ নাই!

আমরা যে যোগ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত উপরি কথিত হঠযোগের কোনই সম্পর্ক নাই, আমরা অন্তঃকরণকেই সর্ব্বপ্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই, পাশ্চাত্য জাতিগণের মতে শরীরের সচ্ছন্দতাই মানসিক উন্নতির একমাত্র কারণ, আমরা ইহা স্বীকার করি না। শরীরের অনুগত মন; এই ধারণা মানুষের মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া দিতে হইবে—আমরা শুদ্ধ মনের দ্বারাই দেবশরীর গঠিত করিয়া তুলিতে চাই। মনই শরীরকে চালিত করিবে, শরীরের অবস্থান্তর মনের দ্বারাই ঘটিয়া উঠিবে, এমন কি জগতের যে নিয়ম মৃত্যু—উহাও যোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে তাই যোগীর হইবে ইচ্ছামৃত্যু। সেইজন্য সাধকের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা কেন্দ্রগত হইবে অন্তঃকরণের উপর—এই অন্তঃকরণের পূর্ণ বিকাশের উপরেই বহির্জগতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে মানুষ হইতেছে বুদ্ধিজীবী, চিত্ত মন প্রাণ শরীর এই সমস্তই বুদ্ধিরই অধীন এবং বুদ্ধিদ্বারাই ইহাদের উন্নতি অবনতি ঘটিতেছে। এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের নূতন যোগ প্রচার করিতে চাই। বুদ্ধির স্বভাবতঃ নিম্নগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাহার সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতে চাই কালীশক্তিকে বুঝিবার জন্য, তারপর এই কালীশক্তির করুণা-

করে, বুদ্ধির মুখের তীব্র উজ্জ্বল আবরণটিকে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিতে চাই এবং তাহারই আলোকে বাঁচিতে চাই —আমরা কে? যখন আমরা অনন্ত কালীশক্তির মন্ত্রটির আর কিছুই নাই এরূপ বলিব তখন সিদ্ধির অসিদ্ধির ঘোষণা করিয়া গর্ভ নিক্ষেপ করিয়া মুক্ত পুরুষের মত বলিয়া উঠিব—আমরা মুক্ত, আমরা শুদ্ধ, আমরা সিদ্ধ।

বিশ্ব-বিমোহিনী সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'র মধ্যে কুরুচির সন্ধান পাইয়া সমালোচক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্যে' এক প্রবন্ধ লেখেন; ইহারই একটু ক্ষুণ্ণ প্রতিবাদ রুচি নাম দিয়া 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় 'অর্ঘ্য' নামক একখানা মাসিক পত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'র পক্ষপাতী; তিনি বলেন আধ্যাত্মিক ভাবে মাকে 'ভুবনমনোমোহিনী' বলিলে ক্ষতি নাই। রুচি ও প্রবৃত্তির কথা। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাহারা বলুন। * * * " ইহার উপর আর কথা নাই। যোগ্য সম্পাদকের যোগ্য উত্তর।

কিন্তু অর্ঘ্য সম্পাদক আমাদের প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ পত্রস্থ করিয়া উক্ত পত্রিকাখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিয়াছেন।

প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধটির নাম "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"। সম্পাদক স্বয়ং এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ মনোরঞ্জনক নহে। সমালোচক মহাশয়ের হৃদয় যে নিতান্ত শুষ্ক ও অগভীর—এই কথাগুলিতেই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় বুদ্ধিহারা হইয়াছেন। নতুবা তিনি সজ্জন হইয়াও লেখককে 'অবুঝ' 'আনাড়ি' 'মূর্খ' প্রভৃতি মধুর বিশেষণে সম্মানিত করিবেন কেন?

লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনে এমন একটা উৎকট অহঙ্কার খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে মানুষ তাহার দুইটী চক্ষের দর্শন ভিন্ন আর কিছু

দেখিতে চায় না—দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধের নিম্নে নামজাদা সাহিত্যিকের নাম দেখিয়াই আজকাল লেখার আদর হইয়া থাকে। কোনক্ষেত্রে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে বেশ মজা দেখা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে 'নারায়ণে' শ্রীঅরবিন্দের নাম সম্বলিত "আর্টের আধ্যাত্মিকতা" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের নাম দেখিয়াই সেই প্রবন্ধটী ঐ একখানি বিখ্যাত মাসিকে আমূল উদ্ধৃত হইল, চারিদিক হইতে তাহার সমালোচনাও বাহির হইতে লাগিল। হায়! হায়! পরে জানা গেল যে সে প্রবন্ধটী শ্রীঅরবিন্দের লেখা নহে পরন্তু নলিনী বাবুর। ইহার পর উক্ত প্রবন্ধটী তত মনোযোগ দিয়া আর কেহ পড়িবেন কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রেও প্রবন্ধকের লেখকগণ সাধারণের নিকট অপরিচিত কেমনা সন্দর্ভের নিম্নে তাঁহাদের নাম নাই—এইজন্যই অর্ঘ্য সম্পাদক নগণ্য কাগজখানার নামোল্লেখ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের মধ্যেও দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া আমরা আর হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী' সঙ্গীতটি কুরুচিপূর্ণ নহে, এই কথা আমরা বলিতে চাহি, এইজন্যই সাধক রামপ্রসাদের গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হয়। সম্পাদক মহাশয় গুরু মহাশয়ের মত বলিয়াছেন, "আগে গানের (রামপ্রসাদের) অর্থভেদ কর, উহার উদ্দেশ্য বুঝ, তাহার পর বলিও"। ভাল। আমরা অর্ঘ্যসম্পাদক মহাশয়ের ভাষাতেই বলি "রামপ্রসাদ মনোমোহিনী লিখিয়াছেন বলিয়া জননীকে মনোমোহিনী সম্বোধন" করিব না—যদিও এই আইন অর্ঘ্য সম্পাদকের।

"জগন্মাতাকে যদিও বা ভুবনমনোমোহিনী বলা যায়, দেশমাতাকে কিছুতেই তাহা বলা যায় না"—একথা স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের। অতএব জগন্মাতাকে ভুবনমনোমোহিনী বলা চলে—এ কথাও স্বীকার করিয়া লইলাম। তারপর একটা "সহজ উদাহরণ" দিয়া বিজ্ঞ সম্পাদক আমাদের বুঝাইয়াছেন, কেননা কঠিন উদাহরণ ত আমাদের বুঝিবার বুদ্ধি নাই। তিনিই একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "যাহারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হয়, তাহাদের মস্তিষ্ক বলিয়া জিনিষ ত নাই"—তা আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হই আর না হই—ইহাই সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা। কিন্তু তিনি যে উদাহরণ দিয়াছেন, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' হইতে উদ্ধৃত,—

ব্রজেশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গরাজ বলিল, "আমাদের মা

ভগবতীর তুল্য" ।—এই কথার উপর টিপ্পনী কাটিয়া অর্ঘ্য-সম্পাদক বলেন, "কৈ বঙ্গরাজ এখানে ব্রজেশ্বরের কথার উত্তরে বলিতে পারিল না—'মা আমার ভুবনমনোমোহিনী'।"

এক্ষণে এই আনাড়ি লেখক যদি দেখাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং জগন্মাতাকে নয়, বঙ্গভূমিকে দেশমাতৃকাকে বিশ্ববিমোহিনী বলিয়াছেন তবেই রক্ষা তখন লেখককে যে সকল মধুর সম্ভাষণে সম্পাদক মহাশয় সম্ভাষিত করিয়াছেন তাহা কোন পক্ষে প্রযুজ্য—তাহার বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর।

কমলাকান্ত আফিঙ্গ চড়াইয়া সপ্তমী পূজার দিন প্রতিমা দর্শনে বাহির হইলেন—মৃণ্ময়ী প্রতিমার মধ্যে দেশমাতৃকার সন্ধান পাইয়া তিনি স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্তবের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন,—

"দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুনাশিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা"।

ইহার উপর ত আর কথা নাই—তারপর ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিতেছেন—,

"তুমি এই অনন্ত জলনওল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ সমীপে প্রকাশ কর।"

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি 'ভুবনমনোমোহিনী' আর 'বিশ্ব-বিমোহিনী'র মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি?

এই সকল অসার আলোচনায় প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে আমরা বেদনা অনুভব করি কিন্তু বাধ্য হইয়া এইটুকু লিখিতে হইল।

ভুবনমনোমোহিনী *

কবি গেয়েছেন,— "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী!"

এই পবিত্র গানটি এ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাণে ভক্তি-রসেরই উদ্রেক করে আসছিল; কিন্তু হঠাৎ শোনা যাচ্ছে যে কোনো কোনো সমালোচকের অন্তঃকরণে ইহা দুষ্ট রসের সঞ্চার করেছে!—মাকে নাকি ভুবনমনোমোহিনী বলা চলে না!

যাঁর চরণতল নীলসিন্ধুজলবিধৌত, যাঁর শ্যামল অঞ্চল অনিলকম্পিত, যাঁর উন্নত ললাট হিমাচলরূপে অম্বরচুম্বিত, যাঁর গগনে বিশ্বসভ্যতার প্রথম প্রভাত যাঁর তপোবনে প্রথম সামগান, যাঁর বনভবনে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রথম প্রচার

* ভারতী—পৌষ

যিনি অন্নপূর্ণারূপে দেশ ও বিদেশে অন্নবিতরণ করছেন, সেই আমাদের নির্ম্মল-সূর্য্যকরোজ্জ্বলা ধরণী-রূপিণী জননী যে ভুবনমনোমোহিনী, তাতে আর সন্দেহ কি? রূপ বলতে কি শুধু কটাক্ষচঞ্চলা যৌবনপ্রধানা ষোড়শীর মাংসরক্তের রূপই বুঝায়? মাতৃত্বের কি পবিত্র রূপ নেই? সে রূপ কি ভুবনমনোমোহন হতে পারে না? তা-ছাড়া, প্রত্যেক হিন্দু যাঁকে দেশমাতৃকার চেয়ে অনেক বড় মনে করে থাকেন, সেই জগন্মাতাকে ষোড়শী ভুবনেশ্বরীরূপে পূজা করবার পদ্ধতি এ দেশের সাধকেরা কি প্রতিষ্ঠা করে যাননি? কবির দেখা মাতৃত্বের যে রূপের মধ্যে পরতে-পরতে পবিত্রতা ফুটে উঠেছে, যে মাতৃত্বের বন্দনায় দেশবাসীর হৃদয় ভক্তিপ্লাবনে প্লাবিত হয়েছে, তার মধ্যে যিনি কুৎসিত ইঙ্গিতের আরোপ করতে এতটুকু লজ্জিত হন না, বঙ্কিমের ভাষায় তাঁকে বলতে হয়—"কবি এখানে অশ্লীল নয়, এইখানে পাঠকের হৃদয় নরক!"

কেবল রবীন্দ্রনাথই যে দেশ-জননীকে ভুবনমমোনোহিনী বলেছেন, তা নয়। আধুনিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নীচের লাইনটি লেখবার সময়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচের ভাব মনে আনেন নি:—"জননী, জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ!"

অন্যত্রও তিনি দেশজননীর "মনোমোহন রূপ" দেখতে একটুও লজ্জাবোধ করেন নি। কারণ এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই। তারপর, আমাদের প্রাচীন সাধক কবিদেরও সকলেই জননীকে এইভাবেই বন্দনা করেছেন। যথা, রাম-প্রসাদী গানে:—

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।"

সাধক কমলাকান্তের শ্যামা-সঙ্গীতেও ঐ একই কথা শুনি:—

"কালি জগমনোমোহিনী মুক্তকেশী।
মায়ের বদনশশী, মধুর হাসি
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥"

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা, তারা ও অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে জগন্মাতাকে সম্বোধন করে, সেই সকল রূপের মধ্যেই দেশমাতৃকার রূপ দেখেছিলেন। ধর্ম্মসাধকের হৃদয়ে শ্যামার যে আসন, স্বদেশ-সাধকের কাছেও জন্মভূমির সেই আসন। দু-জনেই প্রাণের আবেগে বিভোর হয়ে বলেছেন, "আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো।" এমন স্বর্গের আলোয় যে মনের কালো যায় না, সে মন অতি ভয়ঙ্কর কুৎসিত মন বলতেই হবে।